শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

নীলকণ্ঠ

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

প্রথম প্রকাশ

গুরু-পূর্ণিমা, ১৩৬৮

প্রকাশনা : সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৬০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

মুদ্রণ : কৃষ্ণশঙ্কর বসাক
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫-বি, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : ফাইন প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪২, মহেন্দ্র গোসাঁই লেন, কলিকাতা-৬।

" ব্লক : কলার ষ্টুডিও,
৪২, মহেন্দ্র গোসাঁই লেন, কলিকাতা-৬।

" শিল্পী : শিবনারায়ণ নিয়োগী
৬, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন, কলিকাতা-২।

বাঁধাই : দীপক বুক বাইণ্ডার্স,
১৫-বি, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সংঘ
৬০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, মহেশ লাইব্রেরী,
সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তক ভাণ্ডার।

মূল্য : ছয় টাকা

আবাহন

সৃষ্টির অনাদি কাল হতে
সুনীল জলধি বক্ষ প্রলয়ের বিক্ষোভে উত্তাল,
নব নব সৃজনের আনন্দ-লীলায়
ত্রিভুবনে সঞ্চারিত বেদনার ঘন মেঘজাল।...

অমৃতের সন্তানেরা অমৃতের চাহে আস্বাদন,
নিরন্ধ্র নিশীথে তবু দুষ্কৃতের প্রমত্ত নর্তনে
সুধাস্রোতে সমুত্থিত সুতীব্র গরল;
জর্জরিত, নিপীড়িত প্রাণ কাঁদে : কোথা নারায়ণ!...

গুরুদেব! হে অনন্ত, আত্ম-সমাহিত—
ত্রিসংসারে পুঞ্জীভূত যত হলাহল
নিঃশেষে শুষিয়া তব 'নীলকণ্ঠ' নাম!
ওই জটারাশি হতে পূত ধারা নিত্য প্রবাহিত,
নির্ঝরিণী প্রাণগঙ্গা পতিতপাবনী :
নির্ভয় কৃতার্থ সেথা বিশ্বপ্রাণ হয়ে অভিস্নাত।...

তুমি রুদ্র, বিশ্বত্রাস—তুমি শিব পরম দয়াল :
দুর্বৃত্তের অট্টহাস্য স্তব্ধ কর মেলি ত্রিনয়ন,
চূর্ণ কর যত দম্ভ, ব্যর্থ কর কুচক্রীর ভ্রূকুটি ভয়াল—
পীড়িতের আর্তনাদে দাও সাড়া করুণা-নিধান,
বিশ্বভরা বিষরাশি করিয়া হরণ
অমৃতের ভাণ্ড হস্তে নরত্রাণ 'নীলকণ্ঠ' এস ভগবান!...

—তোমারই গঙ্গানন্দ

গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছে ঃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ	··· প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ডায়েরী
আচার্য প্রসঙ্গ	··· সারদাকান্তজীর প্রকাশিত ডায়েরী
শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু লীলানুস্মৃতি	··· ৺দ্বারিকা নাথ রায়
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ	··· ৺অমৃত লাল সেন
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত	··· ৺অমিয় কুমার সান্যাল

Brahmachari Kuladananda

—Dr. B. M. Barua, D. Litt. (London)

ছাত্রদের কুলদানন্দ	··· ৺হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
অমৃত প্রসঙ্গ	··· জিতেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রাক্-কথন

পৌনে পাঁচশো বছর পূর্ব্বের কথা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া আসিলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে। দেশবাসীকে চোখের জলে না ভাসাইয়া শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে নির্জ্জন বনে তপস্যা করিতে মহাপ্রভুকে বারংবার সাশ্রুনয়নে সকাতর অনুরোধ জানাইলেন অদ্বৈত প্রভু। কিন্তু মহাপ্রভু কিছুতেই সম্মত না হইয়া অগত্যা নীলাচলে যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। দুঃসহ বিরহতাপে ও সুগভীর অভিমানে অদ্বৈত প্রভু তখন মহাপ্রভুকে দিলেন অভিসম্পাত :

"...মোর বংশে পুনরায় জন্মিতে রহল দায়,
এবহি না হবে কার্য্যশেষ ;
না পূরিবে মনোআশা, সফল হবে না আশা,
হোক না হে সন্ন্যাসীর বেশ।
দশদিন মোর ঘরে কাটাইলা এহিবারে,
দশ জন্ম ইথে হবে বাঁচা ;
দশম পুরুষে মোর জনমিতে হবে তোর,
সত্য সত্য এহি বাক্য সাচা।..."

এ তো অভিশাপ নয়—ভগবানের প্রতি ভক্তের অখণ্ড দাবী। শান্তভাবে অদ্বৈত প্রভু অতঃপর নিবেদন করিলেন :

"...ব্রহ্মজ্ঞান লভি হবে আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান
শুদ্ধচিত্তে বিলসিবে তুহুঁ ভগবান।
আপনি আচরি এহি ত্রিতত্ত্ব নিভৃতে
ঘরে ঘরে সে সাধনা হবে বিলাইতে।..."

ভক্তের প্রার্থনা ভগবান চিরদিনই পূর্ণ করেন। কলিহত জীবের জন্য অদ্বৈত প্রভুর আকুল নিবেদন এবারও পূর্ণ করিলেন ভগবান শ্রীচৈতন্য। বলিলেন :

"...তবহি যে কিছু কার্য্য সব মোর শিরোধার্য্য,
আরাধনা অভিশাপ—দুই সমতুল ;

এবহি আনলি সাথি, ভবিষে আওব যদি
তোমারি আকাঙ্ক্ষা সেই জনমের মূল।
তুমি আর এ নিতাই যুগে যুগে মোর সাঁই,
একেলা কোথা না যাই বিনা তব সঙ্গ;
পুনহি আওব যদি তুয়া দোঁহে রবে সাথী,
এক দেহে ত্রিমুরতি—নবীন ত্রিভঙ্গ।…"

শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল হইবার নয়। যথাকালে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন তিনি।

অদ্বৈতপ্রভুর নবম বংশধর প্রভুপাদ আনন্দকিশোরের কঠোর সাধনা সিদ্ধ হয়। পুরীধামে ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন: "তুই বাড়ী যা। আমরা দুইজনে তোর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

সেই প্রত্যাদেশক্রমেই আনন্দকিশোরের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ। শ্রীমন্ অদ্বৈতপ্রভুর দশম বংশে পুনরাবির্ভাব হইল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর।

যুগ প্রয়োজনে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৪১) আবির্ভূত হইলেন চিরন্তন-ভারত-সত্তা আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ রূপে।

এই সময়েই বাংলা তথা ভারত বুঝিবা নিখিল বিশ্বেরই অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বীজ উপ্ত হইতেছিল সরস শ্যামল বাংলার উর্ব্বর বুকে। শ্রীঅরবিন্দের ইঙ্গিত: "There are moments when the spirit moves among men and the breath of the Lord is abroad upon the waters of our being." বিগত শতাব্দীর মধ্যাহ্ন কালটি ছিল এমনি যুগান্তকারী মুহূর্ত্ত। বস্তুতঃ এই শতকটি মানুষের ইতিহাসে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অধ্যায়। অলোকসামান্য প্রতিভার সমাবেশ ও শোভাযাত্রার এমন উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বিজয়কৃষ্ণ-জন্মের আগে ও পরে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বছরও নিষ্ফলা যায়নি। ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি ও রাজনীতি জীবন বিকাশের সর্ব্বক্ষেত্রেই এক বা একাধিক দিকপালের আবির্ভাব জাতির ভাগ্য-বিবর্ত্তনের আলোকদিশারী হইয়া আছে। এই শতাব্দীর বিরাট ব্যক্তিত্বের ভীড়ের মাঝে অতিমানবীয় শক্তিধর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া মুষ্টিমেয় যে কয়জন চিহ্নিত তাঁহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম।

পঞ্চদশ শতকের গৌড়বঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যোতির্ম্ময় আবির্ভাব নিখিল

ভারতে যে উন্নত উজ্জ্বল রসের প্লাবন বহাইয়াছিল, তাহার উদ্বেলিত সংবেগ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গতিহীনতায় নিঃসাড় হইয়া পড়ে। ম্রিয়মান সমাজ প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব হইয়া দ্বেষ-বিদ্বেষ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির নোংরামিতে বিষায়িত হইয়া উঠে। মোটের উপর মুসলমান আমলের শেষ ও ইংরাজ আগমনের সন্ধিপর্ব্বে ধর্ম্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্বাজাত্যবোধের নির্দ্দিষ্ট কোন রূপই ছিল না। এমনি শূন্যতা, এমনি গতিহীনতার মধ্যে অপ্রত্যাশিত-ভাবেই ইতিহাসের মোড় পরিবর্ত্তিত হইল পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খৃঃ)। ইতিহাসের বিবর্ত্তনে বুঝিবা ইহার প্রয়োজনও ছিল।

বিজয়ী ইংরাজ বণিকের সঙ্গে অনুপ্রবেশ করিল নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা, আর ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাণোচ্ছ্বাস। প্রতীচ্য ভাব ও ভাবনার প্রচণ্ড সংঘাতে দীর্ণ-জীর্ণ, স্তব্ধ, শূন্যগর্ভ জাতীয় জীবনের মর্ম্ম আলোড়িত হইয়া উঠিল।

যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহনের কণ্ঠে এই নব জাগৃতির প্রথম পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হইল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে (১৮০০ খৃঃ)। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে রাজার পতাকা, তাঁর ভাব ও আদর্শ অগ্রবহ করিয়া লইয়া চলিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ, যাঁহারাই পরবর্ত্তীকালে জাগ্রত বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিকে দিকপাল হিসাবে আজও স্মরণীয় হইয়া আছেন।

বাংলার এই রেনেসাঁর মুল উপাদান আমদানী হইয়াছিল পশ্চিম হইতে এবং ইহার বাহন ছিল ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষা। ইংরাজী শিক্ষার অনুভাবনায় একদিকে জন্ম লইল দেশপ্রেম (patriotism), অন্যদিকে ইহার প্রখর স্রোতাবেগে টলটলায়মান হইয়া উঠিল এদেশীয় প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, পূজা-পার্ব্বণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, সামাজিকতা। ধর্ম্মান্তর গ্রহণেরও হিড়িক পড়িল। স্থিতিশীল সমাজপ্রাণ শঙ্কিত, সচকিত হইয়া উঠিল। এই স্থিতি ও গতি, স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্রতার সংঘর্ষ রকমফেরে আজও চলিয়াছে।

বিগত শতকের মধ্যভাগে এই সাংস্কৃতিক সংঘাত তীব্র হইয়া উঠে। ইহাই চরমতম শ্রদ্ধা-সংকটের যুগ। অশনে-বসনে, ভাব ও ভাবনায়, আদর্শ ও জীবন-চর্য্যায় ইংরেজিয়ানার স্পর্দ্ধিত প্রভাব প্রতিপত্তি। ইতিহাসের বিবর্তনের পথেই এই সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের উৎপত্তি, প্রসার ও প্রতিপত্তি। বস্তুতঃ অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী ব্রাহ্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়াই সে যুগের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির সাধনা আবর্ত্তিত হইয়াছে। তখনকার কালে এমন গননীয় মন ও মনীষা ছিল না যাহা এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে নাই।

বিজয়কৃষ্ণ-জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ (২৫ বৎসর) এই আন্দোলনের সহিত ছিল সক্রিয়ভাবে সংজড়িত। এই আন্দোলনের স্মরণীয় স্তম্ভস্বরূপ ধারক-বাহক যাঁহারা গোসাঁইজী শুধু তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি ছিলেন এ-যুগের সেই চিহ্নিত মৌলিক মহাপুরুষ যিনি চিরকালের ভারতের লুপ্ত ছিন্ন সনাতন সূত্রটি পারম্পর্য্যক্রমিক শৃঙ্খলে পুনঃ সংযোজন করেন। ব্রাহ্ম ও বিদ্রোহী বিজয়কৃষ্ণ-জীবনের এই নিগূঢ় অভিসন্ধিটি আজও পর্য্যন্ত অনালোকিত ও অনালোচিতই রহিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গোসাঁইজীর লীলাময় জীবনের এই 'মিশন'টি প্রলয়পয়োধির উত্তাল তরঙ্গায়িত গর্ভ হইতে বেদোদ্ধারের সহিত তুলনীয়।

অবিস্মরণীয় কালের অন্ধকার হইতে ভারতবর্ষ আজিকার স্মরণীয়কালে উপনীত হইবার পথে বারবার তাহার নিরবচ্ছিন্ন গতি অবচ্ছিন্ন হইয়াছে, অবরুদ্ধ হইয়াছে, বিক্ষুব্ধ-বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বিদেশীর অভিযানে আর বিজাতীয় ভাব-সংঘাতে। তথাপি ভারত-সত্তা আপনহারা হইয়া নিঃশেষ হয় নাই। যুগে যুগে এই ভারত-সত্তাই মূর্ত্ত প্রকট হইয়া ভারতের এই অধ্যাত্মধারাকে ক্রমপরম্পরায় অগ্রবহ করিয়া কাল হইতে কালান্তরে বহিয়া আনিয়াছেন এবং ইহাকে যুগধর্ম্মের উপযোগী বেশ পরাইয়াছেন। ইঁহারাই যুগাবতার—যুগগুরু। শ্রীচৈতন্যের প্রায় চারিশত বৎসর পরে পুণ্য ভারতভূমি যে পশ্চিমী সংঘাতের সম্মুখীন হয় তাহা তীব্রতা ও গভীরতায় অভূতপূর্ব্ব বলা চলে। খুব সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে এযুগের ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, এ-শতকে আত্মস্থ হইবার বহু এবং বিচিত্র প্রযত্ন ও সিদ্ধির মধ্যে ভারতের অমিশ্র মুল সুরটি প্রধানতঃ বিজয়কৃষ্ণের চিহ্নিত আধার আশ্রয়েই অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতের এই নিগূঢ় মর্ম্মের ইতিহাস এখনও ঠিক লিখিত হয় নাই। এমন কি তেমন সুস্পষ্টভাবে হয়তো বা উপলব্ধও হয় নাই।

পারাপারহীন সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ অতল তলের যে অন্তঃস্রোত তাহা সাধারণতঃ কাহারও চোখে পড়ে না। উপরের চঞ্চল তরল, বুদ্‌বুদ্ আর ফেনপুঞ্জই সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হয়। একটা জাতির বিশেষতঃ সুপ্রাচীন ভারতজাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবন আছে। তাহার এই আন্তর প্রাণস্রোতই এ জাতিকে কালাতীত আয়ু দিয়াছে। ভারতের খাঁটি ইতিহাস এই অন্তর্জীবনেরই ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের কথা; "ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্ব্বপ্রধান ঘটনা তাহা তাহার গর্জ্জন

সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। * ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনী মাত্র। * পাঠান-মোঘল, পোর্ত্তুগীজ ফরাসী ইংরাজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। * বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা ঝড়ের কথাই পাই। * কিন্তু বিদেশ যখন ছিল, দেশ তখনও ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপদ্রব্যের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, ইঁহাদিগকে জন্ম দিল কে ?"

বাংলার বিগত শতকের বিচিত্র প্রাণচাঞ্চল্য, অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ব্রাহ্ম-আন্দোলন ছিল একটা প্রসবেরই গর্ভবেদনা। রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ ইহারই সুফল। বিজয়কৃষ্ণের জীবনের চমৎকারিত্ব এই যে, এই সময়ের ভাঙ্গা-গড়া, সংস্কার-সংহারের সঙ্গে বিদ্রোহী বিজয়কৃষ্ণের পঁচিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সক্রিয় সহযোগ অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার বিরাট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিতই শুধু করে নাই, অধিকন্তু তাঁহাকে স্মরণীয় ও সমপুজ্য করিয়াছে সনাতন ভারতের পুনর্জ্জন্মের আশ্রয়ী হিসাবে। এই সনাতন ভারত-তত্ত্বটি এখনও অনুধ্যেয়। ইহার প্রকাশ অবশ্যই কালসাপেক্ষ। চৈতন্যোত্তর কালে অনাগত অধ্যাত্ম ভারতের অমিশ্র অভ্যুত্থানের প্রথম পথিকৃত গোসাঁইজী। ইহার উষাকাল সবে সুরু হইয়াছে। সনাতন ভারতের নব-জাগরণের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের বিরাট পুরুষ ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। সম্ভবতঃ বিজয়কৃষ্ণ-জীবনের এই দিগদর্শন দিতে গিয়াই শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছেন : "The truth of the future that Bijoy Krishna Goswami hid within himself has not yet been revealed utterly to his disciples. A less discreet revelation prepares, a more concrete force manifests , but where it comes, when it comes none knoweth."

গোসাঁইজীর জীবনের নিগূঢ়, অন্তর্নিহিত, নেপথ্যশায়ী মহাসত্যটি যে এখনও ঠিক ঠিক উদ্‌ঘাটিত হয় নাই তাহা তাঁহার সম্পর্কিত ইতিহাসের আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি ও ঘটনার ইতিহাসে গোসাঁইজী গৌণ হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ইতিবৃত্তে বিজয়কৃষ্ণের স্থান হয় নাই, বরং ব্রাহ্মধর্ম্মত্যাগী বলিয়া তাঁহাকে বাদই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য সন্তান অনুরাগীদের পূজার পুষ্পাঞ্জলিতে গোসাঁইজীর ভাবমধুর সদ্‌গুরু স্বরূপটি প্রকাশিত হইলেও তাঁহার সামগ্রিক ভারততত্ত্ব মূর্ত্তিটি ঢাকা পড়িয়াছে। বিগত শতকের মধ্যাহ্নে গোসাঁইজীর আবির্ভাব আর সায়াহ্নে স্বল্পকালস্থায়ী তাঁহার লীলাবিগ্রহের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ পুঞ্জীভূত মেঘগাত্রের রূপালী রেখায়

বিদ্যুৎ-ঝলকের মতই অপ্রকট হয়। গোসাঁইজীর ভাববিগ্রহটি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া কালান্তরে ছিল প্রসারিত। তাঁহার বলিষ্ঠ চরিত্রের অনমনীয় অনন্যসাধারণতা, অনাপোষী সত্যানুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠতা, আশংস-গর্ভতা ও গুরুভাবগাম্ভীর্য্য এমনই ছিল যে, সমসাময়িক কালের পক্ষে গোসাঁইজীকে গ্রহণ করাও যেমন দুঃসাধ্য ছিল, বর্জ্জন করাও তেমনি অসাধ্য ছিল। এই হেতুই বুঝিবা বিজয়কৃষ্ণ-জীবনের গভীরতার পরিমাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও ঠিক ঠিক হইতে পারে নাই।

বর্তমান ও বিগত শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বিজয়কৃষ্ণ বিদ্রোহী হন। দেহাবসানের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের লীলা শেষ হয় নাই ; বরং এই সময় হইতেই তাঁহার ভাব-সত্তার যাত্রা শুরু হয়। বিজয়কৃষ্ণের চিন্ময় সন্মূর্ত্তি বিকাশ-ব্যঞ্জনার অপেক্ষায় এখনও স্ফুটোন্মুখ। তাঁহার সনাতন সত্তাবটি যুগনদ্ধবাহী হইয়া কালের পথে পরিক্রমারত। ঊনিশ শতকের শেষ দশক হইতেই প্রতীচ্য ভাব-প্রভাবিত যুগ-প্রবৃত্তি ভারতের অনুকূলে সুস্পষ্ট দিক-পরিবর্ত্তন করে। সনাতন ধর্ম্ম তথা হিন্দুত্বের এই পুনরভ্যুত্থানই বিংশ শতকের গোড়ায় জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে, যাহাই ক্রমপুষ্ঠ ও পরিণত হইয়া সহিংস ও অহিংস বিপ্লবের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের হেতু হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে শিরোধার্য্য করিয়া বিবেকানন্দ ঠাকুরের ভাবময় সত্তাকে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন দেশ-দেশান্তরে। ভারতীয় পুনর্জ্জাগরণের আত্মসম্বিতে অভী হইয়াই বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মসভায় ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন : "I go forth to preach a religion of which Buddism is nothing but a rebel child and Christianity is but a distant echo." অপর দিকে বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালেই শতাব্দীর সমস্ত কলুষকালিমা নীলকণ্ঠের মতই আকণ্ঠ পান করিয়া বিজয়কৃষ্ণ দিলেন ভারতের সনাতন ধর্ম্মধারার মুক্তি। সেই ভাবগঙ্গায় মুক্তিস্নান করিয়াই পরবর্ত্তী শতকারম্ভেই বাঙালী সাহিত্য-শিল্প, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম্ম-রাষ্ট্র জীবন-বিকাশের সর্ব্বক্ষেত্রেই কলকাকলি-মুখর হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষিত মানস সন্তান বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একদিকে দিকপাল। চরিত্রে, চিন্তায়, চর্চ্চায়, ভাব ও ভাবনায় ইঁহারা গুরুগৌরব রক্ষা করিয়া জাতির আলোকদিশারী হইয়া আছেন। বিপ্লব যুগের অগ্নিসাধক ইঁহারা প্রত্যেকেই ইতিহাস-স্রষ্টা। গোসাঁইজীর উপলব্ধির আলোতে যে আচার্য্য-পারম্পরিক

সনাতন ভাববিগ্রহটি ফুটিয়া উঠে তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া তিনি দিব্য জীবন, সমাজ ও জাতির অভ্যুত্থান চাহিয়াছিলেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্মই ছিল তাঁহার কাছে জাতীয়তা। গোসাঁইজীর অনুগামীদের জীবন-সাধনার বৈশিষ্ট্যও ছিল ইহাই। গোসাঁইজীর অপ্রকট হইবার এক যুগ পরে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যেও চিরন্তন ভারতের এই অভিব্যক্তির চাওয়াটি পুনরুপলব্ধ হয়। শ্রীঅরবিন্দও বলিয়াছেন: "It is the Sanatana Dharma which for me is nationalism and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith." উপকরণ আর অবলম্বনের প্রকারভেদে ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য ঘটিলেও, এই সনাতন ভারতবর্ষের মর্ম্মগত সত্যের অপলাপ হইবার নয়। বিলম্বিত হইতে পারে, বিলুপ্ত হইবার নয়। এই দ্বন্দ্বময় জগৎ সংসারে দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্তির ধারাটি দ্রুত অথবা মন্থর গতিতে চলমান থাকে। বর্ত্তমান শতকের মধ্যাহ্নে উপলক্ষই লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনুকুল্য না করিয়া পরকীয় প্রভাবে ভারতের মূল ও মৌলিক ভাব-ব্যঞ্জনার পথে অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবর্ত্তনের স্রোতধারা আবার আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে। বিজয়কৃষ্ণের জীবন-তাৎপর্য্য পুনশ্চস্তম্ভিত। এই অবরুদ্ধ ভাব-স্রোত আগামী প্লাবনেরই সূচক।

রামকৃষ্ণের যেমন বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণের তেমনি কুলদানন্দ।

বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র ভাব-ভিয়ানের উদ্‌গীর্ণ কলুষরাশি কণ্ঠে ধারণ করিয়া যুগকে বহন করিবার সামর্থ্য সঞ্চার করিয়াছিলেন তিনি কঠোরব্রতী ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের মধ্যে। তাই তো বিজয়কৃষ্ণ স্বহস্তে কুলদানন্দকে নীলকণ্ঠ বেশে সাজাইয়াছিলেন। কুলদানন্দ ছিলেন সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণের গুরুভাব ও সাধনার মুখ্য ধারক ও বাহক—তাঁহার মহাজীবনের মহাভাবের প্রবক্তা। বিজয়কৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মের উন্নতোজ্জ্বল রস পরিবেশনের অসমাপ্ত সূত্রটি কুড়াইয়া লন আপনার মধ্যে এবং প্রকাশ করেন স্বীয় সাধনে-আস্বাদনে, আচারে-প্রচারে। শ্রুতেক্ষিত, বৈদিক পন্থাসম্মত, আচার্য্য-পরম্পরাগত ও মহাজননির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক ধারার আনুগত্যের মধ্যে তিনি শাশ্বত সনাতন সত্য-পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাইতো তিনি অকুণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন: "শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্য পথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় তাহাও যাইবে না। শাস্ত্র—ঋষিবাক্য, সদাচার—মহাজনদিগের আচরণ। ইহা ভিন্ন আর সবই অসার।" গোসাঁইজী নিজে সদাচার ও শাস্ত্রমূর্ত্তি ছিলেন।

তাঁর অধ্যাত্ম সন্তান ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীরও গুরু-গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অনুগমন ও অনুধ্যান এমনি নিখুঁত ছিল যে, শিষ্য গুরুর প্রতিচ্ছবিই হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

বাংলার নব জাগরণ-চঞ্চল বিগত শতাব্দীর বিচিত্র ভাব-মন্থনে উদ্ভূত দুইটি প্রধান অমৃতধারার একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, অপরটি বিজয়কৃষ্ণ-কুলদানন্দ। বাংলার শাক্তবাদের সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের সমন্বয়ে প্রথমটির উদ্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার সহিত যুগোপযোগী কর্ম্মবাদ সংযুক্ত করিয়া এই ধারার চমৎকারিত্ব দিয়া গিয়াছেন। জীবসত্তার অবরোহ-ভিত্তিক ইহার দর্শন। পারমার্থিক জীবনবিকাশের জন্য মহাজন পারম্পরিক কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা গৃহীত হয় নাই। অপর পক্ষে বিজয়কৃষ্ণ-কুলদানন্দের সাধনধারাটি শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত অবতার-ভিত্তিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমসেবা ইহার সাধ্য, ভাগবত জীবন ইহার লক্ষ্য। গোসাঁইজীর জীবনের মুখ্য প্রয়োজন, কোন্ কর্ম্মসাধনের জন্য তাঁহার জন্মগ্রহণ, এ বিষয়ে মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল লিখিয়াছেন: "শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনর্পিতচরী ভক্তিধারা প্রকট করেন, সেই ভক্তিধারার গঙ্গোত্রীরূপে আমরা শ্রীশ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দেখিতে পাই। * এই জন্যই যিনি মহাপ্রভুপ্রকটিত অনর্পিতচরী ভক্তিধারাকে আবার জীয়াইয়া তুলিবেন, তাঁহার পক্ষে অদ্বৈতপ্রভুর সাধনার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনেই অদ্বৈত বংশে পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম হয়।" বর্ত্তমান যুগ মানবতার যুগ। মানুষের মহিমাকেই এ যুগে বড় করিয়া ধরা হইয়াছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ বাংলার বৈষ্ণবেরই কথা। মনীষী বিপীন চন্দ্র পালের মন্তব্য: "There is an element of humanity in vaishnavic ideal which is almost modern in both spirit and expression. To see God in man is the eternal objective of vaishnavic culture. No other school, I think, has so boldly and openly declared the godhead of man as the vaishnavic schools have done." দেশকাল-পাত্রের চশমার মধ্যে মানুষকে দেখিলেই যত বিরোধ উপস্থিত হয়। জাতি-কর্ম-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সবই এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায় যদি শরণাগতিপর হইয়া ঐকান্তিক ভাগবত প্রীতির বশ্যতায় জীব জীবনের কেন্দ্রগত সহজ সুন্দরের সহিত সম্বন্ধান্বিত হইতে পারে। এই অপরূপ অনুপম জীব-ভগবানের চিন্ময় রসাশ্রিত সম্বন্ধের

জগতই ব্রজ। এই ব্রজের সহজ সুন্দর মানুষ ছিলেন গোসাঁইজী।

গোস্বামী প্রভুর জীবন সাধনা ও সিদ্ধির প্রমূর্ত্ত দৃষ্টান্ত শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর মহাজীবন। মধুর ভাবরসে রসায়িত এই জীবনের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাঁহারই অন্যতম অধ্যাত্ম সন্তান ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী বক্ষ্যমান মহাগ্রন্থে। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর অমর সাধন-জীবনের ক্রম-বিবর্তনের পথে প্রস্ফুটিত হইয়াছে ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনের যাবতীয় সমস্যা, অজস্র সংশয় ও অনন্ত জিজ্ঞাসা। আর, প্রাচ্য প্রেম-ধর্ম ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের জীবন্ত বিগ্রহ গোস্বামী প্রভুর কঠোর নির্দেশে, কখনও বা সস্নেহ উপদেশে সর্ব সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান দেখা দিয়াছে, প্রশ্নের পর প্রশ্নের সদুত্তর মিলিয়াছে। গুরুদেবের সেই স্নেহ ও কৃপা পাথের করিয়া কুলদানন্দজী বাল্যাবধি অবিচল সংগ্রাম ও তপশ্চর্য্যার পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়াছেন মহাসিদ্ধির সিংহদ্বারে—যুগের আলোকদিশারী সদ্‌গুরু রূপে মহিমময় আত্ম-প্রকাশে কৃতার্থ করিয়াছেন দেশবাসীকে।

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী আপন সাধন-জীবনের ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা তদীয় গুরুদেবের সেই সংগ্রাম, সাধনা ও সিদ্ধিলাভের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন। আলোচ্য মহাগ্রন্থে অপূর্ব ভাব ও ভাষার মাধ্যমে তিনি সেই সাধনা ও মহাসিদ্ধির প্রতি স্তরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রতি সংশয় ও দুর্বলতা নির্ভীকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, প্রতিটী সমাধানের সহজ ইঙ্গিত উপস্থাপিত করিয়াছেন—সর্বোপরি নানা গ্লানি ও বিড়ম্বনার পরপারে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম-ভক্তি ও মাধুর্যের পথে সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাকে সবলে আকর্ষণ করিয়াছেন যুগের সদ্‌গুরু রূপে, সত্য-শিব-সুন্দরের সার্থক পূজারী রূপে। ফলে এই একখানি গ্রন্থের মধ্য দিয়া শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিভিন্ন পথের ও সর্বস্তরের সাধকবৃন্দ নিঃসংশয়ে মহান আদর্শের প্রেরণায় ধন্য হইবেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু চিন্তাশীল পাঠক জীবন-দর্শনের বিচিত্র ধারা ও তথ্যের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত হইবেন, রসিক সমাজ রসোত্তীর্ণ সংলাপ ও ভাববৈচিত্র্যের সন্ধানে উৎফুল্ল হইবেন—এমনকি অতি সাধারণ পাঠক সমাজও এই গ্রন্থপাঠে মাটীর পৃথিবীতে স্বর্গীয় আলোকের সন্ধানলাভে চমৎকৃত হইবেন। ইহাই এই মহাগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—আর এখানেই গ্রন্থ-প্রণেতা ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর প্রধান সার্থকতা, তাঁহার মহান প্রচেষ্টার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই গ্রন্থের পারমার্থিক বিষয়বস্তু শুধু যুগ সমস্যার উপরই আলোকপাত করিবে না, আজিকার দুর্বল বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট বাঙালীকে সত্য-পথনির্দ্দেশও দিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

আমার কথা

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর মানস-সন্তান নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী মহারাজের জীবন যেমন ভাবগম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধমাধুর্যমণ্ডিত। শুচি-শুভ্র সেই জীবন শিক্ষাপ্রদত্ত বটে। তাঁহার পুণ্য জীবনকাহিনী ভারতের সাধু সমাজে এবং সুধীসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী অনেকেই জানেন; কিন্তু ঘটনাপঞ্জী বা ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদ মাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, যে আবেগ, যে প্রতিভা, যে প্রেরণা থাকে, তাহার রহস্যই জীবন রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনও সহজ নহে; আর আত্মগোপনে সর্বদা সচেষ্ট শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীর ন্যায় সাধননিষ্ঠ ও স্বানুভূতিসিদ্ধ বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরও দুরূহ। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম আলোকস্তম্ভ বিজয়কৃষ্ণের কোন্ যাদুস্পর্শে ব্রহ্মচর্যের আদর্শের সুষমায় কীভাবে তাঁহার জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই পবিত্র জীবন কীভাবে সহস্রের জীবনে আলোড়ন আনিয়াছিল, অনেকেই তাহা জানিতে চাহেন। বাঙ্‌লার এক অতি অন্ধকার যুগে অম্লান জ্যোতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী কুলদানন্দ। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও দ্যুতি আজ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই অফুরন্ত প্রেরণা যোগাইতেছে এবং দেশ ও কালের বহু ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত এই মহাজীবনের প্রতি সকলে শ্রদ্ধানতশিরে পূজার্ঘ্য প্রদান করিয়া ধন্য হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণের পুণ্য পদচ্ছায়ায় বসিয়া কুলদানন্দ স্বীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার অপূর্ব সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর দিব্য সংস্পর্শ ও প্রেরণা ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের বিচিত্রবহুল জীবনকে স্তরে স্তরে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সাধনা ছিল হিমাদ্রির মতই অটল। যুগচেতনার মর্মমূলে যেমন আছেন বিজয়কৃষ্ণ, তেমনি আছেন কুলদানন্দ এবং ভবিষ্যতে নব যুগের নব আলোকে নূতন পৃথিবীতে যে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, তাহার প্রাণকেন্দ্রেও তেমনিই ভাবে গুরুশিষ্য দুইজনেই অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

আজ প্রায় বত্রিশ বৎসর হইতে চলিল মদীয় আচার্য ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার মর্ত্যলীলা সংবরণ করিয়া নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত প্রকাশিত হইল না। অবশ্য আমাদের কোন কোন সতীর্থ শ্রীগুরু সম্পর্কে দুই একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনখানিই সুসম্বদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবন চরিতের পর্যায়ে পড়ে না। মৎপ্রণীত 'যোগিরাজ কুলদানন্দ' গ্রন্থখানিও তাঁহার জীবনের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যোগবিভূতি ঘটনার সমাবেশ মাত্র। আমাদের পরমগুরু গোস্বামী প্রভুর জীবনচরিতের অপ্রতুলতা নাই এবং তাঁহার সম্বন্ধে অদ্যাবধি বহু পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারিজী প্রণীত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থই সর্বপ্রধান। অবশ্য প্রচলিত অর্থে ইহা গোস্বামী প্রভুর জীবনী নহে, ইহা তাঁহার সদ্‌গুরুলীলার উজ্জ্বল দর্পণ, তাঁহার জীবনের একখানি নিপুণ ভাষ্য। ইহাতেই ব্রহ্মচারিজীর জীবনের স্থুল ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অনেকেই তাঁহার বিস্তারিত জীবন-কথা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত। এইজন্য অনেক দিন হইতে আমি নানাভাবে মদীয় আচার্যদেবের একখানি জীবনচরিত রচনা করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। নানাভাবে সাহায্য করিয়া বহুদিন পূর্বে আমি চিত্রশিল্পী শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা রচিত 'ছাত্রদের কুলদানন্দ' পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলাম। সতীর্থ শ্রীজিতেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্তের উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে যাবতীয় উপাদান দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি জীবনী প্রকাশে আজও অসমর্থ। সতীর্থ সুসাহিত্যিক ব্যোমকেশ কোঙার মহাশয়কে দিয়া কতকটা লিখাইয়া ছিলাম, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য কার্য সম্পূর্ণ হয় নাই। শেষ পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব নিজেই বহন করিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীগুরুর দেহাশ্রিত জীবনের যে কয়েক বৎসর তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীমুখে তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়াকে তাঁহার ইংরাজী জীবনী প্রণয়নে সাহায্য কালে শ্রীগুরুর প্রথম জীবনের ও ১৩০১—১৩০৬ সালের অপ্রকাশিত রোজনামচা পড়িবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল। এই সমস্ত উপকরণ মিলাইয়া এই জীবন-চরিতখানি রচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ ব্রহ্মচারী মহারাজের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত এমন দাবী আমি করি না। আমার বিশ্বাস যে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের অন্তরঙ্গ জীবনী রচনা করা একপ্রকার

অসম্ভব। মহাপুরুষগণের জীবন বিকাশের ধারা তাঁহাদের নেপথ্যশায়ী জীবন-সত্যের অনুধ্যান ও উপলব্ধি ভিন্ন সম্যক্ বুঝিবার অন্য উপায় নাই। জীবন ও জীবনী এক কথা নহে—জীবনী জীবনের বহিরঙ্গ প্রকাশ মাত্র। তাহাও দ্রষ্টার গ্রহণশক্তির সামর্থ্যানুরূপ হইয়া থাকে। কোন জীবনচরিত দ্বারা কোন মহাপুরুষের জীবন রহস্যকে সম্যক্ উদ্ঘাটিত করা সম্ভবপর নহে। এই কারণেই ব্রহ্মচারিজী স্বয়ং তাঁহার ইষ্টদেবের কোন জীবনী লিখিয়া যান নাই। তথাপি যে এই গ্রন্থ লিখিলাম তাহা সূর্যের আলোকে সূর্যকে দেখাইবার বাতুল প্রয়াসের অতিরিক্ত কিছু নহে, ইহা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা মাত্র। তাঁহারই বাক্য ও কার্য দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি; ইহাতে যে অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল সে বিষয়ে আমি বিশেষভাবে সচেতন।

সাধকবরেণ্য সুসাহিত্যিক সতীর্থ ৺ব্যোমকেশ কোঙার মহাশয়ের নিকট আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রভূত উপদেশ পাইয়াছি। নানাপ্রকারে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচী, শ্রীসুদর্শন সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির কুমারজী, সুলেখক সতীর্থ শ্রীরাইমোহন সামন্ত ও শ্রীআশুতোষ মণ্ডল, গুরুনিষ্ঠ শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এ্যাডভোকেট, স্নেহাস্পদা অধ্যাপিকা কুমারী রমা চৌধুরী, গুরুনিষ্ঠ শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করিতেছি। ভক্তশিষ্য সাহিত্য-রসিক শ্রীমান সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্বপ্রকার সাহায্য না করিলে পুস্তক প্রকাশ অসম্ভব হইত।

পরম ভাগবত মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক 'সূচনা' ও 'প্রবর্ত্তক' সম্পাদক, নীরব সাধক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয় ভাবসমৃদ্ধ 'প্রাক্-কথন' লিখিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন ও আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশে আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও কিছু মুদ্রাপ্রমাদ থাকিতে পারে ; আশাকরি সুধী পাঠক সমাজ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

গুরু-পূর্ণিমা, ১৩৬৮
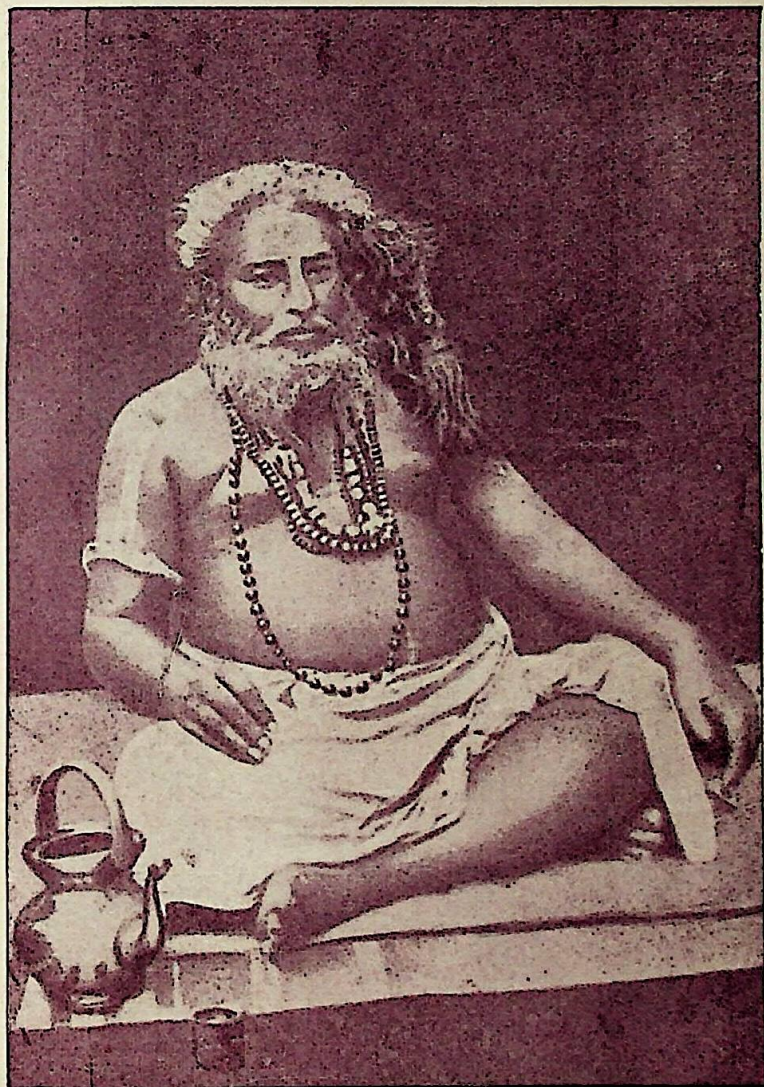
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
(পরমহংস শ্রী ১০০৮ অচ্যুতানন্দ সরস্বতী)

॥ সূচনা ॥

যুগভেদে ও দেশভেদে মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, মানব-প্রকৃতির গঠনের মধ্যেও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়া থাকে; জনসাধারণের চিন্তাধারা এবং শিক্ষা-দীক্ষাও তদনুসারে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ কোন যুগোচিত ভাবধারা কোন দেশে বা সমাজে সহসাই লোকের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে না। প্রত্যেক নূতন যুগের প্রারম্ভে মানুষের বুদ্ধিক্ষেত্রে ও সাধনক্ষেত্রে বহুল সমস্যার সৃষ্টি হয়, প্রাচীনতর চিন্তাপ্রণালী ও ভাবাদর্শের সহিত অভিনব চিন্তাপ্রণালী ও ভাবাদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, নূতনতর মতবাদ সমূহের মধ্যেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই সব সমস্যা, বাদানুবাদ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অবলম্বনে সমাজ-জীবনে বহুবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতে থাকে। ক্রমশঃ যুগপ্রাণের অন্তর্নিহিত সত্যটী আত্মপ্রকাশ করে, যুগের উপযোগী মতবাদ ও সাধনধারা আপনার আভ্যন্তরীণ শক্তিতেই ক্রমশঃ এই সব পরীক্ষার ভিতর দিয়া লোকসমাজের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। এই সব যুগসন্ধি সময়ে ভগবানের অচিন্ত্য বিধানে এমন এক-একজন যুগপুরুষ আবির্ভূত হন, যাঁহার জীবনটী যেন তৎকালে সমস্ত সমাজের সমষ্টি জীবনের একটি পরীক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার।

উনবিংশ শতব্দীতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বৈচিত্র্যময় জীবনটী সমগ্র ভারতীয় জাতির বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এরূপ একটি যুগপুরুষের জীবনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। জ্ঞান ও ভক্তির, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের, আচারনিষ্ঠা ও প্রেমোন্মাদের সমন্বয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-পার্ষদোত্তম আচার্য্য অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মধ্যযুগের সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের সত্য-শিব-সুন্দরানুরাগী প্রাণটিই যেন নবযুগে যুগোচিত নব কলেবর পরিগ্রহ করিয়া লোক সমক্ষে তদীয় আদর্শের যুগানুরূপ রূপটী প্রকটিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। জন্মাবধি সত্য-শিব-সুন্দরের মহতী প্রেরণা তাঁহার জীবনের গতি সুনিয়ন্ত্রিত করিত। এই সুমহান্ আদর্শের প্রেরণা তাঁহার মধ্যে এমন জীবন্ত, এমন ক্রিয়াশীল, এমন শক্তিসমন্বিত ছিল যে, তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে সকলেই একগুঁয়ে মনে

করিত। হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তি বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বালক বিজয়কৃষ্ণ যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, যাহা কল্যাণ বলিয়া ধারণা করিতেন, যাহা সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতেন, তাহা তিনি নির্ভীকভাবে অনুসরণ করিতেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন আপোষনিষ্পত্তি ছিল না; কাহারো ভয়ে, কাহারো মনোরঞ্জনার্থে, কোন প্রকার বিঘ্নবিপত্তির আশঙ্কায়, কোন প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতায় তিনি তাঁহার আদর্শের অনুসরণে বিরত হইতেন না। আবার কাল যাহা তিনি সত্য ও কল্যাণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আজ যদি তাহা অসত্য অকল্যাণ বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়, কাল যাহা তিনি সুন্দর ও মধুর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, আজ যদি তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা কদর্য্য ও হেয় বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে তাহা নির্ম্মমভাবে দূরে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ হইত না। নিজের পূর্ব্বগৃহীত মত ও ব্যবহারের সহিত নবাবলম্বিত মত ও ব্যবহারের বাহ্যিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যও কোন প্রকার আপোষ-নিষ্পত্তির পথ ধরা, কোন প্রকার কপটতার আশ্রয় করা তিনি আবশ্যক বোধ করিতেন না। অসত্যের সহিত সত্যের, অকল্যাণের সহিত কল্যাণের, কুৎসিতের সহিত সুন্দরের কোন প্রকার সমন্বয় বা মিলন হইতে পারে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না। নিজের সিদ্ধান্তের উপরও তাঁহার এমন সুদৃঢ় আস্থা ছিল যে, যখন তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে বলিয়া তাঁহার সংশয় জন্মিত না। তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য-শিব-সুন্দরের যে রূপটি যখন তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইত, তাহারই সেবায় তিনি দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিতেন, জীবনের সকল বিভাগে তিনি তাহা সত্য করিয়া তুলিতে ব্রতী হইতেন।

তাঁহার সত্য-শিব-সুন্দর জীবন-দেবতাও নিজের স্বরূপটী ক্রমশঃ তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত করিতেন, এক এক রূপে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয়কে উন্নত ও উন্নততর স্তরে লইয়া যাইতেন এবং আপনার নূতন নূতন রূপ, নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহাকে আস্বাদন করাইতেন। তাঁহার জীবন-দেবতা, বিশ্বের জীবন-দেবতা, নব যুগের জীবন দেবতা, তাঁহার জীবন সাধনা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে আপনাকে ক্রমশঃ পূর্ণ ও পূর্ণতর রূপে প্রকটিত করিবার পথে যুগসন্ধির সর্ব্বপ্রকার সমস্যা তাঁহার জীবনে উপস্থাপিত করিলেন; সেই সমস্যা নিরসনের বিবিধ প্রচেষ্টা তাঁহার সাধনার মধ্যে অভিব্যঞ্জিত করিলেন, এবং অবশেষে সব সমস্যার সম্যক্ সমাধানের

সুন্দরতম স্বরূপটী তাঁহার সাধনার উচ্চতম সোপানে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ক্রমবিকাশশীল জীবনের পূর্ণতম অভিব্যক্তির স্তরে সত্য-শিব-সুন্দরের জীবন্ত বিগ্রহরূপেই তাঁহার জীবনটী লোকসমাজের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। এই যুগে নরনারীর প্রাণ যাহা চায়, তাহাদের অন্তরাত্মা যে মহান আদর্শ বাস্তব জীবনসাধনার ক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার জন্য তাহাদের মন-বুদ্ধির অজ্ঞাতসারেও আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল, সেই আদর্শ বিজয়কৃষ্ণের জীবনে তাহারা পূর্ণ রূপায়িত দেখিল এবং চমৎকৃত চিত্তে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

বালক বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার জীবন সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তৎকালে প্রচলিত চিন্তাধারা, ভাবধারা, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা লইয়া। তিনি বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান—বৈষ্ণবোচিত সংস্কার তাঁহার জন্মগত ছিল। দেব-দ্বিজে তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা ছিল। দেববিগ্রহকে তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা বলিয়া জানিতেন। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, সমস্ত জীবন দিয়াই তাহা গ্রহণ করিতেন। দেবমূর্ত্তির জীবন্ত সত্তায় তাঁহার বিশ্বাস এমন জীবন্ত ছিল যে, বাল্য ক্রীড়ার ভিতরেও তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন যে, কুলদেবতা শ্যামসুন্দর তাঁহার সহিত খেলা করিতেছেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, স্বপ্নে তাঁহার নিকট অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাকে ও অপরাপর অনেককে নানাপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সরল প্রাণের জীবন্ত বিশ্বাস ধাতু-পাষাণ-মৃণ্ময় দেববিগ্রহের মধ্যে এই ভাবেই সত্য-শিব-সুন্দর চিন্ময় দেবতার বিচিত্র আত্মাভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। বিজয়কৃষ্ণ গুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুবাদ সুপ্রচলিত ছিল; মন্ত্রদাতা পরমার্থোপ-দেষ্টা গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, গুরু ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান অধ্যাত্ম কল্যাণকামী সকল সাধকের সংস্কারগত ছিল। বিজয়কৃষ্ণ সেই সংস্কারের উত্তরাধিকারী ছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেও তাঁহার অটুট আস্থা ছিল।

এই প্রকার বিশ্বাসী চিত্ত লইয়া বিজয়কৃষ্ণের জীবন সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপানুসন্ধানে ব্রতী হইল। বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিচারশক্তি বিকশিত হইতে লাগিল। বিচারের সহিত বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে। বিচারশীল বুদ্ধি নূতন নূতন সংশয় সৃষ্টি করিয়া তাহা অপনোদনের চেষ্টা করে। সংশয় উৎপাদন তাহার প্রথম কার্য্য, তার পরে তর্ক-যুক্তি দ্বারা সংশয় নিরাকরণের প্রচেষ্টা। বিশ্বাসকে সে অবিচলিত ও অক্ষুণ্ণ

থাকিতে দেয় না। জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের চিত্তও সংশয়ে দোলায়মান হইতে লাগিল, নূতন নূতন সংশয় আসিতে লাগিল, নবযুগের যুক্তিবাদ দ্বারা তাঁহার চিত্ত প্রভাবিত হইল, যুক্তিবিচারের পথে তিনি তাঁহার অন্তরের আদর্শকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। অন্তরে তাঁহার মানব-জীবনের চিরন্তন আদর্শের সুতীব্র প্রেরণা ; বিচারমূলক গ্রন্থের অধ্যয়ন এবং নূতন যুগের পাশ্চাত্য যুক্তিধারা প্রভাবিত সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ আলোচনার ফলে তাঁহার জাতিকুল পরম্পরাগত বিশ্বাস ও সংস্কারসমূহ শিথিল হইতে লাগিল ; যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া তিনি তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। সচ্চিৎশিবানন্দঘন পরমাত্মার সম্যক্ উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই, গতির বিরাম নাই, সাধনার কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাঁহার অন্তর্য্যামী অবিজ্ঞাত অভীষ্ট কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন, কখনো কাতর প্রার্থনার পথ অবলম্বন করেন, কখনো উচ্চকণ্ঠে সংকীর্ত্তন করেন, কখনো গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত হন, কখনো ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। একটার পর একটা পথ ধরিয়া তিনি নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে অনেক প্রকার সাধন-পথের পরীক্ষা হইল। এক একটি পন্থার অনুসরণে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তীব্র ব্যাকুলতা ও অনলস পুরুষকারের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ততদূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অনেক পন্থার শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াও তিনি তৃপ্তি পাইলেন না, আপনাকে চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুভব করিলেন না। আবার নূতন পন্থার অনুসন্ধান চলিল। এই যে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা, এই যে নব নব ভাবধারা অবলম্বন ও পরিত্যাগ, এই যে অশান্ত উদ্যম ও শান্তির জন্য আর্ত্তনাদ,—ইহা নবযুগের সাধক জীবনের মুখ্য লক্ষণ। তীব্র পুরুষকারসম্পন্ন সত্যান্বেষী নবযুগের প্রাণের লক্ষণসমূহ যুবক বিজয়কৃষ্ণের জীবনে সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বেদান্ত পাঠের ফলে সাকার সগুণ ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া তিনি একেবারে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের পথে ধাবমান হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয় উপবাসে ও শুষ্কতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। নবীন ব্রাহ্ম সাধকগণের সহৃদয় সংস্পর্শে তাঁহার গুণাতীত ব্রহ্ম অনন্ত গুণসম্পন্ন হইয়া উপাসনার যোগ্য হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়কে সান্ত্বনা দান করিলেন। কিন্তু রূপের স্পর্শ সেই সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় ব্রহ্মের পক্ষে অসহ্য রহিয়া গেল। দর্শনশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের সমন্বয়ের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। সমাজে নবীন ব্রাহ্ম

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব আধুনিক যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের নিকট একটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক তত্ত্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। সনাতনত্ব ও আধুনিকত্ব, ভারতীয়ত্ব ও ইউরোপীয়ত্ব, হিন্দুত্ব ও খৃষ্টানত্বের একটি সমন্বয়-ভূমি রচনার প্রচেষ্টায় নবীন ব্রাহ্মদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যুবক বিজয়কৃষ্ণের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু চিত্ত ইহার মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের যুগোচিৎরূপ দেখিয়া স্বভাবতই আকৃষ্ট হইল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলনে ও প্রচারকার্য্যে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ডঙ্কা যতই নিনাদিত হইতে লাগিল, ইহার অপূর্ণতাও তাঁহার হৃদয়ে ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতে লাগিল।

তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, ভারত ইউরোপকে স্বীয় অধ্যাত্ম সাধনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার প্রচেষ্টায় আপনার নিজস্ব স্বরূপটীই, আপনার সনাতন ভারতীয়ত্বই হারাইতে বসিয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্রমবিকাশের ফলে যে সব শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে, যুগের পর যুগ সত্যের যে সব নূতন নূতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, এই সমন্বয়ের মধ্যে তাহার স্থান হয় নাই। ভারতের ইতিহাস, ভারতের স্মৃতি, ভারতের পুরাণ, ভারতের ভক্তি-ধর্ম্মের বন্যা, ভারতের বর্ণাশ্রম মূলক সমাজ গঠন, সব বিসর্জ্জন দিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বেশ পরিগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা বিজয়কৃষ্ণের প্রথম ভাবোন্মাদনাময় চিত্তকে আকর্ষণ করিলেও, তাঁহার নিবিড় সাধনশীল প্রাণকে সম্যক্ তৃপ্তি দান করিতে অক্ষম হইল। বহু সংখ্যক দেব-দেবীর পৃথক পৃথক সত্তা ও তাঁহাদের জড়ীয় বিগ্রহে বিশ্বাস হারাইয়া তাঁহার তত্ত্বান্বেষী চিত্ত এক অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছিল এবং তাঁহার উপাসনায় সাধনার সমস্ত সত্তা তিনি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উপাসনায় অগ্রসর হইয়া তিনি ভাবিলেন যে, যে ব্রহ্ম সাধনা হইতে সব বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাকে তাঁহার অচিন্ত্য লীলায় অনন্তরূপে রূপায়িত করিয়াছেন, বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বহু দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করাই কি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব? সান্ত দেহের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হওয়াই কি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব? পরিমিত জড় বিগ্রহের মধ্যে তাঁহার অপরিমিত চৈতন্যের লীলাবিলাস কি অসম্ভব? যাঁহাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে দর্শন করিবার জন্য উপনিষদ উপদেশ করিয়াছেন, দেব-প্রতিমার মধ্যে, ধর্ম্মোপদেষ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের মধ্যে, কোন নদী বিশেষ, পর্ব্বত বিশেষ বা

মন্দির বিশেষের মধ্যে তাঁহাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেই কি অপরাধ হয়? লীলাময় সচ্চিৎশিবসুন্দর অনন্ত গুণাধার ব্রহ্মই কি বহু দেবতারূপে, বহু মানবরূপে, বহু জীবনরূপে, বহু জড়রূপে আপনার সত্তা ও চৈতন্য, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও জ্ঞান অভিব্যক্ত করিয়া বিচিত্রভাবে আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছেন না? সকল রূপে, সকল ভাবে, সর্ব্বপ্রকার লীলাভিব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মকে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে না পারিলে, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে ও তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহার সম্যক দর্শন, সর্ব্বাঙ্গীণ উপলব্ধি হইল কৈ? ভারতের দেবতা, তীর্থ, বহু অবতার,—এ সব কি সেই ভূমারই বিভুতি নয়? ভূমাকেই বিচিত্রভাবে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ঋষি-মুনি-ভক্তগণ কি এইসব বিভূতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই?

তপোনিরত ভারতীয় প্রাণ বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে জাগ্রত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডির মধ্যে তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাঁহার জীবনাদর্শ ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে নারাজ হইল। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া তিনি সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভারতের প্রাণদেবতা তাঁহার জীবনটীকে গবেষণাগার রূপে ব্যবহার করিয়া বহু প্রকার আধুনিক ও পৌরাণিক মতের ও পথের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন এবং গুণাগুণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি কত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন, কত সাধক ও সিদ্ধপুরুষের সঙ্গ করিলেন, কত প্রকার সাধন পদ্ধতি অভ্যাস করিলেন, কত পথ গ্রহণ ও ত্যাগ করিলেন। অবশেষে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তিনি শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট অলৌকিকভাবে পূর্ণ দীক্ষালাভ করিলেন। এই দীক্ষার ভিতর দিয়া যে তত্ত্বালোক তাঁহার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইল, তাহার দিব্যজ্যোতিতে তাঁহার তথা ভারতীয় জীবনাদর্শের যুগোচিত স্বরূপটী সম্যক উপলব্ধিগোচর হইল।

সত্য-শিব-সুন্দরের যে পরিপূর্ণ স্বরূপ বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহাতে তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইল, অনুসন্ধিৎসার তৃপ্তি হইল, অনুসন্ধান আস্বাদনে পরিণত হইল। তাঁহার জীবনটী সেই চিরান্বেষিত চিরারাধিত জীবনাদর্শের একটি অতি-উজ্জ্বল অতি-মধুর সর্ব্বলোক-চমৎকারী লীলাস্বাদন কেন্দ্ররূপে অভিব্যক্ত হইল। ভারতের নবযুগের আদর্শ সাধক ও আদর্শ সিদ্ধপুরুষ রূপে তাঁহাকে ভারতের প্রাণদেবতা লোক-সমাজে উপস্থিত করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মভজন, ব্রহ্মকীর্ত্তন, ব্রহ্মবিচার, ব্রহ্মরসাস্বাদনই হইল

তাঁহার বাস্তব জীবন। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম সাম্প্রদায়িক একৈদেশিক ব্রহ্ম নয়। তাঁহার ব্রহ্ম অদ্বয় সচ্চিদানন্দ বটে, কিন্তু শঙ্কর সম্প্রদায়ের নির্গুণ ব্রহ্মও নয়, ব্রাহ্ম সমাজের সগুণ ব্রহ্মও নয়—ত্রিগুণের স্পর্শদোষের ভয়েও তাঁহার ব্রহ্ম আতঙ্কগ্রস্ত নয়, সাকার মূর্ত্তির ছায়া দর্শনেও তাঁহার ব্রহ্ম সন্ত্রস্ত নয়। তিনি যে ব্রহ্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিৎশিবানন্দসুন্দর ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ তেমনি সগুণ, যেমন নিরাকার তেমনি সাকার, যেমন অশব্দ অস্পর্শ অরূপ আবার তেমনি সকল শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধের মধ্যে তাঁহার বিচিত্র বিলাস, যেমন ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত নির্ব্বিকার আত্মস্থ তেমনি সকল গুণবিকারের মধ্যে, সকল তরঙ্গায়িত ভাবের মধ্যে তাঁহারই আনন্দলীলা, তাঁহারই স্বরূপগত অপ্রাকৃত চিদানন্দ-রসের বৈচিত্র্যময় আস্বাদন। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গভীরতম সমাধিতে যে ব্রহ্মকে বিজয়কৃষ্ণ আপনার আত্মার আত্মারূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন রূপে উপলব্ধি করিলেন, চোখ মেলিয়া সেই ব্রহ্মকেই তিনি সকল দেবমূর্ত্তির মধ্যে, সকল অবতার পুরুষের মধ্যে, সকল বিভূতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে, সকল প্রাকৃতিক ব্যক্তির মধ্যে বিচিত্র আকারে দর্শন করিলেন। নিজের পরমার্থোপদেষ্টা ব্রহ্মভাবভাবিত মহাপুরুষের মধ্যে ব্রহ্মেরই অবিদ্যানাশিনী, জ্ঞানপ্রেমমুক্তি বিধায়িনী, পরমকরুণাময়ী, গুরুশক্তির বিশেষ মহিমান্বিত প্রকাশ অনুভব করিয়া তাঁহার চরণে তিনি দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিলেন। গুরুব্রহ্মের সম্যক পরিপূর্ণ জীবনের সহিত নিজের জীবনটীকে মিশাইয়া দিয়া তিনি নিজেও সদ্‌গুরু পদে আসীন হইলেন।

গুরুর নির্দ্দেশ এবং ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতির ধারা অনুসারে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। ভারতীয় অধ্যাত্মনিষ্ঠ সমাজ বিধানে সর্ব্বত্যাগী ও সর্ব্বভূতহিতব্রতী ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীই সমাজের পারমার্থিক ধর্ম্মোপদেষ্টা, মানুষের সম্যক্ দিব্য জীবনগঠনে প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক। গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণকে সন্ন্যাস জীবন দান করিয়া তাঁহাকে সমাজের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু নবযুগের প্রেরণায় তাঁহার মধ্যে সন্ন্যাসের একটি অপূর্ব্ব রূপ প্রদর্শিত হইল। তাঁহার অভিনব জীবনে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সমন্বয় সাধিত হইল। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও স্ত্রীপুত্র-কন্যাদি লইয়া আশ্রম জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে রাখিয়াও কি ভাবে সন্ন্যাসের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখা যায়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জীবনে প্রদর্শন করিলেন। সন্ন্যাসকে তিনি গার্হস্থ্যের মধ্যে লইয়া আসিলেন, সংসারকে তিনি সন্ন্যাসময় করিলেন।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম তাঁহার জীবনে সমন্বিত হইল। তাঁহার সকল কর্ম্ম হইল ভগবৎ কর্ম্ম। "মৎ কর্ম্ম কৃৎ মৎ পরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ" হইয়া তিনি যুগধর্ম্ম প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। এই প্রচারকার্য্যে তাঁহার কোন অভিমান ছিল না, কোন প্রকার দল গঠনের অভিপ্রায় ছিল-না, নিজের সম্বন্ধে কোন গুরু-বুদ্ধি ছিল না, কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ ছিল না। গুরুশক্তি তাঁহার ভিতরে যেমন কার্য্য করিত, যখন যে ভাবে তাঁহার অন্তরে প্রেরণা দান করিত, যে পথে তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিত, তিনি অভিমানশূন্য হইয়া, মমত্ববোধ বিরহিত হইয়া, ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, সেইভাবে চলিতেন, সেই ভাবে ধর্ম্মপিপাসুদিগকে উপদেশ দান করিতেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতেন। তাঁহার সমস্ত দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ গুরুভক্তি ও ভগবৎ প্রেমে সর্ব্বদা অভিস্নাত থাকিত এবং তাঁহার সান্নিধ্যমাত্রেই নরনারী বালকবৃদ্ধের ভিতরে গুরুভক্তি ও ভগবৎ প্রেম সংক্রামিত হইত। তাঁহার বাহ্যিক আচরণে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভাবধারা মুখ্যতঃ প্রবাহিত ছিল, নবযুগের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে তৎসঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দিতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের যুগোচিত নব আবির্ভাব ঘটিল।

১৩০৬ সালে (১৮৯৯) শ্রীক্ষেত্রে গোস্বামীপ্রভু ইহলীলা সংবরণ করেন। মর্ত্যলীলা অবসানের পূর্ব্বে তিনি তাঁহারই হাতে-গড়া প্রাণপ্রতিম মানসপুত্র শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে স্বহস্তে শাস্ত্রসম্মত 'নীলকণ্ঠ' বেশ পরাইয়া স্বীয় জীবনব্রত ও সদ্‌গুরুর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান। শ্রীগুরুর প্রদর্শিত পথে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় অটল থাকিয়া নীলকণ্ঠের মতই দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যুগ-সঙ্কটের আদর্শ অরাজকতার হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী গোসাঁইজীর উত্তরাধিকারীত্বের আলোক-দিশারী হইয়াছিলেন। সদ্‌গুরু-রূপে ব্রহ্মচারিজী মহাশক্তিপূত যুগোপযোগী নামামৃত পরিবেশন করিলেন অকুণ্ঠে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া। তত্ত্ববিগ্রহ গোসাঁইজীর দিব্য জীবনের ভাষ্য ছিল কুলদানন্দজীর জীবন! এই অনুপম মহাজীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য যুগের উপযোগীভাবে সুব্যাখ্যাত হইয়াছে বক্ষ্যমান মহাগ্রন্থে। ব্যাখ্যা করিয়াছেন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহারই সুযোগ্য অধ্যাত্ম সন্তান শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী। গ্রন্থখানি বাংলার ধর্ম্মপিপাসু পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমার সুদৃঢ় প্রত্যয়।

শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জটাশঙ্কর

নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

নীলকণ্ঠ

ষোলই শ্রাবণ, ১২৯৮। শুক্রবার—পুণ্য একাদশী তিথি। স্নিগ্ধ প্রভাত—চতুর্দিকে উদার প্রশান্তি। নবারুণ রাগে দিগন্ত উদ্‌ভাসিত। আসনে গোস্বামী প্রভু শান্ত-সমাহিত। সম্মুখে উপবিষ্ট শুচিস্নাত কুলদানন্দ।

গুরুদেবের আদেশে তিনি পৃথকভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন ১০৮টী রুদ্রাক্ষের মালা। সম্মুখে স্থাপন করিলেন সেই মালা, যোগপাট ও নূতন উপবীত।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চাহিলেন গোসাঁইজী। আঁখিকোণে নিবিড় স্নেহসিক্ত অমৃতাঞ্জন। দৃষ্টিতে অনুপম প্রসন্নতা, অন্তস্রাবী আশীষধারা। মুগ্ধ, বিহ্বল চোখে চাহিয়া রহিলেন কুলদানন্দ।

উপবীত হস্তে লইয়া গোসাঁইজী দ্বাদশবার গায়ত্রীজপ করিলেন। অনুগত শিষ্যের গলদেশে অর্পণ করিলেন মন্ত্রপূত উপবীত। যোগপাট স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রুদ্রাক্ষের মালাগুলি গ্রহণ করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। পরে প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি অঙ্গে স্বহস্তে পরাইয়া দিলেন সেই অপার্থিব অলঙ্কার।···বলিলেন ঃ ইহাই নীলকণ্ঠ বেশ।···

কুলদানন্দের দেহমনে সঞ্চারিত হইল অপূর্ব বিদ্যুৎ। দয়াল গুরুদেবের শ্রীহস্তে আজ তাঁহার মধুর অভিষেক। রাজা রূপে নয়—রাজার রাজা সর্বত্যাগী 'নীলকণ্ঠ' রূপে।···আজ হইতে মনেপ্রাণে তিনিও বরণ করিতে চান সেই মহাযোগীর আদর্শ।···অভিভূত আনন্দে শ্রীগুরুদেবের চরণতলে জানাইলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। চোখের জলে প্রার্থনা করিলেন ঃ ঠাকুর! দয়া করে আমাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার কৃপাতেই যেন তার মর্যাদা রক্ষা হয়। নিয়ত যেন তোমার অনুগত হ'য়ে থাকি।···

গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া নামে নিমগ্ন হইলেন তিনি। পরে উঠিয়া গুরু-ভ্রাতাদের নমস্কার করিলেন। প্রসন্ন মনে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইলেন সকলে।

* * *

"রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতি দ্বে।
ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব॥
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভির্নয়নযুগকৃতে ত্বেকমেকং শিখায়াং।
বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ॥"

[দেবীভাগবত—একাদশ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়]

কণ্ঠে ৩২টী, মস্তকে ২২টী, কর্ণদ্বয়ে ৬টী করিয়া ১২টী, করযুগলে ১২টী করিয়া ২৪টী, বাহুদ্বয়ে ৮টী করিয়া ১৬টী, শিখাতে ১টী এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টী, মোট ১০৮টী রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রসম্মত নীলকণ্ঠ বেশ।

"ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষ্ণোঽপতংস্তু যে।
অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি॥"

দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রামে ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার সময় রুদ্রের অক্ষিযুগল হইতে নির্গত হইয়াছিল অশ্রুবিন্দু; ধরাধামে সেই অশ্রুবিন্দুগুলি ধারণ করে রুদ্রাক্ষ রূপ। ইহাই রুদ্রাক্ষের ইতিকথা। তাহা দ্বারাই গোস্বামী প্রভু প্রিয়তম মানসপুত্রকে রূপায়িত করিয়া তুলিলেন নীলকণ্ঠ রূপে। কুলদানন্দের প্রতি অঙ্গে দিব্য বিভায় শোভা পাইতে লাগিল রুদ্রের সেই জমাটবাঁধা পবিত্র অশ্রুবিন্দুগুলি। তাইতো তাঁহার দুইগণ্ড প্লাবিত হইল অশ্রুধারায়। আর, সেই পুণ্য তিথি হইতে আরম্ভ হইল তাঁহার নীলকণ্ঠ লীলা।...

মহাপুরুষদের দিব্য জীবনে নানা ক্রিয়াকলাপ ও আচরণের কোনটাই অসংলগ্ন বা নিরর্থক নয়। তাই প্রশ্ন জাগে—শ্রীহরির পুণ্যবাসরে ব্রহ্মচারিজীর এই 'নীলকণ্ঠ বেশ' ধারণের তাৎপর্য কী? এই প্রসঙ্গে প্রথমে স্বতঃই মনে পড়ে পুরাণবর্ণিত ঘটনা:

পুরাকালে দেব ও দৈত্যে সুরু হয় এক তুমুল সংগ্রাম। দেবগণ দিন দিন হতবল ও সৈন্যহীন হইয়া নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। অবশেষে তাঁহাদের বড় সাধের স্বর্গ-রাজ্যও শত্রুকবলিত হইবার উপক্রম হয়। তখন শত্রুদমনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মেরুপর্বতের উপরিভাগে এক বিরাট সভা আহ্বান করেন তাঁহারা। ঐ সভায় চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেবগণকে চক্রী বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিবার উপদেশ দান করেন। দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু প্রথমে তাঁহাদিগকে দৈত্যদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সমুদ্রমন্থন করিতে বলেন। মন্দরপর্বত হইল মন্থনদণ্ড, আর সর্পরাজ বাসুকি উহার মন্থনরজ্জু। শ্রীবিষ্ণু আরও বলেন: সমুদ্রমন্থন দ্বারা যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা পান করিয়া অগ্রে তোমরা অমরত্ব

লাভ কর। দৈত্যদেরও তোমাদের সহিত সমুদ্রমন্থন করা প্রয়োজন; কারণ তাহাদের শক্তিসামর্থ্য তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক।

শ্রীহরির উপদেশে সন্ধির জন্য দৈত্যরাজ বলির নিকট উপস্থিত হন দেবরাজ ইন্দ্র। দুগ্ধসমুদ্রে ঔষধমূলক গাছগাছড়া নিক্ষেপ করিয়া মন্দরপর্বত ও বাসুকির সাহায্যে দেবদৈত্যে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করেন। কিন্তু সমুদ্রের উপর মন্দরপর্বত ভাসমান থাকিতে না পারিয়া ক্রমশ নিম্নগামী হওয়ায় ব্যাহত হয় মন্থনক্রিয়া। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ কূর্মরূপ ধারণ করিয়া মন্দরপর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। মন্থনকার্য নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে। ঔষধিগুলি দুগ্ধে বা সমুদ্রজলে মিশ্রিত হইলে সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ওঠে ভীষণ হলাহল। উহার তীব্র গন্ধে ও তেজে বহু দেবদৈত্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুভয়ে ত্রিলোকবাসী তখন স্মরণ করেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে। পতিতপাবন আশুতোষ সেই সুতীব্র বিষ পান করেন—ত্রিজগৎ রক্ষা পায়, আনন্দিত হয়। কিন্তু অজর ও অমর মহাদেব সহ্য করিতে থাকেন এই ভয়ানক বিষের জ্বালা। অবশেষে উহা ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় নীলাভ হইয়া ওঠে রুদ্রকণ্ঠ। তাই মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নামে অভিহিত। (বিশ্বকোষ—নীলকণ্ঠ)

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কাহিনীও উল্লেখযোগ্য।

> "অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্ততঃ পরম্।
> জগদাবৃত্য সহসা সধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৪২
> ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।
> প্রাগ্রসল্লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণো বচনাচ্ছিবঃ॥ ৪৩
> দধার ভগবান্ কণ্ঠে মন্ত্রমূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ।
> তদাপ্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ॥" ৪৪
>
> (মহাভারত—১।১৮)

দেবগণ অমৃতোৎপত্তির পরেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন সাগরমন্থনে। তখন সধূম অগ্নির ন্যায় জগন্মণ্ডল আবৃত করিয়া উৎপন্ন হইল কালকূট। তাহার গন্ধাঘ্রাণেই অচেতন হইয়া পড়িল ত্রিলোকবাসী। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বর সেই কালকূট পান করিয়া ধারণ করিলেন কণ্ঠদেশে। তদবধি তিনি বিশ্রুত হইলেন নীলকণ্ঠ নামে।...

মানবচিত্তে চলিয়াছে দেবাসুরের এই অবিরাম সংগ্রাম। আসুরিক ভাবের প্রাবল্যে দৈবীভাব পরাজিত হয়—তখন দিগন্ত বিদীর্ণ হয় পীড়িতের আর্তনাদে। বিভিন্ন জাতির যুদ্ধবিগ্রহে এই করুণ সত্য প্রকাশিত। এমনকি মোক্ষার্থী সাধকের জীবনেও এই দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। বিশ্বের এই হাহাকার বিশ্বপিতার

শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে ঘূর্ণিত হয় চক্রীর চক্র। বাসুদেবের কল্যাণস্পর্শে হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত হয়—পশুত্ব ও দেবত্বের সমন্বয়ে সুরু হয় সাগরমন্থন।···সেই প্রয়াস ব্যাহত হইলে শ্রীহরি সহায় হন—তবু অমৃতের সহিত উত্থিত হয় হলাহল। মানবচিত্তে দেবত্বের প্রতিষ্ঠায় তখন আবির্ভূত হন মঙ্গলময় মহাদেব। বিশ্বের দুঃখজ্বালা নিবারণ করিয়া মানবহৃদয় আনন্দময় করিবার জন্যই সেই হলাহল পান করেন মহারুদ্র,···ধারণ করেন এই নীলকণ্ঠ বেশ।···

জগতের হিতার্থে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছেন। কল্যাণব্রতী বুদ্ধদেব ত্যাগ করিয়াছেন পরিজন ও রাজৈশ্বর্য। অমৃতের উপাসক সক্রেটিশ ও ভগবান বিজয়কৃষ্ণ পান করিয়াছেন তীব্র হলাহল।···সর্বত্যাগী যোগিরাজ কুলদানন্দের পূত জীবনগাথাও নীলকণ্ঠেরই জীবন্তভাষ্য। পাপীতাপী ও পতিতের ত্রিতাপজ্বালা দূর করিয়া শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার কল্যাণব্রতের উদ্বোধন। চিরদুঃখী মানবের অন্তরসমুদ্রের অনন্ত গরলরাশি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্যই আজীবন তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনা।···আর এই পুণ্যতিথি হইতে সুরু হইল সেই অমোঘ শক্তিসঞ্চয়, বীর্যলাভের প্রস্তুতি ও আয়োজন। তাইতো গোস্বামী প্রভুর শ্রীহস্তে হরিবাসরেই কুলদানন্দের নীলকণ্ঠ-লীলার আজ সার্থক সূচনা।···

ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নির্দেশঃ যাহা শাস্ত্র ও সদাচার বহির্ভূত, তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। কিন্তু অশাস্ত্রীয় ও সদাচার বহির্ভূত অনাচারই ভারত তথা জগতের যাবতীয় অশান্তির মূল। প্রাচীন যুগ হইতে মানবজাতির মহাতীর্থ এই ভারতবর্ষ পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছে শান্তির অমিয় বাণী। আজও সেই শাস্ত্র ও সদাচারের আশ্রয়ে গোস্বামী প্রভু প্রিয়তম সন্তানকে দীক্ষিত করিলেন মানব-মুক্তির মহামন্ত্রে। তাইতো নীলকণ্ঠ বেশ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক সামগানের মাধুর্যে ও পবিত্রতায় ভরপুর হইয়া উঠিল কুলদানন্দের জীবনযাত্রা।···সচন্দন তুলসী-বিল্বদলের স্নিগ্ধ আঘ্রাণে, পূজাপুষ্পের পরিমল সৌরভে সুরভিত হইয়া উঠিল তাঁহার শুচিশুদ্ধ অন্তর।···

প্রবর্তক জীবন

॥ এক ॥

পশ্চিমপাড়া। ঢাকা জেলায় মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম। পদ্মানদীর ছয় মাইল উত্তরে বুড়ীগঙ্গার অদূরে অবস্থিত। বর্ষাকালে মনে হয় যেন সমুদ্রের বুকে ছোট একটি দ্বীপ। গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ কায়স্থ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই শাক্ত। অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব। নানা অবস্থার চাপেও সকলের মধ্যে ছিল একটী সহজ ধর্মভাব। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামে শোনা যাইত নাম-কীর্তনের মধুর ধ্বনি।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বের কথা। এই গ্রামের মধ্যস্থলে বাস করিতেন একঘর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে ছিল বাইরের ঘর, শয়ন ঘর, উত্তরে ঠাকুর ঘর, দক্ষিণে গোশালা, দুইটী রান্নাঘর ও একটি ধানের গোলা। আয়তাকার অঙ্গনের চারিপাশে ছিল টিনের চা'ল দেওয়া এই মাটীর ঘরগুলি। সমস্ত বাড়ীখানি বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। এই বসতবাড়ীর পশ্চিমে ছিল একটি স্নানের পুকুর, তাহার পাশে ছিল 'ছকির বাড়ী' নামে একটি জঙ্গল—মৃত শিশুদের সমাধিস্থান।

বাড়ীর মালিক শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনুপম দেহকান্তির জন্য তিনি 'কন্দর্প' নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির। বেলপুকুরের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক রজনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তাঁহার দীক্ষা হয়। সপ্তদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজে হরিদ্বার যাত্রা করেন তিনি। বহু সন্ধানের পর তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। গুরুদেবের আদেশে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন কমলাকান্ত; কিন্তু সংসার কোনদিন তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অধিক বেলা অবধি জপ-তপ, সাধন-ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন তিনি। অতিথি-সেবা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। অতিথি সমাগম না হইলে অনাহারে থাকিতেন সারাদিন। তিনি ছিলেন গরীব ছাত্র ও দীনদুঃখীর বন্ধু। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর ছিল তাঁহার গভীর স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি। স্বার্থত্যাগ ও

পরোপকারে ছিল তাঁহার প্রকৃত আনন্দ। এইজন্য জীবনে অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই তিনি; কিন্তু লাভ করিয়াছিলেন সাধারণের গভীর প্রীতি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। স্বভাবেও তিনি ছিলেন অক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, সদানন্দ।

এই আদর্শ পুরুষের সহধর্মিণী ছিলেন পুণ্যশীলা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী। ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষা না থাকিলেও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ শুনিয়া ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হন তিনি। স্বামীর ধর্মকার্যে তিনি ছিলেন আদর্শ সহধর্মিণী। তান্ত্রিক সাধনায় শ্যামবর্ণা স্ত্রীর প্রয়োজনে কমলাকান্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তবু স্বামীকে তিনি ভক্তি করিতেন দেবতার মত; আর স্বপত্নীর সহিত কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সাংসারিক কার্যেও তাঁহার বিশেষ যত্ন ও দক্ষতা ছিল। পরিবারের সকলের এমনকি দাসদাসীর প্রতি তাঁহার আচরণ ছিল সুমধুর, পশুপক্ষীর প্রতি ছিল তাঁহার গভীর মমতা। হিন্দুর দেবদেবী ছাড়াও মুসলমান গাজী-পীরের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। চরিত্র-মাধুর্যে, ধৈর্যে ও ক্ষমায় তিনি ছিলেন সকলের বরেণ্য।

ব্রতপালন ও ধর্মনিষ্ঠাই ছিল এই পুণ্যশীলার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সূর্যপূজা-পদ্ধতি ছিল সুকঠোর। প্রত্যূষে আঙিনার মধ্যস্থলে গোবরজল লেপিয়া স্নানান্তে পিঠুলি ও নানা রঙ সহযোগে তিনি সূর্যদেবের মূর্তি তৈয়ার করিতেন। মূর্তিটী অঙ্গনে স্থাপন করিয়া নৈবেদ্য ও পূজার উপকরণ সাজাইয়া দিতেন। সূর্যোদয় হইলে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে অঞ্জলি প্রদান করিয়া করজোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং সূর্যের দিকে তাকাইয়া স্তব পাঠ করিতেন। মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত ধুণচিতে চন্দনকাষ্ঠের গুঁড়া ও ধূপধুনা দিতেন। এক স্থানে এইভাবে সারাদিন সূর্যের দিকে তাকাইয়া স্তবপাঠ করিতেন তিনি। সূর্যাস্তের পর পুনরায় অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। তখন কুলপুরোহিত আসিয়া পূজা সমাপন করিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, সারাদিন উপবাসী অবস্থায় প্রখর রৌদ্রতাপে একভাবে দাঁড়াইয়া সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করিতেন না তিনি। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একমাত্র দাতা কর্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও অবিচল নিষ্ঠার সহিত এইরূপ সুকঠোর ব্রতপালন করিতে শোনা যায় নাই।...

সংসারাশ্রমে কমলাকান্ত ও হরসুন্দরী ছিলেন আদর্শ দম্পতি। স্বভাব-

চরিত্রে, ধর্ম-সাধনায় তাঁহারা একে অপরের সম্পূরক। এইরূপ ঋষি-পরিবার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভক্তির এইরূপ অপূর্ব সমন্বয় সত্যই অতুলনীয়।

১৪ই কার্ত্তিক, ১২৭৪ সাল। পুণ্য বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী তিথি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে শুচিশুদ্ধ, ধর্মপ্রাণ মাতাপিতার বক্ষে আবির্ভূত হন অনুপম দেবশিশু কুলদানন্দ।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতি বিচিত্র। জননী-জঠরে তাঁহার অবস্থান কালে নানা দেবদেবী ও মুনি-ঋষির স্বপ্ন দেখিতেন হরসুন্দরী। ইহাতে কখনও তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন, কখনও বা শঙ্কাকুল হইয়া পড়িতেন। কমলাকান্ত সাহস দিয়া বলিতেন—ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ দয়া করিয়া এই বংশে জন্ম লইতেছেন।...গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণ কামনায় ভক্তিমতী ভগবানের চরণে জানাইতেন সকাতর প্রার্থনা।

কমলাকান্তের মাতুলালয়ে হরসুন্দরীর অবস্থানকালে ভূমিষ্ঠ হন কুলদানন্দ। জন্মলগ্নে শুক্লা চতুর্দশী রজনীতে ফুল্ল জ্যোৎস্নার অমিয় হাসি বিলীন হইয়া গেল, পরিবর্তে দেখা দিল ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা।...উন্মত্ত ঝঞ্ঝায়, প্রবল বর্ষণে উদ্দাম বিশ্বপ্রকৃতি যেন জানাইলেন উদাত্ত অভিনন্দন।...জ্যোৎস্না নিশীথে হাস্যে-লাস্যে ভরা গতানুগতিক জীবনের সূচনা নয়—নটরাজের নর্তনে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর দুরূহ পথ-পরিক্রমার এই বুঝি বা প্রথম পদক্ষেপ।...

জন্মকালীন আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কমলাকান্তের মাতুলালয়ে ছিল অত্যন্ত কুটিল, হিংসুক প্রকৃতির এক বৃদ্ধা। তাহার তুক-তাকে, কলহে ও কুৎসায় গ্রামের সকলে তাহাকে 'ডাইনি বুড়ী' মনে করিয়া ভয় পাইত। কুলদানন্দের জন্মবাসরে এই বৃদ্ধার হঠাৎ মৃত্যু হইল।...আঁধার বুকে যেন দেখা দিল আলোর বিকাশ,...মহাপুরুষের পুণ্যস্পর্শে পাপীর উদ্ধার হইল বুঝি।...সকলেই মনে করিলেন, এই শিশু নিশ্চয়ই সুলক্ষণযুক্ত, পুণ্যাত্মা।...

পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক দিয়াও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন বাসরেই কুলদানন্দের জন্ম। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বাঙ্‌লা ছিল অগ্রগামী—সংস্কার যুগের প্রবল তরঙ্গ তখন বাঙ্‌লার বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন আচার্য বিজয়কৃষ্ণ। তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে বাঙ্‌লা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে দেখা দিয়াছে পট-পরিবর্তন।...ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি—সর্বক্ষেত্রেই দিকপালগণের অভ্যুদয়ে ভারতে তখন নব-জাগরণের শুভ

সূচনা। জাতির পঙ্গু দেহে নব প্রাণসঞ্চারে, দেশের অন্তরাত্মায় নিত্য নূতন ভাববিকাশে কত ভঙ্গিমা, কতই না বৈচিত্র্য।...এমনি যুগসন্ধিক্ষণে বিপ্লবের স্রোতাবর্তের মধ্যেও নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের অভ্যুদয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।...

হরসুন্দরীর চারি পুত্র—হরকান্ত, বরদাকান্ত, সারদাকান্ত ও কুলদাকান্ত * ; আর, তিন কন্যা—কুমুদিনী, মোক্ষদাসুন্দরী ও সুখদাসুন্দরী। তাঁহার স্বপত্নীর একমাত্র পুত্র রোহিণীকান্ত সর্বকনিষ্ঠ। জন্মের ছয়মাস পরেই মাতৃহীন হন রোহিণীকান্ত; কিন্তু হরসুন্দরীর অপার মাতৃস্নেহে তাঁহাকেই স্বীয় গর্ভধারিণী বলিয়া জানিতেন তিনি।

এমনি ধর্মপ্রাণ মাতাপিতার বক্ষে বর্ধিত হওয়ায় কুলদানন্দের অগ্রজেরা সকলেই ছিলেন ধর্মভাবাপন্ন, তাঁহার ভগিনীগণও ছিলেন বিশেষ সৌভাগ্যবতী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনী দেবীর স্বামী মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর। স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডু মথুরানাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী। দ্বিতীয়া ভগিনী মোক্ষদাসুন্দরীর স্বামী অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কুমিল্লা জজকোর্টের পেশকার। আর, তৃতীয়া ভগিনী সুখদাসুন্দরীর স্বামী অভয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমায় একজন বিখ্যাত উকিল।

একদিকে সাধক পিতা, ধর্মশীলা জননী, ধর্মভাবাপন্ন অগ্রজ, এবং স্নেহশীলা ভগিনী—অন্যদিকে গৃহে নিত্য পূজা-অর্চনা, দানধ্যান, অতিথিসেবা, রামায়ণ-মহাভারত আদি পাঠ—সর্বদিক দিয়াই এমনি মধুর ও অনুকূল পরিবেশে লালিত-পালিত হন শিশু কুলদানন্দ। তাঁহার রূপলাবণ্য যেমন অপরূপ, অঙ্গসৌষ্ঠবও তেমনি অনুপম। বিশ্বের অনন্ত রূপ-মাধুর্যে অপূর্ব রূপবান করিয়াই বুঝি এই দেবশিশুকে পাঠাইলেন সৃষ্টিকর্তা।...তাই তিনি ছিলেন পাড়াপড়শী নরনারী, বালক-বৃদ্ধ, সকলেরই নয়নের মণি, বড় আদরের ধন। গ্রামের সকলেরই এমনি সর্বজনীন স্নেহপাত্রের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। বিশেষতঃ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কুটীলা বৃদ্ধার মৃত্যু হওয়ায় তিনি ছিলেন সকলের প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার পাত্র। এইভাবে সকলের স্নেহ-যত্নে, আদর ও শুভেচ্ছায় শশিকলার ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন কুলদানন্দ।

* ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম 'কুলদাকান্ত' হইলেও গুরুদত্ত 'কুলদানন্দ' নামেই তিনি সুপরিচিত। আমরাও সেই নাম উল্লেখ করিব।

॥ দুই ॥

শৈশবে মাত্র চার পাঁচ বৎসর বয়সেই কুলদানন্দ পিতৃহীন হন। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর সুনিবিড় বাৎসল্যে এবং অগ্রজদের স্নেহচ্ছায়ায় তিনি ছিলেন অভিষিক্ত, সযত্নলালিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরকান্ত ছিলেন সিভিল সার্জেন—পিতা অবর্তমানে সংসার চলিতে থাকে তাঁহারই উপার্জনে।

কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত জননীর স্তন্যপান করিবার সুযোগ লাভ করেন কুলদানন্দ। কিন্তু একাকী সেই সুযোগ গ্রহণ করিতেন না তিনি; মাতৃহীন বৈমাত্র ভ্রাতা রোহিণীকান্ত ও ভগিনী সুখদাকে লইয়া সকলে একসঙ্গে স্তন্যপান করিতেন। কুলপুরোহিত এইভাবে স্তন্যপান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিশু কুলদানন্দ বলিতেন—তাঁহারা সকলে যে একই জননীর সন্তান,…তাইতো তাঁহারা একসঙ্গে স্তন্যপান করেন।…

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরকান্ত বিদেশে চাকুরি করিতেন। তাই মেজদাদা বরদাকান্ত ও ছোটদাদা সারদাকান্তের তত্ত্বাবধানে কুলদানন্দের লেখাপড়া সুরু হয়। পশ্চিমপাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় অভাবে জৈনসার মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। বাড়ী হইতে বিদ্যালয় ছিল প্রায় এক মাইল দূরবর্তী।

কুলদানন্দের শিক্ষক ও সঙ্গীরা অতি সতর্কতার সহিত নির্বাচিত হইতেন। মার্জিত রুচিসম্পন্ন একজন দেশভক্ত ছিলেন তাঁহার শৈশবের শিক্ষক। বোধোদয়, বাল্যশিক্ষা, কথামালা, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে কুলদানন্দের আদর্শ জীবন গঠন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করেন এই শিক্ষক মহাশয়। কুলদানন্দের সঙ্গীরাও ছিলেন সকলেই কৃষ্টিসম্পন্ন ভদ্রসন্তান। ব্যারিষ্টার ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাঁকিপুরের উকিল করুণাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনমোহন চট্টোপাধ্যায়—সকলেই ছিলেন শৈশবে তাঁহার খেলার সাথী। ভুবনমোহন, করুণাকান্ত ও মনমোহন—এই তিন বন্ধুই ছিলেন উত্তরকালে সমাজ-সংস্কার কার্যে তাঁহার প্রধান অবলম্বন। ক্রমে তাঁহাদের প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া আজীবন স্থায়ী হয়।

তাঁহাদের গৃহে নারায়ণ-শিলা বিগ্রহ ছিলেন। কুলপুরোহিত ছিলেন প্রকৃত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের প্রধান সহায়। কুলদানন্দ অনেক প্রেরণা লাভ করেন এই সত্যনিষ্ঠ পুরোহিতের নিকট।

কুলদানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ আদর্শ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও যুগধর্ম ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; এজন্য মাতাপিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়াও তাঁহারা হইয়া ওঠেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। কিন্তু এই প্রভাব সহজেই কাটাইয়া উঠেন হরকান্ত। তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে লাভ করা কুলদানন্দের পক্ষে ছিল যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। গোস্বামীপ্রভু বিজয়কৃষ্ণের মতে সরলতায় ও চরিত্রমহত্বে হরকান্ত ছিলেন যেন সত্যযুগের পুরুষ।

গৌরসুন্দরের বিশেষ অর্চনার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন হরসুন্দরী। সেই অর্চনা ও মহোৎসবের পর হরকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার ধর্ম-জীবন প্রথম অবস্থায় ছিল একান্তই সুপ্ত। স্যার কে, জি, গুপ্ত এবং ডাঃ পি, কে, রায় ছিলেন তাঁহার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কর্ম-জীবনে কাশী, মথুরা, লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদ হাসপাতালের দায়িত্বে দক্ষতার সহিত তিনি সরকারী কার্য পরিচালনা করেন। কেশবচন্দ্রের আবেগময়ী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বিজয়কৃষ্ণের সহিত পরিচিত হন তিনি। কাশী, মথুরা, প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে সাধু-মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়া পরে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ওঠেন; এবং যথাসময়ে গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কর্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণের পর পুরীধামে গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরে সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন হরকান্ত। শীঘ্রই গুরুদেবের অলৌকিক প্রভাব উপলব্ধি করেন তিনি। তীরে দাঁড়াইয়া সাগরপারে বাঙ্‌লার দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইতেন—শুনিতে পাইতেন গঙ্গার সুমধুর কলধ্বনি।…মৃত্যুর একমাস পূর্বে বরদাকান্তকে ডাকিয়া পাঠান এবং মৃত্যুর সঠিক দিন বলিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে গোসাঁইজী স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, তাঁহার জাগতিক কর্ম শেষ হইয়াছে। প্রত্যুষেই স্ত্রীকে সে-কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। পরে কিঞ্চিৎ বার্লি গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পান। কিছুক্ষণ পরেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে বিলীন হইয়া যান তিনি।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু বিস্ময়কর স্বপ্নদর্শন করিতেন হরকান্ত। গুরুদেবকে এইরূপ একটী স্বপ্নের কথা বলেন তিনি। স্বপ্ন দেখেন: এক বিরাট নদীর মধ্যে

যেন দাঁড়াইয়া আছেন গোসাঁইজী, বহু মর্তবাসী সেই ভয়ঙ্কর নদীর স্রোতে ঝাঁপ দিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিতেছে। ডুবিতে ডুবিতেও কাছে পৌঁছিলে তাহাদের ধরিয়া একে একে স্নান করাইতেছেন গোসাঁইজী; আর তাহাদের নশ্বর দেহ চিন্ময় রূপে পরিণত হওয়ায় তাহারা পরপারে যাত্রা করিতেছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে কুলদানন্দের এবং তাঁহার সহোদরগণের ধর্মজীবন বহুলাংশে অনুধাবন করা যায়। প্রথম কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া পরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন বরদাকান্ত। হরকান্তের ন্যায় তাঁহারও সংভাব তখন ছিল সমাচ্ছন্ন। বিপুল অর্থাগম সত্বেও ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া পরে ধর্মকার্যে ব্রতী হন তিনি এবং তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। সারদাকান্তও প্রথমে ছিলেন শিক্ষাব্রতী; পরিশেষে পুরীধামে গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরে সেবাইত নিযুক্ত হইয়া অপূর্ব নিয়মনিষ্ঠার সহিত সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রোহিণীকান্ত পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হইয়া পরে ডি, এস, পি, পদে উন্নীত হন। ইঁহারা সকলেই গোস্বামী প্রভুর আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হন।

কুলদানন্দকে একবার গোস্বামী প্রভু বলেন: "তোমরা কয়টী সহোদর যেন পরামর্শ ক'রে পৃথিবীতে এসেছ। বাইরে তোমাদের প্রকৃতি বিভিন্ন ব'লে মনে হ'লেও তোমরা একই ধাতু দিয়ে গঠিত।" তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা দেয় ত্যাগ-বৈরাগ্যের স্বাভাবিক প্রকাশ।

সাধিকা জননীর স্নেহযত্নে, ধর্মপ্রাণ অগ্রজদের অভিভাবকত্বে, আদর্শ শিক্ষক ও নিষ্ঠাবান কুল-পুরোহিতের তত্বাবধানে শৈশব হইতেই কুলদানন্দের জীবন অগ্রসর হইয়া চলিল সার্থকতার পথে। অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা লইয়া ক্ষুদ্র একটি বীজ এমনি প্রস্তুতি ও পরিবেশের মধ্য দিয়াই বিকশিত হইতে লাগিল তিলে তিলে। অচিরেই উন্নত শীর্ষে ভুবন আলো করিয়া দাঁড়াইল এক অভ্রভেদী বিরাট মহীরুহ।…

জন্মকাল হইতেই মহাপুরুষদের প্রাণযমুনায় উজান বহিয়া চলে। লক্ষ কোটী শিশুর মত তাঁহারাও হাসিয়া খেলিয়া বেড়ান; অথচ হাসিতে খেলিতে তাঁহারা যে আসেন নাই, শৈশব হইতেই তাহা যেন সুস্পষ্ট। দশের মাঝে থাকিয়াও তাঁহারা স্বেচ্ছাবন্দী; সাধারণের মাঝেও নিতান্ত অসাধারণ। জ্ঞানোন্মেষ হইতেই তাঁহারা অলৌকিক গুণ, দক্ষতা ও অতুল অন্তর-সম্পদের অধিকারী।

প্রথম হইতে কুলদানন্দের পূত জীবনধারা এমনই একটা মধুর ও সার্থক ব্যতিক্রম। শৈশবকালে তাঁহার মধ্যে দেখা দেয় কতকগুলি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীদের সহিত ঠিক প্রাণ খুলিয়া মিশিতে বা খেলাধূলায় মাতিয়া উঠিতে পারিতেন না তিনি। একটা অজ্ঞাত বস্তুর অভাববোধ তাঁহার অন্তরে জাগাইয়া তুলিত অব্যক্ত বেদনা।…মায়ের কাছে ভূত-প্রেতের বাজে গল্প না শুনিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী শুনিতেন। আর, রাম-লক্ষ্মণ, ভীম-দুর্যোধন ও কৃষ্ণ-বলরামের অনুকরণে সঙ্গীদের সহিত খেলা করিতেন। মাটির ঢিবি তৈয়ার করিয়া গিরি-গোবর্ধন ধারণ করিতেন। দাতা কর্ণের মত নিজের অতি প্রিয়বস্তু অপরকে দান করিয়া লাভ করিতেন বিমল আনন্দ। ভক্ত মালের গল্প শুনিয়া ভাবিতেন—আহা, কবে আমি এমন হব!…রাম-সীতা ও যীশুখৃষ্টের আত্মদানের কাহিনীতে তাঁহার চোখে টলমল করিত অশ্রুবিন্দু।…

বৈষ্ণব ভিখারীদের কাছেও রাধাকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যেন ব্যথাতুর হইয়া উঠিতেন। মাঠে-জঙ্গলে একাকী দয়িতের সন্ধানে বালক ধ্রুবের মত অশ্রুসিক্ত হইতেন। শুনিতেন শ্রীকৃষ্ণের বসতি নাকি বৃন্দাবনে—সেখানে তরুলতা দেখিবার জন্য, ধূলায় গড়াগড়ি দিবার জন্য অন্তরে জাগিত আকুল ক্রন্দন।…প্রশ্ন জাগিত শিশুর মনে—সেই মধুর ধাম বৃন্দাবন কোথায়,… কত দূর…কোন্ পথে?…

বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য তাঁহার অন্তরে জাগিত গভীর ব্যাকুলতা। তিনি লিখিয়াছেন: "আমাদের পাড়ায় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ কৃত্তিবাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেন। শুনিতে বড় ভাল লাগিত। রাম যেন আমাদের পরিবারেরই কেহ, আমাদের ছাড়িয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন মনে করিয়া রামের জন্য কাঁদিতাম। ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে বনে জঙ্গলে গেলে সেখানে রাম আছেন কিনা চারিদিকে দেখিতাম। রামের বর্ণ দুর্ব্বার মত, তাই আগ্রহের সহিত দুর্ব্বার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। দুর্ব্বায় পা পড়িলে রামের গায়ে পা লাগিল ভাবিয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িতাম, রামকে নমস্কার করিতাম। তীর-ধনুক সর্ব্বদা হাতে রাখিতাম। একখানা ছেঁড়া রামায়ণ পাইয়া সারাদিন উহা সঙ্গে রাখিতাম। রাত্রিতে উহা মাথার নীচে রাখিয়া শুইতাম। এ সময়ে আমি শিশুশিক্ষাও পড়ি নাই।"…

খেলাচ্ছলে রামায়ণের কাহিনী অনুকরণে তাঁহার অভিনয়ের আগ্রহ দেখা যাইত। করুণাকান্ত গাঙ্গুলীকে রাম সাজাইয়া নিজে লক্ষ্মণ সাজিতেন তিনি।

পরবর্তীকালে ইহার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—রাম চরিত্রের ত্যাগে, মহত্বে ও উদারতায় লক্ষ্মণের ভূমিকার মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইতেন। চৌদ্দ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে, দুর্জয় মেঘনাদকে পরাভূত করিবার বীরত্বে এবং রামচন্দ্রের আদর্শ ভক্ত হিসাবে লক্ষ্মণ চরিত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিত।···

আশৈশব এই গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের মূলে ঠাকুরের অন্তরে ছিল প্রবল আস্তিক্য বুদ্ধি। বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে অতীন্দ্রিয় লোকের অস্তিত্বে ভারত চিরবিশ্বাসী। সেই চিন্ময় লোকনাথের প্রতি অবিচল ভক্তি এই আস্তিক্য বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সাধারণের ধারণাতীত—বিদ্যুতের মত চমকিত করিয়া মিলাইয়া যায় পরক্ষণে। শিশুকাল হইতে যিনি সেই অমূল্য সম্পদের অধিকারী, তাঁহার মত ভাগ্যবান মহাপুরুষ সত্যই বিরল। জনসাধারণ যখন বিষয়-বাসনায় মত্ত, তখন্ একটী শিশু ত্রিজগতের পরমবস্তুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন ?···বহু জন্মের সাধনায় যাহা সুদুর্লভ, নিতান্ত শিশুর অন্তর সেই প্রেম ও প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হইল কেমন করিয়া ? · ইহার সদুত্তর ঠাকুরের চরিতামৃত কথার মধ্যেই মিলিবে।

আশৈশব এই আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভাবে রূপ বা যশের মোহে, কিংবা প্রকৃতির বাহ্য মোহিনী মূর্তিতে কখনও মুগ্ধ হন নাই তিনি। সহজভাবে অনুভব করিতেন—এই বিরাট বিশ্বে অনন্ত বৈচিত্র্যের মাঝে তিনি একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ যেন।···ভগবানের সহিত নিবিড় সম্বন্ধবোধ তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ ও অভিভূত করিয়া তুলিত। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাইতো তাঁহার এত ব্যাকুলতা।···

ইহাই প্রকৃত প্রবর্তক অবস্থা। এই আত্মসন্ধানের সূচনা হইতে তাঁহার যৌবনে দেখা দেয় দুশ্চর সাধক অবস্থা, এবং সিদ্ধ অবস্থায় ইহার সার্থক পরিণতি। ঠাকুরের জীবন-বেদের এই মূল যোগসূত্রটী বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তবেই উপলব্ধি করা যাইবে তাঁহার জীবন-চরিতের ক্রমবর্ধন ও পূর্ণবিকাশ।···সর্ব-খল্বিদং ব্রহ্মঃ—যাঁহার অন্তরে ব্রহ্মের সহিত আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত, সর্বভূতে তিনি অনুভব করেন চিন্ময়ের অধিষ্ঠান। তাঁহার মর্মকেন্দ্রে জাগিয়া ওঠে জীবে দয়া ও মমতা। উত্তরকালে যে অনন্ত প্রেম ঠাকুরের হৃদয় ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম হইতে তাহার পূর্বাভাষ বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

কুলদানন্দ সাধক অবস্থায় গোস্বামী প্রভুর নিকট বলেন: "একবার ছোটবেলায় তখন আমি ন্যাংটা থাকি। একদিন বৃষ্টির পর ঘর থেকে বের হ'য়ে দেখি ছাঁচতলায় জল জমেছে; একটী কেঁচো জল থেকে উঠবার চেষ্টা কচ্ছে,

পাচ্ছে না। আমি একটি কাঠির দ্বারা তাকে জলের উপর তুলে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখলাম অসংখ্য বড় বড় লাল পিঁপড়া তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছে, কেঁচোটী ছটফট ক'চ্ছে। দেখে অত্যন্ত কষ্ট হল ; আমি যদি জল থেকে না তুলতাম, কেঁচোটীর এদশা হ'ত না। কেঁচোটিকে বাঁচাবার অন্য উপায় নেই বুঝে তাকে আবার জলে ফেললাম। তখন কতকগুলি পিঁপড়া জলে ডুবে মরে গেল, কতকগুলি জলে ডুবে ভেসে উঠল। জলের উপরের পিঁপড়াগুলিকে বাঁচাতে জল থেকে এক একটি করে তুলতে লাগলাম। কয়েকটি পিঁপড়া আঙ্গুল কামড়ে দিল, জ্বালায় অস্থির হয়ে স'রে পড়লাম। কেঁচোটির যন্ত্রণার চিত্র এখনো ভুলতে পারিনি।…"

শিশুরা প্রাণীহত্যায় উৎকট আনন্দলাভ করে, কিন্তু শৈশবেই ক্ষুদ্র জীবের যন্ত্রণায় তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়াছে। ইহার স্মৃতি পরিণত বয়সেও তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। সর্বজীবে এই দয়া ও মমতার জন্য তাঁহার জীবহিংসা প্রবৃত্তি কখনও জাগে নাই। এমনকি আশৈশব তিনি ছিলেন নিরামিষভোজী। মাংস দূরে থাক, অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ তাঁহাকে মাছ খাওয়াইতে পারে নাই। পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্যও জীবনে গ্রহণ করেন নাই। শিশুকাল হইতে তাঁহার এই স্বতঃস্ফূর্ত সংযম সত্যই বিস্ময়কর।

রোগে শয্যাশায়ী এক বৃদ্ধার মৃত্যুযন্ত্রণায় অভিভূত ও চিন্তামগ্ন হইয়া পড়েন তিনি। এই যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় কী—এই প্রশ্ন তাঁহার শিশুমনকে নাড়া দেয় গভীরভাবে। সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধারণায় কাহারও মনে কোনরূপ ক্লেশপ্রদান করেন নাই। বাল্য সঙ্গীদের প্রতি কখনও অসদ্ব্যবহার করিতেন না। ইতর জাতি ও পশুপক্ষীর প্রতিও সদয় ব্যবহার করিতেন। এজন্য সকলে তাঁহার অনুরক্ত ছিল ; আর অল্প বয়সেই তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়।

শিশু কুলদানন্দের স্বভাবটি ছিল যেমন মধুর, তেমনই সুন্দর। কোন কারণে লোভ, হিংসা বা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। শৈশবে ও বাল্যকালেই তিনি সত্য, সংযম ও নির্ভীকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। একদিন খেয়াল বশে ক্ষেত হইতে একটি টমাটো তুলিয়াছিলেন। খেলিবার সময় সহসা সম্বিৎ ফিরিল—তিনি ছুটিয়া চলিলেন বাড়ীর দিকে। সঙ্গীদের ডাকাডাকিতে কর্ণপাত করিলেন না, বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে একটি পয়সার জন্য আবদার ধরিলেন। ছেলের স্বভাব জানিতেন হরসুন্দরী ; হয়ত কোন দীনদুঃখীকে দিবেন ভাবিয়া

পয়সা দিলেন তিনি। অমনি কুলদানন্দ এক ছুটে চলিয়া আসিলেন টমাটোর ক্ষেতে। যে টমাটোটি লইয়াছিলেন তাহার দাম লইবার জন্য সজোরে ডাকিতে লাগিলেন চাষী ভাইকে। সাড়া না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিলেন। সঙ্গীরাও মজা দেখিতে আসিল এবং কী হইয়াছে মা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাই সব বুঝাইয়া দিল। বলিল ঃ কুলদা কী বোকা! এক পয়সায় টমাটো মেলে একঝুড়ি। ভারি একটা নিয়েছে—তার আবার দাম! তাতে আবার এত কান্না?...

ছেলেকে বুকে টানিয়া লইলেন হরসুন্দরী। বলিলেন ঃ তাই হ'ক—কুলদা আমার চিরদিন যেন এমনি বোকা হ'য়েই থাকে।...কুলদানন্দকে পরম স্নেহে বলিলেন ঃ যে গাছ থেকে ফলটি নিয়েছিলে, সেখানে নমস্কার ক'রে পয়সাটি রেখে এসগে'। মায়ের আদেশ মত জমিতে আসিয়া বলিলেন কুলদানন্দ ঃ "গাছ, তোমার ফলের দাম নেও। আমার পাপ নিও না—তোমাকে প্রণাম!"—খুশী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন তিনি। যেমন মা, তেমনি তাঁর সন্তান।...

মায়ের কথা কুলদানন্দের কাছে ছিল বেদবাক্য। পরদিন সরস্বতী পুজা—একটি পয়সা দিয়া কুমোর বাড়ী হইতে পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি দোয়াত আনিতে বলিলেন হরসুন্দরী। কুমোরের হাতে পয়সাটি দিয়া কুলদানন্দও পাঁচটি দোয়াত লইলেন। কুমোর বলিল ঃ পয়সায় আটটি দোয়াত, আরও তিনটে নেও।

ঃ না, কুমোর কাকা—মা যে নিতে বলেছেন পাঁচটা।

কিছুতেই একটিও বেশী লইতে রাজী হইলেন না তিনি। কুম্ভকার অবাক হইয়া ভাবিল—এইটুকু ছেলে, অথচ মায়ের উপর কী আশ্চর্য ভক্তি!...

বলা বাহুল্য, অনুন্নত হিন্দু ও মুসলমানদের বর্ণহিন্দুরা 'দাদা, কাকা' ইত্যাদি বলিয়া ডাকিত। বিনিময়ে তাহারাও পাইত অনুরূপ আচরণ। তখন গ্রামাঞ্চলে প্রীতির সম্পর্ক ছিল এমনই মধুর। রাজনীতির আবর্তে আজ তাহা স্বপ্নাতীত।...

শিশুকাল হইতে কুলদানন্দ ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। বাড়ীর পুকুরের ওপারে একটি গাছ কোমর পর্যন্ত রাখিয়া কাটা ছিল। একদিন রাত্রিতে খাওয়ার পর বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে মুখ ধুইতে যান কুলদানন্দ। অন্ধকারে গাছের গুঁড়ি দেখিয়া মেয়েটীর মনে হইল 'কন্ধকাটা ভূত।' সে বলিল ঃ ওদিকে যাব না—ভূতে ধরবে!...

ঃ হ'ক ভূত—রাম নামে আবার ভয় কিসের ?···

'জয় রাম, জয় রাম' বলিয়া অগ্রসর হইলেন কুলদানন্দ। দেখিলেন ভূত নয়, গাছের গুঁড়ি। মেয়েটাকেও তাহা দেখাইয়া দিলেন। ভগবানের নামে কী অটল বিশ্বাস, কী আশ্চর্য নির্ভীকতা !···

দীনদুঃখীর উপরও তাঁহার দয়ার অন্ত ছিল না। তাঁহার বয়স তখন মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর। একদিন দুধের বাটী খোঁজাখুজি সুরু হইল। এদিকে গরীবদের ছোট মেয়ে মীনু বাটী লইয়া আসিতেই ধরা পড়িল। চুরি করে নাই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল মেয়েটি। অমনি ছুটিয়া আসিয়া কুলদানন্দ জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন ঃ মা, কবরেজ মশাই ওকে দুধ খেতে বলেছেন। ওরা গরীব, দুধ কোথায় পাবে ? তাই বাটীতে ক'রে আমার দুধ ওকে দিয়েছি। আমার তো দুধ না খেলেও চলে।···জননীর চক্ষুদুটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

আর একদিন আসিল একটী ভিখারিণী। রুক্ষ চেহারা, শতচ্ছিন্ন বেশ, চোখদুটী সজল। কুলদানন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন—ছুটিয়া আসিয়া জননীকে বলিলেন ঃ মা, তোমার তো অনেক কাপড় আছে—একখানা দাওনা।··· ভিখারিণীকে কাপড় দিয়া তবে নিশ্চিত হইলেন।

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ভিক্ষা করিত একটী কুষ্ঠরোগী। একদিন কুলদানন্দ দেখিলেন, মাছির দারুণ উৎপাতে অসহায় রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। ত্বরিতে তাহার কাছে গিয়া মাছি তাড়াইতে বসিলেন। প্রতিদিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার পথে এইভাবে বহুক্ষণ তিনি মাছি তাড়াইতেন এবং সাধ্যমত রোগীকে সাহায্য করিতেন।

বাড়ীতে একটী গাভী দুবেলাই দেড় সের করিয়া দুধ দিত। কিন্তু ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল নধর বাছুরটি। অবলা জীবের দিকে নজর পড়িল কুলদানন্দের। দুপুরে সকলের বিশ্রামকালে চুপি চুপি দড়ি ছাড়িয়া দিয়া বাছুরটিকে প্রাণ ভরিয়া দুধ খাওয়াইতে লাগিলেন। বিকালে গাভীর দুধ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় সকলে তো অবাক। কয়েক দিন পরে গোপনে সব কথা স্বীকার করিলেন তিনি।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারেন, ধর্মকর্ম ও পূজা-পার্বণের মূল লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। তিনি অনুভব করিতে থাকেন, নিয়মিত ধর্মকর্মের মধ্য দিয়াই ভগবৎকৃপা লাভ সম্ভব। এজন্য শৈশব হইতে বিধিমত ধর্মসাধনের জন্য তাঁহার অন্তরে জাগে প্রবল আগ্রহ।

এইভাবে কুলদানন্দের জীবন-নদী ফল্গুধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইয়া চলে আপন পথে। বাল্যকালে প্রথম অনুভূতির সেই পরম সন্ধিক্ষণে তাঁহার জীবন-বেলায় অভাবনীয়রূপে আবির্ভূত হন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ। অমনি আত্মহারা নদীর বুকে দেখা দিল প্রথম প্লাবন।...অজ্ঞাত, অপরিচিত এই মহাপুরুষ যেন তাঁহার চিরপরিচিত, পরম আপনার।...

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজের বিজয়স্তম্ভ। তাঁহার সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎলাভের কথা ঠাকুর নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায়। প্রায় ছয় বৎসর বয়সে একদিন অপরাহ্নে খেলা করিতেছিলেন। কে হঠাৎ ডাকিয়া বলিল ঃ ওরে, তোদের বাড়ী গোসাঁই এসেছেন, শিগ্‌গির যা'।...এক দৌড়ে বাড়ী আসিলেন তিনি। দেখিলেন ঠাকুরঘরের ধারে শেফালী গাছের নীচে তাঁহাদের আত্মীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দাঁড়াইয়া আছেন একজন সুপুরুষ।...ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ "হাতে তাঁর মোটা লাঠি, পায়ে জুতা, গায়ে একটি জামা ও ময়ূরপঙ্ক্ষী রঙের জামীয়ার ; শরীরটি প্রকাণ্ড। উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়িয়া আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই তিনি স্নেহদৃষ্টিতে ঈষৎ হাসিমুখে আমাকে খুব পরিচিতের মত বলিলেন—কি, খেলা করছিলে? বেশ! বেশ!! যাও, খুব খেলা কর গিয়ে!...এই বলিয়া তিনি নবকান্ত বাবুর সহিত ময়দানের দিকে চলিলেন, যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আকৃতি ও সস্নেহ চাহনিটী আজ পর্যন্তও আমি ভুলিতে পারি নাই। 'গোসাঁই' শব্দটী বলিলে আমি এই গোসাঁইকে বুঝিতাম।"...

উত্তরকালে যিনি জীবন-দেবতা রূপে দেহ-মন-প্রাণ, সমস্ত অস্তিত্ব অধিকার করিয়া বসিলেন, আকস্মিকভাবে তাঁহার এই প্রথম দর্শনলাভ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ...এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়াই সকলের অলক্ষ্যে উপ্ত রহিল অদূর ভবিষ্যে বিরাট বিস্ময় ও সম্ভাবনার বীজ ; আর গভীর দৃষ্টির পরশ বুলাইয়া তিনি বর্ষণ করিয়া গেলেন প্রথম সস্নেহ আশীষ ধারা।...অন্তরের মণিকোঠায় অক্ষয় হইয়া রহিল তাহার চিরমধুর স্মৃতি।...

॥ তিন ॥

নয় বৎসর বয়সে জৈনসার বিদ্যালয়ে কুলদানন্দের প্রাথমিক বিদ্যালাভ সাঙ্গ হয়। এই বিদ্যালয়ে বোধোদয় পর্যন্ত পড়া হইলে বরদাকান্ত তাঁহাকে ঢাকা লইয়া গিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। সারদাকান্ত তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। দুইজনেই মেজদাদার তত্ত্বাবধানে এক ছাত্রাবাসে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে থাকেন। হরকান্তবাবুর পুত্র সজনীকান্ত কিছুদিন পরে ঢাকায় আসিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। তাঁহাকে সাথীরূপে লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন কুলদানন্দ।

দশ বৎসর বয়সেই কুলদানন্দকে ডায়েরী লিখিতে শিক্ষা দেন বরদাকান্ত। তখন হইতে কুলদানন্দ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী যথাযথভাবে এই ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। পরে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন ঃ সারাদিন কয়টা মিথ্যা কথা বলিতাম, কার সঙ্গে ঝগড়া করিতাম, কী কী দোষ করিতাম, প্রত্যহ ঠিক ঠিক এই ডায়েরীতে লেখা হইত। এই সময় হইতে ডায়েরী লেখা আমার অভ্যাস'।···উত্তরকালে এই ডায়েরীগুলি আংশিকভাবে 'শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ' নামে প্রকাশ করিয়া ধর্মজগতের অশেষ কল্যাণসাধন করেন তিনি। এইজন্য লক্ষকোটী ভক্তবৃন্দ বরদাকান্তের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এই ডায়েরীগুলি অতি সুন্দরভাবে লিখিত। বর্ণমালার সমতা, পংক্তির সরলতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য—সবদিক দিয়াই ডায়েরীগুলি যেন নিপুণ শিল্পীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর। স্বীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী বিষয়বস্তু ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছুই ইহাতে স্থান পায় নাই। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তাঁহার এই সংযম ও কৃতিত্ব বিস্ময়কর। ঘটনা ও প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লাল ও নীল উভয়বিধ কালি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কিছু লেখার পর সেগুলি আর আদৌ সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয় নাই—ইহাই এই লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ডায়েরীর পাণ্ডুলিপি শিল্প-প্রদর্শনীতে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য।

কুলদানন্দের উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত লিখিত ডায়েরী দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল। দশ হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত ঘটনাবলী লিখিত ছিল বৃহত্তর খণ্ডে। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে সতের হইতে উনিশ বর্ষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া পাওয়া যায় তাঁহার তারুণ্যের স্পষ্ট অথচ সকরুণ আভাস।

শৈশবকালের ন্যায় তাঁহার বাল্যজীবনও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাল্যে তাঁহার মনোরাজ্যে দেখা দেয় কত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঝড়-ঝঞ্ঝা। তবুও অন্তর-দেবতার আহ্বানে তিনি অগ্রসর হইয়া চলেন বিজয়ী বীরের মত। তাঁহার প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব কীভাবে বিকশিত হইতেছিল সে সম্পর্কে দু-একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

একদিন মাঠে খেলিবার সময় তাঁহার হাত অজ্ঞাতে গিয়া লাগে তাঁহার এক বন্ধুর চোখে। অমনি সঙ্গীটি প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাইয়া দেয় তাঁহার বুকে। অকস্মাৎ এমনি গুরুতর আঘাতে বেশ কাতর হইয়া পড়েন তিনি। অধিকতর বলবান ছিলেন, স্বচ্ছন্দে উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতেও পারিতেন। কিন্তু মধুর কণ্ঠে শুধু বলিলেন ঃ আমি ইচ্ছে ক'রে তোমার চোখে আঘাত দিইনি। এমন সজোরে তুমি আমাকে মারলে কেন ?...

লজ্জা বা সমবেদনার পরিবর্তে বেশ কর্কশ কণ্ঠে সঙ্গীটি জবাব দিল ঃ ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝিনে—তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ, তাই আমিও প্রতিশোধ নিয়েছি।

ঃ কিন্তু বুকে মারা তোমার খুব অন্যায় হয়েছে—আমার ভয়ানক কষ্ট হ'চ্ছে।

ঃ কষ্ট দেবার জন্যেই তো মেরেছি।...মনে থাকে যেন, তুমি আমার চোখে আঘাত দিয়েছ।

বালক কুলদানন্দের অন্তরে জাগিয়া উঠিল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। পরক্ষণে নিজেকে সংযত করিয়া তিনি বলিলেন ঃ তাই হ'ক—আমি যে তোমার চোখে আঘাত দিয়েছি, একথা যেন আমার চিরদিন মনে থাকে। আর, তুমি যে আঘাত দিয়েছ তা যেন অচিরে ভুলে যাই।...

ঘটনাটি বাল্যকালেই তাঁহার অপূর্ব সংযম ও তিতিক্ষার পরিচয়।

এইসময়ে তাঁহার স্বভাব-প্রবৃত্তি আশ্চর্যভাবেই সৎপথে ধাবিত হয়। খেলার সাথীদের লইয়া একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন তিনি। ঠিক হয়—সারাদিনের আলাপ ব্যবহারের মধ্যে কে কত কম মিথ্যা কথা বলে এবং কত কম অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, প্রথমে চলিবে তাহারই পরীক্ষা ; পরে সন্ধ্যা-বেলায় সকলে একত্র হইয়া নিজ নিজ ত্রুটিবিচ্যুতি অকপটে স্বীকার করিবে, এবং পরদিন যাহাতে মিথ্যা কথা ও অন্যায় আচরণ আরও কম হয় প্রত্যেকেই তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। এই প্রতিযোগিতা ও আত্মপরীক্ষার ফলে নিজের সহিত সঙ্গীদেরও নৈতিক উন্নতির পথে চালিত করেন তিনি।

একদিন কয়েকজন বন্ধু ভাল আম খাইবার আমন্ত্রণ জানায়। আমগুলি তাহারা কোথায় পাইয়াছে তাহা কৌতুহল বশে জিজ্ঞাসা করেন তিনি। উত্তরে

জানিতে পারেন পাড়ার কোন আমবাগান হইতে আমগুলি তাহারা চুরি করিয়া আনিয়াছে। শৈশবে একটি মাত্র টমাটো খেয়াল বশে না বলিয়া লইবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন; আজো' তৎক্ষণাৎ নিতান্ত বিরক্তভাবে বন্ধুদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বালক হইলেও মিষ্ট আমের লোভে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে ছিল অভাবনীয়।

আর একদিনের কথা। গভীর রাত্রে সহসা প্রবল কান্নার রোলে সচেতন হইয়া উঠিল ঘুমন্ত পল্লী। শোনা গেল একটী শিশু মারা গিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার, দুর্যোগময়ী রাত্রি। পল্লীপ্রান্তে ভয়াবহ শ্মশানে কেহই যাইতে চাহে না। গ্রীষ্মের ছুটিতে তখন বাড়ী আছেন কুলদানন্দ। নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন তিনি, সেই বাড়ীর দুইটী ছেলের সঙ্গে শিশুর মৃতদেহ লইয়া চলিলেন। শিশুটির শবদেহ সমাধিস্থ করিতে হইবে; কিন্তু শ্মশানে গিয়া খেয়াল হইল কোদালি আনা হয় নাই। সঙ্গীদের কেহ একা এই গভীর রাত্রে কোদালি আনিতে কিংবা এই ভয়ঙ্কর স্থানে একাকী থাকিতে রাজী হইল না। তখন দুজনকেই পাঠাইয়া দিয়া মৃতদেহের নিকট বসিয়া রহিলেন তিনি একা। উভয়ে হতবাক হইয়া চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিল প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। শৈশবে পুকুরপাড়ে কাটা গাছ দেখিয়া সঙ্গী বোনটী ভূতের ভয় পাইলে তিনি রাম নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। আজও দুর্যোগময়ী গভীর নিশীথে সেই নির্জন ভয়াবহ শ্মশানে শবদেহের পাশে একাকী তিনঘণ্টা বসিয়া বালকরূপী সেই নির্ভীক পুরুষ অটল বিশ্বাসে স্মরণ করিলেন রাম নাম।···রাম নামে দুনিয়ায় কোন ভয়ই যে থাকে না—এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার অসাধারণ নির্ভীকতার মূলমন্ত্র।

এমনি ক্ষমা ও সংযম, সত্যাগ্রহ ও নির্ভীকতা, সর্বোপরি ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস ও অনন্ত নির্ভরতা—বালক কুলদানন্দের এই সকল বৈশিষ্ট্য সত্যই অনন্যসাধারণ।· ·

ঢাকায় অধ্যয়নকালে লেখাপড়ায় মন্দ ছিলেন না তিনি। তবে ধর্মভাবের আতিশয্য বশতঃ ছাত্র হিসাবে খুব বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। চরিত্র গঠনের ন্যায় স্বাস্থ্যোন্নতির দিকেও ছিল তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। তাস-দাবার পরিবর্তে হকি, ক্রিকেট, হাডু-ডু প্রভৃতি খেলা এবং ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করিতেন। এই বয়সেই পল্লী-সংস্কার ও ছাত্রদল সংগঠন কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বরদাকান্তের বিবাহের সময় বন্ধুদল লইয়া অপূর্ব তৎপরতার সহিত অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ণ করেন তিনি।

তাঁহাকে সচ্চরিত্র, দৃঢ়চেতা ও সমাজসেবী জানিয়া জনৈকা পল্লীবধূ তাঁহার শরণাপন্ন হয়। বধূটীর স্বামী একটী চরিত্রহীনা বিধবার প্রণয়াসক্ত হয়—স্বামীকে রক্ষার জন্য বিধবার পত্রগুলি কুলদানন্দের হাতে দেয় সে। পত্রগুলি বিধবাটীর পিতার হস্তে দিয়া তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলেন তিনি। ফলে, হতভাগিনী নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। একটা অপরাধের প্রতিরোধ করিতে গিয়া দেখা দিল আর একটী গুরুতর অধঃপতন—ভাবিয়া তিনি মর্মাহত হন।··· অবশ্য সমাজ-সংস্কার কার্যে আশ্চর্য মানসিক ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দেন তিনি। দেবদেবীর পূজা ও ভূতপ্রেতে বিশ্বাস তাঁহার মনে হইত ঘোর কুসংস্কার—এইগুলি হিন্দুসমাজ হইতে দূর করিবার জন্য বন্ধুদের সহিত চেষ্টা করিতে থাকেন। 'ভূতের-বাসা' বলিয়া কথিত কোন বৃক্ষের একটী শাখা রাত্রে একাকী ভাঙ্গিয়া আনিয়া যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দেন।

কুলদানন্দের ছাত্রজীবনের উপর ব্রাহ্মধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ইংরাজি শিক্ষিতদের প্রায় প্রত্যেকে তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে কমবেশী অনুপ্রাণিত। বিশেষতঃ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা তখন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট দীক্ষিত হইয়া তিনি তখন নূতন আলোক প্রচারে ব্যস্ত। তাঁহার ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতায় ও উপদেশে জনসাধারণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ, প্রবল ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ। শৈশবে প্রথম দর্শনে তাঁহার মধুর বাণী ও সস্নেহ দৃষ্টি কুলদানন্দের মানসপটে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। আজ আচার্যের বেদীতে তাঁহার অমৃতকণ্ঠের সঙ্গীত, প্রার্থনা ও উপাসনায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল সেই মধুর স্মৃতি। ছাত্র কুলদানন্দ অনুভব করিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ।···ব্রাহ্মধর্মের সত্যনিষ্ঠাও ছিল এই আকর্ষণের প্রধান হেতু।

এই সম্পর্কে ঠাকুর লিখিয়াছেন : আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই ব্রাহ্ম। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরেরাও সকলে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। ক্রমে মেজদাদা প্রতি রবিবারে আমাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মদের উপাসনা প্রণালীতে অল্পদিনের মধ্যেই আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। প্রতিদিন দুবেলা নিয়মিতরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিয়া যেদিন আমি না কাঁদিতাম, উপাসনা হইলনা ভাবিয়া সারাদিন উদ্বেগে কাটাইতাম।···

তাঁহার বাল্যবন্ধু ভুবনমোহন, মনমোহন ও সজনীকান্ত তখন ঢাকা স্কুলের ছাত্র। তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মধর্মের সার সত্যগুলি প্রতিপালন করিবার সঙ্কল্প

করেন তিনি। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যোগদান করার ফলে সুন্দর গান গাহিতে শেখেন। ধর্মচিন্তাতেই হৃদয় ভরিয়া উঠে, লেখাপড়ায় দেখা দেয় দারুণ শৈথিল্য। দ্বিতীয় খণ্ড ডায়েরীতে ঠাকুর লিখিয়াছেন : নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি। বহুদিন হইতেই মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করিয়াছি। ব্রতভঙ্গ হইলে আমরা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকি। আমি আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে প্রতি মাসে দুই একবার মাত্র মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।...

ব্রাহ্মসমাজে একদিন তাঁহার হাত হইতে একটি ফুলদানী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। সাধারণের ন্যায় দোষ না ঢাকিয়া বা অপরকে দায়ী না করিয়া সম্পাদকের নিকট নিজের দোষ স্বীকার করেন, এবং ফুলদানীর দাম লইতে অনুরোধ জানান। এইরূপ সত্যানুরাগী ছিলেন তিনি। প্রতিবেশী কোন শিশুপুত্রের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের শান্তির জন্য নির্জনে গিয়া জানান সকাতর প্রার্থনা। সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে তিনি অনুভব করেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

একদিন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ধর্মালোচনায় যোগদান করেন। সন্ধ্যাকাশে সহসা দেখা দিল প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস। সকলে ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলেন তিনি। নবকান্তবাবু বার বার নিষেধ করিয়া বলিলেন : এমন দুঃসাহস করো না।

শান্তভাবে বলিলেন কুলদানন্দ : ভগবান প্রার্থনা শোনেন কিনা পরীক্ষা ক'রব। বাড়ী পৌঁছাবার আগে বৃষ্টি হবেনা ব'লেই আমার বিশ্বাস। যদি হয় তবে বুঝব, আমি ভিজে যাই এইটেই তাঁর ইচ্ছা।...

প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি চলিলেন ধীর পদক্ষেপে। সত্যই তিনি বাড়ী পৌঁছাইলে তবে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।...

এই সময়ের ডায়েরীতে দেখা যায়, পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগিতা ক্রমে তাঁহার স্বভাবে পরিণত হয়। ধর্মগ্রন্থপাঠ, ধর্মালোচনা, প্রার্থনা ও উপাসনায় সমস্ত সময় কাটাইবার সংকল্প করেন তিনি। পড়াশুনায় মনোযোগী হইতে তাঁহাকে বাধ্য করার জন্য চতুর্দিক হইতে চেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু তাঁহার মনে সংকল্প জাগে—হয় তিনি সন্ন্যাসী হইবেন, নতুবা ব্রাহ্মধর্মের আদেশ মানিয়া চলিবেন।...

তারাকান্ত গাঙ্গুলীর (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) সহিত সাংখ্যদর্শন এবং উহার

চতুর্বিংশতি তত্ব বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন তিনি। কখনও হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্বগুলি নির্জনে গভীরভাবে বিচার করিতেন। কখনও বা গায়ত্রী জপ ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য কিনা, সেই বিষয়ে যুক্তিতর্কে মাতিয়া উঠিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁহার স্বজনবর্গ। এমনকি জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ প্রথমে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গেলেও ব্রাহ্ম পরিবারবর্গের সহিত এখন তাঁহার ঘনিষ্ঠতা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। সময় সময় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন তাঁহারা, কঠোর পীড়ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একজন ভগ্নিপতি তাঁহাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন।

কিন্তু সমস্ত তিরস্কার ও শাসন নীরবে সহ্য করিতেন কুলদানন্দ। তাঁহার অন্তরে চলিয়াছিল নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। নির্দোষ, পবিত্র জীবন যাপনের জন্য অহরহ নিজের উপর ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ইহার কোন সন্ধান রাখিতেন না বলিয়াই জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ তাঁহাকে শাসন করিতেন। আর তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন ছাত্রাবাসের অভিভাবক পণ্ডিত মহাশয়। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোথাও গেলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখাইতেন এই গোঁড়া ব্রাহ্মণ। সপ্তাহে উপাসনার দিন দুই একবার ভিন্ন আর ব্রাহ্মসমাজে যাইতে পারিবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিতে কুলদানন্দকে তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন।

আশৈশব তিনি ছিলেন নিরামিষভোজী। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাকে আমিষ ভোজনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হইলেও স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তাঁহাকে অবাধ্য মনে করিয়া ভ্রাতারাও চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। চাকর ও পাচক ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিলেন, মাছমাংস ভিন্ন পৃথক কোন নিরামিষ তরকারী যেন তাঁহার জন্য রান্না করা না হয়। তবু নিজ সংকল্পে অটল রহিলেন তিনি, শুধু আলু সিদ্ধ দিয়া ভাত খাইতে লাগিলেন। তাহাও নিষিদ্ধ হইলে সম্বল হইল শুধু নুন-ভাত।...

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সমর্থনে অন্যান্য ছাত্রেরা এমনকি ঠাকুর চাকর পর্যন্ত নানা কৌশলে তাঁহাকে আমিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আন্তরিকতার কষ্টিপাথরে তিনিও হইলেন কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন। একদিন লাউ-চিংড়ির তরকারী হইতে চিংড়িগুলি ভাল করিয়া বাছিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল।

তরকারী নাকের কাছে তুলিতেই সন্দেহ হইল তাঁহার ; কিন্তু তাহাতে মাছ দেওয়া কিনা জিজ্ঞাসা করিলে শিখানো মত ঠাকুর চাকর সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। মহা সমস্যায় পড়িলেন তিনি ; সবকিছুর যিনি সমাধান করিয়া দেন চক্ষু মুদিয়া সেই অন্তর্যামীর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন ঃ হে ভগবান ! তরকারীতে মাছ দেওয়া কিনা, যে কোন চিহ্ন দেখিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে তা বুঝিয়ে দেও।

প্রার্থনা শেষে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন তরকারীর উপর রহিয়াছে একটি চিংড়ি মাছ।...সানন্দে সকলকে ডাকিয়া দেখাইলে তাহারা তো হতবাক ! এত ভাল করিয়া চিংড়ি বাছিয়া লওয়া হইল, তবু একটা আসিল কোথা হইতে ? এই ঘটনার পরে সকলের অন্তরে সহানুভূতি জাগিল—আর তাঁহার নিষ্ঠা হইল জয়যুক্ত। তাঁহার জন্য পৃথক নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইলে অসুবিধা আপাততঃ দুর হইল। কিন্তু একদিকে এই সমবেত বিরোধিতা, অন্যদিকে নিজের দৃঢ়তা ও কৃচ্ছ্রসাধন—ইহার ফলে তাঁহার দেহমনে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল।...

ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে আসিবার পর হইতে সত্যরক্ষা ও অকপট আচরণের প্রতি বিশেষ অবহিত হন কুলদানন্দ। অন্তরের অন্তস্থলে অনুপ্রবেশ করিয়া নিজেকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতেন, এবং কোন ত্রুটিবিচ্যুতির সন্ধান পাইলে সর্বপ্রযত্নে তাহা দুর করিতে বদ্ধপরিকর হইতেন। নৈতিক চরিত্র কলুষিত হওয়ার আশংকায় মহিলাদের সংস্পর্শ পরিহার করিয়া চলিতেন। এমনকি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ওঠেন। বাধ্য হইয়া কখনও কোন মহিলার সাহচর্যে থাকিতে হইলে নিজ অঙ্গে রক্তপাত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়শ্চিত্ত করিতেন তিনি।...

কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা, যত্ন ও দৃঢ়তা সত্বেও আত্মদমন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া ওঠে। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য, সদগুণ ও সদালাপে এই সমস্ত পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাঁহার সঙ্গলাভে আগ্রহান্বিত হইয়া ওঠেন। গৃহকর্ত্রীদের আদর আপ্যায়নে এবং তরুণীদের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ও স্বচ্ছন্দ হাসিগল্পে তাঁহাদের সংস্রবে যাইবার জন্য প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি। বিশেষতঃ তরুণীদের সংস্পর্শ নিজের পক্ষে যে চরম হানিকর, ইহা মনেপ্রাণেই বুঝিতেন ; কিন্তু যতই তাহাদের এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন, ততই তাহাদের আকর্ষণ যেন প্রবলতর হইয়া উঠিতে থাকে।...

ক্রমে কোন একটী ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা দেখা দেয়। তাঁহার ধর্মভাব ও নৈতিক চরিত্রের জন্য সেই বাড়ীর সকলে তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতে থাকে—প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা সুরু করে বাড়ীর অবিবাহিতা দুইটি তরুণী। সর্বদা তাঁহার সাহচর্য লাভের জন্য কনিষ্ঠা তরুণীর অন্তরে জাগে দারুণ ব্যাকুলতা, এবং কুলদানন্দ নিজেও ঐ তন্বীর জন্য মনের সঙ্গোপনে অনুভব করেন প্রবল আকর্ষণ। আত্মসংযম রক্ষার জন্য উহাদের সংস্রব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন তিনি। তবু মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া যাইবার সময় সারা পথ ঈশ্বরের নিকট জানাইতেন আন্তরিক প্রার্থনা। ফলে, কামভাব প্রবল হইয়া উঠিতে পারিল না; কিন্তু মুগ্ধা তরুণীর প্রতি তাঁহার অন্তরে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। ক্রমে দুইটী তরুণ হৃদয়ে দেখা দিল গভীর অনুরাগ—জীবনপথে প্রেমডোরে বাঁধা যেন দুইটী অভিন্নহৃদয় সাথী।···

অন্য কেহ হইলে এই তরুণ, নিবিড় প্রেম হয়ত পরিণয়ের স্থায়ী বন্ধনে পরিণতি লাভ করিত; কিন্তু কুলদানন্দের জীবনধারা প্রথম হইতে স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত ছিল। শুচিশুদ্ধ আত্মত্যাগের পথেই সুরু হয় তাঁহার জীবনযাত্রা। অবিরত প্রার্থনা ও কঠোর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যদিয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন তিনি। কিন্তু তাঁহাদের সাদর আহ্বান ভদ্রতার খাতিরে প্রায়ই উপেক্ষা করা সম্ভব হইত না; আবার সেখানে গেলে তরুণীদের সংস্রব হইতে দূরে থাকা অধিকতর অসম্ভব হইয়া পড়িত। এই নিদারুণ উভয় সঙ্কটে স্বীয় অঙ্গে রক্তপাত করিয়া তিনি করিতেন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত—পুনঃ পুনঃ এই আত্মনিগ্রহে ক্ষতস্থান নিরাময় হইতে পারিত না।···এইভাবে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বে ও মর্মবেদনায় তাঁহার বক্ষপঞ্জর যেন চূর্ণবিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইল।···

জগৎ সৎ ও অসৎ-এর লীলাভূমি। সৃষ্টিবৈচিত্র্যে নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা অসৎ ভাবের অস্তিত্ব নাই। বিধাতার অমোঘ বিধানে সৎ-এর ক্রমবিবর্তনের জন্যই অসৎ-এর সৃষ্টি—আলোর ক্রমবিকাশের জন্যই আঁধারের বুকে তাহার বিচিত্র লুকোচুরি।···

জগতে সর্ব দ্বন্দ্ব ঐ ভিন্নমুখী অথচ পরস্পর অভিন্ন প্রবৃত্তির জন্য। তবে প্রারব্ধ ও কর্মফল অনুযায়ী মানব মনে সৎ বা অসৎ বৃত্তির আধিক্য দেখা যায়—সেই অনুসারে আমরা মানুষকে বলি ভাল বা মন্দ। কিন্তু কোন একটি পরিস্ফুট এবং প্রবলতর বলিয়া অন্যটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না—সেটী তখন থাকে সুপ্ত।

ঠাকুর কুলদানন্দের মধ্যে আশৈশব সৎস্বভাবের প্রকাশ ছিল সমধিক। এজন্য সাধু ও সচ্চরিত্র রূপে তিনি ছিলেন সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু শৈশব ও বাল্যকালে যাহা সুপ্ত ছিল, যৌবনের প্রথম উন্মেষে সেই অসৎভাবের বীজ পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মুনিঋষি এমনকি স্বয়ং মহাদেব পর্যন্ত যে অসৎ প্রবৃত্তির তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, যৌবনের সন্ধিক্ষণে তিনি যে তাহা হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিবেন, তাহা অসম্ভব। বরং কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সৎ-বৃত্তির সম্যক স্ফূরণই ছিল জীবন-দেবতার অভিপ্রেত।···

নিজের অন্তরে এই কু-প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিবার মত কোন কামনা বা প্রলোভনের মোহে কখনও বিব্রত হন নাই তিনি। কিন্তু বাহির হইতে সকলে নানাভাবে অবিরত আকর্ষণ ও উত্তেজিত করিতেই সেই সুপ্ত পশু যেন সবেগে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল। আত্মসমীক্ষার ফলে সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই ক্ষুব্ধ ও হতচকিত হইয়া উঠিলেন তিনি—অন্তরের নিষ্ঠা ও সহজাত সৎ-বৃত্তিও রুখিয়া দাঁড়াইল। নিজের উপর চলিল কঠোর প্রায়শ্চিত্ত—বিক্ষুব্ধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিবেক সুতীক্ষ্ণ সায়কে উদ্ধত পশুকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আর ভগবৎ বিশ্বাসের প্রেরণায় অন্তস্থল হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল নিত্য আকুল প্রার্থনা।···অন্তরের সঙ্গোপনে নিজের বিরুদ্ধে এই নিরলস সংগ্রাম যেমন সকরুণ, তেমনই হর্ষোদ্দীপক—ইহাই তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিপ্লবের গোড়ার কথা।···

এই সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় লেখাপড়ার উপর আর কিছুমাত্র আগ্রহ রহিল না কুলদানন্দের। পড়াশুনার জন্য ঢাকায় আগমন—তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত, ব্রাহ্মতরুণীদের প্রবল আকর্ষণ, আর গুরুতর আত্মসংগ্রাম।···এজন্য ঢাকায় অধ্যয়নই সমস্ত উৎপাত ও অন্তর্দাহের মুল বলিয়া তাঁহার মনে হইল। ব্রাহ্মসমাজের উপরেও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন তিনি। ব্রাহ্মমন্দিরের প্রোজ্জল আলোক তাঁহাকে যেমন সত্যনিষ্ঠা ও উপাসনার পথে নূতন আনন্দ ও প্রেরণা দান করিল, ব্রাহ্মপরিবারে ঘন অন্ধকার তাঁহাকে তেমনি বিব্রত ও দিশেহারা করিয়া তুলিল। তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছিল বহুশীর্ষ ভুজঙ্গ—আপাততঃ শুধু তাহার কামপ্রবৃত্তি রূপ একটী মাত্র ফণার প্রকোপেই বিপর্যস্ত হইয়া উঠিলেন তিনি।·

লীলাময়ের বিচিত্র লীলা এইভাবে নূতন ছন্দে লীলায়িত হইতে লাগিল

তাঁহার জীবনে। শৈশবে খেলার মাঝে যাঁহার জন্য আনমনা হইয়া পড়িতেন, প্রতি জীবে অনুভব করিতেন তাঁহার অস্তিত্ব; তাঁহারই প্রতীক ভাবিয়া কুষ্ঠরোগীর সেবা করিতেন। অন্তরে এই যে আকুতি লইয়া জীবনপ্রভাতে যাত্রা সুরু হইল, কৈশোরে জাগ্রত প্রেরণায় দেখা দিল তাহার ক্রমবর্দ্ধমান গতি। ঢাকায় বিদ্যায়তন ও খেলার মাঠ সমভাবে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিল—সত্যের সন্ধানে ও সমাজ-সেবায় উৎসাহী হইলেন তিনি। প্রথম যৌবনে গভীর আবেগে মনপ্রাণ গিয়া পড়িল ব্রাহ্মসমাজে; এই স্থান হইতে ব্যাকুল অন্তর জুড়াইতে চাহিল প্রাণের পিপাসা। প্রার্থনা, উপাসনা ও অশ্রু-বিসর্জনের মধ্য দিয়া দেখা দিল তাঁহার মধুর অভিষেক, দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির জন্য সুরু হইল তাঁহার অভিযান।

কিন্তু নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হৃদয়-দেবতা তাঁহাকে ফেলিলেন কঠোর পরীক্ষায়। ফলে, একদিকে অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে বাধ্য ও অনুগত হইতে শিক্ষা দিল,—অন্যদিকে তাঁহাদের সমস্ত তিরস্কার ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল স্বীয় উজ্জ্বল আদর্শ।···একদিকে ভগবৎ-চরণে আত্মদান করিবার জন্য সহজাত আস্তিক্য বুদ্ধি তাঁহাকে অধীর ও ক্রন্দনরত করিয়া তুলিল, অন্যদিকে প্রথম যৌবনের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস গ্রাস করিতে চাহিল তাঁহার সমস্ত সংযম ও বিবেকবুদ্ধি।···একদিকে ব্রাহ্মসমাজে তিনি লাভ করিলেন নূতন আনন্দ, অন্যদিকে ব্রাহ্মপরিবারে ভোগ করিলেন তীব্র দহনজ্বালা! বস্তুতঃ শৈশবে যিনি অন্তরে ভগবৎপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিলেন, যৌবনেও তিনিই আজ দেহে অপরূপ রূপবহ্নি জ্বালাইয়া ব্রাহ্ম রমণীদের আকৃষ্ট করিলেন, অন্তরে অনুপম মাধুর্যভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া তরুণীদের করিলেন আত্মহারা।···বাহিরে নিত্য নব সংঘাতে এবং অন্তরে প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিল ব্যাপক ও গুরুতর।

তবু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না কুলদানন্দ। এই পরীক্ষা ও উভয় সঙ্কটের মধ্য দিয়া স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন তিনি। মনেপ্রাণে অনুভব করিলেন—ব্রাহ্মমন্দিরে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই পরমাত্মা বিরাজিত নিজেরই মনোমন্দিরে।···তাই, ক্রমে বাহিরের সমস্ত সংস্রব বর্জন করিয়া তিনি হইলেন অন্তর্মুখী—অন্তর্যামীকে পাইতে চাহিলেন অন্তরের সঙ্গোপনে। তবু অন্তরে বাহিরে এই সংঘাত ও অন্তর্বিপ্লবের গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাঁহার দেহে ও মনে। অসুস্থ ও বিপর্যস্ত অবস্থায় অবশেষে ঢাকা

পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী রওনা হইতে বাধ্য হইলেন তিনি।

এই বিপ্লব ও বিক্ষোভের ফলে কুলদানন্দের অন্তস্থল হইতে বিভিন্ন সময়ে উৎসারিত হয় অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রার্থনা। প্রথম দিকের প্রার্থনাগুলি প্রথম খণ্ড ডায়েরীর সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত প্রার্থনাগুলি তাঁহার চিন্তা ও দ্বন্দ্ব, পথ ও লক্ষ্যের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। ইহাতে সমস্ত বাধা-বন্ধ, কামনা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার আত্মোন্নতির প্রবল আগ্রহ। প্রার্থনাগুলির ভাষা যেমন সরল, ভাবও তেমনি সুমধুর—সেই সঙ্গে ভগবৎভক্তি ও মর্ম্মবেদনার সকরুণ সুর প্রতিধ্বনিত। ইহার একটী প্রার্থনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"জননি! আমায় এমন করিলে কেন? আমার জীবনের কতপ্রকার অবস্থাই তুমি দেখাইলে। নিজের জীবনের নানা অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তোমার প্রভুত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়া অবাক হইয়া বসিয়া পড়ি, কিন্তু অবস্থার বিষম ও শোচনীয় পরিবর্ত্তনে কাহার না হৃদয়ে কষ্ট হয়! আমাকে তুমি সারা জীবনে কেবল ইহাই দেখিতে দিলে যে কোন বিষয়েই আমি স্বাধীন নই। মা! যদিও তুমি বারংবার জীবনে একই বিষয় দেখাইলে তবুও এই পাপহৃদয় স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া আগাগোড়া জীবনের শুভাশুভ সমস্ত তোমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে পারিতেছেনা! মা! আমার এই বৃথা চেষ্টা কেন? দয়াময়ি! দয়া করিয়া আমার এই ভ্রান্তি দূর কর। আমার হৃদয়ে এখনও এমন নির্ভরতা আসে নাই যে তোমার কৃপার উপর ভরসা রাখিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকি। মা! যতদিন না আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব, ততদিন কখনই তোমার দয়ায় স্থির বিশ্বাস জন্মিবেনা। তাই, কৃপাময়ি! একবার কৃপাদৃষ্টি কর, আর যেন বৃথাই চেষ্টা করিয়া ভয়ানক কষ্ট পাইয়া ভগ্নহৃদয় না হই। মা! তোমার ইচ্ছা কি তাহা বুঝিনা, কবে আর যে বুঝিব তাহাও জানিনা। আমাকে মা রক্ষা কর। তোমার দয়াতে এ জীবনের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া সুখী হইতে দাও দয়াময়ি! তোমার দয়াতে চিরদিন সমানরূপে অবস্থিত জানিতে দাও এই প্রার্থনা।"

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রার্থনাগুলির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

জননি! আমি কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিব তুমিই আমাকে বলিয়া দাও। আমি বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিবনা ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? আমার নিকট যে সকল প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয় সেগুলি দমন করা আমার

সাধ্যাতীত। দয়াময়ি! প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইয়া আমি যদি অচঞ্চল থাকিতে না পারি, তবে তুমি আমাকে অন্ধ করিয়া দাও।

ওগো জননি! আমার প্রতি কেহ সামান্য অন্যায় করিলেও আমি যদি তাহা উপেক্ষা করিতে না পারি, তবে আমার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইতেছে কেমন করিয়া বুঝিব? আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম কেহ আমার প্রতি অন্যায় করিলেও আমি তাহার উপকার করিব; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে।...মাগো! নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমি অপরের উপকার করিব ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? আমি যে এইরূপ স্বপ্নদর্শন করিয়াছি, তাহা কি সত্যে পরিণত হইবে?......

মাগো! আমার পক্ষে কোনটা ভাল তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। একদিকে বন্ধুগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে হয়, অন্যদিকে অন্যের জিনিষের অংশ লইতে গেলে অপরাধী হইতে হয়। বন্ধুগণ আপাততঃ আমার প্রতি রুষ্ট হইলেও তাহাদের অসন্তুষ্টির ভাব হয়ত স্থায়ী হইবে না; কিন্তু আমি যদি জ্ঞানত কোন অপরাধ করিয়া বসি, তবে ভবিষ্যতে আমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ওগো দয়াময়ি! যে সকল সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে আত্মার উন্নতি হয় তাঁহাদের নিকট যাইতেও এত বাধার সৃষ্টি কর কেন? যাঁহারা বাধা প্রদান করেন তাঁহাদের ভুল তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, অথবা তাঁহাদের মনোভাব তাঁহারা যাহাতে আমার নিকট খুলিয়া বলেন তাহার ব্যবস্থা কর।...

মঙ্গলময়ি! একদিকে তুমি আমাকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিবার সুযোগ দিয়া আমার যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছ, অন্যদিকে নানা প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ। কতদিন আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছি এবং প্রলোভনের ক্ষেত্রে যাইবনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তবু ভদ্রতার খাতিরে আমাকে যাইতে হইয়াছে।...মা! যেখানে গেলে সদালাপ বা সৎশিক্ষার দ্বারা কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে গিয়া কী লাভ? তুচ্ছ আমোদ প্রমোদ এবং অসৎ প্রসঙ্গ হইতে দয়া করিয়া তুমি আমাকে দূরে রাখ।

হে প্রভু! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে বাঘকে আমি ভয় করি তাহারই সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি। এই স্বপ্ন যেন আমার চিরদিন মনে থাকে। তুমি আমাকে এমন শক্তি দাও যেন আমি শত্রুদের সঙ্গেও একত্র বাস করিতে পারি।

…হে সর্ব্বশক্তিমান! তোমার যে অল্প কয়েকজন সন্তানকে তুমি ভালবাস, আমার জীবন তাঁহাদের মত করিয়া গড়িয়া তোল। তোমার জন্য অপরের সমস্ত অত্যাচার আমি যেন নীরবে সহ্য করিতে পারি।…

হে ভগবান! সত্য গোপন করা মহাপাপ। মূর্তিপূজা অপেক্ষা প্রার্থনার দ্বারা তোমাকে আহ্বান করা যে শ্রেয়, তাহা যেন আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে পারি।…হে প্রভু! জাতিভেদ প্রথা অনিষ্টকর কিনা তুমি আমাকে সঠিক বুঝাইয়া দাও। এ বিষয়ে তোমার সুস্পষ্ট অভিমত যতদিন জানিতে না পারিব, ততদিন আমার বন্ধু-বান্ধব ও হিতকামীদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হইবে?

হে ভগবান! তোমারই প্রেরণায় আমি ব্রতগ্রহণ করিয়াছি, তোমারই ইচ্ছায় আমি যেন উহা পালন করিতে পারি।…ওগো দয়াময়! আমি ব্রত রক্ষায় অসমর্থ হইব ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? তোমার সেই ইচ্ছা যদি পূর্ণ হয় তবে ব্রতগ্রহণ করিয়া লাভ কী? আমাকে যদি সর্ব্বদা প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া রাখ, তবে আমার উপায় কী আমাকে বলিয়া দাও।

হে ভগবান! ব্রাহ্মধর্ম্ম কী তাহা আমি বুঝিয়াছি। তুমি আমাকে এই ধর্ম্মপথে চলিবার শক্তি প্রদান কর।…ওগো ভাগ্যলক্ষ্মি! আজ সর্ব্বত্র তোমারই পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু তোমার তো কোন রূপ নাই। তোমার রূপ বা মূর্তি তুমি আমাকে ভুলাইয়া দাও।…হে প্রভু! আমি যেন তোমার নিরাকার রূপের ধ্যান করিতে পারি। অন্যে ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলুক না কেন, আমি যেন ইহাতেই স্থির থাকিতে পারি।…হে ভগবান! তুমি আমাকে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখাইলে কেন? ব্রাহ্মসমাজ কি একটা মরুভূমি? ব্রাহ্মগণ কি দস্যু? যাহাই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম—আমাকে এই পথে চলিতে শক্তি দাও।…

হে প্রভু! তুমিই সমস্ত জীবের জীবন। আমাকে উপলক্ষ করিয়া তুমি একটা বোলতার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। হে প্রভু! তোমার অসীম কৃপার কথা যেন আমি না ভুলি।…হে প্রভু! আজ দুইটী প্রাণীর উপকার করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বিবেচনার দোষে তাহাদের মৃত্যু হইল। হে দয়াময়! আমাকে বিচারশক্তি প্রদান কর।…হে ভগবান! ঋণ করিয়া দান করা উচিত নয় ভাবিয়া আজ আমি দানে বিরত হইয়াছি। ঋণ করিলেও উহা অনায়াসে শোধ করিতে পারিতাম। অভুক্ত লোকটীর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া আমি খুব ব্যথিত হইয়াছি।…

হে সত্যস্বরূপ ভগবান! বিবেকের নির্দ্দেশ পাইলে আমি জগতের অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইব না। বিবেকই আমার একমাত্র চালক।… হে প্রভু! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। আহার গ্রহণের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দাও। আমি যাহা কিছু আহার করিব তোমারই প্রসাদ বলিয়া মনে করিব। যদি কোন অন্যায় হয় তুমি আমাকে অপরাধী করিওনা।… হে ভগবান! ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিয়া অপরাধী হওয়া কি ভাল? ভাল হইলেও আমি উহা পছন্দ করি না। আমি সম্পূর্ণ অসহায়—তুমি আমাকে তোমার আদেশ প্রতিপালনের শক্তি দাও।

হে দয়াময়! বাল্যবিবাহ যে নিন্দনীয় তাহা আমি জানি। ঐ অজ্ঞান দম্পতীকে ক্ষমা করিয়া তুমি তাহাদিগকে সুখী কর।…হে দয়াময় প্রভু! তুমি আমাকে এ কী স্বপ্ন দেখাইলে? আমি কি এডেন ও মক্কায় যাইতে পারিব? হে ভগবান! আমাকে অন্তরে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া পরে তুমি আমাকে সন্ন্যাসী সাজাও। আমি যেন সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এই সকল স্থানে যাইতে পারি।…

যৌবনোন্মেষে ঠাকুর কুলদানন্দের চরিত্র অনুধাবনের দিক দিয়া প্রার্থনাগুলির মুল্য যথেষ্ট। ইহার প্রতিটী ছত্র গভীর বিশ্লেষণ ও অনুভূতি সাপেক্ষ। ইহার মধুর অথচ সকরুণ সুরের মাধ্যমে প্রথমেই পাওয়া যায় তাঁহার প্রবর্তক জীবনের সম্যক পরিচয়।…ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস যেমন সুগভীর, তেমনি তাঁহার দৃঢ় ধারণায় অন্তরে বাহিরে ভগবান সদাজাগ্রত। প্রতি সংশয় ও সমস্যার মাঝে তাই অন্তর্যামীকে স্মরণ করিয়াছেন—প্রার্থনা করিয়াছেন তাঁহার শক্তি ও নির্দ্দেশ। দয়া, ক্ষমা, সেবা, রিপুজয়, শত্রুবশ, আত্মোন্নতি—সর্ববিষয়েই প্রকাশ পাইয়াছে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অনন্ত নির্ভরতা ও মধুর আত্মসমর্পণ।… প্রার্থনাগুলির মধ্য দিয়া এই সহজ-সুন্দর সুরটিই সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ফলেই তাঁহার অন্তরে জাগে ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্ব। প্রার্থনার মধ্য দিয়া সত্যনিষ্ঠ অন্তর চাহিয়াছে সেই সত্যধর্মের পথনির্দেশ। গৃহস্থগণের মধ্যে প্রচলিত তৎকালীন আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম যে অনেকাংশে শ্রেয়, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করা সমীচীন কিনা এ প্রশ্নও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ সাধু-সন্ন্যাসীদের আচরিত শাস্ত্রধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। ফলে ব্রাহ্মধর্ম অথবা সন্ন্যাসধর্ম—কোন পথে অগ্রসর হইবেন এই দ্বন্দ্ব তাঁহার

অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এইজন্য, প্রার্থনাগুলির মধ্য দিয়া কখনও হিন্দুর মত 'মা' আর কখনও ব্রাহ্মদের মত 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন জানাইয়াছেন; আবার কখনও শুধু 'ভগবৎ' সম্বোধনে উভয় কূল বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রার্থনার মধ্য দিয়া অন্তর্বিপ্লবের পরিচয়ও সুস্পষ্ট। চরিত্র গঠন ও আত্মোন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি চাহেন অন্তরের পবিত্রতা। কিন্তু যৌবনের প্লাবনে দুর্জয় কামরিপু পরিপূর্ণভাবে দমন করিবার মত সংযম ও পরিণত বুদ্ধি তখনও তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে। প্রথম হইতে সংগ্রামের অভিপ্রায় লইয়া কামপ্রবৃত্তির মূলে কুঠার হানিবেন, অথবা সেবার মনোভাব লইয়া তাহাকে বশীভূত করিবেন—এ সম্পর্কে স্থিরসিদ্ধান্তে তখনও উপনীত হইতে পারেন নাই। ভগবৎ-বিশ্বাসের আলোকে একদিকে সদগুণাবলী, অন্যদিকে কামপ্রবৃত্তি—নিজের এই দ্বৈত সত্তায় কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া পড়েন তিনি। প্রথমে মনে হয়—দয়া, ক্ষমা, বিবেক প্রভৃতির ন্যায় কামক্রোধাদিও একই বৃন্তে বিভিন্ন ফুল। নিজের ন্যায় অন্য সকলেও তো ভগবৎ-বিধানে ভালমন্দের আধার। সুতরাং কাহাকেও শত্রু মনে করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলে যে মহাপাপ হইবে, প্রথমে দেখা দিল এই জড়বুদ্ধি। মনে পড়িল স্বপ্ন-কথা : যে বাঘকে ভয় করেন, তাহার সঙ্গে একত্রে বাস করিতেছেন।···প্রার্থনা জানাইলেন শত্রুর সঙ্গেও যেন একস্থানে বাস করিতে পারেন। পরে ব্রাহ্ম তরুণীদের সংস্পর্শে কামরিপুর আবর্তে প্রাণ হইয়া উঠিল কণ্ঠাগত। অমনি অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হইল পাঞ্চজন্যের শঙ্খনাদ—সংগ্রামের ভূমিকা গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন তিনি। ফলে, তাঁহাকে অসামাজিকতা ও অশিষ্টতার অপবাদ সহ্য করিতে হয়—তবু বিবেকের কঠোর আহ্বানে তিনি হইলেন অন্তর্মুখী।···

ছাত্রজীবনে সংঘাত ও সংগ্রামের ফলে অনেক সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ব উপলব্ধি করেন কুলদানন্দ। এইগুলি তাঁহার নানা চিন্তা, অনুভূতি ও আকাঙ্খার চমৎকার নিদর্শন। মনোবিশ্লেষণ ও চরিত্র অনুধাবনের জন্য প্রার্থনাগুলির ন্যায় তাঁহার এই অনুভূতিগুলির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

: কামাদি ষড়রিপুর মধ্যে প্রথমটীই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু।···নৈতিক জীবন গঠন করিতে হইলে সমস্ত রিপুকেই অতি অবশ্য দমন ও সম্পূর্ণ জয় করিয়া পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই রিপুগুলির সহিত সংগ্রাম

করিতে হইলে দৃঢ় ইচ্ছা ও কঠোর সংকল্পই সর্বপ্রথমে একান্ত প্রয়োজন।

ঃ ধৈর্যের সহিত সুযোগ অনুযায়ী এই সমস্ত রিপুর সহিত সংগ্রাম করিতে উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা কিছুটা সাহায্য করে।...প্রতি পদে উপস্থিত বুদ্ধি, যথোচিত শক্তি এবং অবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান—এই বৃত্তিগুলিও সংগ্রামের সহায়ক।...অপরাধবোধ, অনুশোচনা এবং অপরাধ স্বীকার মোহাচ্ছন্ন নৈতিক দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে এবং নূতন শক্তি সঞ্চয় করিতে প্রার্থনা আমাদের সহায়তা করে।

ঃ ধর্মপথে চলিতে হইলে অপরের এমনকি নিকৃষ্ট জীবেরও প্রতি ক্ষতিকর বা হিংসাজনক কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।...আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইলে নিরামিষ আহার, সর্বজীবে গভীর শ্রদ্ধা এবং আর্তনরনারী ও ইতর প্রাণীর প্রতি সমবেদনা প্রয়োজন।

ঃ কথায় ও কার্যে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে অকপট থাকিতে হইবে।...কাহারও মিথ্যা আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—তাহাতে আত্মার অধোগতি হয়।...চৌর্যবৃত্তি সর্বদা পরিহার করিতে হইবে এবং স্বভাবে ও আচরণে সর্ব অবস্থাতেই সৎ হইতে হইবে।...নিজস্ব বিশ্বাস সম্পর্কে দৃঢ়তা থাকা চাই এবং প্রকৃত বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়।...সত্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে যে কোন প্রকারেই হউক তাহা অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

ঃ সম্ভোগের প্রলোভন যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করা কর্তব্য। সর্বোপরি মানুষ নিজেই তাহার প্রকৃত শত্রু।...গোপনে কু-আলোচনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে চরিত্র কলুষিত হয়।...পক্ষান্তরে সৎ-সঙ্গ, সৎ-আলোচনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং ধর্মের আদর্শ স্থাপন আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সহায়ক। সর্ব অবস্থায় নৈতিক শক্তি দ্বারা পশুশক্তিকে বশীভূত করা উচিত ; সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া মানবাত্মা শক্তিসঞ্চয় করে, আর প্রতিহিংসার মধ্য দিয়া সেই শক্তির অপচয় করে।

ঃ আত্মার পূর্ণ শুচিতা এবং বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড সত্তা উপলব্ধির মধ্যে মানবের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিহিত। আর প্রকৃতির কর্মধারার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের মধ্যে আত্মার সর্বাধিক আনন্দ নিহিত ; সর্বভূতে ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করা এবং সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দর্শন করাই প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ যথার্থ বিচার করিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। মানবের স্বাধীনতার মোহ শুধু

দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করে। শান্তির লক্ষ্যপথে সুখে-দুঃখে ভগবৎ-কৃপার উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে শিক্ষা করা উচিত।

ঃ প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা তাহা মানিয়া চলাই নিরাপদ। সর্বপ্রকার অবস্থার মধ্য দিয়াই নিজেকে সুখী রাখিতে পারিলে সন্তুষ্ট চিত্তে সবকিছু গ্রহণ করা এবং সকলের সহিত মেলামেশা করা সম্ভবপর হয়। ভালবাসার প্রতিদানে কোন কিছু প্রত্যাশা না করিয়া সর্বদা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাই উচিত।...

প্রথম যৌবনে ঠাকুর কুলদানন্দের এই অনুভূতিগুলি সত্যই আশ্চর্য দৃঢ়তা, শুচিতা, আত্মসংযম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। রিপুজয়ের উদ্দেশ্যে কঠোর সংগ্রামের দৃঢ়সঙ্কল্প, শুচিশুদ্ধ সত্যপথে চলিবার গভীর আন্তরিকতা, আত্মোন্নতি সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পনের দিব্য প্রেরণা এই অনুভূতিগুলির ছত্রে ছত্রে অতি সুন্দরভাবে বিজড়িত। গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই এই স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচেতনা ও দৃঢ়সংকল্প তাঁহার অনাগত জীবনে ব্যাপক সংগ্রাম ও সাধনার সার্থক প্রস্তুতি।...

॥ চার ॥

ধর্মভাবের দোটানায় পড়িয়া কুলদানন্দের অন্তরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমে তাহা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম স্বাধীন ইচ্ছা, বলিষ্ঠ যুক্তিবাদ ও অকপট সত্যের পাদপীঠ। হিন্দুর কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা বা জাতিভেদের স্থান ইহাতে নাই। বুদ্ধির দীপ্তিতে জীবনের সব কিছুই এখানে উজ্জ্বল ও আনন্দময়—পরব্রহ্মের অনন্ত সত্তায় সকলেই এখানে ভাই-বোন, পরম প্রীতি ও সহানুভূতির পাত্র।...আবার, হিন্দুধর্মের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস তাঁহার নিকট সমধিক আকর্ষণের বস্তু। ইহা শুধু বিষয়-বাসনা ত্যাগ নয়—সংসারের সর্ব স্বার্থ বিসর্জন,...ভগবানে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। যুক্তি ও বুদ্ধির ঘূর্ণাবর্তে বার বার দেখা দিয়াছে শোচনীয় পরাজয়, একটা অন্যায় প্রতিরোধ করিতে যাইতে আর একটা অন্যায়। সুতরাং যুক্তিতর্ক ও স্বাধীন ইচ্ছার মিথ্যা অহংকার পরিত্যাগ করিয়া শুচিশুদ্ধ প্রেমভক্তির পথে শ্রীভগবানে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই কি মুক্তি ও আনন্দলাভের যথার্থ উপায় নয়?...

বস্তুতঃ, কুলদানন্দের প্রার্থনা ও অনুভূতিগুলির মধ্যে অন্তরের এই বিমূঢ়তা ও পরিশেষে আত্মসমর্পণের ভাব পরিস্ফুট। অসুস্থ হইয়া ঢাকা হইতে বাড়ী যাইবার পথেও তাঁহার অন্তরে ধর্মভাবের দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলিতে থাকে।

বাড়ী যাইবার সময় পশ্চিমপাড়া হইতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দূরের পথে এক ব্রাহ্মণ পল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন তিনি। এখান হইতে বাড়ী যাইবার পথ তাঁহার অচেনা—তবু ভগবানের নামে রওনা হইলেন। কল্পনা করিলেন, বামে যে পথ পাইবেন তাহাই ব্রাহ্মধর্মের পথ, আর ডাইনের পথ হিন্দুধর্মের।...পথের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া কখনও বামে কখনও ডাইনে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে জনৈক পথিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, তিনি ভুল পথে চলিয়াছেন, ডাইনের পথই ঠিক পথ। লোকটী তাঁহাকে ঠিক পথ ধরাইয়া দিল—সেই পথেই কয়েক ঘন্টা পরে বাড়ী পৌছিলেন।

বস্তুতঃ, কোন ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া উচিত—এই দ্বন্দ্ব স্বপ্নের ঘোরেও তাঁহার অন্তর মথিত করিয়াছিল। এই সম্পর্কে তাঁহার দুইটী স্বপ্নদর্শন উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রথম স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

স্বপ্নে দেখিলেন—এক ভীষণ সমুদ্রের তটে গিয়া পৌছিলেন তিনি। একজন সন্ন্যাসী সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই সমুদ্রের অপর পারে যাইতে বলিলেন ; কিন্তু তিনি ভরসা পাইলেন না। ক্ষিপ্ত হইয়া সন্ন্যাসী বারবার তাঁহাকে সাঁতার দিয়া পরপারে যাইতে বলিলেন ; তবুও সম্মত হইলেন না তিনি। ক্রোধান্ধ সন্ন্যাসী গালি দিতে দিতে তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে ভীত হইয়া তিনি ছুটিয়া পালাইলেন। সন্ন্যাসীও ভীষণভাবে তাড়া করিলে সম্মুখে একটী ব্যাঘ্রের গহ্বর দেখিয়া নিরুপায় অবস্থায় তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া ব্যাঘ্রটী অকথ্য গালিগালাজ করিয়া সন্ন্যাসীকে তাড়াইয়া দিল। যাইবার সময় সন্ন্যাসী বলিয়া গেলেন ঃ যদি মঙ্গল চাও তবে সমুদ্রতটে ফিরে এসো। তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে।......তাড়াতাড়ি চ'লে এসো—নইলে বাঘের কবলে প'ড়ে তুমি প্রাণ হারাবে।...

এই স্বপ্নের মধ্য দিয়াই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাইলেন তিনি। বুঝিলেন, আপন প্রচেষ্টা ও সাধনায় আত্মবিসর্জনের পথে ভিন্ন পরপারে যাইবার আর বুঝি কোন উপায় নাই। ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ সত্য বলিয়া মনে হইলেও সন্ন্যাসের পথে ফিরিয়া যাইবার জন্য স্বপ্নঘোরে ইহা যেন তাঁহার অন্তর-দেবতার ভবিষ্যৎবাণী।...

দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখিলেন—একাকী তিনি গভীর অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইবার সময় কয়েকজন দস্যু তাঁহার অনুসরণ করিল এবং সুন্দর ফলের লোভ দেখাইয়া ডাকিল। সহসা কে একজন তাঁহাকে বলিলেন ঃ সাবধান! ঐ দস্যুদের সঙ্গে যেয়ো না, প্রাণ হারাতে হবে, অথবা ফিরে আসতে হবে।...তবু ফলের লোভে দস্যুদের দিকে অগ্রসর হইলেন তিনি ; কিন্তু বনপ্রান্ত ভীষণ বিপজ্জনক মনে হওয়ায় বহুকষ্টে ঘর্মাক্ত দেহে এক মনোরম স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।...

স্বপ্ন দেখিবার পর তিনি প্রার্থনা জানাইলেন ঃ হে প্রভু, তুমি আমাকে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখালে কেন? ব্রাহ্মসমাজ কি একটা অরণ্য? ব্রাহ্মগণ কি দস্যু?...

ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্পর্শে যাইয়া তিনি যে গুরুতর অন্তর্বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য হয়ত ইহা অবচেতন মনের গোপন প্রস্তুতি। তাই স্বপ্নের পর তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মনে জাগিয়াছে গভীর সংশয়। ব্রাহ্মধর্ম আকর্ষণ করিয়াছে তাঁহার সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন ; কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের ত্যাগ-বৈরাগ্য অধিকার করিয়াছে প্রেম-ভক্তি ও ভগবৎ-বিশ্বাসে সঞ্জীবিত তাঁহার হৃদয়।...

এই প্রসংগে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুলদানন্দের বসতবাড়ীর নিকটস্থ প্রান্তরে ছিল বিরাট একটী আম্র বৃক্ষ। সেই বৃক্ষতলে বাস করিত হবিবুল্লা নামে গরীব এক মুসলমান। লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া জানিত, কিন্তু আসলে সে ছিল এক ধর্মপ্রাণ ফকির। একদিন বন্ধুদের সহিত প্রান্তরে সেই আম্রবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন কুলদানন্দ। হবিবুল্লা ছুটিয়া আসিয়া কয়েকটী আম দিল। আর বলিল ঃ মানুষ আপন প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করে। হিন্দু মা-কালীর পূজা করে, আর মোল্লা আল্লার উপাসনা করে—সকলে এক ভগবানেরই পূজা করে। মানুষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া পূজাপদ্ধতিও বিভিন্ন। সকলেরই উদ্দেশ্য সাধু, অতএব কাহাকেও তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।...বলিয়া পদধূলি লইতে যাইতেই পিছু হটিলেন কুলদানন্দ—তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া চলিয়া গেল হবিবুল্লা। হিন্দুর পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করিতেছিলেন কুলদানন্দ—ঠিক সেই সময় হবিবুল্লা দিয়া গেল উল্লিখিত উপদেশ। কুলদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ "এই ঘটনা গভীরভাবে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল এবং আমি কোন ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিবনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম।"...

কুলদানন্দ বুঝিলেন, নিজের দুর্বলতার দরুণ ব্রাহ্মপরিবারে আশঙ্কা থাকিলেও

ব্রাহ্মধর্ম সত্য ও কল্যাণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। তেমনি হিন্দুর দেবদেবী পূজার মধ্য দিয়াও দেখা দেয় সত্য ও সুন্দরের ভক্তিনম্র প্রার্থনা ও উপাসনা। ধর্মবিচারে তরুণ বয়সেও কোন গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁহার ছিল না, ধর্ম তাঁহার নিকট ছিল জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কোন সত্য পথে মিলিবে শ্রীভগবানের সন্ধান, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। হবিবুল্লার উপদেশে কোন ধর্মই যে অবহেলার বস্তু নয়, যে-কোন পথে ঈশ্বরকে স্মরণ ও বরণ করাই যে পরম লক্ষ্য—এই উদার সমন্বয়ের বাণী তাঁহার তরুণ অন্তরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিল।

পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় মধুর পরিবেশে কুলদানন্দের দেহমন অনেকটা সুস্থ হইল। পুনরায় ঢাকা ফিরিয়া আসিলেন তিনি। নামে ছাত্র রহিলেও পড়াশুনা একেবারেই বন্ধ হইল।

ব্রাহ্মসমাজে আচার্য বিজয়কৃষ্ণের নাম তখনও সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারিত। তাঁহার প্রাণবন্ত বক্তৃতায় ও উপদেশে, অপূর্ব উপাসনায় ও ভাবাবেগে ব্রাহ্মমন্দিরে তখন প্রত্যহ লোকে লোকারণ্য। এমনকি মুসলমান ও খৃষ্টানদেরও ব্রাহ্মমন্দিরে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত—বহু দূরদেশ হইতেও অনেকে উপাসনায় যোগদান করিতেন। গোস্বামী মহোদয়ের মর্মভেদী প্রার্থনায় চারিদিকে উঠিত ক্রন্দনের রোল—ক্রমে অনেকেই হইয়া পড়িত ভাবমুগ্ধ, সংজ্ঞাশূন্য।...

শৈশবে ভাবনেত্রে সর্বপ্রথম যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, কৈশোরে যাঁহার প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অন্তরে জাগে আকর্ষণ,-আজ যুব-সন্ধিক্ষণে তাঁহার দিব্য কান্তি ও অলৌকিক ভাবসম্পদ কুলদানন্দকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। হবিবুল্লার প্রভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি এবার আর কোন বিরাগভাব দেখা দিল না; বরং ব্রাহ্মমন্দিরে হিন্দু-ব্রাহ্ম, মুসলমান-খৃষ্টান সর্ব জাতির সমাবেশে কুলদানন্দের অন্তরে ধর্মবিচারের উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। বিশেষতঃ গোস্বামী মহোদয়ের বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদার আহ্বানে এতদিনে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিল নূতন আলোক,...তাঁহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল সত্যধর্মের প্রকৃত স্বরূপ।...

কিন্তু ব্রাহ্মপরিবারের দিকে ছিল তাঁহার সদাসতর্ক দৃষ্টি। ফলে একদিকে গোস্বামী মহোদয়ের ভাবমধুর আকর্ষণ, অন্যদিকে ব্রাহ্মতরুণীদের রূপ-যৌবনের প্রবল মোহ—পরস্পরবিরোধী এই দুইধারার মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করিলেন তিনি। ব্রাহ্মপরিবারের বেড়াজাল সাবধানে পরিহার করিয়া সন্তর্পণে শুধু ব্রাহ্মমন্দিরেই সুরু হইল তাঁহার যাতায়াত—আর সম্মুখে রহিল গোস্বামী

সহোদরের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি,...অন্তরে তাঁহার সুমহান প্রেরণা।...

গোস্বামী প্রভুর জীবনচরিত যেন দ্বিতীয় মহাভারত—যেমন বিরাট, তেমনি মহিমান্বিত। তাঁহার মহাভাব ও লীলারসও নিঃসন্দেহে বর্ণনাতীত। সদ্‌গুরুর কৃপাবলে তাহার কণামাত্র উপলব্ধি সম্ভবপর। তবু নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের জীবনদর্শন উপলব্ধির প্রয়োজনে সেই লীলারসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপরিহার্য। তবেই বোঝা যাইবে, তাঁহার দিব্য জীবনের ন্যায় কুলদানন্দের জীবন-নদীও কীভাবে বহু দুঃখ ও বাধার পর্বত অতিক্রম করিয়া আপন মহিমায় ছুটিয়া চলিয়াছে মহাসাগরের বুকে।

গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্যন্ত সারাজীবনের আপাত-বিরোধী লীলাবৈচিত্র্যের মাঝে একটা নিবিড় যোগসূত্র ও সামঞ্জস্য পরিস্ফুট। 'সূচনা'য় উল্লেখ করা হইয়াছে, খৃষ্টান মিশনারীদের কবল হইতে সনাতন ধর্মরক্ষার তাগিদেই ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার দৃঢ় পদক্ষেপ। উপবীত ছিন্ন করিয়া গোস্বামী সন্তান ঝাঁপ দিলেন যুগধর্মের উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভে—ব্যাপক প্রচারকার্যে আলোড়িত করিলেন আসমুদ্রহিমাচল। কুঠার হানিলেন প্রতি অন্যায় ও কুসংস্কার, প্রতিটী দুর্নীতি ও দুর্বলতার মূলে। পরে, ৺নামব্রহ্মের অমৃতসিঞ্চনে সনাতন ধর্মকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করিলেন পরম সার্থকতায়। স্তম্ভিত বিস্ময়ে, গভীর শ্রদ্ধায় শিরনত করিল খৃষ্টান মিশনারী দল—ভারতীয় ধর্মনীতির নিকট সেই তাঁহাদের প্রথম পরাজয়।...

অতঃপর গোস্বামী প্রভু ফিরিয়া চাহিলেন আপনার দিকে—আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে পরমবস্তুলাভের অদম্য আগ্রহে অন্তরে জাগিল ক্রমবর্ধমান ব্যাকুলতা। দীক্ষাগ্রহণ তথা পুনরায় উপবীত ও সন্ন্যাস গ্রহণের পর হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ব্রহ্মজ্ঞানের শুষ্ক পথ ছাড়িয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন প্রেমভক্তির অমৃতময় পথে। পরমহংসদেব সানন্দে বলিলেন: "বিজয়ের ফোয়ারা এতদিন চাপা ছিল—এবার খুলে গেছে।"...গোস্বামী প্রভু নিজেও লিখিয়া গিয়াছেন: "সেই অবধি (দীক্ষাগ্রহণের পর) আমার জীবনে এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারিনা, কিন্তু...আমার অভাব মোচন হইয়াছে এবং এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি।"...অদ্বয়, নির্গুণ ব্রহ্মলাভ ব্যতীত সগুণ, সাকার ভগবৎলীলায় প্রবেশ করিবার যে অধিকার জন্মেনা—আত্মজীবনে তিনি প্রদর্শন করিলেন সেই নিগূঢ় তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ।

তাই, একদিকে ধর্মসংস্থাপন, অন্যদিকে জ্ঞান ও ভক্তির পথে ব্যক্তিসত্থার ক্রম-বিকাশ—এই উভয়বিধ কল্যাণ সাধনের জন্যই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন তিনি। সেই উদ্দেশ্যে দীক্ষাগ্রহণের পরেও কিছুকাল গুরুদেবের আদেশে ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া তিনি প্রচার করেন অসাম্প্রদায়িক সত্য ধর্ম। ব্রাহ্মসমাজের বেদীমূলে বসিয়াই নাম সঙ্কীর্তন পরিবেশন কালে তিনি দর্শন করেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চারিপাশে বুদ্ধ, যিশু, শঙ্কর, মহম্মদ, নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষের সূক্ষ্মদেহে ভাবনৃত্যের অপূর্ব আধ্যাত্মিক দৃশ্য।…এইভাবে সর্ববিধ প্রয়োজন যখন ফুরাইল, তখন বক্ষরক্তে সংগঠিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত তিনি অবহেলে ছিন্ন করিলেন সমস্ত সংস্রব। এ যেন সেই চিরাচরিত পুতুল খেলা—হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙ্গলাম।…কী মধুর—অথচ কত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।… তাঁহার বিচিত্র জীবনলীলায় দেখা দিল নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ পরব্রহ্মের কী সহজ-সুন্দর সামঞ্জস্য,…অচিন্ত্য, অদ্বয় পরম পিতার সহিত আনন্দময়ী বিশ্বজননীর কী অপূর্ব চিরমধুর সমন্বয়।…

বস্তুতঃ বাল্যকালে গোস্বামী প্রভু যাঁহার সহিত কথা বলিতেন ও খেলা করিতেন, সেই ৺শ্যামসুন্দরের ইচ্ছায় ও নির্দেশেই ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার এই অভূতপূর্ব পদসঞ্চার। ৺শ্যামসুন্দরের আবদারে বাঁশি ও সোণার চূড়া গড়াইয়া দিয়া তাঁহার মোহন রূপে গোস্বামী প্রভু যখন মহাভাবে অভিভূত, ৺শ্যামসুন্দর তখন তাঁহার ব্রত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন: আমিই তো তোকে ঘরছাড়া করেছি—তুই আবার ঘরে ফিরে এলি কেন?…দীক্ষা অন্তে ভগবৎপ্রাপ্তির পর ৺শ্যামসুন্দর একদিন প্রকাশিত হইলে গোস্বামী প্রভু বলেন: তোমার মনে যদি এই ছিল, তবে আর ব্রাহ্মসমাজে নিয়েছিলে কেন? ৺শ্যামসুন্দর বলেন: "আরে যা—আমি তোকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়েছিলাম, আবার আমিই তোকে ফিরিয়ে এনেছি।…"

অতঃপর, শ্রীমন্ মহাপ্রভু মাত্র সাড়েতিন জনকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, স্বয়ং ৺নারায়ণ প্রবর্তিত নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদের প্রাণধন যে নাম এতদিন সংগোপনে শুধু সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই প্রচারিত হইত, তাহা গৃহীদের মধ্যে প্রচার করাও গোস্বামী প্রভুর প্রধান ব্রত হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার জীবনলীলার ইহাও একটি বিশেষ তাৎপর্য। গেণ্ডারিয়ায়, শ্রীবৃন্দাবনে, হরিদ্বারে, প্রয়াগে, শ্রীক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রতিদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার এবং সর্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মার্থীকে অজপা নাম-সাধনে দীক্ষাদান করেন তিনি। সাধুমহাত্মা,

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হাড়ি-মুচি, চোর-ডাকাত এমনকি পতিতা নির্বিশেষে শত সহস্র নরনারীকে দীক্ষাদান প্রসংগে তিনি বলেন : এই সংসারে অকথ্য দুঃখযন্ত্রণা আমি নিজে ভোগ করিয়াছি। ইহা হইতে জগৎ রক্ষা পাইবে এই আশায় সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে ইহা দান করিতেছি।...

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিতেই নরনারী পশুপক্ষী পর্যন্ত মহাভাবে বিভোর হইয়া পড়িত—ইহা বহুজন্মের সুকঠোর সাধনারও অতীত সম্পদ। গোস্বামী প্রভুর সংস্পর্শে আসিয়াও আবালবৃদ্ধবনিতা সেই মহাভাবের বন্যায় আপ্লুত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। এছাড়া, সর্প, ব্যাঙ, কুকুর, বানর, পক্ষী প্রভৃতির ভাব এবং বৃক্ষাদির নৃত্য, মধুবর্ষণ, ও পুষ্পবর্ষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদির মধ্যেও দেখা দিয়াছে মধুর ভাবাবেশ। মহাপুরুষ, অবতার এবং শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ বিভূতিদর্শন ও সঙ্গসুখ সম্ভোগ তাঁহার জীবনামৃতকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহর্ষির জনৈক আত্মীয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন : ভগবানকে সত্যসত্যই দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায়। শুধু তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, তাঁহার দুই হাত দুই পা টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়াছি। তাঁহার অপরূপ রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছি।...

এছাড়া বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ অনেককেই গোস্বামী প্রভুর পবিত্র সঙ্গলাভের এবং তাঁহার নিকট দীক্ষালাভের নির্দেশ দান করেন। পরমহংসদেবের দেহরক্ষার পরও তাঁহার নির্দেশে অনেক পরলোকগত আত্মা গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও সদ্গতিলাভ করিতে আসিতেন। প্রয়াগ কুম্ভমেলায় মহাত্মা পূর্ণানন্দস্বামী গোস্বামী প্রভুর ললাটস্থ তিলক দেখিয়া বলেন : তেরা ললাটমে তো মেরা মহাদেব ঝাড়া ফেরতা।...মহাত্মা ভোলাগিরি তাঁহাকে বলেন, : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন মিলায় করকে এক ব্যাটা হ্যায়।...মহাত্মা নরসিংহ দাস (পাহাড়ী বাবা) বলেন : এ বাবা সাক্ষাৎ রামজী হ্যায়।...মহাত্মা অর্জুন দাস (ক্ষ্যাপাচাঁদ) বলেন : মহারাজ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়।...মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা বলেন : বাবা প্রেমী হ্যায়, উনকা বহুৎ প্রেম হ্যায়।...শ্রীবৃন্দাবনে জননী যোগমায়া দেবী সঙ্গে থাকার জন্য কতিপয় সাধু আপত্তি তুলিলে কাঠিয়া বাবা বলেন : কেয়া বোলতা হ্যায়—দেখতা নেহি উনকা ললাটমে আগ্ জলতা হ্যায় ? তোমলোক ঐছা আসন পর হরদম বৈঠ রহ তো—শরীর খান খান হো যায়েগা।...

জননী যোগমায়া দেবী সম্পর্কে গোস্বামী প্রভু বলেন : যিনি ইঁহাকে আমা

হইতে পৃথক জ্ঞান করিবেন, তিনি কদাচ আমাকে বুঝিতে পারিবেন না। ...সহধর্মিণীর মধ্যে জগজ্জননীকে দর্শন করিয়া একদিন ভাবাবেশে তিনি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেই জননী অবাক হইয়া যান।...আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়—ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গোস্বামী প্রভুর পবিত্র জীবনগঙ্গা। আবির্ভাব লগ্নেই শ্রীভগবানের অপার মহিমা প্রচার, শৈশবে ৺শ্যামসুন্দরের বিভূতি প্রকাশ, বাল্যে দুর্নীতিদমন, যৌবনে ধর্মসংস্থাপন, প্রৌঢ়কালে দীক্ষালাভ ও ভগবৎপ্রাপ্তি, বার্দ্ধক্যে দীক্ষাদান, নামমহিমা ও মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার এবং অবশেষে শ্রীক্ষেত্রে ৺জগন্নাথদেবের সহিত সাজুয্য ও সজ্ঞানে অপূর্ব তিরোভাব—প্রতি অধ্যায়ের মধ্য দিয়া দেখা দেয় লোকশিক্ষা ও প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহার মহিমান্বিত জীবনলীলার সার্থক রূপায়ণ।...

গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব ও জীবনচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সহিত ঠাকুর কুলদানন্দের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সবিশেষ লক্ষ্যনীয়।

প্রথম জীবন পশ্চিমবঙ্গে অতিবাহিত হইলেও ঢাকা সহরই ছিল গোস্বামী প্রভুর প্রচার, উপাসনা ও সাধন-ভজনের প্রাণকেন্দ্র। কুলদানন্দের পূর্বপুরুষগণও পশ্চিমবঙ্গ হইতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন ঢাকার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায়। উভয় পরিবার ছিলেন রক্ষণশীল—উদ্‌ভাবন অপেক্ষা প্রচারকার্যে, বিপ্লব অপেক্ষা সংস্কার ও ক্রমোন্নতিতে আস্থাবান। উভয় পরিবারই সদাচারী, নিষ্ঠাবান, ভগবৎ-ভক্ত। দয়া, নিষ্ঠা ও প্রেমভক্তিতে গোস্বামী প্রভুর পিতা শ্রীমৎ আনন্দকিশোর এবং কুলদানন্দের পিতা কমলাকান্ত ছিলেন আদর্শস্থানীয়। তেমনি উভয়ের জননী স্বর্ণময়ী দেবী ও হরসুন্দরী দেবী ছিলেন আদর্শ সহধর্মিণী—মাতৃত্বে, করুণায় ও ধর্মনিষ্ঠায় যেন জগজ্জননী।

নিজেদের দিক দিয়াও গোস্বামী প্রভু ও কুলদানন্দের জন্মলগ্ন অলৌকিক ঘটনায় অবিস্মরণীয়। শৈশবে উভয়েই পিতৃহীন হন এবং জননীর নিকট ধর্মনিষ্ঠা ও ভগবৎভক্তির প্রেরণা লাভ করেন। রামায়ণ, মহাভারত বিশেষতঃ রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি উভয়ে ছিলেন অনুরাগী। বাল্যকালেই উভয়ের অন্তর ছিল শুচিশুদ্ধ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন—তেমনি দুর্নীতি, কপটতা, জীবহিংসা ও আমিষ খাদ্যগ্রহণের বিরোধী। উভয়ে আত্মসমীক্ষার ভিত্তিতে জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিবরণ লিখিতে অভ্যস্ত, নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি অকপটে প্রকাশ করিতে যত্নবান। প্রথম জীবনে উভয়ে হিন্দুধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান,

উৎসব-আড়ম্বর ও জাতিভেদের অনাচারে বীতশ্রদ্ধ—সংস্কারমুক্ত জ্ঞান ও সত্যের পথে ব্রাহ্মধর্মে আস্থাবান। মুসলমান ফকিরের সংস্পর্শে উভয়ে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্মে বিশ্বাসী। পরে উভয়েই সদ্‌গুরুর কৃপালাভের মাধ্যমে ভগবৎলাভে আগ্রহান্বিত,—ত্যাগ-বৈরাগ্য, প্রেম-ভক্তি ও ঐশ্বরিক সংযোগের উপর নির্ভরশীল। উভয়ে গয়ার আকাশগঙ্গায় চরম সাধনার মধ্য দিয়া লাভ করেন পরমসিদ্ধি—পরিশেষে সদ্‌গুরু-জীবনে প্রকাশ করেন অপার লীলা, অনন্ত করুণা।...

এইভাবে সর্বদিক দিয়া গোস্বামী প্রভু ও কুলদানন্দ ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, ভগবৎ-লাভে ব্যাকুল, অমর প্রেমভক্তিতে আত্মহারা। তবে গোস্বামী প্রভু সাহসী, দৃঢ়চেতা, গৃহী-সন্ন্যাসী—কুলদানন্দ একাগ্র, ধর্মশীল, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।...পক্ষান্তরে এইটুকু বৈষম্যই পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট কার্যকরী। তাই গতি ও প্রকৃতিতে উভয়ের জীবননদী মহানন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে একই মহান লক্ষ্য-পথে ; এমনি মধুর ঐক্য ও সমন্বয়ের পথে উভয়ে হৃদয় নিঙড়াইয়া পরস্পরকে পরম আপনার রূপে গ্রহণ করেন। সেই সমন্বয় ও সার্থকতার পথে প্রথম যৌবনাবধি কুলদানন্দকে কত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া কত বাধার পর্বত অতিক্রম করিতে হয়—তাহাই এখন আলোচ্য।

॥ পাঁচ ॥

১০ই চৈত্র, ১২৯২। কলিকাতা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করেন বিজয়কৃষ্ণ। 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ' কর্তৃক আচার্যপদে মনোনীত হইয়া ঢাকা প্রচারক নিবাসে কিছুকাল অবস্থান করেন তিনি।

কলিকাতায় বিজয়কৃষ্ণের নীতিবিরুদ্ধ কার্যে যে আন্দোলন দেখা দেয়, এখানেও চলে তাহার পুনরাবৃত্তি। কারণ তাঁহার আসনঘরে টাঙান দেবদেবীর ছবি ; বাউল বৈষ্ণবদেরও বিকৃত প্রেমসংগীতাদির প্রশ্রয় দিতেছেন তিনি। ফলে, গভীর শ্রদ্ধাভক্তি সত্বেও বিজয়কৃষ্ণের আদর্শ সম্পর্কে বিস্ময় ও সংশয় জাগে কুলদানন্দের মনে। অথচ ব্রাহ্মসমাজও নীরব! তাই বন্ধুদের লইয়া সমাজের কর্তৃপক্ষের নিকট একথা উত্থাপন করিলেন তিনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলিলেন, বেশী বাড়াবাড়ি দেখা গেলে প্রতিবাদ করা যাইবে। ইহাতে অনেকের প্রতি কটাক্ষ করিলেন কুলদানন্দ। তাঁহারাও উত্তেজিত হইলেন—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বলিলেন : জাতিভেদ তুমি অপরাধ মনে কর, অথচ তার চিহ্ন ঐ

উপবীত ধারণ ক'চ্ছ কেন? হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংস্রব রেখে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় তুমিও কি দিচ্ছনা?…

নিজের দুর্বলতায় ক্লেশভোগ করিতেছিলেন কুলদানন্দ। এবার দুঃখ ও লজ্জা বোধ করিলেন আরো বেশী। বন্ধুদের মধ্যে প্রচার করিলেন—অগ্রহায়ণ মাসে সাংবাৎসরিক উৎসবে উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন তিনি। …ব্রাহ্মবন্ধুরা খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন; কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দেখা দিল প্রবল আন্দোলন ও নানা ভীতিপ্রদর্শন। তবু সর্ব ভয় ও বাধা জয় করিয়া সত্যপথে তিনি ছিলেন অগ্রণী। অন্তরে জানাইতেন সকাতর প্রার্থনা: তোমাকে লাভ করবার যথার্থ পথ তুমিই আমাকে দেখিয়ে দাও। দয়া ক'রে আমাকে অকপটে সত্যপথে চলবার শক্তি দাও।…

এইরূপ প্রার্থনার পর একদিন শেষরাত্রে দেখিলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন: যেন তিনি ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত—সহসা বাগিচায় শিউলি গাছতলায় দাঁড়াইয়া বিজয়কৃষ্ণ সস্নেহে ডাকিলেন: 'ওহে, শিগ্‌গির এদিকে চ'লে এস—যেবস্তু তুমি চাও আমি তোমাকে তাই দেব'।…তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ও মমতাপূর্ণ আহ্বানে কুলদানন্দের অন্তরে জাগিল বিহ্বল আনন্দ—ভগবৎলাভের আশায় অগ্রসর হইয়া সাশ্রুনেত্রে যেন তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন তিনি। অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল।…চোখে ভাসিতে লাগিল তাঁহার সেই স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্তি,…কানে বাজিতে লাগিল পরম আশ্বাসবাণী।…নিরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে মনে হইতে লাগিল, বিজয়কৃষ্ণ সত্যই যেন বাগিচায় আছেন তাঁহারই প্রতীক্ষায়।… কিছুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া চোখের জলে প্রার্থনা করিলেন: প্রভু, আমি তোমার সম্বন্ধে অন্ধ। তোমাকে লাভ করবার যথার্থ পথে দয়া ক'রে তুমিই আমাকে নিয়ে যাও।..

মনের অস্থিরতায় একটু পরেই ছুটিয়া চলিলেন তিনি। ব্রাহ্মমন্দিরের দরজা বন্ধ থাকায় দেওয়াল টপকাইয়া বাগিচায় গিয়া পড়িলেন।…পূর্বাচলে ফুটিয়াছে উষার শুভ্র তিলক। সেই আবছা আলোকে চাহিতেই চমকিয়া উঠিলেন।… দেখিলেন—অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন সত্যই যেন দেবদূত,…অবিকল স্বপ্নদৃষ্ট অবস্থায়, ঠিক সেই স্থানে,—চাহিয়াও আছেন তাঁহারই দিকে!…মন্ত্রমুগ্ধের মত অগ্রসর হইলেন কুলদানন্দ।…

নিকটে গেলে মধুর কণ্ঠে বলিলেন বিজয়কৃষ্ণ: দেখ কী সুন্দর! দূর্বার উপরে যেন খই ফুটে রয়েছে।…

স্পন্দিত আবেগে কুলদানন্দের অন্তরে গুমরিয়া উঠিল অব্যক্ত ক্রন্দন।…

পায়ে প্রণাম করা এতদিন মনে হইত কুসংস্কার—কিন্তু আজ কম্পিত দেহে লুটাইয়া পড়িলেন বিজয়কৃষ্ণের চরণতলে।···অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন : আপনি আমাকে দয়া করুন।···

পরম স্নেহে ধরিয়া তুলিলেন বিজয়কৃষ্ণ। বলিলেন : পশ্চিম থেকে ঘুরে আসি। তুমিও পূজার ছুটিতে বাড়ী থেকে এস। পরে সাধন হবে।···

: বাড়ী গিয়ে কী নিয়মে চলব ?

: সর্বদা পবিত্র, প্রফুল্ল মনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করবে। মনদিয়ে পড়াশুনাও ক'রো।

উল্লিখিত স্বপ্নটী কুলদানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল। বিজয়কৃষ্ণের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও তাঁহার হিন্দুধর্মপ্রীতি কুলদানন্দের নিকট অবাঞ্ছিত। ফলে, জাগ্রত অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণের কথায় কতদূর আস্থাস্থাপন করিতে পারিতেন সন্দেহের বিষয়। তাই, তাঁহার অন্তরে গুরুবাদের প্রতি আস্থা ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই হয়ত ভগবানের এই স্বপ্নের অবতারণা।··· বিজয়কৃষ্ণের চরণে কুলদানন্দের আত্মসমর্পণও ভগবানের অভিপ্রেত। ব্রাহ্মপ্রণালী মতে বহুকাল সাধন-ভজন করিয়াও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পরে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন বিজয়কৃষ্ণ। তাই কুলদানন্দকে সনাতন আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্যই প্রয়োজন ছিল বিজয়কৃষ্ণের মত মহাশক্তিমান পথপ্রদর্শক।

আশ্বিন মাসে স্কুল বন্ধ হইলে অগ্রজদের সহিত বাড়ী গেলেন কুলদানন্দ। সকলে শুনিয়াছিলেন, ছুটির পর ঢাকায় গিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন। এজন্য নির্জনে তুলসীতলায় অশ্রু-নিবেদন করিতেন হরসুন্দরী। ছুটীর শেষে কুলদানন্দ ঢাকা রওনা হইলে তিনি বলিলেন : ধর্ম-ধর্ম করে পৈতাটা ফেলিস না। ঠাকুর তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। গলায় পৈতাটি রেখে তুই ধর্মকর্ম কর্।···

মাতৃআজ্ঞা কুলদানন্দের কাছে বেদবাক্য, মায়ের আশীর্বাদ তাঁহার অক্ষয় কবচ। মৌন সম্মতি জানাইয়া জননীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন তিনি। ফিরিয়া আসিলেন ঢাকায়। স্বপ্নদর্শন ও জননীর নির্দেশে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের আগ্রহ অনেক কমিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ কী সাধন দিবেন অহোরাত্র শুধু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন তিনি।

কাকিনাড়ার মহোৎসবের পর অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকায় ফিরিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

ব্রাহ্মসমাজে আবার দেখা দিল নিত্য উৎসব-প্রবাহ। সন্ধ্যাকীর্তনে বিজয়কৃষ্ণের বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাসে দলে দলে সকলে যোগদান করিতে লাগিল।

ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করিতে গেলেন কুলদানন্দ। সাধনপ্রাপ্তির কথা উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন: এই সাধন নিলে প্রত্যেককে নিজ অবস্থা অনুযায়ী সব কাজ করতে হয়।...ছাত্রদেরও মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা না করলে অনিষ্ট হয়। এটা গিয়ে বেশ ক'রে বোঝ—পরে কাল এসে আমাকে ব'লো।...

কুলদানন্দ ভাবিয়াছিলেন সাধন পাইলে পড়াশুনার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন, নির্জন পাহাড় পর্বতে মুনিঋষিদের মত দিবারাত্র উপাসনায় জীবন অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের কথায় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন তিনি। তবু উপায়ান্তর না দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের চরণোদ্দেশে মনে মনে জানাইলেন সকাতর প্রার্থনা: প্রতিজ্ঞা করা সম্ভব না হ'লেও পড়াশুনা ক'রব এইটুকু শুধু বলতে পারি। প্রাণের দুঃখ বুঝে আপনি আমাকে দয়া করুন।...

পরদিন বিজয়কৃষ্ণের কাছে গিয়াও প্রণামান্তে সেই কথা বলিলেন। একটু হাসিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন: এখন আমার আর কোন আপত্তি নেই। শুধু অভিভাবকের অনুমতি হ'লেই হ'লো।

অধিকতর দুশ্চিন্তায় পড়িলেন কুলদানন্দ। বলিলেন: তিন দাদাই আমার অভিভাবক।

: এখানে যে-দাদা আছেন তাঁর অনুমতি নিয়ে এসো।...অস্থির হ'য়োনা—সাধন তোমার হবেই।

অগ্রজদের অনুমতি পাইবেন না জানিলেও আশ্বস্ত হইলেন কুলদানন্দ। কিন্তু বাসায় ফিরিয়া সারদাকান্তকে মনের অভিপ্রায় জানাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন তিনি। কুলদানন্দের মনে দেখা দিল নিদারুণ যন্ত্রণা। রাত্রে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিলেন।

মমতা জাগিল সারদাকান্তের মনে। বলিলেন: আচ্ছা, মত দিতে পারি—খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করা চাই কিন্তু।

সায় দিলেন কুলদানন্দ। দারুণ নৈরাশ্যের মাঝেও চিত্তে জাগিল ক্ষীণ আশা। কিন্তু পরদিন সকালে আবার ধমক দিয়া উঠিলেন সারদাকান্ত: না, না—যোগ করলে ভয়ানক রোগ হয়, মাথা একবারে নষ্ট হয়ে যায়। আমি তো মত দেবই না—দাদারাও যাতে অনুমতি না দেন সেজন্যে তাঁদের চিঠি লিখব।...

আশা-নিরাশার এ কী মর্মান্তিক খেলা! ক্রোধে, দুঃসহ যন্ত্রণায় কুলদানন্দের বুক জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। পরদিন বিজয়কৃষ্ণকে সব জানাইলেন। সারদাকান্ত অনুমতি দেন নাই শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ সস্নেহে বলিলেন: তিনি অনুমতি নাই বা দিলেন—দাদাদের একটু লিখতে আর আপত্তি কী?

বাউল, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান—সর্বজাতির সমাগমে পূর্ণ হইল মন্দিরপ্রাঙ্গন। বেদীর কার্যকালে বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন: সরল বিশ্বাসে যথার্থ কাতর হ'য়ে প্রার্থনা ক'রলে ভগবান নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করেন।···শিশু যেমন মাকে ডাকে, একবার তেমনভাবে কাতর হ'য়ে মাকে ডাক। বিশ্বাস ক'রে ডাকলে নিশ্চয়ই মাকে পাবে।···

কুলদানন্দের মনে হইল সব যেন তাঁহাকেই বলিলেন বিজয়কৃষ্ণ।···

দুইদিন পরে বরদাকান্ত একরামপুরে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া কুলদানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হৃৎকম্প উপস্থিত হইল কুলদানন্দের—সারা রাত কাটিল দারুণ উদ্বেগে। পরদিন মেজদাদার নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন তিনি; তীব্র ভাষায় গালি দিতে দিতে ক্ষিপ্ত হইয়া চটিজুতা হাতে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন—স্ত্রীর নিকট বাধা পাইয়া তবে নিরস্ত হইলেন, কিন্তু রূঢ় তিরস্কার চলিল সমানভাবে।

ক্ষোভে ও অপমানে চোখের জলে ফিরিয়া আসিলেন কুলদানন্দ। স্থির করিলেন আরও একবার সাধনলাভের চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করিলেন—তাঁহার কৃপায় সাধনলাভ হইলে, সর্বপ্রথমে অগ্রজদের বিজয়কৃষ্ণের চরণে আনিয়া বলি দিবেন।···

সর্বত্যাগী বিজয়কৃষ্ণের আশ্রয়ে কুলদানন্দ সংসারত্যাগী হইবেন ইহাই ছিল অগ্রজদের প্রধান আশঙ্কা। কিন্তু কুলদানন্দের সংকল্পের দৃঢ়তা বাড়িয়া চলিল। অভিভাবকদের অনুমতি পাওয়া অসম্ভব বুঝিয়া বিজয়কৃষ্ণের উপর তাঁহার মনে জাগিল অভিমান। অভিভাবকেরা নাস্তিক হইলে তাঁহার কি ভগবানের নাম লইবার অধিকার থাকিবে না?···এই ব্যবস্থা কি শুধু তাঁহারই জন্য?···

তিনি স্থির করিলেন—দীক্ষার জন্য আর একবার বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়া দেখিবেন এবং কোন ওজর আপত্তি তুলিলে দশ কথা শুনাইয়া দিবেন।···বস্তুতঃ, এই অভিমানের অন্তরালে তাঁহার অন্তরে জাগে দাবী ও গভীর শ্রদ্ধা।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর সোজা বিজয়কৃষ্ণের নিকট গিয়া জানাইলেন, অনুমতি পাওয়া গেল না। তাঁহার বড়দাদার অনুমতির জন্য চিঠি দিবার নির্দেশ

দিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন : তিনি তোমায় অনুমতি দেবেন। ব্যস্ত হয়োনা, সব ঠিক হয়ে আসবে।...

প্রথম হইতেই দুঃখ, আঘাত ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া এইভাবে তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।...বড়দাদা হরকান্তকে চিঠি দিতেই খুশী হইয়া অনুমতি দিলেন তিনি, তবে মায়েরও অনুমতি লইতে বলিলেন। এতদিনে ভগ্ন প্রাণে নব আশার সঞ্চার হইল—পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ বিজয়কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন : বেশ তো—বাড়ী গিয়ে এবার মায়ের অনুমতি নেও।

: কিন্তু 'যোগ'এর কথা শুনলে মা আবার যদি......

: সাধন নেব—এই শুধু ব'লো ; তাহলেই তিনি অনুমতি দেবেন।

অগ্রজদের অমতে এখন বাড়ী যাওয়া যে কত দুষ্কর সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন কুলদানন্দ।

ব্রাহ্মসমাজে সাংবাৎসরিক উৎসব। মন্দিরে ও প্রাঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। বেদীতে উপাসনা কালে বিজয়কৃষ্ণ ঢলিয়া পড়িয়া ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। সংকীর্তন কালে তাঁহার নৃত্যে ও ভাবোচ্ছ্বাসে সকলে মত্ত হইয়া উঠিলেন—কেহ কেহ বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বিজয়কৃষ্ণ 'হরিবোল' বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিলে সকলে শান্তভাব ধারণ করিলেন। এই অপূর্ব দৃশ্য ও বিজয়কৃষ্ণের এমনি ভাবাপ্লুত রূপ দেখিয়া অভিভূত হইলেন কুলদানন্দ।

কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লইয়া বাড়ী যাইতে বলিলেন সারদাকান্ত। ভগবৎকৃপায় চমৎকৃত হইয়া কুলদানন্দ পরদিনই বাড়ী গেলেন। তাঁহার গলায় পৈতা দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন হরসুন্দরী। পরদিন কুলদানন্দ প্রণামান্তে দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি চাহিলে তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। বলিলেন : তুই কি পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হবি ?

: না মা—আমি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নেব। তুমি আশীর্বাদ ক'রে অনুমতি না দিলে তিনি যে আমাকে সাধন দেবেন না।...বলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে মায়ের পা-দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন কুলদানন্দ।

মাথায় হাত বুলাইয়া সানন্দে অনুমতি দিলেন হরসুন্দরী। বলিলেন : সংসারে থেকেই ধর্মকর্ম কর্। ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবেন—আমিও

তোকে এই আশীর্বাদ করি।...

বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনার পর এতদিনে কুলদানন্দের চোখেমুখে দেখা দিল আনন্দের আবেশ। মনে পড়িল বিজয়কৃষ্ণের কথা : ব্যস্ত হয়ো না—সব ঠিক হ'য়ে আসবে।...মায়ের পদধূলি লইয়া ঢাকা ফিরিলেন তিনি। বিজয়কৃষ্ণের নিকট গিয়া সব জানাইলেন। সানন্দে দিনস্থির করিয়া দিয়া প্রত্যুষে স্নানান্তে প্রচারক নিবাসে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে কোন বাধাই চিত্তের গতিরোধ করিতে পারেনা। ব্যাকুলতা বৃদ্ধির জন্য এ বাধাবিঘ্ন তাঁহারই সৃষ্টি—নিষ্ঠা ও একাগ্রতা পরীক্ষার পর সব অন্তরায় তিনিই আবার অপসারিত করিয়া দেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন : মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।...

২রা পৌষ, ১২৯৩ সাল। বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। কুলদানন্দের আজ দীক্ষা—তাঁহার জীবনের একটী পরম স্মরণীয় দিন।...

মনের উদ্বেগে সারা রাত্রি ভাল ঘুম হইল না। সাড়ে তিনটায় উঠিয়া বিজয়কৃষ্ণের নির্দেশমত বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিলেন তিনি। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উপস্থিত হইলেন প্রচারক নিবাসে। বিজয়কৃষ্ণ তখন উষাকীর্তনে বিভোর। কীর্তনান্তে এত ভোরে কুলদানন্দকে দেখিয়া খুশী মনে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে লইয়া দোতলায় পূর্বদিকের ঘরে প্রবেশ করিলেন তিনি।

ঘরে দুইখানি আসন পাতা। একখানিতে বিজয়কৃষ্ণ পশ্চিমমুখো হইয়া বসিয়া সম্মুখস্থ আসনে কুলদানন্দকে বসিতে বলিলেন। পাশে রহিলেন অনাথবন্ধু মৌলিক, শ্রীধর ঘোষ, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ধূপধূণা চন্দনাদি ধুনুচিতে কয়েকবার নিক্ষেপ করিলেন বিজয়কৃষ্ণ। করজোড়ে বার বার নমস্কার জানাইয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। বিগলিত অশ্রুধারায় সমাধিস্থ হইলেন তিনি।

মনে মনে কুলদানন্দ জানাইলেন সকাতর প্রার্থনা : হে দয়াময় প্রভু! তোমার চরণলাভ করবার আকাঙ্খা বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার বিঘ্ন ও বিপদ সৃষ্টি করেছ; আবার তুমিই দয়া ক'রে আমাকে উদ্ধার করেছ। আজ গোসাঁইয়ের ভিতরে থেকে তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। তোমার শ্রীচরণলাভ করবার পথ তুমিই আমাকে ব'লে দাও। এখন আমি আমাকে তোমার শান্তিপ্রদ অভয় চরণে সমর্পণ ক'রলাম।...স্বয়ং তুমিই আমাকে আজ দীক্ষা না দিলে গোসাঁইয়ের মুখ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে পড়ুক।...

এই প্রার্থনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত তাঁহার প্রবর্তক জীবনের প্রধান রহস্য। ভগবৎলাভের আবাল্য আকাঙ্খা পূর্ণ করিতেই অমৃতকুম্ভ হস্তে সম্মুখে আজ সমুদ্যত গোস্বামী প্রভু। তবু তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারিলেন না—প্রত্যক্ষভাবে ভগবানেরই কৃপা প্রার্থনা করিলেন তিনি। সদগুরুকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান যে কৃপাবর্ষণ করেন, এই তত্ত্ব তখনও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত। এছাড়া, মনুষ্যবুদ্ধিতে গুরুদর্শন কর্তব্য নয়, আবার ভগবান ভিন্ন আর কেহ গুরুপদবাচ্য নন—তাঁহার মনে ছিল এই সংশয়। কিন্তু গোসাঁইজীর মধ্য দিয়া ভগবান তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন এই স্বপ্নদর্শনের পর গোসাঁইজীর মুখেও শুনিয়াছিলেন : যে বস্তু তুমি চাও, আমি তোমাকে তাই দেব।...তাই পথপ্রদর্শক রূপে যে সচ্চিদানন্দকে তিনি চাহিয়াছিলেন, আজ সদগুরুর মাধ্যমে সেই পরমপুরুষের উদ্দেশেই উৎসারিত হইল অন্তরের প্রার্থনা। 'ভগবান সর্বেষামপি গুরু' —এই সত্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইতে চলিল। নীরব প্রার্থনার মধ্য দিয়া দেখা দিল প্রাণের দেবতার বোধন ও আবাহন।

প্রার্থনার পর চক্ষু মেলিতেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন তিনি। দেখিলেন রোমাঞ্চিত কলেবর গোসাঁইজী পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন। করজোড়ে গদ-গদ কণ্ঠে তিনি পাঠ করিলেন : নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ। যো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতঃ॥...গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের পর তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ব্রহ্মস্তোত্র : ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়, নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।

চারিদিকে প্রভাতের সমুজ্জল প্রসন্নতা। সম্মুখে ধ্যানরত সদগুরুর কণ্ঠে বিশ্বদেবতার বন্দনা। স্বঃতই এক দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল কুলদানন্দের শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তর। মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—গুরুরূপে যাঁহাকে বরণ করিতেছেন, তিনি বহু আকাঙ্খিত জন্মজন্মান্তরের ইষ্টদেবতা।...

'জয়গুরু জয়গুরু' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন গোসাঁইজী। কিছুক্ষণ পরে সচেতন হইয়া সংযতভাবে বলিলেন : পরমহংসজী দয়া ক'রে তোমাকে এই মন্ত্র দিচ্ছেন—তুমি গ্রহণ কর।...দুর্লভ মহামন্ত্র প্রদান করিয়া তিনি নামের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন এবং প্রাণায়াম দেখাইয়া দিয়া সেইরূপ করিতে বলিলেন। কুলদানন্দ প্রাণায়াম সুরু করিলে 'জয়গুরু জয়গুরু' বলিয়া পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন গোসাঁইজী। ক্ষণকাল পরে বলিলেন : প্রতিদিন দুবেলা এইরূপ করতে চেষ্টা করো।

নাম জপ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন কুলদানন্দ। স্বীয় মত, ভাব ও সংস্কার অনুযায়ী মন্ত্রলাভ করিয়া যথার্থ আনন্দ ও কৃতার্থ বোধ করিলেন তিনি। এক বিচিত্র অনুভূতির গভীরতায় তাঁহার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইল। ঋষিপ্রদর্শিত সাধনপথে আজ সুরু তাঁহার সার্থক পদক্ষেপ।...

নাম ও প্রাণায়াম এই বৈদিক সাধনের প্রধান অঙ্গ। প্রাণায়াম সাধনে দৈহিক সুস্থতা, মানসিক সংযম ও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, অন্তরীক্ষে বিচরণের ক্ষমতা জন্মে, পরমার্থ শক্তি প্রবুদ্ধ হয়। তবু নাম-সাধনই প্রকৃত সাধন। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা সর্বপ্রথম এই সাধন করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব, নারদ, বশিষ্ঠ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি এই নাম ও সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

সর্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। চিত্তস্থৈর্য-লাভের জন্য উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ এবং নামকীর্তন করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। শাস্ত্রে আরও দুই প্রকার জপ-এর উল্লেখ আছে—উপাংশু অর্থাৎ নিম্নস্বরে জপ এবং মানস অর্থাৎ মনে মনে জপ। বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপ দশগুণ, উপাংশু জপ শতগুণ এবং মানস জপ সহস্র গুণ শ্রেয়ঃ। গোস্বামী প্রভু নাম জপের যে বিধান দিতেন, তাহা এই মানস জপ। বিনা উচ্চারণে শ্বাস-প্রশ্বাসে মনে মনে এই জপ করিতে হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম 'অজপা সাধন'। নানক, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সাধনবলেই সিদ্ধিলাভ করেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে মানস জপ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত। এই সাধনে কোনপ্রকার মূর্তিকল্পনা কিংবা রূপের ধ্যান করিবার প্রয়োজন হয় না।

এই দীক্ষাকে 'সাধন' এবং মন্ত্রকে 'নাম' বলিতেন গোসাঁইজী। কোন উপচার বা অনুষ্ঠান এই সাধনগ্রহণে অনাবশ্যক। সাধন দিবার সময় তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখা হইত তুলসীরূপী নারায়ণ—টবে রোপিত এই তুলসী বৃক্ষমূলে ধূপ-ধূণা দেওয়া হইত। দীক্ষার পূর্বে কিছুক্ষণ মগ্নাবস্থায় থাকিতেন গোসাঁইজী। দীক্ষার্থীর অন্তরেও শান্তগম্ভীর ভাবের উদয় হইত, উভয়ের মধ্যে দেখা দিত নিবিড় সান্নিধ্য। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে প্রণাম মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করিয়া 'জয়গুরু, জয় শচীনন্দন' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতেন ; এবং গুরুদেব পরমহংসজী সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হইলে দীক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রথমে বিধিনিষেধ সম্পর্কিত উপদেশ প্রদানের পর কিছুক্ষণ এক আত্মিক গভীরতায় নিমগ্ন হইতেন। তখন দীক্ষার্থীর প্রাণে দেখা দিত এক শান্ত-সমাহিত স্নিগ্ধতা ও একাগ্রতা, ...নব আশা ও আনন্দের স্পন্দন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে শক্তিযুত নামামৃত প্রদান

করিয়া গোসাঁইজী বলিতেন ঃ গুরুদেব দয়া ক'রে এই নাম প্রদান করলেন।... অতঃপর ইষ্টমন্ত্রের অর্থ ও প্রণাম-মন্ত্র বলিয়া দিয়া প্রাণায়াম শিক্ষা দিতেন তিনি।

সাধকের সমগ্র সত্তা অধিকার করে গুরুদত্ত চৈতন্যময় এই ইষ্টমন্ত্র। শাস্ত্রে ইহাকে 'বেধ দীক্ষা' বলা হইয়াছে। কলার্ণবতন্ত্রে আছে ঃ

"যথা কূর্ম্ম স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেন পোষয়েৎ।
বেধদীক্ষোপদেশ চ মানসঃ সাৎ তথাবিধ॥"

কূর্ম যেমন নদী বা সাগরে থাকিয়া তটদেশে মৃত্তিকামধ্যে রক্ষিত অণ্ডগুলিকে মননশক্তি দ্বারাই প্রস্ফুটন ও প্রতিপালন করে, সদ্‌গুরুও তেমনই স্বীয় মননশক্তি প্রভাবে শিষ্যদের আত্মিক বৃত্তি জাগরিত করিয়া পরানন্দ দানে পরিপোষণ করেন।..

সদ্‌গুরু প্রদত্ত নাম একটী অক্ষর বা শব্দ মাত্র নয়, এই নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতর এই শক্তিসঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। সদ্‌গুরুর কৃপায় একবার সেই দীক্ষালাভ হইলে তাহার জীবনের সমস্ত কার্য, এমনকি প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত তখন সদ্‌গুরু তথা ভগবানের ইচ্ছাধীন। এই সাধন সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত—সকল সম্প্রদায়ের মুমুক্ষু নরনারী নাম সাধনের আশ্রয়গ্রহণ করিবার অধিকারী। এই সাধনের অন্তর্ভুক্ত নরনারীর অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে কোন বাধা নাই। সংক্ষেপে ইহাই শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু প্রবর্তিত সাধন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য।

* * * *

বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত কুলদানন্দের 'প্রবর্তক জীবনের' মোটামুটি বিবরণ প্রদত্ত হইল। আশৈশব ভগবৎপ্রেমে তিনি ছিলেন ব্যাকুল, প্রতি জীবে অনুভব করিতেন ভগবানের অধিষ্ঠান। আত্মপরীক্ষার ফলে বুঝিতেন আপন হৃদয়ের ভাবধারা সাধারণের বোধগম্য নয়; তাই আত্মগোপন প্রবৃত্তি ছিল তাঁহার স্বভাবধর্ম। নৈতিক উন্নতি বিধানে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত, সত্য ও সুন্দরের পূজায় কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান সমস্যা। এমন সময় আবির্ভূত হইলেন বিজয়কৃষ্ণ—সত্যধর্মে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রদূত, আবার প্রেমধর্মে মহাপ্রভুর ভাবোন্মত্ত প্রতিভূ। তাই সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণের মধ্য দিয়া তিনি আত্মনিবেদন করিলেন হৃদয়-দেবতার চরণতলে। এই ভাবে যে মহাশক্তির বীজ রোপিত হইল তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, 'সাধক জীবনে' আমরা দেখিতে পাইব তাহার দিব্য প্রকাশ।...

সাধক জীবন

॥ এক ॥

বালক ধ্রুবকে দীক্ষামন্ত্র প্রদানের জন্য ভগবান প্রেরণ করেন দেবর্ষি নারদকে। তেমনি কুলদানন্দের ব্যাকুলতায় হৃদয়-দেবতা তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন সদ্‌গুরু গোস্বামী প্রভুর চরণতলে।

অনেকের ধারণা, ভগবানের কৃপা হইলেই তাঁহার দর্শনলাভ করা যায়—সেজন্য অপরের সাহায্যলাভের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু স্বয়ং ভগবানই ভক্তকে কৃপা করেন সদ্‌গুরুরূপে। এছাড়া, বিদ্যা, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি শিক্ষার ন্যায় মহত্তম ধর্মপথেও গুরুর সাহায্য অপরিহার্য। বস্তুতঃ এই বিশ্বের সবকিছু নিয়মের অধীন, তেমনি ভগবৎদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ এক অব্যর্থ নিয়ম। শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়াও বিজয়কৃষ্ণের জীবনই ইহার প্রমাণ। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা যে ভগবৎলাভ হয়, নিজের দিব্য জীবনে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ তাহার পরিচয় দিয়াছেন লোকশিক্ষার জন্যই। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন ব্রহ্মপদলাভ যে অসম্ভব, ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

> "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
> গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভগবৎপ্রসাদেই বিজয়কৃষ্ণের নিকট যোগসাধন গ্রহণ করিয়া কুলদানন্দ লাভ করিলেন সেই 'ভক্তিলতা বীজ'।

> "মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
> শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
> উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
> বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
> তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
> কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অর্থাৎ, মালী যেমন বীজ রোপণ করিয়া জলসেচন করে, সেইরূপ ভাগ্যবান জীব গুরুদত্ত বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া তাহাতে লীলা-শ্রবণ ও নামকীর্তন রূপ জলসেচন করে; ফলে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইলে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়; পরে বিরজা ভেদ করিয়া পরব্যোমে তথা ভক্তিরাজ্যে উপনীত হয় এবং পরিশেষে গোলকধামে বাসুদেবের পদকল্পতরু প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হয়।

সেই পরমার্থলাভের পথে তরুণ কুলদানন্দ কর্তৃক প্রাপ্ত ভক্তিলতা বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইল, তাঁহার সাধক জীবনে ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া আমরা লাভ করিব তাহার সার্থক পরিচয়।

* * * *

হিন্দুধর্মের প্রশ্রয় দেওয়ায় বিজয়কৃষ্ণ যে ভ্রান্তপথগামী, এই সংশয় দীক্ষাগ্রহণের পরেও দোলা দেয় কুলদানন্দের মনে। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতে দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে থাকেন বিজয়কৃষ্ণ। কুলদানন্দও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে অপূর্ব মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও ভগবৎভক্তির সন্ধানলাভ করিয়া পরিশেষে নিঃসংশয়ে তাঁহার অনুসৃত পথ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর প্রবলতর আকর্ষণে প্রায়ই বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন কুলদানন্দ। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে গেলেই দেখিতে পান, প্রচারক নিবাসে নিজ আসনে গোসাঁইজী ধ্যানস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট। বাউল বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ-কথা অথবা গৌরকীর্তনে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। এইসব গানে তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস ভাল লাগেনা কুলদানন্দের। সঙ্গীদের লইয়া ব্রাহ্মকীর্তন আরম্ভ করেন তিনি; অমনি বাউল বৈষ্ণবেরা সরিয়া পড়েন।

গোসাঁইজীর সন্ধ্যাকীর্তনের পর দরজা বন্ধ হইলে অনুগত শিষ্যেরাই শুধু সাধন-বৈঠকে মিলিত হন। গোসাঁইজীর নির্দেশে মাঝে মাঝে এই বৈঠকে যোগদান করিয়া তাঁহার সম্মুখেই বসেন কুলদানন্দ। একঘণ্টা প্রাণায়ামের পর ভজন হয়, আবার আরম্ভ হয় প্রাণায়াম। এইভাবে তিনবার প্রাণায়ামে কাটে প্রায় তিনঘণ্টা। শুধু প্রাণায়ামে মন বসিলে তাঁহাকে নামে চিত্ত স্থির রাখিতে বলেন গোসাঁইজী। কিন্তু বাহিরে প্রাণায়াম আর অন্তরে নাম—একসঙ্গে দুইদিক সামলাইতে পারেন না তিনি। গোসাঁইজীর ভাবসমাধি ও সতীর্থদের ভাবোচ্ছ্বাস তাঁহার খুবই ভাল লাগে। বৈঠকে মহাত্মাদের আবির্ভাব দর্শনে কেউ কেউ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। তিনি কিছু দেখিতে পান না; তবু

গোসাঁইজী সাশ্রুনেত্রে গদ-গদ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিলে রোমাঞ্চিত হয় তাঁহার সর্বশরীর, অন্তরে নাচে এক অব্যক্ত ভাবতরঙ্গ।...

মহাত্মাদের সত্যই আবির্ভাব হয় কিনা জানিতে তাঁহার প্রবল কৌতূহল জাগে। কিন্তু পর পর কয়েক দিন বৈঠকে যোগদান করায় গোসাঁইজী বলেন : ছাত্রজীবনে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করাই প্রধান কর্তব্য। সপ্তাহে একদিন তুমি বৈঠকে এলেই হবে।

সেই ভাবেই বৈঠকে যোগদান করিতে লাগিলেন তিনি।

সারদাকান্তের এক বন্ধুর মাতৃবিয়োগে অগ্রজদের সহিত তাঁহাদের বাড়ী গেলেন কুলদানন্দ। ক্রন্দনের রোলে সহসা মনে হইল, তাঁহার জননীও বুঝিবা মৃত্যুশয্যায়। তৎক্ষণাৎ বাড়ী রওনা হইলেন তিনি।

দশ মাইল হাঁটিয়া বাড়ী পৌছিতেই দেখিলেন, জননী সত্যই কলেরায় আক্রান্ত হওয়ায় সকলেই শোকাচ্ছন্ন। মনে হইল গোসাঁই রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। চোখের জলে গোসাঁইজীকে স্মরণ করিয়া আকুল প্রার্থনা জানাইলেন তিনি। ভাইঝিরও ভেদবমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার বলিলেন মায়ের শেষ অবস্থা, তবে মেয়েটীর তখনও জীবনের আশা আছে।...

ঔষধের ফর্দ লইয়া সহরে ছুটিলেন কুলদানন্দ। ঢাকা পৌছিয়া সোজা গেলেন গোসাঁইজীর কাছে। গোসাঁইজী বলিলেন : তুমি এখানে! বাড়ী যাওনি ?...ও, বাড়ী থেকে এলে বুঝি ?...অবস্থা কেমন ?...

সব শুনিতেই মেয়েটীর জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া চক্ষু মুদিলেন গোসাঁইজী। যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন তিনি। সেই অবসরে তাঁহার নিকট জননীর আরোগ্যলাভের প্রার্থনা জানাইলেন কুলদানন্দ। সস্নেহে বলিলেন গোসাঁইজী : মা'র জন্যে ব্যস্ত হয়োনা।...ওষুধ নিয়ে যাও—গ্রামবাসীদেরও উপকার হবে।...

ঔষধ লইয়া বাড়ী ছুটিলেন কুলদানন্দ। সারা পথ কেবলই মনে হইতে লাগিল গোসাঁইজীর কথা। তিনি কি সবই জানিতে পারেন ? না পারিলে 'অবস্থা কী রকম' এ কথাই বা শুধাইবেন কেন ?.. মেয়েটীর যে আর ঔষধ লাগিবেনা প্রকারান্তরে তাহা জানাইয়া মায়ের জন্য ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিলেন। তবে কি মা ভাল হইবেন ?...আশায় বুক বাঁধিয়া বাড়ী পৌছিতেই শুনিলেন—সত্যই মেয়েটী মারা গিয়াছে, আর মায়ের অবস্থা ভাল।...

কুলদানন্দের সারা অন্তর আন্দোলিত হইল। গোসাঁই কি জ্যোতিষ

জানেন ? না, যোগশক্তি বলে সবই জানিতে পারেন ?…হয়ত সহানুভূতি বশে ঐরূপ বলিয়াছেন, আর তাহা সত্য হওয়ার অন্ধ বিশ্বাস জন্মিতেছে। এইভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা অন্তরের বিশ্বাস খণ্ডন করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। মনে জাগিল চমক, বিস্ময়-জড়িত শ্রদ্ধার দোলা।…

জননী সুস্থ হইলে গোসাঁইজীকে দেখিতে রওনা হইলেন তিনি।

মাঘোৎসব। ব্রাহ্মসমাজে মহা ধুমধাম। সারা বাঙলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যেন। সকালে প্রচারক নিবাসে গেলেন কুলদানন্দ।

কাঙাল ফিকির চাঁদ সঙ্গীতে মত্ত। নিস্তব্ধ জনতার মাঝে গোসাঁইজী দণ্ডায়মান। সম্মুখে স্থির দৃষ্টি, গণ্ড অশ্রুসিক্ত। বক্ষস্থলে বামহস্ত, দক্ষিণ হস্ত ব্রহ্মতানুতে কর-মুদ্রাবদ্ধ। থরথর কম্পিত হইল তাঁহার নৃত্যরত দেহ ; হাসিতে লাগিলেন একটানা অট্টহাসি। পরে তর্জনী সংকেতে প্রচার করিলেন মহাদেবের আবির্ভাব, আবাহন জানাইলেন জগদ্ধাত্রীকে, এবং নৃত্যরত শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্টাদি মহাপুরুষকে। নৃত্য, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও কান্নাহাসির মধ্য দিয়া সমাধিস্থ হইলেন তিনি।…

কুলদানন্দ চমকিত, অভিভূত হইলেন। স্তম্ভিত জনতার সহিত ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তিনি। কয়েক ঘণ্টা বেশ সরস ও প্রফুল্ল রহিলেন, কিন্তু আবার মনে জাগিল আন্দোলন। ব্রাহ্মমন্দিরে এ কী পৌত্তলিকতা !…কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি তুলিলেন তিনি ; তাঁহারা বলিলেন উৎসবের পর এসব লইয়া আন্দোলন হইবে।

পরদিন প্রচারক নিবাসে গিয়া হতবাক হইলেন কুলদানন্দ। আহারে বসিয়া সকলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কেবল কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় নৃত্যগীতে মত্ত। শুধু তিনি খোল বাজাইতেছেন—অথচ কুলদানন্দের মনে হইল যেন বহু খোল বাজিতেছে, …বহু লোক গাহিতেছে।…ওদিকে কাহারও হাতের ভাত হাতে, কেহ পাতার উপর সজ্ঞাশূন্য ; কেহ সর্বাঙ্গে ডালভাত মাখিতেছে, চিৎকার করিতেছে। সেই মুহুর্মুহুঃ প্রাণায়ামের শব্দে চারিদিক যেন একাকার।…শুধু গোসাঁইজী সমাধিস্থ, আর মহাভাবের তরঙ্গে কুলদানন্দ উদ্বেলিত।

অপরাহ্নে সকলে নিস্তব্ধ হইল। সন্ধ্যা না হইতেই ব্রাহ্মমন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। ভাববিহ্বল গোসাঁইজী সকাতরে ভগবানকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলে জনতা নিস্পন্দ হইয়া রহিল। গোসাঁইজী সমাধিস্থ হইলে সকলে চলিয়া গেল।

গোসাঁইয়ের জন্য ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ভাবিয়া গর্বানুভব করেন কুলদানন্দ। কিন্তু সাকার বা নিরাকার কোন্ মতের পক্ষপাতী গোসাঁইজী ?··· তাঁহার ধর্মমত সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে সম্মত হইলেন না তিনি। অবশেষে 'ব্রাহ্মোপাসনা' সম্পর্কে মত জানাইতে রাজী হইলেন। ব্রাহ্মমন্দির জনাকীর্ণ হইল; কিন্তু বক্তৃতা দিতে উঠিয়া অদম্য ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হইল, পুনঃপুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও স্তবপাঠ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন গোসাঁইজী।

এই সম্পর্কে কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: বক্তৃতা শুনিয়া যে উপকার হইত, আজ গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আমরা অধিক উপকার লাভ করিলাম। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ!···

কয়েকদিন পরে গোসাঁইজীর শূন্য আসনের সম্মুখে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া প্রতিবাদ জানান কুলদানন্দ। ইহা ঘোর কুসংস্কার মনে করিয়া তর্ক করিতে থাকেন তিনি। পাশের ঘর হইতে গোসাঁইজী বলিয়া পাঠাইলেন, শূন্য আসনের সম্মুখে আর কেহ যেন প্রণাম না করে।

নবকান্তবাবুর বাসায় ফিরিয়া গোসাঁইজীর পৌত্তলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন কুলদানন্দ। ক্রমে গোসাঁইজীর অসাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচার ও হিন্দুদের প্রশ্রয়দান লইয়া ব্রাহ্মসমাজে দেখা দিল আন্দোলন। কুলদানন্দ শুনিলেন প্রচারক পদ ত্যাগ করিবেন গোসাঁইজী। একদিকে শ্রদ্ধাভক্তি, অন্যদিকে বিরুদ্ধ মতবাদ—এই দোটানায় সংশয়াচ্ছন্ন হইলেন কুলদানন্দ।

একদিন গোসাঁইজীর আসনের নিকটে খুব বড় পুরাতন একজোড়া খড়ম দেখিলেন তিনি। শুনিলেন: সমাধি অবস্থায় বারদীর ব্রহ্মচারীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যান গোসাঁইজী। দেড়শত বৎসর বয়সের এই মহাপুরুষ গোসাঁইয়ের পিতামহের খুল্লতাত। এই পাদুকা ও একখানা কম্বল পূর্বপুরুষের চিহ্নস্বরূপ গোসাঁইকে দিয়াছেন তিনি।···নানা অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া ব্রহ্মচারীর দর্শনলাভ করিবার ইচ্ছা রহিল কুলদানন্দের। ফাল্গুন মাসে পশ্চিমে রওনা হইলেন গোসাঁইজী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১২৯৪। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আছেন কুলদানন্দ। অনেকদিন গোসাঁইজীর কোন খবর পান নাই তিনি।

সহসা প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। ঢাকায় আসিয়া শুনিলেন, দ্বারভাঙ্গায় গোসাঁইজী ভীষণ অসুস্থ—ডবল নিউমোনিয়ায় দুইটী ফুসফুসই পচিতে আরম্ভ

করিয়াছে। বুক কাঁপিয়া উঠিল কুলদানন্দের—পরক্ষণেই কান্না আসিয়া পড়িল। ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া সকাল হইতে বেলা একটা অবধি পড়িয়া রহিলেন তিনি—গোসাঁইয়ের আরোগ্যের জন্য ভগবান ও পরমহংসজীর চরণে অবিরাম চোখের জলে জানাইলেন আকুল প্রার্থনা।…

তিনি লিখিয়াছেন ঃ প্রাণটা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সংসার অন্ধকার মনে হইল। গোসাঁইয়ের আরোগ্য সংবাদের জন্য দিনরাত ছটফট করিয়া কাটাইতে লাগিলাম।…ব্রাহ্মসমাজে গোসাঁইজীর অসাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ সমর্থন করিতে পারেন নাই তিনি; কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে গোসাঁইজীর প্রতি তাঁহার অন্তরে জাগে এমনই গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।

তিন চারি দিন টেলিগ্রাফ আফিসে ছুটাছুটির পর গোসাঁইজীর আরোগ্য সংবাদে কুলদানন্দ এবং অন্য সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। শুনিলেন ডাক্তারেরা জবাব দিলে অন্তিম সময়ে পরমহংসজী ও বারদীর ব্রহ্মচারী সূক্ষ্মদেহে অবতীর্ণ হইয়া অলৌকিক শক্তিবলে প্রাণরক্ষা করেন।…অমনি 'হরিবোল' বলিয়া গোসাঁই নৃত্য সুরু করিলে হতবাক হইয়া যান ডাক্তারেরা।…শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন কুলদানন্দ।

আষাঢ় মাসে গোসাঁইজী ঢাকায় ফিরিলে ব্যস্তভাবে দর্শন করিতে গেলেন তিনি। জননী যোগমায়া দেবীর চরণে এবার প্রথম প্রণাম করিলেন এবং গোসাঁইজীকেও প্রণাম করিয়া বসিলেন। প্রচারক নিবাসে বহু লোকের ভীড়ে একটী কথাও বলিতে পারিলেন না; কিন্তু গোসাঁইজীর শীর্ণ, মলিন চেহারা দেখিয়া বড়ই ক্লেশ অনুভব করিলেন।

কিছুদিন পরেই গোসাঁইজীর ধর্মমত লইয়া আবার সুরু হইল বিরূপ সমালোচনা। এবার কেমন যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল কুলদানন্দের। হিন্দুসমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গোসাঁইজী দুই চারিটি কথা বলিলেই যেন বাঁচেন তিনি; কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছুই যে বলিতে চাহেন না গোসাঁইজী।…বহু অনুরোধের ফলে 'ধর্ম ও নীতি' বিষয়ে অপূর্ব বক্তৃতা দিলেন। তাহার কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত হইল ঃ যেমন আগুনের ধর্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম শীতলতা, ধর্মও সেইরূপ মানবের স্বভাব।…গুণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম। এই তিন গুণের উৎকর্ষ সাধনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, ইহাই মানবের ধর্ম।…অবস্থা ভেদে মানুষের সাধারণ নীতি ও কর্তব্যের

পার্থক্য থাকবেই।...যে যাহা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে, সরল প্রাণে সত্য বলে স্বীকার করে, তাহাই অবশ্য পালনীয়।

বক্তৃতাটী খুবই ভাল লাগিল কুলদানন্দের ; কিন্তু তাঁহাদের মনোমত কিছুই শুনিতে না পাইয়া ক্ষুন্ন হইলেন তিনি।

শ্রাবণের প্রথম দিন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও অপরাহ্নে ব্রাহ্মসমাজে গেলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজীকে প্রণাম করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি : সাধন কেমন চলছে ?

প্রাণায়ামকে প্রধান সাধন মনে করিয়া কুলদানন্দ বলিলেন : বাড়ীতে ভাল হয়নি। এখন একরকম চলছে।

: নাম কর তো ? নাম করে কেমন বোঝ ?...

: নাম ক'রে সময়ে সময়ে আনন্দ হয়। আগের চেয়ে এখন ভগবানের উপর নির্ভর করতেই ভাল লাগে।

: বেশ ! অল্প বয়সে সাধন নিয়েছ, জীবনে খুব উন্নতি ক'রে যেতে পারবে।... লেখাপড়া ভাল চলছে তো ?

সায় দিয়া 'ত্রাটক সাধন'এর অনুমতি চাহিলেন কুলদানন্দ। অনুমতি পাইয়া প্রণালীগুলি জানিয়া লইলেন। পঞ্চভূতেই এই সাধন করিতে হয়—প্রথম অভ্যাস ক্ষিতিতে। সবুজবর্ণ ক্ষিতিজ সম্মুখে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপলক দৃষ্টি একাগ্র করিতে হয়। সংকেত জানিয়া লইয়া তিনিও আরম্ভ করিলেন 'অনিমেষ সাধন।'

ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ কুলদানন্দকে খুব উৎসাহী ব্রাহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহার নিকট হইতে গোসাঁইজীর ব্রাহ্মমতবিরুদ্ধ কার্যাদির সন্ধান লইবার চেষ্টা করেন তাঁহারা। তিনিও বলেন অনেক কিছু। তাঁহাদের নির্দেশে গোসাঁইজীকে একদিন 'অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুবাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু গোসাঁইজী সম্মত হইলেন না ; বুঝিলেন তাঁহার মতবাদ ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। ইহাতে সমাজে সোরগোল সুরু হইল ; তাঁহারা গোসাঁইজীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আজকাল গোসাঁইজীর সঙ্গলাভ করেন নানা সাধক, ফকির ও সন্ন্যাসী। একদিন কুলদানন্দ শুনিলেন একজন উদাসী সাধুকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছেন

গোসাঁইজী ; তাঁহার শিষ্যদের সাহায্যে এই সন্ন্যাসী প্রচারক নিবাসেই গাঁজা খাইতেছেন। ব্রাহ্মদের আলোচনায় জ্বলিয়া উঠিলেন কুলদানন্দ ; বলিলেন গাঁজা খাইতে দেখিলেই গাঁজাখোরকে চলিয়া যাইতে বলিবেন। দন্তের সহিত চলিয়া সিঁড়ি অনুমানে শূন্যে পা দিতেই নীচে পড়িয়া গেলেন তিনি। এক বন্ধু কোলে করিয়া তাঁহাকে বাসায় পৌছাইয়া দিল, তিনি অচল হইয়া রহিলেন দুই-তিন দিন। শুনিলেন ঐ সন্ন্যাসী উচ্চ স্তরের মহাত্মা ; তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেই এই শাস্তি।...

একদিন কুলদানন্দকে কাহারও সাক্ষাতে প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন অপরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণও নিষিদ্ধ।

শ্রাবণের শেষে গোসাঁইজী পীড়িত হওয়ায় তাঁহার আদেশে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় কুলদানন্দকে কুম্ভক শিখাইয়া দিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুম্ভক অভ্যাস করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। গুরুপ্রদত্ত প্রণালীমত প্রাণায়াম দ্বারা শুধু প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া একেবারে মূলেতে স্থাপন করিতে হইবে ; পরে শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিয়া নামে চিত্তসংযোগ পূর্বক দৃঢ়তার সহিত উহা ধারণ করা বিধেয়। সাধারণ্যে ইহার প্রচার নাই—একমাত্র ভাগবত গীতায় সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ আছে। ইহা গুরুমুখী।

ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল। লোকের ভীড়ে সারা সহর ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন। প্রায় তিন মাইল রাস্তা বেষ্টন করিয়া অপরাহ্নে বাহির হইল এই মিছিল। প্রথমে মল্লবীর ও লাঠিয়ালদের বিভিন্ন কৌশল, গোপেদের নন্দোৎসব, হস্তীসজ্জা, অশ্বসজ্জা ইত্যাদির পর বাহির হইতে লাগিল নৌকা, মন্দির ও অট্টালিকার মধ্যে পৌরাণিক দৃশ্যাবলী সম্বলিত আদর্শ 'চৌকিসমূহ'। মিছিল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন তিনি। চৌকিগুলির অপূর্ব কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্যের খুব প্রশংসা করিলেন গোসাঁইজী।

একদিন নেংটিপরা জীর্ণ কম্বল গায়ে এক আশ্চর্য ফকিরের দর্শনলাভ করিলেন কুলদানন্দ। দুর্বোধ্য ভাষায় রাত্রে গোসাঁইজীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন সেই ফকির। তিনি একজন উচ্চস্তরের সাধক শুনিয়া তাঁহার বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিবার কৌতুহল জাগিল কুলদানন্দের। তিনি ঘরের অস্পষ্ট আলোয় ফকির

সাহেবের চোখের জ্যোতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ফকির সাহেব গোসাঁইজীকে নমস্কার করিয়া পথে বাহির হইলেন, দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। চুপি চুপি অনুসরণ করিয়াও তাঁহার কোন হদিস পাইলেন না কুলদানন্দ।

এইসব কারণে গোসাঁইজীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়িয়া চলিল। তিনি দেখিলেন, গোসাঁইজীর অসাম্প্রদায়িক বক্তৃতায় ও উপদেশে ব্রাহ্মগণ বিরক্ত হইলেও সাধারণ সকলেই খুব সন্তুষ্ট। গোসাঁইজীর পৌরাণিক গল্পের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেও আকৃষ্ট হইতেছেন। সন্ধ্যাকীর্তনে 'হরিবোল' বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে জ্ঞানশূন্য, কখনও বা মূর্ছিত হইয়া পড়েন তিনি; অমনি বহু লোকের 'ভাব' আসিয়া পড়ে। তবু নিজের খাঁটি ভাবের অভাবে দুঃখবোধ করেন কুলদানন্দ। যুক্তির বেড়াজালে তাঁহার মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম এবং শাস্ত্রপুরাণাদি প্রচলনের জন্য ইহা গোসাঁইজীর একটা 'পাকা চাল'।...

সাধন-বৈঠকেও দেবদেবী, মুনিঋষিদের দর্শনে ভাবাবেশে স্তবস্তুতি করেন গোসাঁইজী। শিষ্যদেরও নানা জ্যোতিদর্শন হয়। কিন্তু কুলদানন্দের কিছুই দর্শন হয় না বলিয়া সব কথা বিশ্বাস হয় না। আবার যাহা দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত হন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সাহস পান না তিনি। তবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন, ব্রাহ্মসঙ্গীত অপেক্ষা নামকীর্তনেই গোসাঁইজীর অধিকতর রুচি; আর কীর্তনে, বৈঠকে, এমনকি আহারে বসিয়াও সমাধিস্থ হইয়া পড়েন তিনি। কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: ভক্তিভাবের আধিক্য বশত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমত ছাড়িয়া গোসাঁই অনেকটা প্রাচীন ভ্রান্তমতে পড়িয়া গিয়াছেন, গোসাঁইকে খুব ভাল-বাসিলেও তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা।...

গুরুভ্রাতাদের হাবভাবও লক্ষ্য করিতেন কুলদানন্দ। বৈঠকে, সংকীর্তনে ইঁহাদের আনন্দ ও ভাবাবেশ স্বতন্ত্র ধরণের; আবার সর্বদাই ইঁহারা বিনয়ী, প্রফুল্ল ও সাধননিষ্ঠ। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র অপেক্ষাও পরস্পরকে অধিকতর ভালবাসেন তাঁহারা; ছেলে-বুড়োয় এত মেশামেশি, এমন ভালবাসা আর কোথাও দেখা যায় না। নানা উদ্বেগেও ইঁহাদের সঙ্গ বড়ই শান্তিদায়ক; ইঁহাদের দর্শনেই পরম আনন্দ। কাহারও মধ্যে দেখা দেয় যোগৈশ্বর্য ও অলৌকিক শক্তি; আবার কাহারও মধ্যে জাগে খেয়াল ও হঠকারিতা। তখন কঠোর শাসন করিয়া

গোসাঁইজী বলেন : ভগবৎশক্তি ভগবানের ইচ্ছায় প্রয়োগ না হলে তার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হতে পারে—এ বিষয়ে অত্যন্ত সংযত ও সাবধান থাকতে হয়।···কথাটা খুব মন দিয়া শুনিয়া রাখিলেন কুলদানন্দ।

একদিন একটী বাউলনী গোসাঁইজীর পায়ের আঙ্গুল চুষিয়া শক্তিহরণ করিবার চেষ্টা করে, শেষে নিজেই নিস্তেজ ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। গোসাঁইজীকে প্রশ্ন করিয়া কুলদানন্দ জানিতে পারেন—আঙ্গুল চুষিয়া, পদধূলি লইয়া, আলিঙ্গন করিয়া, কেহ বা দৃষ্টি দ্বারাও অন্যের শক্তি ও সৎভাব আকর্ষণ করিয়া লয়। অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেকে খুব ছোট মনে করিলে এবং ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যানে রাখিলে নিরাপদ হওয়া যায়।···যোগৈশ্বর্য সম্পর্কে গোসাঁইজীর কাছে জানিতে পারেন—সেই শক্তি ও তেজ রক্ষার জন্য যোগিরা ধারণ করেন গুরুদত্ত ত্রিশূল। গৃহীদের পক্ষে তিন-চার ইঞ্চি ছোট ইস্পাতের ত্রিশূল রাখাও চলে।···

পূর্বে কুলদানন্দের মনে হইত, এসব কুসংস্কার। কিন্তু বাউলনীর ব্যাপার দেখিয়া এবং গোসাঁইজীর মুখে শুনিয়া আজ আর কিছুই অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এইভাবে ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই গোসাঁইজীর প্রভাবে তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

অগ্রহায়ণ মাস। ব্রাহ্মসমাজে সাংবাৎসরিক উৎসব। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন কুলদানন্দ, এ যেন সকল সম্প্রদায়ের উৎসব—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ধনী-দরিদ্র সকলেরই সমাগমে সমাজ প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। প্রকাণ্ড অঙ্গনের সম্মুখে গোসাঁইজী ধ্যানস্থ। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উচ্চ সংকীর্তন আরম্ভ হইলে দেখা দিল ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা। বেদীতে বসিয়া কয়েকটী কথা বলিতেই রুদ্ধকণ্ঠ ও সমাধিস্থ হইলেন গোসাঁইজী।

শান্ত পদক্ষেপে সকলে ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। আর, ভাবে ও ভক্তিতে আত্মসমাহিত হইয়া রহিলেন কুলদানন্দ।

॥ দুই ॥

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। কফাশ্রিত বায়ু ও পিত্তশূল বেদনায় কুলদানন্দকে স্কুল ছাড়িতে হইল। কবিরাজী চিকিৎসার জন্য বাড়ী আসিলেন তিনি।

তাঁহার ধারণা বাল্যকাল হইতেই অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনে এই মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি। তাঁহাদের কুলগুরু একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও তান্ত্রিক। দীক্ষার পূর্বে একদিন তাঁহার চরণদুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন তিনি ঃ যাতে কাম জয় ও আহার ত্যাগ করতে পারি, আপনি দয়া করে আমাকে বলে দিন। আমি পাহাড়ে গিয়ে সাধন করব।…কুলগুরু দুইটী ঔষধ দিয়াছিলেন—স্ত্রীলোক দর্শন ও লালসাবশে খাদ্যগ্রহণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া গত দুই বৎসর ঔষধদুটী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ফলে কামভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষুধাবোধ একেবারে নষ্ট হইয়াছে। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এখন অন্নগ্রহণ করেন মাত্র এক মুষ্টি। এছাড়া অনেকদিন এক প্রকার কুম্ভকও করেন তিনি। তাঁহার বিশ্বাস, ব্যাধির উৎপত্তি এই সব কারণেই।

অসুস্থ অবস্থায় এবার বাড়ী আসিলেন দীক্ষাগ্রহণের প্রায় এক বৎসর পরে। আসিয়া ঔষধ দুইটী ত্যাগ করিলেন, শ্বাসরোধের চেষ্টাও ছাড়িয়া দিলেন। অন্যান্য নিয়ম ও অনুষ্ঠানও বন্ধ হইল। কেবল অন্নই এক মুষ্টি এখনও বরাদ্দ রহিল।…৩

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কালী কবিরাজ মহাশয়ের অধীনে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসকেরা একবাক্যে বলিলেন—আরোগ্যলাভ একরূপ অসম্ভব, বহুমূল্য ঔষধাদি ব্যবহারে সাময়িক উপশম হইতে পারে। ফলে, তাঁহার ধারণা হইল, এ যন্ত্রণা ভোগাইতে ভগবান বেশীদিন আর সংসারে রাখিবেন না। তাই সাধনভজনে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িলেন আরো বেশী, চিকিৎসা মনে হইল নিরর্থক। তবু সূর্যোদয় হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে তৈল মালিশ করা হয়, ঔষধ খাইতে হয় দুইবার। এই সময়ে বেশ নাম করেন তিনি। আহারান্তে গিয়া বসেন 'ছকির বাড়ী'র জঙ্গলে; পাঁচটা পর্যন্ত নির্জনে নাম করিয়া বড় আনন্দলাভ করেন। কোন কারণে এই নির্জন নাম-সাধনা ব্যাহত হইলে খুব কষ্টবোধ করেন তিনি।

পৌষ মাস, ১২৯৪। দীক্ষাগ্রহণের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইল। বাড়ীতে কাটিল অনেকদিন—গোসাঁইজীকে দেখিবার জন্য প্রাণ সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এমন সময় সংবাদ পাইলেন—ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন গোসাঁইজী, প্রচারক নিবাস ছাড়িয়া সপরিবারে তিনি বাস করিতেছেন একরামপুরে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে।···শুনিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল যেন। বিজয়কৃষ্ণই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ, তাহার উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ; সেই গোসাঁই বিহনে ব্রাহ্মমন্দির তবে যে আজ অন্ধকার, নিষ্প্রাণ শ্মশানক্ষেত্র।···

বিজয়কৃষ্ণের উদার নীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজে দেখা দেয় প্রবল আন্দোলন। কুলদানন্দ বুঝিলেন এই ঘটনা তাহারই মর্মান্তিক পরিণতি।···ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন একমাত্র গোসাঁইয়ের জন্যই; তবু তাঁহার নীতি তিনি নিজেও সর্বদা সমর্থন করিতে পারেন নাই। গত সাংবাৎসরিক উৎসবে গোসাঁইয়ের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণীতে তাঁহার অন্তরে জাগে এক নূতন, উদার ভাবের প্রেরণা। আজ বুঝিতে পারেন, গোসাঁই তাঁহাদের ধরা-ছোঁয়ার অনেক উপরে। তাঁহার বিরুদ্ধে পরোক্ষে আন্দোলন করিবার জন্য কুলদানন্দের অন্তরে জাগে গভীর অনুতাপ। গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্য অস্থির হইয়া উঠেন তিনি।

নিয়মিত চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেইসঙ্গে আবার দেখা দিল চক্ষুরোগ—দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। তাঁহাকে অযোধ্যায় বড়দাদা হরকান্তের নিকট পাঠাইবার কথা হইল। গুরুদেবের সম্মতির জন্য এবং যাত্রার পূর্বে তাঁহার ও বারদীর ব্রহ্মচারীর দর্শনলাভের জন্য চিঠি দিলেন কুলদানন্দ। অনুমতি দিয়া গোসাঁইজী জানাইলেন চক্ষুপীড়ার জন্য দৃষ্টি-সাধনের দরকার নাই। দৃষ্টিসাধন ছাড়িয়া দিলেন তিনি—নামের সহিত প্রত্যহ তিনবেলা জানাইতে লাগিলেন সকাতর প্রার্থনা। রুগ্নদেহেও আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

সাধনপথে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন গুরুভক্তি, নতুবা গুরুতে বিশ্বাস ও নামে রুচি জন্মে না। কিন্তু নিজের গুরুভক্তির অভাবে গভীর উদ্বেগ বোধ করিতে থাকেন তিনি। গোসাঁইজী সম্বন্ধে জ্ঞানবুদ্ধির অতীত কোন অলৌকিক ঐশ্বর্য কল্পনা করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে গোসাঁইজীর সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার অসাধারণ অবস্থা ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিবার গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। বাস্তবে তাহা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহার মনে হয়, এ সাধনগ্রহণ তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।···প্রথম যৌবনে গুরুতর অন্তর্বিপ্লবের মাঝে প্রার্থনাই ছিল

তাঁহার প্রধান অবলম্বন। আজো ভগ্ন দেহমন লইয়া অন্তর্যামীর উদ্দেশে তিনি জানাইলেন আকুল প্রার্থনা। গভীর রাত্রে গোসাঁইজীর চরণোদ্দেশেও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া বলিলেন ঃ গোসাঁই, এ জীবন তোমার হাতে অর্পণ করেছি। কিন্তু কই, তোমার প্রদত্ত সাধনে আমার তো রুচি হ'ল না, তোমাতেও ভক্তি জন্মাল না।···গুরুদেব, তুমি দয়া না করলে আমার উপায় আর কে ক'রবে ?···

গোসাঁইজীর উদ্দেশে কুলদানন্দের এমনি আত্মনিবেদন এই প্রথম। ফলে, সেই রাত্রেই স্বপ্নযোগে গোসাঁইজীর কৃপালাভ করিলেন তিনি। স্বপ্ন দেখিলেন ঃ ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইবার ফলে ব্রহ্মাণ্ডকে পরব্রহ্মের প্রকাশ ভাবিয়া সর্বত্র মাথা নত করিতেছেন। সহসা গোসাঁইজী সম্মুখে আসিয়া বলিলেন ঃ বাঃ—এ তো বেশ সাধন ক'চ্ছ! সবই যদি ঈশ্বর, তবে নিজেকে বাদ দিচ্ছ কেন ? আমি তুমিও তো ঈশ্বর। তোমাকেই তুমি ঈশ্বর ভেবে সন্তুষ্ট থাক না কেন ?···তিনি বলিলেন ঃ এতে আমার তৃপ্তি হ'চ্ছে না। আমি গুরুতে ভক্তি ও নামে রুচি চাই। আপনি আমাকে দয়া করুন।···তখন তাঁহাকে প্রত্যহ সাধনের পূর্বে একটী নাম সহস্রবার জপ করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন গোসাঁইজী। তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল।···

অভিভূতভাবে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া গোসাঁইজীকে প্রণাম জানাইলেন কুলদানন্দ। সহস্রবার জপ করিলেন স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত সেই নাম। স্বপ্ন নয়—যেন জাগ্রত সত্য। বুঝিলেন, অন্তরের প্রার্থনা গোসাঁই তবে সত্যই জানিতে পারেন।···স্বয়ং তিনিই যে এই নির্দেশ দান করিলেন, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না।

অতঃপর দিনে দিনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। বহুকাল যাবৎ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে খুব আনন্দলাভও করেন ; ভাবে বিভোর হইয়া মনে হয়, এই তো ঈশ্বরকে অনুভব করিলাম। কিন্তু প্রার্থনান্তে সেই ভাব, আনন্দ ও উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসে। উক্ত স্বপ্নদর্শনের পর তাঁহার মনে হইতে থাকে—শুধু ভাবেরই উপাসনা করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা ঈশ্বরের উপাসনা নয়।···প্রকৃত ঈশ্বরের অনুভূতি হইলে নিঃসংশয়ে তাহা স্থায়ী হইত। এই অস্থায়ী আনন্দলাভের পর তাই অন্তরে দেখা দেয় শতগুণ যন্ত্রণা। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন ঃ আর প্রার্থনা করিব না—অস্থায়ী, অসার আনন্দকে আর কখনও ঈশ্বরসম্ভোগ জনিত আনন্দ মনে করিব না—স্থির করিলাম। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে যে তাঁহার উপাসনা হয় না, এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল।

কুলদানন্দের এই আত্মবিশ্লেষণ সত্যই অপূর্ব। সাধনপথে অনেকেই সাময়িক ভাবালুতার আশ্রয়ে উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে ভাবিয়া স্ফীত হইয়া ওঠেন। এই অভিমান ও আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে সযত্নে দূরে থাকিয়া সত্যপথে সুরু হইল তাঁহার অগ্রগতি। বহুকালের অভ্যস্ত প্রার্থনা ত্যাগ করিয়া শুধু নামজপে নিমগ্ন হইলেন তিনি।

'আনন্দরূপমমৃতং'—ইহাই তাঁহার সাধক-জীবনের চরম কাম্য। কিন্তু ক্ষণিক আনন্দে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া সেই লক্ষ্যপথে স্বীয় অগ্রগতি ব্যাহত করেন নাই তিনি। একটা দুর্বিসহ জ্বালা বক্ষে লইয়া নিবিড় আঁধারে প্রার্থনার আলোকেই পাইয়াছিলেন পথের সন্ধান; যাত্রাপথে অন্তরায় মনে হওয়ায় পরিত্যাগ করিলেন আস্থায়ী আনন্দজ্যোতির বাহন সেই প্রার্থনা। পরিবর্তে নিদারুণ শুষ্কতায় চিত্ত ভরিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন; সম্বল রহিল শুধু গুরুদত্ত ইষ্টনাম।

কিছুকাল এইভাবে সাধনপথে দুইবেলা প্রাণায়াম ও সর্বদা নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু কোন আনন্দ বা উপকার বুঝিতে পারেন না; বরং যেন অধিকতর শুষ্কতায় তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।···আর, নাম-সাধনের সহিত প্রত্যহ অন্তরে জাগে নানা প্রশ্ন : কে করে এই নাম ?···কোথা থেকে এই নামের উৎপত্তি ?···আমিই বা আছি কোথায় ?'···চিত্তের ব্যাকুলতায় সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে যেন। ক্রমে তলপেটে, নাভিমূলে, হৃদয়ে কণ্ঠায়, অবশেষে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নামের উৎপত্তি অস্পষ্ট অনুভব করেন তিনি।···

সমুদ্রের অতল তলে ডুবিয়া মণিমুক্তা অন্বেষণের ন্যায় হৃদয়ের নিঃসীম গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়া তিনি আত্মবস্তু সন্ধানে ব্যাকুল। সাধনপথে এই বিচিত্র আত্ম-সন্ধান ও অগ্রগতির সুন্দর চিত্র তৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই দুর্লভ আত্মপরীক্ষা, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধানই তাঁহার সাধক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গোসাঁইজীর দর্শনলাভের জন্য মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও সবকিছু নিবেদন করা প্রয়োজন। ওদিকে মাঘোৎসবও নিকটবর্তী। বাড়ী হইতে অবিলম্বে ঢাকা রওনা হইলেন তিনি।

একরামপুর—বিজয়কৃষ্ণের বাসা। কুলদানন্দ গিয়া দেখিলেন নিজ আসনে বসিয়া আছেন বিজয়কৃষ্ণ। ঘরে অনেক লোক—সকলেই নীরব। এক কোণে

গিয়া বসিলেন তিনি।

একটি ছাত্র রাধাকৃষ্ণের চিত্রপট হস্তে বিজয়কৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া খুবই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাকে পুনঃপুনঃ স্থির হইতে বলিলেন বিজয়কৃষ্ণ, তবু ছাত্রটী আরো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যেন। বিজয়কৃষ্ণ ধমক দিয়া উঠিলেন ঃ বটে—এখানে চালাকি! নবাবের বাগানে নির্জনে সুন্দরী একটী যুবতী পেতে চাও কিনা, ভেবে বল তো ?· ·

জোঁকের মুখে লবণ পড়িল যেন।···পলকে নিস্তব্ধ হইয়া গেল ছেলেটী—ম্লান, পাংশু মুখে উঠিয়া গেল পরক্ষণে।

কুলদানন্দ বুঝিলেন, গোসাঁইজীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে কোনপ্রকার ফাঁকি বা ভাবের ঘরে চুরি চলিবে না। অন্তর্যামীর মতই তিনি যে সর্বজ্ঞ,···সর্বতমোহর প্রদীপ্ত ভাস্কর।···নিজের মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে বেশ সচেতন হইয়া উঠিলেন কুলদানন্দ।

আজ মাঘোৎসব। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর দেখা দিয়াছে কত আনন্দ। সকল আনন্দের উৎস গোসাঁইজী বিহনে ব্রহ্মমন্দির আজ অন্ধকার। তবু সেখানে উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজীর প্রিয় শিষ্য মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এখন সমাজের পরিচালক। তাঁহার উপাসনা ভাল লাগিল; কিন্তু মনে হইল ঃ এ তো কেবল ভাবের উপাসনা, বাক্যের আড়ম্বর ও কল্পনার ছড়াছড়ি মাত্র। পরমেশ্বর কোথায় ?···অমনি মন্মথবাবু বলিতে লাগিলেন ঃ মা, একটী ছেলে তার শূন্য অন্ধকারময় কুটিরে ব'সে কী ভাবছে দেখ। মা আনন্দময়ি, আজ তার অন্ধকার ঘর তুমি কি তোমার আলোয় উজ্জ্বল করবে না ?···কুলদানন্দের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার শুষ্কতা টের পাইয়া মন্মথবাবু ভাবুকতায় তাঁহাকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিবেন নাকি ?···কেমন একটা আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন তিনি।

আহারান্তে গেলেন বিজয়কৃষ্ণের বাসায়। আজকাল আর অস্থায়ী ভাবাবেশের প্রশ্রয় দেন না তিনি। ভাব হইলে ক্ষণকাল পরেই তো ছুটিয়া যাইবে। তাই তিনি ভাবের কথা শোনেননা, ভাবের গান ভালবাসেন না, এমনকি ভাবুকদের নিকট বসিতেও চান না। গোসাঁইজী ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন এই বিশ্বাসে নিজ শুষ্কতা দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন। কিন্তু প্রার্থনা আরম্ভ হইতেই অপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধকণ্ঠে নীরব হইলেন গোসাঁইজী, চক্ষে বহিল অবিরাম অশ্রুধারা। ক্রন্দন

জড়িত কণ্ঠে এক একবার বলিতে লাগিলেন ঃ জয় মা—জয় মা !···

তাহারই আবেগপূর্ণ প্রতিধ্বনি বারবার প্রতিহত হইল কুলদানন্দের হৃদয়-দুয়ারে, তাঁহার শুষ্ক-কঠোর প্রাণ সহসা স্পন্দিত হইয়া উঠিল যেন। সর্বাঙ্গে দেখা দিল থর-থর কম্পন, টুটিয়া গেল সমস্ত সংযম ও ভাববিমুখতা। রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে মেঝেতে লুটাইয়া পড়িলেন তিনি। অন্তরে বাহিরে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল এক অব্যক্ত আকুল ক্রন্দন।···এক ঘণ্টারও অধিক কাল ভাবাবেশে বিভোর থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলেন তিনি।

পূর্বদিনে যে ছাত্রটী আসিয়াছিল, আজ সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লইবে শুনিয়া গোসাঁইজী বলিলেন ঃ কেবল কি দলবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য ? তাহ'লে পাগলগুলোকে নিয়েও তো দীক্ষা দিতে পারে।···

কথাটী লক্ষ্য করিলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন সমাজের মূল্য সংখ্যায় নয়, মনুষ্যত্বে। তাই তো সংখ্যালঘু হইলেও সিংহই পশুরাজ।···ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তিনি গোসাঁইজীর নির্দেশ জানাইলে ছেলেটীর দীক্ষা বন্ধ হইল। ফিরিবার সময় রেবতীবাবু গোসাঁইজীর সাধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। রেবতীবাবুর কীর্তনে গোসাঁইজী আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার নিজেরও শুষ্কতার পরিবর্তে সাধনের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া চলিয়াছে। রেবতীবাবুকে গোসাঁইজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইলেন তিনি।

সকালে উঠিয়াই কুলদানন্দ গেলেন গোসাঁইজীর কাছে। পরদিন বাড়ী যাইবার কথা উত্থাপন করিলেন। গোসাঁইজী বলিলেন ঃ আমিও তো কাল ইছাপুরা যাব—এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। শরীর কেমন আছে ? পশ্চিমে দাদার কাছে যাচ্ছ কবে ?

ঃ শরীর ভাল নেই। দাদা শিগগির বাড়ী আসবেন ব'লে যাওয়া হয় নি।

ঃ লেখাপড়া বুঝি হচ্ছে না ? যাক, শরীরটা আগে সুস্থ ক'রে নেও। সাধন কেমন চলছে ? নাম কর তো ?

ঃ নাম তো করি ; কিন্তু কুসঙ্গ, কুচিন্তা ও অসুখের জন্য মন বড় অস্থির হয়। শুষ্কতায় দিন দিন কাঠ হয়ে যাচ্ছি যেন। বড় কষ্ট হয়, প্রাণে নৈরাশ্য আসে।

ঃ সাধনের সঙ্গে একটু ক'রে দৃষ্টিসাধন ও প্রাণায়াম অভ্যস্ত হ'লে আর কোন রোগ থাকবে না। শুষ্কতায় কোন ক্ষতি নেই—নামে সব দূর হবে। নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই।

ঃ আমি যাঁদের খুব শ্রদ্ধাভক্তি করি, সাধনের আগে তাঁদের স্মরণ করি ; এতে

কি কোন ক্ষতি হয় ?

ঃ না—বরং উপকারই যথেষ্ট হয়। ওরকম খুব করবে—আমিও করি।

ঃ সাধনের সময় নামটী কোথা হ'তে আসে, সন্ধান ক'রতে ইচ্ছে হয়। তলপেটে, নাভিতে, কণ্ঠায়, নানাস্থানে অনুভব করি। এখন মাথার পিছন দিকে ধারণা হ'চ্ছে। এইভাবে যে যে স্থানে অনুভব হয়, ধারণা ক'রব ?

ঃ হ্যাঁ—খুব করবে। এইসব ধারণা অনেক স্থানে হবে—ক্রমে কপালে ও ব্রহ্মতালুতেও হবে। এসব হওয়া খুব ভাল।···

গুরুদেবের নিকট আজ অনেকক্ষণ প্রাণের কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন কুলদানন্দ। সস্নেহ উপদেশ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইলেন। মনেপ্রাণে দেখা দিল স্নিগ্ধ, সরস ভাবাবেশ।

কিন্তু বেনিয়াটোলায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে গোসাঁইজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে ক্ষুণ্ণ হইলেন। আর কখনও গুরুদেবকে বিগ্রহের নিকট প্রণাম করিতে দেখেন নাই। মনে বড় কষ্ট হইল। সাকার উপাসনা সম্পর্কে তখনও নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই তিনি।

আজ বাড়ী যাইবার কথা। হাতমুখ ধুইয়া কুলদানন্দ প্রস্তুত। সারদাকান্ত বলিলেন ঃ গয়নার নৌকার তো সময় হ'য়ে গেছে—এখনও ব'সে আছিস যে ?

ঃ গোসাঁই ইছাপুরা যাবেন, সেই সঙ্গে যাব।

ঃ গোসাঁইয়ের সঙ্গে না হ'লে বুঝি যাওয়া যায় না ? দিনরাত কেবল 'গোসাঁই—গোসাঁই' ! তা হবেনা—এক্ষুনি তুই গয়নায় চলে যা।

ক্ষুব্ধপ্রাণে রওনা হইলেন কুলদানন্দ। গয়নায় উঠিলে ক্রন্দনের আবেগে অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল। মনে মনে গুরুদেবকে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন ঃ আমার জন্যে আপনি যেন আর অপেক্ষা না করেন। আর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।···সারাটি পথ বড় মনোকষ্টে কাটিল—বুকে চাপিয়া রহিল দারুণ বিচ্ছেদ বেদনা।

পরদিন সকালে গুরুদেবের জন্য মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাড়ী হইতে ইছাপুরা অর্ধঘণ্টার পথ। সেখানে গোসাঁইজীর কাছে গিয়া প্রণামান্তে একপাশে বসিলেন।

ঃ তুমি যে কাল সকালে গয়নায় চ'লে এলে, তা তখনই জানতে পেরেছিলাম।

ঃ আপনাকে কি কেউ খবর দিয়েছিল ?

ঃ না, তা নয় ।···

কুলদানন্দ তো অবাক !···

গৃহস্বামীকে ডাকিয়া গোসাঁইজী বলিলেন ঃ দুমুঠো মুড়ি এনে দিন তো, বুকে বেদনা বোধ হচ্ছে ।···

বুকের বেদনা অহরহ লাগিয়াই আছে কুলদানন্দের। বাড়ী হইতে অর্ধঘণ্টার পথ অতি কষ্টে আসিয়াছেন দেড় ঘন্টায়। এখনও যন্ত্রণায় বুক চাপিয়া বসিয়া আছেন। মুড়ি আসিলে গোসাঁইজী দুই-একবার মাত্র মুখে দিয়া খাইতে দিলেন তাঁহাকেই। মুড়ি খাইয়া বেদনার অনেক উপশম হইল। অন্তরেও জাগিল নূতন তৃপ্তি ও আনন্দ। বুঝিলেন, মুড়ির ফরমাস কাহার জন্য ।···তবে কি তাঁহারই বেদনা অনুভূত হইল গোসাঁইজীর বুকে ?···তাঁহার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশা সবই কি তবে প্রতিফলিত গুরুদেবের অন্তর-মুকুরে ?···

গোসাঁইজীর নিকট বসিয়াছিলেন লালবিহারী। অষ্টম বর্ষে গৃহত্যাগী, যোগৈশ্বর্যশালী এক কিশোর সাধক। মহোৎসবের সময় মহাপ্রভুর বিগ্রহের সম্মুখে লালবিহারীর সহিত মল্লবেশে ছুটাছুটি করিলেন গোসাঁইজী। শ্রীধর সুরু করিলেন আরতি-নৃত্য। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনির মাঝে তাঁহারা সকলেই মুর্ছিত হইলে অচেতন হইলেন আরও অনেকে। গুরুদেবের শ্রীচরণ অন্যের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন কুলদানন্দ। ভাবাবেশে তিনি যেন আচ্ছন্ন, সর্বাঙ্গ কণ্টকিত ।···

আজ চন্দ্রগ্রহণ। রাত্রে গুরুদেবের নিকট রহিলেন তিনি। অধিক রাত্রে গোসাঁইজী বলিলেন ঃ সারারাত জেগে আজ অনেকে জপতপ করবে।

ঃ তাতে কি বিশেষ কোন লাভ হয় ?

ঃ তিথির একটা গুণ আছে বৈকি।

গভীর নিশীথে গুরুদেবের সান্নিধ্যে কুলদানন্দ লাভ করিলেন পরম আনন্দ, নূতন প্রেরণা ।···গুরুদেবের আদেশে রাত্রি প্রায় তিনটায় শয়ন করিলেন তিনি। ধুনীর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন ধ্যানরত গোসাঁইজী।

ফাল্গুন মাস, ১২৯৪। গুরুভ্রাতাদের উন্নত অবস্থায় বিস্মিত হন কুলদানন্দ। বিজয়কৃষ্ণের দিব্যজীবনই এই সাধনে সিদ্ধিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁহার ধিক্কার জন্মে নিজের উপর। প্রাণপণ সাধনে দেহমন জ্বালাইয়া অঙ্গার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন তিনি। স্নানাহার ও নিদ্রা ব্যতীত প্রভাত হইতে দীর্ঘরাত্রি

পর্যন্ত প্রত্যহ চলে প্রাণায়াম, কুম্ভক, দৃষ্টিসাধন এবং অবিশ্রাম নামজপ।

একদিন প্রভাতে নাপজপ কালে ললাট মধ্যে দেখিলেন এক অপূর্ব জ্যোতি।... ক্রমশ যেন সহস্র বৈদ্যুতিক আলোর ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইল। স্বচ্ছ নদীবক্ষে কম্পিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় তাহার সৌন্দর্যে মূর্ছিতপ্রায় হইলেন তিনি।... একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইলেও সেই জ্যোতির স্মৃতিতে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। পরদিনই গোসাঁইজীর নিকট যাইবেন স্থির করিলেন।

দীক্ষার পর অপূর্ব জ্যোতিদর্শন কুলদানন্দের সাধনপথে এই প্রথম। ঢাকা পৌছাইয়া গুরুভ্রাতাদের নিকট নিভৃতে বলিলেন সে-কথা। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন হয় গুরুকৃপায়। উচ্ছ্বসিত আনন্দের মাঝেও মনে জাগে সংশয়। এক ডাক্তার বন্ধুকে বলিতেই সন্দেহ দেখা দেয়। গোসাঁইজীকে কিছু বলিলেন না; জ্যোতিদর্শনের আগ্রহে অধিকতর উৎসাহে সাধনে নিমগ্ন হইলেন।

চৈত্রের শেষ। বুড়ীগঙ্গায় প্রচণ্ড ঘুর্ণিবাত্যা উঠিল। জলস্তম্ভ হইতে বিক্ষিপ্ত হইল অসংখ্য অগ্নিগোলা। ভয়ংকর গর্জনে কাঁপিয়া উঠিল সারা সহর। বিজয়কৃষ্ণ দেখিলেন মহাকালী ও মহাবীরের উদ্দণ্ড নৃত্যে সুরু হইয়াছে মহাপ্রলয়।... সৃষ্টিরক্ষার জন্য তিনি আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। অমনি দুই তিন মিনিট মধ্যে স্তব্ধ হইল সেই ভয়াবহ ঘুর্ণিবাত্যা। তবু এক বৃদ্ধাকে বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে অপর পারে এক স্কুলের দোতালায় আনিয়া ফেলিল অক্ষত অবস্থায়। এমনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল।

জড়শক্তিতে চিৎশক্তি মিলিত হইলে নিতান্ত অসম্ভবও যে সম্ভব হয়, তাহা বুঝিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কুলদানন্দ। আর সেই অলৌকিক ঘটনার পশ্চাতে গোসাঁইজীর অভাবনীয় যৌগিক শক্তির পরিচয়ে অধিকতর ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন।

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। হিমালয় হইতে যোগিগণ রাত্রিকালে তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করিতে আসেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য গোসাঁইজীর অনুমতি গ্রহণ করেন কুলদানন্দ। হরকান্ত বাড়ী আসিলে তাঁহাকেও বারদী যাইতে সম্মত করাইলেন।

যাইবার পূর্বে শেষরাত্রে স্বপ্নযোগে ব্রহ্মচারীর দর্শনলাভ করেন তিনি। বড়দাদা, মেজদাদা ও দাদার বন্ধু তারাকান্ত বাবুর সহিত সাগ্রহে রওনা হইলেন। পরদিন প্রভাতে স্নানান্তে বারদীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন সকলে।

হরকান্তকে পাশে বসাইয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণের উপদেশ দিলেন ব্রহ্মচারী। কুলদানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। বরদাকান্তকে লোকসেবায় অর্থব্যয় করিবার উপদেশ দিয়া কুলদানন্দকে বলিলেন ঃ ওরে, তুই এসেছিস্ কেন ? দেবতা দেখতে ?

গুরুদেবের নির্দেশে নীরবে বসিয়াছিলেন কুলদানন্দ। তিনি শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন ঃ না।—

কিল দেখাইয়া ধমক দিলেন ব্রহ্মচারী ঃ মাথা ঝাঁকিস—মাথা ভেঙ্গে দেব। কথা বল্।—

কুলদানন্দকে পাশে বসাইলেন তিনি। নানা উপদেশ দিয়া বলিলেন ঃ ওরে, তুই তো নিত্য 'নোট' লিখিস ? তাতে তোর সম্বন্ধে আমার দুটো কথা লিখে রাখিস—বিলাসিতা ত্যাগ কর্, বিদ্যা হবে না।…

ব্রহ্মচারী ডায়েরী লিখিবার কথা বলায় শ্রদ্ধানত হইলেন কুলদানন্দ। কথায় কথায় ব্রহ্মচারী বলিলেন ঃ ধর্মকর্ম সব হবে। অস্থির হ'স না—কোন ভয় নেই। 'একটা বেদনায় তুই খুব কষ্ট পাচ্ছিস, না ? কাছে আয়—আমি তোর বুকে হাত বুলিয়ে দি', এখনই সেরে যাবে।

ব্রহ্মচারী বেদনার কথা বলিলে কুলদানন্দের শ্রদ্ধা বর্ধিত হইল। তিনি বলিলেন ঃ বেদনা সারিয়ে দেবেন এজন্যে আমি আসিনি —এসেছি শুধু আপনাকে দর্শন করতে। স্বপ্নে আপনাকে ঠিক এমনি দেখেছিলাম।…

স্বপ্নের কথা জানিয়া লইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন ঃ স্বপ্নটা লিখে রাখিস। তোর পথ তো স্বপ্নেই তোকে দেখিয়েছি।…

হৃদ্যতাপূর্ণ আরো অনেক কথাবার্তা হইল। মধ্যাহ্নে আহারান্তে তাঁহারা ব্রহ্মচারীর নিকট শুনিলেন তাঁহার বিচিত্র জীবনকথা। শান্তিপুরে অদ্বৈত বংশের এই সন্তান উপনয়নের পর এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে সাধন শিক্ষা অন্তে গুরুর সহিত তীর্থপর্যটন করেন। পাহাড়তলীতে এক বিধবা যুবতীর প্রতি দেখা দেয় প্রবল আসক্তি। প্রায় তিন বৎসর পরেও নিস্তারলাভ না করিয়া স্থানত্যাগ করিবার জন্য গুরুকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তবুও গুরুর ঔদাসীন্যে অবশেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলে গুরু তাঁহাকে নিভৃত পর্বতে হঠযোগ শিক্ষা দেন পঁয়ত্রিশ বৎসর। রাজযোগ অভ্যাস করিয়াও বহুকাল পরে কৃতকার্য হন তিনি। গুরুর অন্তর্ধানের পর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একজন মুসলমান ফকিরের সহিত অগ্রসর হন হিমালয়ের উত্তরে সুদুর্গম তুষারাবৃত পথে। বহুকাল

চলিবার পর উত্তর মেরু ছাড়াইয়া তাঁহারা আরোহণ করেন উদয়াচলে। পরে মক্কা, এশিয়া, ও ইউরোপের বহুস্থান পর্যটন করিয়া চন্দ্রনাথ যাইবার পথে মিথ্যা সন্দেহে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িয়া দিলে এক ভদ্রলোক তাঁহাকে বারদী আনিয়া সেবাযত্ন করিতে থাকেন। তখন তিনি বাকশক্তিহীন, গাত্রচর্ম খড়খড়ে, দেহরক্ত ঘাসের মত সবুজ। ক্রমে দুধ, মোহনভোগ ও শক্ত জিনিষ খাইতে আরম্ভ করায় বাকশক্তি ফিরিয়া আসে, দেহরক্ত হয় স্বাভাবিক। প্রারব্ধ শেষ করিবার জন্য মুসলমান চাষীদের সহিত 'নাস্তা' খাইয়া ক্ষেত নিঙড়াইবার কাজ করেন তিনি,···স্কন্ধে বাঁশ লইয়া শূকর তাড়াইয়া বেড়ান সারারাত্রি। বহুকাল এইরূপ গুপ্তভাবে ছিলেন। অবশেষে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার নাম প্রচার করেন।

ব্রহ্মচারীর নিকট কুলদানন্দ আরো জানিতে পারেন, যোগাভ্যাসের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই মানুষের গতিবিধি সম্ভব। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা—এক একটী দ্বীপে সাতটী 'বর্ষ'। জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী এই ভারতবর্ষ। পৃথিবী পূর্ব-পশ্চিমে গোল, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে শঙ্খাকৃতি মালার মত। এইরূপ সাতটী দ্বীপের দ্বারা গঠিত এই পৃথিবী।

সময় মতই ব্রহ্মচারীর দর্শন ও সঙ্গলাভ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে কুলদানন্দের মনেপ্রাণে। যোগশিক্ষা ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানলাভের আগ্রহ বর্ধিত হয়। হরকান্ত দীক্ষাপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হইলে তিনি খুশী হইয়া ওঠেন। কিন্তু তাঁহারা ঢাকা ফিরিয়া আসিবার পূর্বে কলিকাতায় রওনা হন বিজয়কৃষ্ণ।

॥ তিন ॥

সাধন-গ্রহণের দ্বিতীয় বর্ষ। দেহে দারুণ ব্যাধি, মনে আশা-নিরাশার নিয়ত দ্বন্দ্ব। তবু সাধনপথে তাঁহার অগ্রগতি রহিল অব্যাহত।

কফাশ্রিত বায়ু ও পিত্তশূল বেদনার যথোচিত চিকিৎসায় বাড়ীতে কাটিল বহুদিন। কিন্তু উপশমের পরিবর্তে রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইল চতুর্গুণ; মনের ধৈর্য ও প্রফুল্লতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। সেই সাথে তেজস্কর ঔষধ সেবন ও তৈল মালিশের ফলে দেখা দিল নিস্তেজ রিপুর উত্তেজনা। সাধন-ভজনে সাময়িক বিশেষত্ব উপলব্ধির ফলে মনে হইল, রিপুদমন তো ইচ্ছাধীন।···অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে সাধারণ বিধি-নিষেধে শৈথিল্য আসিয়া পড়িল। অতঃপর দুইটী অবাঞ্ছিত

ঘটনায় দেখা দিল তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া।…

পল্লীতে একটী তরুণীকে লইয়া এক বৈষ্ণবী সুরু করে গণিকাবৃত্তি। লাঠিয়াল সহ তাহাদের শাসন করিতে যাইয়া কুলদানন্দ নিজেই পড়িলেন বেড়াজালে। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির পর তরুণীর আলিঙ্গনে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। পলকে যেন লুপ্ত হইল সমস্ত তেজ ও বিচারবুদ্ধি।…পরক্ষণে এক অলৌকিক শক্তি বলে নিজেকে মুক্ত করিয়া তিনি ছুটিলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে। পরদিন উহাদের ঘরে আগুন দিবার যুক্তি করিলে বৈষ্ণবী গ্রাম ছাড়িয়া গেল। কিন্তু যুবতীর স্পর্শসুখ ও আলিঙ্গন জীবনে এই প্রথম—তাই রহিয়া গেল সেই স্মৃতির দহন,…আর ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনায় সাধন-ভজন ব্যাহত হইতে লাগিল।…

উপরন্তু দেখা দিল আর এক বিষম প্রলোভন। বাড়ীতে ছিল এক অনাথা কুমারী—তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার পড়িল কুলদানন্দের উপর। সারাদিন গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকায় রাত্রি নয়টা হইতে নিশুতি রাত পর্যন্ত তাঁহারই ঘরে বসিয়া চলিল মেয়েটীর অধ্যয়ন। শয্যাপাশে তরুণীর সান্নিধ্যে শিথিল দেহমনে জাগিল প্রবল কামবেগ।…সেই সঙ্গে সংযম ও সাধনার জন্য ধ্বনিত হইতে লাগিল বিবেকের কঠোর আদেশ।…অহরহ চলিল এই গুরুতর আত্মসংগ্রাম—সঙ্কল্প সাধনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় অবশেষে গৃহত্যাগ করিলেন তিনি। ঢাকায় ফিরিয়া আবার স্কুলে ভর্তি হইলেন।

ভিতরের দুর্বলতা চাপিয়া গুরুজীর সঙ্গ করিতে লাগিলেন। একদিন ধ্যানস্থ অবস্থায় গোসাঁইজী বলিলেনঃ এবার যোগপন্থীদের যার যে ছিদ্র আছে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে। সময় অতি ভয়ানক।…শুনিয়া ভিতরের দুর্বলতা ও আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইল; খুব সাবধানে সাধন করিতে লাগিলেন। গোসাঁইজী কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গেলেন; অমনি গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সুরু হইল বিবাদ, চরিত্রহীনতা ও গুরুদ্রোহিতা। নূতন উদ্যমে প্রাণপণে সাধন-ভজনে তৎপর হইলেন তিনি।

শ্রাবণের শেষ, ১২৯৫। কুলদানন্দের নিয়মিত সাধন-ভজন চলিয়াছে। শেষরাত্রে ছাদের উপরে গিয়া পূর্বমুখী আসনে বসেন। গুরুদেবকে প্রণাম ও একান্ত মনে স্মরণ করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রটি জপ করেন সহস্রবার। তারপর চলে প্রাণায়াম ও নামজপ।

ধীরে ধীরে ললাটদেশ কম্পিত করিয়া দেখা দেয় মনোহর জ্যোতিপ্রকাশ।

ইতিপূর্বে ইহার প্রথম দর্শনকালে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এখন অহরহ সেই শ্বেতোজ্জ্বল প্রভায় মাঝে মাঝে দিশেহারা হইয়া পড়েন। ক্রমে ইহা অভ্যস্ত হইয়া যায়—তরঙ্গায়িত জ্যোতি এখন চন্দ্রমার ন্যায় স্থির ও নির্মল। নামে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে ইহার মাধুর্যে অভিভূত হইয়া পড়েন ; গুরুদেবের রূপের ধ্যানে স্তরে স্তরে বিকীর্ণ ও বর্ধিত হয় ইহার অনুপম দীপ্তি। গভীর আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন তিনি।

সহসা আবার দেখা দেয় এক দুর্বিপাক। নানা কাজে সর্বদা সাহায্য করিত এক শূদ্রাণী বিধবা। অসহায় অবস্থায় পড়িয়া সে কুলদানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইল। দয়াবশতঃ তাহার একটা ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিলেন। সেই সুযোগে সন্ধ্যায় নির্জন গৃহে তাঁহাকে একাকী পাইয়া সাদরে পাশে বসাইল বিধবা যুবতী।...উদগ্র কামনার আবেগে কামবিহ্বলা তাঁহার বক্ষলগ্ন হয় বুঝি।...প্রবল উত্তেজনায় অধীর হইয়া ওঠেন কুলদানন্দ। কিন্তু আত্মসচেতন হইয়া উঠিতেই ললাট মধ্যে লক্ষ্য করেন সেই স্থির জ্যোতির থরথর কম্পন।...অমনি যুবতীর বাহুপাশ সবেগে ছিন্ন করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসেন। তবু সেই কম্পিত জ্যোতির্মণ্ডল অন্তর্হিত হয় ধীরে ধীরে। দারুণ দুঃখে ও অনুতাপে মুহ্যমান হইয়া পড়েন তিনি।...

গোসাঁইজী ঢাকায় আসিবেন শুনিয়া গুরুভ্রাতারা ষ্টেশনে গেলেন। কুলদানন্দ রহিলেন সকলের পশ্চাতে—তাঁহার অপরাধী মনে জাগে গুরুতর আশঙ্কা,...বুকে ওঠে দুরু দুরু কম্পন।...কিন্তু ট্রেণ আসিলে প্রথমেই গোসাঁইজীর নজর পড়িল সর্বপশ্চাতে। তিনি বলিলেন : কী কুলদা—এসেছ ?...বেশ—বেশ !...তোমরা বাসায় যাও—আমি ফুলবেড়ে নেমে যাচ্ছি।...তাঁহার প্রসন্ন হাসিতে ও সস্নেহ বচনে অমৃতবর্ষণ হয় যেন,...নিমেষে ধুইয়া মুছিয়া যায় কুলদানন্দের সমস্ত ক্ষোভ, লজ্জা ও অনুতাপ।...অন্য একটী গুরুভ্রাতা স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে অপদস্ত হওয়ায় দুঃখে ও লজ্জায় ষ্টেশানে আসেন নাই। ফুলবেড়ে ষ্টেশানে নামিয়া সেই সর্বজন-উপেক্ষিতকে গোসাঁইজী সর্বাগ্রে দিয়া আসিলেন নিবিড় আলিঙ্গন।...

পূর্বেই গুরুশক্তির কিছু পরিচয় পাইয়াছেন কুলদানন্দ। পতিত জনে গুরুদেবের অযাচিত স্নেহে ও কৃপায়, তাঁহার এমনি অন্তর-মাধুর্যে আজ নূতন ভরসায় ও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইলেন। সর্ব বিচ্যুতি ও দুর্বলতা হইতে পরিত্রাণলাভের নিশ্চিত আশ্বাসে তাঁহার অস্থির চিত্তে জাগিল নব আশা ও প্রশান্তি। এইভাবে প্রতি পদে অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল

অমোঘ গুরুশক্তি ও গভীর গুরুভক্তি। গুরুদেবের প্রতি অন্তরে জন্মিল মধুর ও প্রগাঢ় আত্মীয়তাবোধ।···

মধ্যাহ্নে আমতলায় গোসাঁইজী ধ্যানস্থ। দূর হইতে কুলদানন্দ প্রণত হইলে চক্ষু মেলিয়া বসিতে বলিলেন তিনি। বারদীর ব্রহ্মচারীর দর্শনলাভের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুলদানন্দ সবকিছু জানাইলে বলিলেন ঃ ব্রহ্মচারী যা বলেছেন লিখে রেখো। তবে তোমাকে যা বলেছি ক'রে যাও। আমি তো আছি—পরে যা ক'রতে হবে আমি ব'লে দেব। ব্যস্ত হয়ো না। স্বপ্নটী বল তো।

ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে যাইবার পূর্বরাত্রে কুলদানন্দ যে বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বলিলেন ঃ স্বপ্ন দেখলাম যেন আপনি এসে ডাকলেন; ব্রহ্মচারী, আপনি ও তারাকান্ত গাঙ্গুলী অগ্রসর হ'লে আমি পিছনে চললাম। এক অরণ্যের মধ্য দিয়ে আপনি কাঁটা সরিয়ে চ'ললে আমার দৃষ্টি রইল সেইদিকে। পরে এক পর্বতমধ্যে গিয়ে সকলে তার চূড়ায় উঠলাম। আপনার আদেশে সম্মুখে ব'সে আমি সাধন করলাম, আবার সকলে অগ্রসর হ'লাম। উচুনীচু কাঁটাভরা পথে হুঁচোট খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হ'লে আপনার কথামত সাবধানে চ'ললাম। অদূরে দেখা গেল কাঁটাঘেরা এক জ্যোতির্ময় রাজ্য—তার অপরিসর প্রবেশদ্বারে আপনারা উপস্থিত হ'লেন। অমনি ভয়ংকর একটা সাপ তেড়ে এলে আপনি আমাকে অভয় দিতে লাগলেন। ব্রহ্মচারী ও আপনার কাছে ফণা নত ক'রে সাপটী ছুটল তারাকান্তের দিকে। আপনার নিষেধ সত্বেও তারাকান্ত লাঠিদ্বারা আঘাত করলে সাপটী তাঁর পাদুখানি জড়িয়ে ধরল। ব্রহ্মচারী সেই রাজ্যে প্রবেশ করলেন, আপনি প্রবেশদ্বারে দাড়িয়ে সাহস দিয়ে আমাকে ডাকলেন। আর, এক লাফে সাপটী পেরিয়ে আমি পৌছালাম আপনার কাছে।···অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।···

গোসাঁইজী বলিলেন ঃ স্বপ্নটী লিখে রেখো। অনেক সময়ে স্বপ্ন কাজে আসে।

বস্তুতঃ স্বপ্নটী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার মধ্য দিয়াই কুলদানন্দ প্রাপ্ত হইলেন নির্ভুল পথনির্দেশ। বুঝিলেন—দুর্গম, মহত্তর জীবনপথে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও কৃপালাভ প্রতিপদে অপরিহার্য।

অতঃপর, নিজের কয়েকটি 'দর্শন' বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। গোসাঁইজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন ঃ এসব বিষয় বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে নেই; শ্রদ্ধাবান দেখে শুধু সাধনের লোকের কাছে বলতে পার।

ঃ ব্রহ্মচারীর উপদেশে বড়দা আপনার কাছে দীক্ষা নিতে এসেছিলেন। পশ্চিমে গেলে দয়া করে তাঁকে···দর্শন দেবেন। গোসাঁইজী সম্মত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় এক মুসলমান ফকির। কীর্তন ও গুরুমাহাত্ম্য বর্ণনার পর গোসাঁইজীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। গুরুদেবের নির্দেশে কুলদানন্দ এবং আরো অনেকে বাহিরে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ফকির সাহেবের আর দর্শন পাইলেন না।

গোসাঁইজী বলিলেন ঃ ইনি একজন মহাপুরুষ। মানুষ চিনতে হ'লে সবাইকে আপনার চেয়ে বড় ব'লে মনে ক'রতে হয়। নিজেকে অধম আর সবাইকে অধম-তারণ ভাবতে হয়।···রাস্তার মুটে-মজুরকেও মহাত্মা ভেবে নমস্কার করতে হয়। তবেই মহাপুরুষদের কৃপায় জন্ম সার্থক হয়।···

পরিপূর্ণ বিনয় ও নিরহংকার ভাবের এই মহামূল্য উপদেশ দাগ কাটিয়া বসে কুলদানন্দের অন্তরে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মহাপ্রভুর মহামূল্য উপদেশ ঃ

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

কয়েকদিন পরে গোসাঁইজীর বাসায় গিয়া নৈশবৈঠকে যোগদান করেন। সমাধিস্থ অবস্থায় গদগদ কণ্ঠে গোসাঁইজী বলেন ঃ এক মহালীলা হবে—মহাত্মারা সব বের হ'য়েছেন।··মহাঝড় গিয়ে সাগরে প'ড়বে,···সমস্ত দেশবাসীকে ভাসাবে,···শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক ইংরেজও ভেসে যাবে। যাঁরা এই সাধনে আছেন তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ—তাঁরা ধন্য হ'য়ে যাবেন।···নামে রুচি গুরুতে ভক্তি তাঁদের হবেই।···ভয় নাই—ভয় নাই।···

ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পর্কে গোসাঁইজীর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী স্মরণীয়। এছাড়া কুলদানন্দের কর্ণে বাজে গুরুদেবের অভয়বাণী। ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব নিজের অজ্ঞাতেই তাঁহার অন্তর হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে থাকে। সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, ভয়ংকর এক দস্যু ছুটিয়া আসিতেই নিরুপায় অবস্থার মাঝে সহসা গোসাঁইজী উপস্থিত হইয়া তাহাকে হঠাইয়া দিলেন।··· এইভাবে নিদ্রায় ও জাগরণে গোসাঁইজী তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিতে থাকেন ;···তাঁহার প্রাণে সঞ্চারিত করেন নামে রুচি, সাধননিষ্ঠা ও গুরুভক্তি।···

জন্মাষ্টমী, ১২৯৫। গেণ্ডারিয়ায় আশ্রম-সঞ্চার করিলেন গোসাঁইজী। সংকীর্তন মহোৎসবে যোগদান করিলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবকে স্বহস্তে হরিলুট

দিতে দেখিলেন। কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত গুরুদেবের পাশে বসিয়া আজ প্রথম তাঁহার প্রসাদও পাইলেন। জনৈক গুরুভ্রাতা গুরুদেবের ভোজনপাত্র হইতে নিজেই প্রসাদ তুলিয়া লইলে বিস্মিত হইলেন তিনি। আশ্চর্য নিঃসংকোচ ভাব তো!

সন্ধ্যায় গুরুভ্রাতাদের সহিত বসিয়া আছেন। গোসাঁইজী বহুক্ষণ সমধিস্থ। অর্ধচেতন অবস্থায় অস্ফুটে তিনি বলেন: সাধনের সময় যিনি যা দেখেন কল্পনা নয়—এ সাধন এমন জিনিষ যে এসব দর্শন হবেই। প্রথমে ক্ষণস্থায়ী হ'লেও ক্রমে দেখা দেয় জীবন্ত মূর্তি—কথাবার্তা শোনা যায়, কথা ব'লে উত্তরও পাওয়া যায়।...

কুলদানন্দের মনে জাগে বিস্ময় ও আনন্দের আবেশ। মনে হয় নিজের দর্শন সম্পর্কেই গুরুদেবের এই অমিয় বাণী। সাধন-জীবনে তিনি লাভ করেন গভীর প্রেরণা। কিন্তু তাঁহার দর্শন যে এখনও চঞ্চল, অস্পষ্ট। অন্তরেও দেখা দেয় দুর্বার রিপুর উত্তেজনা, সেইসাথে দুঃসহ বিবেকদংশন।...তাহারও সমাধান মেলে গুরুদেবের গুরুগম্ভীর নির্দেশের মধ্যে: চিত্ত স্থির হ'লেই দর্শন পরিস্কার হয়। চিত্ত স্থির রাখতে হ'লে শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম ও সদাচার চাই। নামে রুচি ও চিত্ত নির্মল হ'লে বাসনা কামনা ত্যাগ হয়। তখন দর্শন প্রত্যক্ষ হ'তে থাকে। 'দর্শনের' অবস্থাই যোগের আরম্ভ।...

সাধনপথে অভিনব আলোক-সম্পাত!...সেই দীপ্তিতে তাঁহার মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই গোসাঁইজী বলেন: সংসারে সবাই প্রারব্ধের অধীন। যে যত চেষ্টা করনা কেন, প্রারব্ধ-কার্যের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধের উপর আধিপত্য অসম্ভব।...

বলিয়া বারদীর ব্রহ্মচারীর ক্ষেত নিঙড়ান ও শূকর তাড়াইবার দৃষ্টান্ত দিলেন। কুলদানন্দের মনে হইল, তবে কি অবিরাম আত্মসংগ্রাম ও সাধনপ্রচেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল?...নির্বিচারে শুধু প্রারব্ধের উপর নির্ভরতাই কি একমাত্র পথ?...

অমনি গোসাঁইজী বলিলেন: প্রারব্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্ত্রে দুটী উপায় আছে—বিচার ও অজপা সাধন। যখন যা কিছু ক'রবে, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ক'রবে। যাবতীয় কাজ নিষ্কামভাবে বা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হ'লেই প্রারব্ধ কর্ম শেষ হয়ে যায়। আর শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম ক'রলে আরো সহজে হয়।...

কুলদানন্দের সংশয় বাড়িয়া চলে। দিবারাত্র প্রয়োজনীয় কার্যে নিষ্কাম

ভাবের স্থান কোথায়? শৌচ, স্নানাহার ইত্যাদিও ভগবৎপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা মনে হইবে কিরূপে? শ্বাসপ্রশ্বাসে দশ মিনিটও নাম করা দুরূহ—অথচ অবিরাম নামই বা চলিবে কীপ্রকারে?…ভাবিয়া মনে নৈরাশ্য প্রকট হইয়া ওঠে যেন।…

কিছুদিন পরে হরকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা জলে ডুবিয়া ভবজ্বালা হইতে উদ্ধার পাইল। ইহার তিনদিন পূর্ব হইতে তিনি যেন দেখিতে পাইতেছিলেন মেয়েটীর মৃতদেহ।…তাঁহার অপর ভ্রাতুষ্পুত্রীও দুইদিন পূর্বে দেখে ঐরূপ দুঃস্বপ্ন। মনে মনে প্রশ্ন জাগে: কী তবে ইহার অর্থ? ইহাই কি প্রারব্ধ?…

এই সংশয় ও নৈরাশ্যের মাঝে আবার দেখা দিল রিপুর উত্তেজনা। অন্তরে প্রবল কামবেগ, আর বাহিরে অজস্র প্রলোভন।…এ অবস্থায় উপায় কী? তবে কি উপভোগের দ্বারাই দুর্বার কামরিপু শান্ত হইবে?…

সমাধানের জন্য গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন তিনি। গোসাঁইজী আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন: শুধু উপদেশ শুনে কী হবে?…সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা—এই তিনটী অভ্যস্ত হ'লে আর বড় উৎপাত থাকে না। এই তিনটে আগে অভ্যাস কর, সব উৎপাতের শান্তি হবে।…

কুলদানন্দ ভাবিয়াছিলেন, উৎপাত শান্তির একটা কিছু প্রণালী গুরুদেব বলিয়া দিবেন। কিন্তু সেই পুরাতন নীতির পুনরাবৃত্তিতে ভগ্নমনে বাসায় ফিরিলেন। সাধনপথে প্রথম সাফল্যের স্তরে মনে জাগিয়াছিল অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, ভাবিয়াছিলেন রিপুজয় নিতান্ত সহজসাধ্য। কিন্তু প্রবুদ্ধ যৌবনে দেখা দিল উদগ্র কামরিপু,…সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় ও হতাশা।…

তবু গুরুসঙ্গলাভ অব্যাহত রহিল। নানা উপদেশে ভারাক্রান্ত দেহমন ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একদিন নির্জনে গুরুদেবকে বলিলেন: সাধনের সময় যেসব দর্শন হ'ত এখন আর তা কিছুই হয় না।

: কেন, কোন অনিয়ম হয়েছে?

: অনিয়ম তো কতই হয়। তবে 'দর্শন' বন্ধ হবার মুল কারণ কী তা তো বুঝি না।

: অনেক রকম অনিয়ম এর কারণ—আহারাদির অনিয়মেও 'দর্শন' বন্ধ হয়।

কুলদানন্দ নিরামিষভোজী, কাহারও উচ্ছিষ্টগ্রহণও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু গোসাঁইজী বলেন: কারো লোভের বস্তু তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয়।

কোন তামসিক প্রকৃতির লোকের সঙ্গে একাসনে এমনকি একস্থানে ব'সে আহার করলেও নানা উৎপাত ও কামরিপুর উত্তেজনা দেখা দেয়। তাই খাবার জিনিষ ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করা উচিত—তাঁরই কৃপায় সব কিছু শুদ্ধ হয়।

ঃ আমি তো প্রতি গ্রাস নিবেদন করি—তাতে কি ইষ্টদেবতার কোন ক্ষতি হয়?

ঃ না—তাই তো করতে হয়। এজন্যে আহারের সময় অনেক ব্রাহ্মণ মৌন থাকেন। আহারটী সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন—প্রাণালী মত আহার ক'রতে পারলে তাতেই সব হয়। এখন যা পার ক'রে যাও—ক্রমে সবই জানবে, করতেও পারবে।

গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী আহার বিষয়ে খুব সতর্ক হইয়া চলিলেন তিনি।

আশ্বিনের শেষে কুলদানন্দের রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। স্কুল বন্ধ হওয়ায় বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু গুরুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সেখানে বিপদে রক্ষা করিবে কে? কয়েকদিন পূর্বে গুরুভ্রাতা শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছেন, ঘরে বসিয়াই আশ্চর্যভাবে গোসাঁইজীর চরণামৃত তাঁহার লাভ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, গুরুর চরণামৃত গ্রহণে সর্ব বিকারের শান্তি হয়।...ভবিষ্যতে নানা উত্তেজনা ও উৎপাতের আশঙ্কায় সুযোগমত গুরুদেবের পাদোদক গ্রহণ করিলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী সস্নেহে বলিলেন ঃ যত গোপনে ব্যবহার ক'রবে ততই উপকার পাবে। লোকের সামনে গ্রহণ করো না, আর কাউকে জানতেও দিও না।...

বাড়ী গিয়া বেশ কাটিল কিছুদিন। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে আবার দেখা দিল নানা উৎপাত ও চিত্তবিকার। উপর্যুপরি প্রলোভনে অন্তর বিক্ষুব্ধ হইল। গুরুতর আশঙ্কায় দেহ হইয়া পড়িল আরো দুর্বল। পড়াশুনা একেবারেই বন্ধ হইল—সাধন ভজনেও চিত্ত যেন বিমুখ, ললাটস্থ জ্যোতির্মণ্ডল অন্তর্হিত।... কুচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া, তবু তাহার বেড়াজাল হইতে পরিত্রাণ নাই।...

নিদারুণ হতাশায় ও অনুতাপে বারদীর ব্রহ্মচারীকে সবকিছু জানাইলেন তিনি। উত্তরে ব্রহ্মচারী জানাইলেন—সব আপদ দূর হবে, কোন ভয় নেই।... ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দর্শনে গেলে বলিলেন ঃ ধর্ম-ধর্ম ক'রে অস্থির হ'স না।... প্রারব্ধ শেষ কর—ধর্ম পরে লাভ হবে।

মনের অস্থিরতা তবু দূর হইল না। দেখা দিল আর এক নূতন অশান্তি। ঢাকায় ফিরিয়া হরকান্তের পত্রে জানিলেন—অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রাহ্মপ্রচারক

রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছেন, তবে নিয়মিত জপ করিয়া তিনি কিছু উপকার পাইতেছেন।...

দারুণ যন্ত্রণায় গোসাঁইজীর কাছে গেলেন কুলদানন্দ। বড়দাদার পত্রখানি হাতে দিলে হাসিমুখে গোসাঁইজী বলিলেন : এ তো বেশ হয়েছে।

: আপনি আগে দাদাকে একটু আশ্রয় দিলে এমনি বোধ হয় হ'ত না।

: ভগবানের ইচ্ছায় যা হয়, তা কি কখনও মন্দ হতে পারে ?

: না, তাঁকে কৃপা না করলে হবে না—আমি একা আপনার কৃপাভোগ করতে চাই না।...

: কেন, তাঁর কাজ তিনি করুন—তোমার কাজ তুমি কর।...

রুদ্ধকণ্ঠ কুলদানন্দের চক্ষে ফুটিল বেদনার অশ্রু ! নীরব প্রার্থনা জানাইলেন তিনি : দাদাকে শ্রীচরণে ঠাঁই না দিলে আমাকেও ছেড়ে দিন—দাদাকে ছেড়ে মুক্তিলাভও আমি চাইনা।...

বেদনাময় সেই প্রার্থনা অনুরণিত হইল গোসাঁইজীর অন্তস্থলে। ক্ষণকাল কুলদানন্দের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চক্ষু বুজিলেন। অনুগত শিষ্যের বিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহারও চোখে দেখা দিল মুক্তাবিন্দু।...অশ্রু মুছিয়া তিনি বলিলেন : দুঃখ ক'রোনা, তাঁকে আমার কাছেই আসতে হবে। এখন ঐ সাধন করুন, ওতে বেশ শিক্ষা হবে।...খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লেখ।...এতে তোমারও খুব উপকার হবে।

গোসাঁইজীর সমবেদনায় ও অশ্রুজলে অভিভূত হইলেন কুলদানন্দ। তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইল অভিনব প্রশান্তি।...দুইটী অন্তর যেন একই সূত্রে গ্রথিত,...একই ছন্দে স্পন্দিত।...

॥ চার ॥

গেণ্ডারিয়া আশ্রম। গোসাঁইজীর জন্য ভজন-কুটীর নির্মিত হইয়াছে। আম্রবৃক্ষের উত্তর-পূর্ব কোণে দক্ষিনদ্বারী ছোট কুটীরখানি। শহরের কোলাহল-মুক্ত নির্জন, মধুর পরিবেশ—সাধনভজনেরই অনুকূল। এখানে গোসাঁইজী বাস করিতেছেন সপরিবারে। অথচ তিনি আশ্চর্য নিরাসক্ত, বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক।...কুটীর মধ্যে উত্তরমুখী আসনে তিনি ধ্যানমগ্ন। সম্মুখে প্রজ্বলিত শুধু একটী ধুনী। কুলদানন্দের মনপ্রাণ ভরিয়া ওঠে বিমল আনন্দে, গভীর ভক্তিতে।

২রা পৌষ, ১২৯৫। আজ কুলদানন্দের সাধক-জীবনে তৃতীয় বৎসরের শুভযাত্রা। অপরাহ্নে তিনি গুরুসন্নিধানে গেলেন।

গোসাঁইজী বলিলেন : প্রাণায়ামের কাজ তোমাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী নিয়মরক্ষা করে চলতে চেষ্টা করবে।

গোসাঁইজী নিয়ম বলিলেন দশবিধ—দৃষ্টিসাধন, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, স্বাধ্যায়, সাধুসঙ্গ, দান ও তপস্যা।

কুলদানন্দের মনে হইল প্রত্যহ এই সকল নিয়মপালন একরূপ অসম্ভব, তবুও নিয়মগুলি অন্ততঃ একবার যেন স্মরণ হয়—গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন এই আশীর্বাদ।

রোগের প্রকোপ খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিনরাত অসহ্য যন্ত্রণা। পড়াশুনায় আর উৎসাহ নাই। একেবারে বন্ধ হইলে দাদারা কী বলিবেন এই যা আশঙ্কা।

অকস্মাৎ বড়দাদার পত্র আসিল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে তিনি পশ্চিমে যাইতে লিখিয়াছেন। অবাক হইলেন কুলদানন্দ। দুরবস্থার মধ্যেও ভগবানের কী আশ্চর্য কৃপা।...

মনে পড়িল গোসাঁইজীর কথা। বড়দাদার দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন : এতে তোমারও খুব কল্যাণ হবে। তুমি তা শিগ্রই জানতে পারবে।...সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত প্রণত হইল পরম শান্তির আধার গুরুদেবের শ্রীচরণে। প্রার্থনা জানাইলেন—চিরকালের মত লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়া সতত গুরুসঙ্গলাভ করিতে পারেন যেন।...পশ্চিমে যাইবার অনুমতি লাভের জন্য চলিলেন গোসাঁইজীর ভজন-কুটীরে। শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট জানিলেন, দিনরাতই গোসাঁইজী আসনঘরে সমাসীন। পঞ্চমুণ্ডাসনে একমাসের জন্য কঠোর সাধনায় তিনি নিমগ্ন, সমাধিস্থ। এখন নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত তাঁহার দর্শনলাভ দুরূহ।

তবু গুরুদেবের দর্শন প্রত্যাশায় তিনি ভজন-কুটীরে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন গোসাঁইজী। চমৎকৃত কুলদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন : তোমার শরীর তো খুব কাতর দেখছি—এখন কী করবে স্থির করেছ ?...

: দাদা পশ্চিমে যেতে লিখেছেন। তাই কি যাব ?

: তোমার পক্ষে এখন তাইতো উচিত। এবার বুঝি পরীক্ষা ?

: হ্যাঁ. এবারেও না পারলে আর পরীক্ষা দেওয়া হবেনা।

: শরীর নষ্ট হ'লে পাশ দিয়ে কী করবে ?···স্কুলে না পড়েও বিদ্যালাভ করা যায়। তুমিও তাই কর।···তোমার দাদার কাছে চলে যাও, শরীর মন ভাল থাকবে। খুব ভাল লোকের দর্শনও পাবে।

একটু পরে আবার বলিলেন : এই সাধনের কোন কথা তোমার দাদাকে ব'লনা। আর, তাঁকে সাধনের মধ্যে আনবার চেষ্টা ক'রোনা।···আমাদের এ সাধন প্রচারের বস্তু নয়। যাঁর প্রয়োজন, ভগবানই সময় মত তাঁর নিকটে প্রচার করেন।···

অবশেষে আসন ও দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ধ্যান করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন : এই আসনে অম্ল, বাত, পিত্ত, ইত্যাদি দূর হয়। আরও অনেক উপকার হয়। অভ্যাস করলে ক্রমে সব জানবে।

পরদিন হরকান্তের আর একখানি চিঠি আসিল। লিখিয়াছেন—তিনি ল্যাঙ্গাবাবার আশীর্বাদ পাইয়াছেন ; নামজপে নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া যান, আনন্দে অজ্ঞানের মত হইয়া পড়েন।···

চিঠি লইয়া গোসাঁইজীর কাছে গেলেন কুলদানন্দ। শুনিলেন তিনি খুব অসুস্থ, আজ আর দেখা হইবে না। আমগাছের কাছে বসিয়া তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দর্শনও মিলিল—গোসাঁইজী ডাকিয়া পাঠাইলেন। পত্র শুনিয়া বলিলেন : সুন্দর অবস্থা !···ল্যাঙাবাবা খুব উঁচু দরের সিদ্ধপুরুষ। তাঁর দৃষ্টির ফল অবশ্যই পাবেন।···

গুরুদেবকে অসুস্থ দেখিয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিলেন কুলদানন্দ। কিন্তু অন্তরে দেখা দিল ক্রন্দনের আবেগ। বলিলেন : ভিতরে দারুণ দুরবস্থা ! এতকাল আপনার কাছে ছিলাম ; এখন কোথায় কী অবস্থায় গিয়ে পড়ব, কখন কী করে ফেলব, কে জানে !···

সঙ্গে সঙ্গেই গোসাঁইজী বলিয়া উঠিলেন : তুমি তো এখন গর্ভস্থ সন্তান।··· তোমার আবার চিন্তা কী !···

তিনি বুঝাইয়া বলিলেন—গর্ভিণী যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা টের পান, সদ্‌গুরুও তেমনি শিষ্যের সমস্ত অবস্থা জানিতে পারেন। মাতার আহার হইতেই গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি—তেমনি গুরুর উন্নতিতেই শিষ্যের উন্নতি। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেও মাতাই তাহাকে লালন পালন করেন, বড় না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে চোখে চোখে রাখেন। কিন্তু শিষ্য সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলেও সদ্‌গুরু তখনও

তাঁহাকে শিশুর মত কোলে করিয়া রাখেন,…সর্বদা সকল বিষয়ে শিষ্যের সুখ সুবিধা দেখেন।…

সাধন গ্রহণের দুই বৎসর পরে আজ কুলদানন্দ শুনিলেন পরম আশ্বাসবাণী। দীক্ষালাভ করিয়া রীতিমত সাধনভজন করিবার মত নিষ্ঠাবান সাধকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। কিন্তু কুলদানন্দের সাধক-জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি সেই মুষ্টিমেয় সাধকের অন্তর্ভূক্ত। এইজন্য সাধনপথে নানা বাধাবিপত্তিতে তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। সাময়িক নৈরাশ্য ও অবসাদে মনে হইয়াছে, এই সাধন গ্রহণ তাঁহার পক্ষে নিরর্থক ; কিন্তু পরক্ষণে চিত্তে জাগিয়াছে নব আশা, নূতন বল।…

যৌবন-সায়রে দুর্বার প্রলোভন ও উত্তেজনার তরঙ্গাঘাতেও চলিয়াছে তাঁহার অবিরাম সংগ্রাম। আজ গুরুদেবের আশ্বাসবাণীতে প্রাণে সঞ্চারিত হইল অভিনব শক্তি। তিনি অনুভব করিলেন সাধনপথে তিনি একক নন – গুরুর নির্দেশ, উপদেশ ও কৃপাই তাঁহার প্রধান পাথেয়। আত্মপ্রচেষ্টা গৌণ, গুরুশক্তি এখানে মুখ্য।…একাধারে মাতা ও পিতার ন্যায় গুরুই তাঁহার ধারক ও বাহক—প্রতিপালক ও পরিচালক।…চাই শুধু অখণ্ড বিশ্বাস, অনন্ত নির্ভরতা।…

দ্বিতীয়তঃ, সাধক-জীবনের অগ্রগতি গুরুশক্তি সাপেক্ষ হইলেও সাধনের সার্থকতা তিনি নূতন করিয়া অনুভব করেন। ভ্রূণের পুষ্টি ও জীবনধারণ তাহার চেষ্টাসাধ্য নয় বটে ; কিন্তু তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন গর্ভিণীর পক্ষে ক্লেশদায়ক। সন্তান যত স্থির থাকিবে গর্ভিণীর পক্ষে ততই শান্তি।…ইহা হইতে এই ধারণা ও বিশ্বাস কুলদানন্দের মনে বদ্ধমূল হয় ঃ তাঁহার প্রতি কার্য, প্রতি পদক্ষেপ শ্রীগুরু কর্তৃক অনুভূত—সুতরাং অনিয়মে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিলে তাহাতে গুরুদেবের যন্ত্রণা দেখা দিবে ; আর যতই নিয়ম ও সদাচারে থাকিয়া সাধনভজন করিবেন, ততই গুরুদেবের শান্তি ও আনন্দ।…এইজন্য তিনি লিখিয়াছেন ঃ নিজের উন্নতির জন্য সাধনভজন নয় ; গর্ভধারিণী জননীকে আরামে রাখাই নিয়মনিষ্ঠা ও সাধনভজনের উদ্দেশ্য।'…এইরূপ চিন্তাধারার জন্য তাঁহার সাধন-জীবনে দেখা দিল নব অধ্যায়ের শুভ সূচনা।

গোসাঁইজীর নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন কুলদানন্দ। স্বপ্ন দেখিলেন ঃ যেন মেজদাদার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। কিসে দুঃসহ জ্বালার শান্তি হয় মেজদাদা জিজ্ঞাসা করিলে গোসাঁইজীর আশ্রয় নিতে বলিলেন

তিনি। গোসাঁইজী দীক্ষা দিবেন কিনা মেজদাদার এই আশঙ্কায় বলিলেন: তিনি বড় দয়াল, প্রার্থী হলে নিশ্চয়ই দেবেন।...পরে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মনে দেখা দিল নূতন আনন্দ। তবে কি মেজদাদারও পরিবর্তন আসন্ন?...

পশ্চিমে যাইবার অনুমতি লইবার জন্য কয়েকদিন পরে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। গুরুদেব অসুস্থ শুনিয়া দরজার বাহিরে প্রণাম করিলেন। অমনি তাঁহাকে ডাকিয়া নিজ আসনের একপাশে বসাইলেন গোসাঁইজী। আজ রাত্রে রওনা হইবার কথা শুনিয়া বলিলেন: মাত্র একদিন কলকাতায় থেকো।...তোমার মেজদা বুঝি মুঙ্গেরে আছেন? মুঙ্গের বড় সুন্দর স্থান। এখন কিছুকাল গিয়ে তাঁর কাছে থাক। সেখানেই এখন তোমার থাকা প্রয়োজন।...

কী এমন প্রয়োজন!...তবে কি তাঁহার স্বপ্নদর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এই নির্দেশের?...মেজদাদার উপর তবে কি শ্রীগুরুর কৃপা হইয়াছে?...

মুঙ্গের হইতে ফয়জাবাদ যাইবার নির্দেশ দিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: উৎসাহের সঙ্গে সাধনভজন ক'রো—তাহলে সব বুঝতে পারবে। কোন চিন্তা ক'রোনা। ভয় কী!...

শ্রীগুরুর নিশ্চিত অভয়বাণী। অন্তরে ধ্বনিত হয় কয়েকদিন আগেকার কথা: তুমি তো এখন গর্ভস্থ সন্তান—তোমার আবার চিন্তা কী!...না—আর কোন চিন্তা, কোন ভয় নাই। সব ভয়-ভাবনাই সমর্পণ করিয়াছেন গুরুদেবের শ্রীচরণে—সত্যই তিনি নির্ভয়...একেবারে নিশ্চিন্ত।...

গোসাঁইজীর চরণামৃত লইয়া তিনি বিদায় হইলেন কুলদানন্দ।

পৌষ মাস, ১২৯৫। শুভক্ষণে ব্রাহ্মমুহূর্তে পশ্চিমে রওনা হইলেন কুলদানন্দ।

নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে একটী দীনা নীচজাতীয়া বৃদ্ধার কলেরা দেখা দিল; ষ্টীমার কর্তৃপক্ষ তাহাকে চড়ার উপর ফেলিয়া দিবে স্থির করিল। সকলকে সচকিত করিয়া বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এক মেমসাহেব। তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় রোগিনী সুস্থ হইল।

চমৎকৃত কুলদানন্দ মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ করিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—যিশু অবতার নন, একজন মহাপুরুষ। মেমসাহেব বলিলেন-সত্যের সন্ধান তর্কে নয়, বিশ্বাসে; যিশুকে বিশ্বাস করিলেই তাঁহাকে জানা যায়।...ভক্তিমতীর কথা কয়টী খুব ভাল লাগিল কুলদানন্দের।

কলিকাতায় পৌঁছাইয়া বিধুভূষণ মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত কুলদানন্দের সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সকলেই ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম—কিছুকাল পূর্বে গোসাঁইজীর কাছে সাধন লইয়াছেন। কুলদানন্দ আলাপে বুঝিলেন গুরুর উপর তাঁহাদের অসাধারণ ভক্তি। কীভাবে কামভাব ও উত্তেজনা দূর হইয়াছে, সেই বিষয়ে গুরুদেবের কৃপার বিবরণ দিলেন সতীশচন্দ্র। তিনিই ছিলেন 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক ও 'ডন' সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা।

গোসাঁইজী কুলদানন্দকে কলিকাতায় থাকিতে বলিয়াছিলেন মাত্র একদিন; কিন্তু তিনি দুইদিন থাকিয়া রওনা হইলেন। রাত্রি ১২টায় মুঙ্গের যাইয়া ফলও পাইলেন হাতে হাতে। এক্কাগাড়ীতে মেজদাদার বাসায় পৌঁছাইয়া শুনিলেন, তিনি পূর্বদিন অন্য বাসায় উঠিয়া গিয়াছেন। একঘণ্টা বৃথা ঘুরিলেন—রাত ২টায় এক্কাওয়ালা নামাইয়া দিল পথের মধ্যে। বাধ্য হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। একটু পরেই একটি লোক তাঁহাকে নূতন বাসা দেখাইয়া দিল। তুচ্ছ ঘটনার মধ্যদিয়াও গুরুকৃপা ও তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে মেজদাদার সহিত গেলেন কষ্টহারিণীর ঘাটে। গঙ্গার উপরই অতি সুন্দর ঘাট। কত স্নানার্থীর পাপতাপ ধুইয়া মুছিয়া আপন ছন্দে নাচিয়া চলিয়াছেন কলনাদিনী জাহ্নবী। অপর পারেই শ্রেণীবদ্ধ পর্বতমালা—ধ্যানমৌন মহাদেবের অপরূপ জটারাশি যেন।...ঘাটে বসিয়া আত্মস্থ হইয়া গেলেন কুলদানন্দ।...

রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিলেন—ঘাটের ধারে বহুকালের একটা পুরাণো পাকা পথ গঙ্গার ভিতর নামিয়া গিয়াছে। ঐ বিভীষিকাময় পথে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; বারদীর ব্রহ্মচারী উপস্থিত হইয়া জানাইলেন কয়েকজন মহর্ষি ও প্রধান যোগী গঙ্গার নীচে আশ্রম করিয়া আছেন। গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যদিয়া অগ্নিময় আর একটী পথও তাঁহাকে যেন দেখাইলেন ব্রহ্মচারী।...পরদিন মেজদাদার সহিত ঘাটে গিয়া বিস্ময়ভরে দেখিলেন ঘাটের অদূরে সত্যই একটী গুপ্ত পথ গঙ্গার নীচে প্রবেশ করিয়াছে। অপর পারে পাহাড়ের মধ্যেও একটী চঞ্চল অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন।

মেজদাদার সহিত অতঃপর তিনি বেড়াইতে গেলেন পীরপাহাড়ে। ইহা অপূর্ব শক্তিশালী এক সিদ্ধ ফকিরের সাধনপীঠ ও কবরস্থান। এই স্থানের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি গোসাঁইজীর কাছে কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। আজ

কবর প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলেন এবং নাম করিয়া একটা বিশেষ অনুভূতি লাভ করিলেন। এমনি নির্জনে পাহাড়-পর্বতে থাকিয়াই সাধনভজন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন গুরুদেবের চরণে।

পীরপাহাড় হইতে গেলেন সীতাকুণ্ডে। কয়েক হাত দূরেই রামকুণ্ড ও ভরতকুণ্ড। এখানে আসিয়া সহসা মনে পড়িল পিতৃপুরুষের কথা। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি চিরদিনই তাঁহার নিকট কুসংস্কার। তবু কুণ্ডে স্নানান্তে পিতৃপুরুষদের স্মরণ করিয়া জলদান করিতেই অব্যক্ত ভাবে অভিভূত হইলেন—অনুভব করিলেন একটা অপূর্ব শক্তি।...মনে পড়িল গুরুদেবের কথা ঃ প্রথমে ওখানে গিয়ে থাক—বেশ উপকার পাবে।...

মেজদাদার দীক্ষা সম্পর্কিত তাঁহার স্বপ্নটীও বাস্তবে রূপায়িত হইল। তাঁহার কথামত বরদাকান্ত গোসাঁইজীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। উত্তর আসিল—আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।...আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের নির্দেশে এখানে আসিবার প্রয়োজন এতদিনে অনুভব করিলেন। দীক্ষাগ্রহণ হইতে আজাবধি সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলেন সবকিছুর অন্তরালে গুরুশক্তিই নিয়ত ক্রিয়াশীল।...প্রথম হইতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন—গোসাঁইজীর প্রভাবেই ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে সত্যধর্মের প্রতি অন্তরে জাগে অবিচল শ্রদ্ধা। দীক্ষাপ্রাপ্তিও তাঁহার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন। গুরুদেবের আলাপ, আচরণ ও কর্মধারার মধ্যে পৌত্তলিকতার পরিচয় পাইয়া কত দুঃখবোধ করিয়াছেন, পরোক্ষে জানাইয়াছেন কত প্রতিবাদ। অথচ গোসাঁইজী ধীরে ধীরে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন সর্বধর্মের সমন্বয়ের পথে।...ফলে ব্রাহ্মধর্মের সাম্প্রদায়িক ভাব আজ তাঁহার নিকট যেন অন্তর্হিত। আবার হিন্দুশাস্ত্রের অনেক নির্দেশ পূর্বে কুসংস্কার বলিয়া মনে হইলেও বর্তমানে সদাচারের মর্যাদায় গ্রহণযোগ্য।...এছাড়া, সর্ব প্রলোভন ও উত্তেজনার মাঝে মনে হয় শ্রীগুরু একমাত্র ত্রাণকর্তা।...পরম স্নেহে, সুনিশ্চিত অভয়বাণীতে শ্রীগুরুই আজ তাঁহার প্রাণপ্রিয়,...জীবনপথে সার্থক পরিচালক।...

মুঙ্গেরে আসিয়া জলবায়ুর গুণে, প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের ফলে দেহ অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় মনেও শান্তি আসিয়াছে। সাধন-ভজনে দেখা দিয়াছে নূতন উৎসাহ। শেষরাত্রে উঠিয়া তিনি প্রাণায়াম ও কুম্ভক করেন, প্রত্যুষে হাতমুখ ধুইয়া আসনে বসেন। ৭৷৷০টা পর্যন্ত চলে ত্রাটক সাধন।

পরে মেজদাদার সঙ্গে চা-পান করিয়া আবার ৯৷৷৹টা পর্যন্ত করেন নাম-সাধন। ১০৷৷টায় স্নানাহার শেষ করিয়া স্থিরভাবে আসনে বসিয়া নাম করেন ৪৷৷টা পর্যন্ত। স্কুলের কাজ সারিয়া মেজদাদা বাসায় আসিলে কথাবার্তায় সময় কাটে। রাত্রি ৯৷৷টায় আহারান্তে নিদ্রা না আসা পর্যন্ত নাম-সাধন করেন। এইভাবে সাধনভজনে সারাদিন কাটিয়া যায়।

গোসাঁইজীর নিকট কুলদানন্দ শুনিয়াছিলেন মানুষের মতই বৃক্ষাদি অনুভূতি-শীল। এইজন্য প্রায় দুই বৎসর কোন বৃক্ষের পাতা বা ফুল ছেঁড়েন নাই। এমনকি তরকারী কুটীতে দেখিলেও প্রাণে কেমন একটা বেদনা জাগিত। ছাদে কতকগুলি ফুলগাছে প্রত্যহ জল দিতেন। পাশের বাড়ীর ছাদেও ছিল কতকগুলি সুন্দর ফুলগাছ। তাঁহার মনে হইত, দুই ছাদেই ফুলগাছের শোভা কত মনোরম। একদিন শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—পাশের বাড়ীর ছাদে তিনটী ফুলগাছ অকস্মাৎ নড়িয়া উঠিল এবং আকণ্ঠ পিপাসায় তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিল। বলিল, জল না-হইলে তাহারা বাঁচিবেনা।...পাশের বাড়ী যাইতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় চাকরাণীকে তিনি প্রচুর জল দিতে বলিলেন। তবু চতুর্থ দিনে সেই সতেজ ফুলগাছ তিনটী শুকাইয়া যাওয়ায় মনে দেখা দিল অনুতাপ। তবে কি কোন পরলোকগত আত্মা বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পিপাসার জল চাহিয়াছিলেন? ...ভাবিয়া গাছ তিনটীর উদ্দেশে ছিটাইয়া দিলেন তিন গণ্ডুষ জল। প্রাণ অনেকটা শান্ত হইল।...

আর একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন: ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটী জনাকীর্ণ বাজারে তিনি উপস্থিত। নদীর ঘাটে অসংখ্য ছোটবড় নৌকা। গোসাঁইজী শিষ্যবর্গসহ তাঁহাকে লইয়া এক বজরায় রওনা হইলেন গঙ্গাসাগরে। অন্য একজন মহাত্মা তাঁহার ছোট নৌকায় শিঘ্র যাইবার জন্য ডাকিলেন—কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। গোসাঁইজী পাল তুলিয়া দিতেই উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিল প্রকাণ্ড বজরা—ছোট নৌকাটীর পূর্বেই গঙ্গাসাগরে পৌছাইল। চড়ায় নামিয়া সানন্দে স্নানাহার করিলেন সকলে। পরে ছোট নৌকায় সেই মহাত্মাও উপস্থিত হইলেন। ভগবৎলাভের সহজ উপায় সম্বন্ধে সেই মহাত্মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। নামই যে একমাত্র অবলম্বন এই কথা জানাইয়া মহাত্মা বলিলেন: তোমার আবার চিন্তা কী? সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়ছ, তাঁর উপদেশ মত চললেই সহজে ভগবৎলাভ হবে। তোমার গুরুদেবের অজ্ঞাত কিছুই নাই।...

ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি কৃতার্থবোধ করিলেন। এমনি অপূর্ব স্বপ্নের মধ্যদিয়াও

মহাত্মারা কীভাবে গুরুনিষ্ঠার উপদেশ দেন সবিস্ময়ে তাহা ভাবিতে থাকেন। নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিবার সার্থকতা উপলব্ধি করেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে প্রত্যহ গিয়া বসেন কষ্টহারিণীর ঘাটে। গঙ্গার সুস্নিগ্ধ হাওয়ায়, মনোরম পরিবেশে দেহমনে দেখা দেয় মধুর শান্তি। ঘাটের উপরেই সাধুদের ভজনালয়—সাধু-সন্ন্যাসীরা সর্বদাই ধ্যানমগ্ন। ঘাটের উপরে কষ্টহারিণী দেবী প্রতিষ্ঠিতা। সাধনভজনের উৎকৃষ্ট স্থান। স্থানমাহাত্ম্যে দূর হইয়া যায় সর্ব দুঃখতাপ। এখানে বসিয়া নাম করেন সন্ধ্যা পর্যন্ত।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি দেখিলেন আর একটী অদ্ভুত স্বপ্ন : গুরুভ্রাতাদের সহিত যেন গঙ্গাস্নানে উপস্থিত। সহসা দ্রুতবেগে আবির্ভূত হইলেন গোসাঁইজী। চঞ্চল দৃষ্টিতে এক এক জনকে ধরিয়া কী যেন বলিলেন—তাঁহার দিকে আসিতেই কেমন একটা ভয় দেখা দিল। তাঁহাকে ধরিয়া গোসাঁইজী বলিলেন : শীঘ্র ন্যাংটা হও, তোমার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেই—একটা দুর্লভ অবস্থা লাভ হবে।...উত্তেজনায় অস্থির হইয়া তিনি একটু সময় চাহিলেন—গুরুদেব বারংবার উলঙ্গ হইতে বলিলেও সঙ্কোচভরে পারিলেন না। আবার আসিব বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন গোসাঁইজী।... অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলেন নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিবার শক্তি ও নিষ্ঠা এখনও জন্মে নাই। স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন বড় অস্থির হইল।

মুঙ্গেরে কাটিল দুইমাস। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উপলক্ষে এখানে আসিয়া গোসাঁইজীর ধর্মজীবনে দেখা দেয় অনুপ্রেরণা। কষ্টহারিণী ঘাটের সংস্পর্শে তাঁহারও দেহমনের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল। সৌন্দর্য ও মাধুর্যরসে মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। সাধনভজনে বিশেষ উপকার অনুভব করিলেন। এখানকার স্বপ্নদর্শনগুলি তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আসিবার পশ্চাতে ছিল শ্রীগুরুর আশীর্বাদ। সবদিক দিয়া আপন বৈশিষ্ট্যে মুঙ্গের তাঁহার কাছে স্মরণীয়। এখানে আগমন ও অবস্থিতি তাঁহার পক্ষে সবিশেষ কল্যাণপ্রদ।...

বি-এল পরীক্ষা দিবার সুবিধার জন্য মেজদাদা কলিকাতা হেয়ার স্কুলে বদলী হইলেন। কুলদানন্দ ভাগলপুর গিয়া উঠিলেন ভগ্নিপতি মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায়। খঞ্জরপুরে গঙ্গার ঠিক উপরেই এই বাসা—নাম 'পুলিনপুরী'। এমনি নির্জন, মধুর পরিবেশে কাটিল ফাল্গুন ও চৈত্র। সৎসঙ্গ ও সাধনভজন ভালই হইল। কিন্তু শরীর পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িল।

বৈশাখ, ১২৯৬। দৈহিক অসুস্থতায় গেলেন ফয়জাবাদে বড়দাদার কাছে। বড়দাদা সরকারী হাসপাতালের এসিসটেণ্ট সার্জেন—বিস্তৃত প্রাঙ্গনে হাসপাতালের পাশেই তাঁহার দ্বিতল বাসভবন। দাদার সঙ্গে ধর্মালোচনায় দিন কাটিতে লাগিল। ঔষধে ব্যাধির উপশম অসম্ভব বুঝিয়া সদাচারে স্বভাবের উপরেই থাকিবার পরামর্শ দিলেন হরকান্ত।

গোসাঁইজী বলিয়া দিয়াছেন ফয়জাবাদে, অযোধ্যায় মহাপুরুষেরা সর্বত্রই বিচরণ করেন ছদ্মবেশে। সেই কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যহ সকাল-বিকাল বেড়াইবার সময় সকলকেই মনে মনে প্রণাম করেন কুলদানন্দ। ভগবানের কৃপায় ক্রমে কয়েকজন মহাত্মার দর্শন পাইলেন। তাঁহাদের অযাচিত কৃপায় তাঁহার অযোধ্যা আগমন সার্থক মনে হইল। সঙ্গপ্রভাবে গুরুদেবের প্রতি দেখা দিল আন্তরিক আকর্ষণ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা। মন স্বতই নিবিষ্ট হইল সাধনভজনে, অন্তরে জাগিল সহজ-সুন্দর বৈরাগ্য।

চারিমাস যাবৎ তিনি গুরুদেবের মধুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত। গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্য তাঁহার প্রাণে জাগিল ব্যাকুলতা। গুরুকৃপায় সুযোগও মিলিল—বিশেষ কাজে বড়দাদা বাড়ী যাইতে বলিলেন তাঁহাকে। সাগ্রহে তিনি রওনা হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন গুরুদেব সেখানেই আছেন। তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য ঝামাপুকুরে মেজদাদার বাসায় উঠিলেন।

অপরাহ্নে সুকীয়া ষ্ট্রীটের ছোট দ্বিতল বাড়ীতে গেলেন গোসাঁইজীর দর্শনে। অন্যান্য শিষ্যবর্গের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। কুলদানন্দকে দেখিয়াই ডাকিয়া কাছে বসাইলেন গোসাঁইজী। পরম স্নেহভরে বলিলেন: কি—অযোধ্যা থেকে এলে?…ভাল ভাল সাধু মহাত্মার দর্শন পেয়েছ তো?

: হ্যাঁ, কয়েকজন মহাত্মার দর্শন পেয়েছি।

: তাঁদের সম্বন্ধে যতদূর জেনেছ, বলতো শুনি।

সাধু-মহাত্মাদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিলেন কুলদানন্দ। ফয়জাবাদে প্রথমে দর্শনলাভ করেন সিদ্ধপুরুষ ল্যাঙ্গাবাবার। সরযূনদীর তীরে নির্জন বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে তাঁহার আসন। একদিন গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশে জ্বলন্ত ধুনীর মধ্যে পড়িয়া ভীষণভাবে তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁহার সকাতর প্রার্থনায় মহাবীর আবির্ভূত হইয়া জ্বলন্ত ধুনীর উপর তাঁহাকে বসাইলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। ধুনীর বিভূতি তাঁহার সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া মহাবীর আদেশ

করেন ঃ আসন কোভি মৎ ছোড়না—সিদ্ধ বন্ যাও।…ক্যানটনমেণ্টের মাঠে সৈন্যদের গোলাগুলি ছুঁড়িবার সময়েও তিনি আসন ত্যাগ করেন নাই; চতুর্দিকে অজস্র গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও একটীও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে নাই। স্তম্ভিত কর্ণেল ক্রলী সসম্ভ্রমে প্রণত হন তাঁহার চরণে।…বাবাজীকে প্রায়ই দর্শন করিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস লাভের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেন কুলদানন্দ। সস্নেহে বলিতেন বাবাজী ঃ আরে তোম্‌তো ভগবানকা আশ্রয় লিয়া হ্যায়।…ভক্তি বিশ্বাস দেনেওয়ালা ওহি হ্যায়। পুরা বন্ যায়েগা। আনন্দ্ কর—আনন্দ্ কর।…

ইহার পর কুলদানন্দ বলিলেন পতিতদাস বাবাজীর কথা। তাঁহার দর্শন পাওয়া বড়ই কঠিন। একদিন আশ্রমে গিয়া দেখিলেন ভজন-কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। বাহিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই দরজা খুলিয়া সস্নেহে ডাকিলেন বাবাজী। বলিলেন ঃ আঃ! ধন্য হো গিয়া!…দুর্লভ সদ্‌গুরুকা আশ্রয় পায়া!…কিসে কল্যাণ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন ঃ আউর ক্যা বাচ্চা? সব তো পূরণ হো গিয়া। ওহি কালাকো ধ্যান কর্।…দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ বাবাজীর বয়স প্রায় দেড়শত বৎসর। কথায় কথায় ঝরিয়া পড়ে তাঁহার ভক্তিঅশ্রু।

গোসাঁইজী বলিলেন, বাবাজী তান্ত্রিক সাধনে সিদ্ধ, মহাপ্রেমিক। অতঃপর রঙ্গমহলে হনুমান গৌরীতে কোন সাধুর দর্শন পাইয়াছেন কিনা তিনি জানিতে চাহিলেন। কুলদানন্দ বলিলেন গোপালদাস বাবাজীর কথা। একদিন হরকান্ত শুনিলেন রঙমহলে একটী সাধু কাণের যন্ত্রণায় অস্থির। দাদার সহিত গেলেন কুলদানন্দ। রঙমহলে তাঁহারা একটী অন্ধকার কুঠরিতে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্তী ভূগহ্বর হইতে বাহিরে আসিলেন বাবাজী। কাণের ময়লা বাহির করিলে তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইল। বাবাজীকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ চাহিলেন কুলদানন্দ। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন বাবাজী ঃ বাচ্চা, বহুৎ ভাগ্‌মে রামজীকা আশ্রয় পায়া। আবু নাম করো, আউর আনন্দ্ করো।…

অযোধ্যায় সরযূতীরে একটী মন্দিরে প্রসিদ্ধ সাধু তুলসীদাস বাবাজীরও তিনি দর্শনলাভ করেন। বাবাজী সর্বদাই নামজপে মগ্ন। কাহাকেও তিনি কোন উপদেশ দেননা। শুধু বলেন 'নাম কর, নাম কর'।

ফরক্কাবাদে বেগমগঞ্জে গোপনে আছেন এক মহাত্মা। পূর্বে কোন রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, বিষম অনর্থের সূচনায় রাজ্যত্যাগ করেন। আকস্মিক বিপদে তিনি অন্ধ হইয়া যান। বহু শাস্ত্র, পুরাণ-দর্শনে তিনি অগাধ পণ্ডিত। কুলদানন্দ

তাঁহার দর্শনে গেলে অন্ধ বাবাজী বলেন : কঠোর সাধন ও তীব্র বৈরাগ্য না হলে কিছুই হয়না—সদাচারে থাকিয়া সদ্‌গুরুর নির্দেশে সাধনভজন করিলে গুরুকৃপায় তাঁহার ইহলোক, পরলোক এক হইয়া যায়।

গোসাঁইজীর সঙ্গে নানা কথাবার্তার পর বাসায় আসিলেন কুলদানন্দ। কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া প্রত্যহ গুরুর সঙ্গলাভ করিতে থাকেন।

॥ পাঁচ ॥

অগ্রহায়ণ মাস, ১২৯৬। কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থানের পর বাড়ী গেলেন কুলদানন্দ। কিন্তু রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অল্পদিন পরেই আবার চলিয়া আসিলেন ভাগলপুর। আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত এখানেই থাকিবার সংকল্প করিলেন।

গোসাঁইজীর মধুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার এত কালের দিনলিপি লিখিবার উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসিল। বহুকাল পরে বন্ধ হইল ডায়েরী লেখা। ভাবিলেন, গুরুদেবের দুর্লভ সঙ্গলাভ হইলেই আবার লেখা আরম্ভ করিবেন।

লেখা বন্ধ রহিল মাঘ মাস পর্যন্ত। তাঁহাকে ডায়েরী লিখিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন স্বয়ং গোসাঁইজী এবং বারদীর ব্রহ্মচারী। জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী আলোচনায় ভাবীকালে কল্যাণ হইবে হয়ত তাঁহারই। মনের চঞ্চলতা ও উত্তেজনায় মাঝে মাঝে দেখা দেয় দারুণ হতাশা। মনে হয় ডায়েরী লেখা নিরর্থক। কিন্তু অন্তরে গুরুদেবের মমতাপূর্ণ পবিত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ; অতএব পতনের আশঙ্কা অমূলক।...বরং গুরুদেবের অনন্ত কৃপা-বিস্মৃতিই গুরুতর অপরাধ—অধঃপতনের নিশ্চিত পূর্বাভাষ।...সেই দুর্দিনেও দিনলিপির মাধ্যমে অবশ্যই দেখা দিবে আত্মচেতনা। গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টির স্মৃতি প্রস্ফুটিত হইবে মনোহর শতদলে।... ভাবিয়া গুরুদেবের নাম স্মরণ করিয়া আবার তিনি ডায়েরী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভাগলপুরে গঙ্গার উপর থাকিয়াও রোগযন্ত্রণার উপশম নাই। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল দুশ্চিন্তা ও হতাশা। তবু একটা নিয়মের মধ্যদিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। গুরুকৃপায় ভজনানন্দী সৎসঙ্গীও লাভ হইল। তাঁহাদের মধ্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হরিমোহন চৌধুরী

এবং পরম সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, ভক্ত গায়ক মহাবিষ্ণু যতি অন্যতম। তাঁহারা জাহ্নবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে প্রথমতঃ তিনি উহাকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার উপরে বাসস্থান হইলেও গঙ্গাস্নান করিতেন না। পরে ইঁহাদেরই অনুরোধে একসঙ্গে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলেন। ফলে কয়েকদিনেই বেশ উপকার পাইলেন, সমস্ত অবসাদ কাটিয়া গেল। দেহমনে দেখা দিল স্নিগ্ধতা ও প্রফুল্লতা। একটা পবিত্রভাবেও অন্তর পূর্ণ হইল—স্নানের সঙ্গে সঙ্গে আপনিই নাম চলিতে লাগিল যেন।

ক্রমে দেখা দিল জাতি ও বংশগত সংস্কার। মনে জাগিল পতিতপাবনী গঙ্গার প্রশস্তি ও মাহাত্ম্য। তিনি অনুভব করিলেন—পিতা, পিতামহ ও পূর্বপুরুষগণ, কত যোগিঋষি, কত পরলোকগত আত্মা মোক্ষদায়িনী গঙ্গাদেবীর স্তবস্তুতি করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রত্যহ স্নানের সময় অভিভূত আনন্দে তিনি গঙ্গোদক সিঞ্চন করিতে লাগিলেন তাঁহাদের উদ্দেশে। আর, মনে হইতে লাগিল—দেব-দেবী, মুনিঋষি, পূর্বপুরুষগণ সকলেই মহানন্দে আশীর্বাদ করিতেছেন তাঁহাকে। একটা অব্যক্ত ভাবে ও অনুভূতিতে চোখে টলমল করিত আনন্দাশ্রু।···ক্রমে তাঁহাদের অধিকতর তৃপ্তি ও আনন্দ বিধানের প্রেরণায় তিনি তর্পণ প্রণালী কণ্ঠস্থ করিলেন—শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতেই আরম্ভ করিলেন নিয়মিত তর্পণ। একদিন তর্পণ কালে একটা কুকুর বহু তাড়না সত্বেও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দারুণ শীতে গলা জলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তর্পনের জল গঙ্গাস্রোতে পড়িতেই সাগ্রহে তাহা পান করিতে লাগিল। একটু পরেই কুকুরটী উপরে উঠিল; তিনিও তর্পণ শেষ করিয়া তখনই তীরে উঠিলেন। কিন্তু বিস্তৃত বালির চড়ায় কুকুরটীকে না দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হইলেন।

একদিন রাত্রে তিনি স্বামিজী হরিমোহনের সহিত শয়ন করিলেন। গোসাঁইজীর প্রসঙ্গে দেখা দিল তন্দ্রাবেশ। স্বামিজী বলিলেন মূলাধার হইতে প্রাণায়াম দ্বারা শক্তি আকর্ষণ করিয়া সহস্রারে লইয়া গেলে সমাধি হইবে। কুলদানন্দ দুই চারিবার চেষ্টা করিতেই মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া ঊর্ধ্ব দিকে উত্থিত হয় অদম্য শক্তি। একটা ভীষণ যন্ত্রণা দেখা দিলেও সেই শক্তি বলে প্রাণায়াম চলিতে থাকে। ক্রমে মহাবেগে সেই শক্তি সহস্রারে গিয়া পৌছাইলে তিনি অভিভূত হন পরমানন্দে। পুনরায় তাহা মূলাধারে নামিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হয়। স্বামিজী হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—গুরুজী

যেন তোমার মধ্যে কী একটা প্রক্রিয়া করলেন, কিন্তু একটু বাকি র'য়ে গেল।···
এই অপূর্ব শক্তির খেলা কুলদানন্দের জীবনে এই প্রথম।···

এই শক্তিবিকাশের পর সাধনভজনে দেখা দিল অধিকতর উৎসাহ।

আজকাল প্রত্যহ রাত্রি ৩ টায় উঠিয়া শৌচান্তে ৬টা পর্যন্ত নাম, প্রাণায়াম ও কুম্ভক করেন কুলদানন্দ। স্বামিজী ও বিষ্ণুবাবুর সহিত জলযোগের পর ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত নির্জনে চলে ত্রাটক-সাধন। আহারান্তে ১২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সাধনে মগ্ন থাকেন গঙ্গাতীরে নির্জন শিবমন্দিরে। সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা ও সংকীর্তনে যোগদান করেন। রাত্রে আহারান্তে বাগিচায় তমালতলায় ধূনীর সম্মুখে আসনে বসিয়া নাম করেন। গোসাঁইজী বলিয়া ছিলেন: নামে করতে করতে সত্যবস্তু আপনিই প্রকাশিত হবে।···নামের সঙ্গে সঙ্গে কুলদানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় গোসাঁইজীর অপরূপ রূপের জ্যোতি।···মনে প্রাণে দেখা দেয় একটা অব্যক্ত আনন্দ। প্রভাতে একদিন গঙ্গাস্নানান্তে ললাটমধ্যে দর্শন করেন সেই জ্যোতির অপূর্ব ছটা—সুনীল আকাশে ভাস্বর সূর্যমণ্ডলের শুভ্র বিদ্যুৎদীপ্তি যেন। আনন্দে, আবেশে তিনি গঙ্গাতীরে মূর্ছাগত হইয়া পড়েন।

দর্শনের আকর্ষণে সাধনে উৎসাহ বর্ধিত হইল। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসে অবিশ্রান্ত নামজপ সম্ভব হইয়া ওঠেনা। নাম করিতে করিতে অসতর্ক মুহূর্তে মন হইয়া পড়ে ভিন্নমুখী। বহু চেষ্টার পর অবশেষে তিনি স্থির করিলেন দিবারাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের সমসংখ্যক নাম করিবেন। প্রত্যহ ত্রিশ বত্রিশ হাজার করিয়া চলিতে থাকে এই নাম সাধন। ফলে কর ও মালায় এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে নিদ্রিত অবস্থায়ও কর আপনিই ঘুরিতে থাকে। দিনেও কাহারো সহিত কথা বলিবার অবসর থাকে না। গোসাঁইজী বলিয়াছেন: আমাদের সাধনে শ্বাস-প্রশ্বাসই নামের জপমালা।···কিন্তু এইরূপ নামসাধনে পরিপূর্ণ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি সুবিধা মত মালাগ্রহণ করিবেন স্থির করেন। গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী এইভাবে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে অবিরাম নাম সাধন করিবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখা দেয় তাঁহার অন্তরে। কুলদানন্দের সাধক জীবনে এই নাম সাধনের গতি ও ক্রম সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।

ত্রাটক সাধনেও তাঁহার নানাবিধ অপূর্ব দর্শনের ক্রমপর্যায় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সাধন সময়ে প্রথমে দর্শন করেন অতিশয় চঞ্চল, কৃষ্ণবর্ণ, বহু স্তরবিশিষ্ট গোলাকার চক্র। পরে তিন চারি মাস দর্শন করিতে থাকেন স্থির

মণ্ডলাকার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিম্ব, তাহার চতুর্দিকে বিন্দু বিন্দু খণ্ডজ্যোতির ঝিকিমিকি। মাঘ মাস হইতে সেই মণ্ডলের মধ্যস্থলে প্রকাশিত হয় শ্বেতোজ্জ্বল, তেজঃপূর্ণ বলয়। প্রায় তিন মাস পরে দৃষ্টি স্থির হইতেই মণ্ডল মধ্যে দৃষ্ট হয় একটী সমচতুর্ভূজ যন্ত্র—ক্রমে উহা মটরের আয়তনে সংকীর্ণ হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম স্তরে ক্ষিতিতেই দৃষ্টি স্থির করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে গুরুদেবের নির্দেশে সেই দৃষ্টি ব্যোমে নিবদ্ধ করিলেন।

একদিন কুলদানন্দ শুনিলেন ভাগলপুরে বারোয়ারীতে আছেন পার্বতিচরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার আশ্রমটী যেন ঋষির তপোবন। পার্বতিচরণ ঋষিকল্প, তেজস্বী, গৌরবর্ণ পুরুষ। ষড়দর্শনে তিনি অগাধ পণ্ডিত; পুরাণ, উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণাদি পাঠেও তাঁহার গভীর নিষ্ঠা। তাঁহার সঙ্গ কুলদানন্দের খুব ভাল লাগিল। তিনিও সস্নেহে উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতির মর্ম বুঝাইতে লাগিলেন। শাস্ত্র ও সদাচারে কুলদানন্দের নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। প্রথম হইতেই অনুশীলন ও বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি ছিল তাঁহার স্বভাবজাত। দর্শনশাস্ত্রের নানা বিচার-বিতর্কে সেই প্রবৃত্তি বর্ধিত হইল। শুদ্ধাচারে আগ্রহ ও নিয়মনিষ্ঠা সহকারে সাধনভজন করায় প্রত্যক্ষ ফললাভও করিতেছিলেন; কিন্তু এখন প্রতিপদে পুনরায় বিচার ও বিশ্লেষণের ফলে মন হইয়া পড়িল সংশয়াচ্ছন্ন। এমনকি গোসাঁইজীর অসাধারণ কৃপাও ক্রমে যেন বিচার্য বিষয় হইয়া উঠিল—সাধনরাজ্যে দেখা দিল প্রলয়ের সূচনা।…সাধন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মনে জাগিল সংশয়। মনে হইল: পুরুষকার নিতান্তই নিরর্থক, জীবের প্রারব্ধ এমনকি সবকিছুই ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত; জীব শুধু দ্রষ্টা ও ভোক্তা মাত্র। সুতরাং সাধনভজন, নিয়মনিষ্ঠা, সদাচার ইত্যাদির জন্য কী প্রয়োজন এই অশান্তি ও উদ্বেগের?…গুরুদেবও তো বলিয়াছেন তিনি গর্ভস্থ সন্তান—পুষ্টি ও জীবনধারণ কিছুই গর্ভস্থ সন্তানের সাধ্যায়ত্ব নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া যায় সাধনভজনের সার্থকতা সম্পর্কে নিজস্ব মনোভাব। নিয়ম ও সদাচারে থাকিয়া যতই সাধনভজন করা যাইবে, ধীর স্থির সন্তানের গর্ভধারিণীর ন্যায় গুরুও ততই সুস্থ ও আনন্দবোধ করিবেন।… বস্তুতঃ, এই মনোভাবের ফলে ক্রমে তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংশয় স্তিমিত হইল। বুঝিলেন, সাধনভজনে সাময়িক ব্যর্থতা বা সাফল্য নিঃসংশয়ে গুরুকৃপা সাপেক্ষ।

সদাচার ও নিয়মনিষ্ঠাও বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডে স্বীকৃতি লাভ করিল।…

সূক্ষ্ম আত্মজিজ্ঞাসার ফলে কুলদানন্দ বুঝিলেন, জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতে না দিতেই দার্শনিক তত্ত্বের বিচার বা মীমাংসার প্রচেষ্টা নিছক মূর্খতার পরিচয়। তবু নিজের প্রতিটী মনোভাব, দ্বিধা-সংশয় ও বিচার-বিশ্লেষণ আশ্চর্য কৃতিত্বের সহিত তাহার ডায়েরীতে তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। জীবনদর্শন বিচারে প্রথমে তাঁহার মনে হয়ঃ কর্ম্মই ধর্ম, কর্ম না করিলে কিছুই হইবেনা। কর্মদ্বারাই ক্রমে বাসনার নিবৃত্তি ও পরিণামে মুক্তিলাভ হয়।…কিন্তু তাহা কী প্রকার কর্ম ?…মনে পড়ে গীতার বাণীঃ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।… বাসনা অনুযায়ী ভোগের জন্য যে-গুণ অবলম্বন করিয়া মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই গুণকর্ম্মই তাহার স্বধর্ম। সেই স্বধর্মে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটিলেও বাসনার আংশিক বা ক্রমিক নিবৃত্তিবশত তৃপ্তিতেই তাহা অবশ্যই কল্যাণকর। এইজন্য মনুষ্যবিশেষের পক্ষে সাধারণ পাপও ধর্ম, আবার সাধারণ ধর্মও পাপ।…তাঁহার মনে পড়িল, বারদীর ব্রহ্মচারীর অপূর্ব জীবনীই তাহার প্রমাণ। ·এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁহার অন্তরে জাগিল অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবৃত্তি। মধ্যাহ্নে তিনি অফিসের কাজ শিখিতে লাগিলেন। আত্মনিয়োগ করিলেন মথুরাবাবুর সংসারের শৃঙ্খলা-বিধানে। সেইসঙ্গে চলিল প্রাতে ও রাত্রে নামজপের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণের প্রচেষ্টা। ফলে অপরিমিত পরিশ্রমে বেদনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, কর্মস্পৃহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল—দেহমনে দেখা দিল ক্লান্তি ও বিরক্তি।…

এই সময়ে একটী পাগলা সাধুর নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নজরে পড়িল। খাদ্যশস্য পাইলে সে পাখীদের ছড়াইয়া দিত—শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি খুঁজিয়া লইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিত। এইসব দেখিয়া কুলদানন্দের মনে হইলঃ 'নিষ্কাম কর্মই ধর্ম'।…সামান্য সুখের চেষ্টায় কত দুঃখ বিপদ দেখা দেয়; নিষ্কাম কর্মদ্বারা অন্তর্মুখী হইলেই জীবনে দেখা দিবে প্রকৃত উন্নতি।…এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে আসক্তি-শূন্য কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি। মথুরাবাবুর সংসারের যাবতীয় কর্মভার গ্রহণ করা, বিষ্ণুবাবুর অফিসের কাজে সাহায্য করা, ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি নিঃস্বার্থ কর্মে রত হইলেন। কিন্তু অনুভব করিলেন নিষ্কাম কর্মও সকাম—তাহারও মূলে আছে বাসনাক্ষয়, কর্মশেষ ও মুক্তিলাভের সংস্কার। তবে ইহাও মনে হইল, অভ্যস্ত হইলে স্নানাহার ও মলমূত্র ত্যাগের ন্যায় কর্ম নিষ্কাম হইতে পারে। ভাবিয়া পুনরায় সময়মত দৈনিক কার্যে মনযোগ দিলেন।

একাগ্র অনিমেষ সাধনের ফলেও দেখা দিল অপূর্ব জ্যোতিদর্শন। চক্ষু মুদ্রিত অথবা অমুদ্রিত, সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে প্রতিভাত হইতে লাগিল অদ্ভুত দীপ্তি : প্রথমে বলয়াকার শ্বেত প্রভার আবর্তে ঘন নীল জ্যোতির ঘূর্নন,… কিছুদিন পরে পীতাভ শ্বেতমণ্ডল মধ্যে অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ জ্যোতিপ্রকাশ; অতঃপর শ্বেতমণ্ডলের বিলুপ্তিতে ক্ষণে ক্ষণে শুধু দেখা দেয় নীল ও হরিৎ আভায় মিশ্রিত বিদ্যুৎদীপ্তির ঝলকানি। আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন তিনি; আবার অন্তর্ধানে চিত্তে জাগে দারুণ হাহাকার!…কোথায় আলো,…কোথায় সেই অপরূপ জ্যোতিপ্রকাশ?…সর্ব ক্লেশ ও ক্লান্তির পরপারে কোথায় সেই আনন্দসাগর?…

কর্মে দেখা দিল ঔদাসীন্য, শৈথিল্য; কর্মের পরিবর্তে নিয়ত ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবার ইচ্ছা জাগিল। মনে হইল সৎকর্ম, পুণ্যকার্য সবই আত্মার কল্যাণের পরিপন্থী। কর্মের সমাপ্তিতেই বুঝি বা আত্মবিকাশেরও নিবৃত্তি। বাসনা ত্যাগজনিত নিবৃত্তিই যথার্থ ধর্ম, যাবতীয় কর্ম বিকাশধর্মী বলিয়াই ধর্মবিরোধী। সূক্ষ্মতর মানসিক কর্মত্যাগের মাধ্যমে পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়, স্থির অবস্থাই বাসনা-বর্জিত স্বরূপাবস্থার দিকে উপনীত হইবার উপায়। সুতরাং এখন মনে হইল কর্মই মহা অনর্থের মূল। অতএব যাবতীয় কর্মত্যাগের পর নির্জনে নাম সাধনেই মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অমনি চিত্তে উদিত হইল গুরুদেবের অপরূপ রূপজ্যোতি। অন্তরে উপলব্ধি হইল গুরুদেবের অধিষ্ঠান, প্রত্যক্ষ হইল তিনিই নামরূপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।…তাঁহার ধ্যানে সর্বাঙ্গ অবসন্ন ও বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া আসে। অব্যক্ত আনন্দে বহিতে থাকে অবিরল অশ্রুধারা।…সর্বত্র সর্বক্ষণ চোখে ভাসে শ্রীগুরুর সেই অপরূপ রূপ!…নামেতে রূপের বিকাশ, রূপেই নামের স্মৃতি ও গতি। এক বিস্ময়কর যোগাযোগ যেন। তাহারই মধ্য দিয়া বিমল আনন্দে নিমজ্জিত হইলেন তিনি।…

কিন্তু আবার জাগে বিচার ও বিশ্লেষণ। দর্শনটী নিঃসংশয়ে কল্পনা বা সংস্কার প্রসূত নয়। তবু ইহার দর্শন হইতেছে কোথায়? স্থান ও বায়ু চঞ্চল হইলেও এই রূপ ও জ্যোতি যে স্থির, অচঞ্চল!…এই দর্শনেই বা আপন আত্মার কোন কল্যাণ সাধিত হইবে?…অনন্ত পরব্রহ্ম যাহার লক্ষ্য, সে এখন মনুষ্যাকৃতি জ্যোতির্ময় রূপের বিভায় দিশেহারা!…ইহার জন্য কেনই বা এত আকর্ষণ?… সত্য, সরলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর বিকাশই তো ধর্ম। তবে এই বিন্দু রূপের মোহ কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে?…'বিন্দুই সিন্ধু, গুরুই ভগবান'

—এই বাক্যে বা বিচারে তৃপ্ত হইতে পারেন না তিনি। কিছুদিন দর্শন সম্পর্কে ঔদাসিন্য দেখা দেয়। ফলে দেখিতে দেখিতে সেই রূপ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন কিন্তু মনে জাগিল দারুণ অনুতাপ। প্রাণের ঠাকুর গুরুদেব কৃপা করিয়াই প্রকাশিত হইতেছিলেন—অনাদরে তবে কি তাঁহাকে বিসর্জন দিলেন তিনি? অন্তরে জাগিল প্রার্থনা : সাধনগর্বে বহুবার তোমার কৃপা প্রলোভন মনে করে অগ্রাহ্য করেছি, ঠাকুর! এবার তোমার দগ্ধপ্রাণ সন্তানকে ক্ষমা কর।…

জ্ঞান ও ভক্তি, বিচারবুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি—উভয়ের মধ্যে চলে এমনই দ্বন্দ্ব। ব্রাহ্মধর্ম প্রভাবে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সংস্কার ও মনোভাব এখনও প্রবল; তাই অলৌকিক সবকিছুই বিচার ও বিশ্লেষণের মানদণ্ডে যাচাই করিতে চান কুলদানন্দ। কিন্তু দৃপ্তপদে অগ্রসর হইতেই আনন্দের গভীর অনুভূতি হইতে নিমজ্জিত হন নিবিড় অন্ধকারে। তখনই মনে জাগে অনুতাপ ও আকুল প্রার্থনা; আর হৃদয়ের গভীরে প্রবাহিত হয় ভক্তির ফল্গুধারা,…গুরুকৃপার উপর নির্ভরতার প্রস্রবণ।…

॥ ছয় ॥

ফাল্গুন মাস, ১২৯৬। আসনে বসিয়া নাম করিতেছেন কুলদানন্দ। নামে যেন আর সে আনন্দ নাই। মন সদাই চঞ্চল, উদ্ভ্রান্ত।…

সহসা লালবিহারীকে দেখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। শুনিলেন লালবিহারী (লাল) শ্রীবৃন্দাবনে গোসাঁইজীর সঙ্গে ছিলেন; হঠাৎ প্রাণ অস্থির হইয়া ওঠায় পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছেন। সম্বল একটি মাত্র নেংটি ও কম্বল। অথচ কোন কষ্টই হয় নাই তাঁহার। কুলদানন্দ তো অবাক!

লালবিহারীর আগমনের সঙ্গেসঙ্গেই ধর্মভাবের মোড় ঘুরিয়া গেল যেন। সংকীর্তনে তাঁহার মহাভাবে, স্থির সমাধিতে এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সকলেই হতবাক। একদিন তাঁহাকে লইয়া কুলদানন্দ পার্বতীবাবুর নিকট গেলেন। দু'চার কথার পর লালবিহারী বলিলেন—ব্রহ্মজ্ঞানী ও মহাত্মাগণ গুরুকৃপা বলেই পরমতত্ব লাভ করেন,…একমাত্র সদ্‌গুরুর পলকের ইচ্ছাশক্তিতেই শিষ্যের অন্তরে সঞ্চারিত হয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্‌ভক্তি।

কুলদানন্দকে পাতঞ্জল দর্শন পড়িতে দেখিয়া একদিন লালবিহারী বলিলেন—ওসব পড়ে কী হবে? গুরুকৃপায় নামের মধ্যদিয়েই সকল শাস্ত্র অন্তরে প্রকাশ পাবে।···প্রমাণস্বরূপ সেই গ্রন্থের যেকোন স্থান হইতেই তিনি অবিকল বলিয়া দিলেন। কুলদানন্দকে বলিলেন: মহাশক্তিযুক্ত নাম পেয়েছ, সেই নাম কর—গুরুকৃপায় অনন্ত শাস্ত্রে অখণ্ড জ্ঞান লাভ করবে। সেজন্য গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকাই একমাত্র পথ।···কথাটী কুলদানন্দের অন্তরে দাগ কাটিয়া বসিল।

লালবিহারীর যোগৈশ্বর্যের প্রভাবে হরিমোহন নিরুদ্দেশ হইলেন। পরে একদিন লালবিহারীও কোথায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অনির্বাণ বহ্নিশিখা যেন নির্বাপিত হইল। কুলদানন্দের মনে হইল সবই যেন শূন্য, বিষাদময়। ইহা গুরুদেবের দুর্লভ কৃপা অগ্রাহ্য করিবার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। নিদারুণ যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যে মনে পড়ে ল্যাঙ্গাবাবা প্রমুখ মহাত্মাগণের ও সর্বোপরি গুরুদেবের অক্ষয় আশীর্বাদের কথা।···যাদুমন্ত্রের ন্যায় তখনই মনে জাগে নূতন বল। ভরসা হয়—দেহমন যতই অবসন্ন হক, গুরুকৃপায় পরিণামে পরম কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।···

লালবিহারী কুলদানন্দকে তিনটী কথা বলিয়া গেলেন: (১) ডায়েরী লেখা ছেড়োনা, (২) খুব নাম কর, তুমি সন্ন্যাসী হবে; এবং (৩) গুরুতে একনিষ্ঠ হও, সবই গুরুকৃপা সাপেক্ষ।···

কথা কয়টী খুবই মূল্যবান মনে হয় কুলদানন্দের। তবু সাধনভজনে মন ঠিক একাগ্র হয়না। অন্তরে কেমন একটা জ্বালা ও নৈরাশ্য জাগে যেন।··· একদিন স্বপ্ন দেখিলেন বহু ঝড় তুফান, বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গুরুদেবের নিকট পৌছাইলেন। গুরুভ্রাতাদের সহিত হাসিগল্প, তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলে বিরক্তিভরে বলিলেন গোসাঁইজী: উঃ, তুমি এত কথা বলতে পার!··· নিদ্রাভঙ্গে স্থির করিলেন তিনি বাকসংযম পালন করিবেন।

আর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যেন তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। স্বপ্নটী তাঁহার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অবিরত চোখে ভাসে নিজেরই ধ্যানমৌন সন্ন্যাসী মুর্তি! সেই সঙ্গে মনে জাগিল সন্ন্যাস অবস্থা লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা। সুরু হইল কঠোর সাধনা। দিবসে একাহার—শয়নের শয্যা একখানি মাত্র কম্বল। পাকাঘর ছাড়িয়া পুলিনপুরীর বাগিচায় তমাল তলায় আসন করিলেন। পরনে নেংটী, সম্মুখে ধুনী—বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন নির্জন পরিবেশে

সারারাত্রি কাটিতে থাকে। নামে আবার রুচি দেখা দেয়, সাধনে আসে প্রবল আগ্রহ।...

প্রথম হইতেই কুলদানন্দের একদিকে সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ, অন্যদিকে অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন এবং তাহার অপূর্ব প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়।...ভাবাবেশে, কল্পনার মাদকতায় নিজেকে ভুলাইতে বা ঠকাইতে চান না তিনি ; তাই বার বার বিশ্লেষণের সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদ্যত হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র স্বপ্নদর্শনের মধ্যদিয়া দেখা দিয়াছে সত্যের অম্লান প্রকাশ, আর গুরুদেবের অপার মহিমা। এই দুই বিভিন্ন আবর্তের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাঁহার সাধক জীবন-প্রবাহ ; আর, নিজস্ব কর্মধারা ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্তে প্রকটিত হইয়াছে গুরুকৃপা ও গুরুশক্তির জলন্ত প্রভাব।...তাই সাধনার প্রতি স্তরে আত্মবিশ্লেষণ যতই জাগ্রত হ'ক, পুনঃপুনঃ স্বপ্নদর্শনের ফলে গুরুদেবের অনুশাসন বাক্যদ্বারাই তিনি প্রভাবিত ও পরিচালিত হইতে থাকেন।

কিন্তু দেহের উপর দেখা দিল তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। সাধনভজনে আগ্রহ ও অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতার ফলে শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। আত্মীয় বন্ধুর সতর্কবাণী সত্বেও দুর্লভ সাধনায় ফললাভের তাগিদে দেহপাত করিতেও তিনি প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় আর একটী আশ্চর্য স্বপ্নদর্শনের ফলে তাঁহার সন্ন্যাসলাভের অভিমান চূর্ণ হইল।...তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা মনোমোহন ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ; অকালে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাত্রে কুলদানন্দ স্বপ্ন দেখিলেন—মনোমোহন সন্ন্যাসী বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত। কুলদানন্দও উৎসাহিত হইয়া বলিলেন : আমিও সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমার সঙ্গে থাকব।

মনোমোহন বলিল : সন্ন্যাস তো ভেক নয়—জিতকাম না হলে সিদ্ধিলাভ হয়না।

সন্ন্যাসের লক্ষণ দেখিতে চাওয়ায় মনোমোহন উলঙ্গ হইলেন। তাঁহাকে স্ত্রীলোকের মত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। মনোমোহন বলিলেন : এ তো শুধু বাহ্য লক্ষণ। অন্তরে সন্ন্যাসীর দুর্লভ অবস্থা লাভ হয় একমাত্র গুরুকৃপায়। এখন সাধন কর, খুব নাম কর। গুরুকৃপা হলে সবই হবে।...

সন্ন্যাসী ভ্রাতা অন্তর্হিত হইলে কুলদানন্দেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্নদৃষ্ট অবস্থা লাভের জন্য গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাধনভজন ও তপস্যা আরম্ভ করিলে সাধকের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে ভীষণ পশুশক্তি জাগ্রত হয়। আন্তরিক দীনতা বা নিয়মনিষ্ঠার অভাব হইতেই সেই শক্তি সাধককে আক্রমণ করে। কুলদানন্দেরও অন্তরে এই অভিমান জাগে, কঠোর সাধনভজনের ফলে তিনি জিতকাম হইয়াছেন। অমনি সেই দর্প চূর্ণ করিতে দেখা দিল এক নূতন উৎপাত। তিনি যে বাগিচায় আসন করিয়া সাধনভজন করেন, তাহারই প্রান্তে এক ভদ্রলোক বাসা ভাড়া নিলেন। তাঁহার যুবতী কন্যার সন্তান স্তনদুগ্ধের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুলদানন্দকে শক্তিশালী মহাপুরুষ জ্ঞানে ভদ্রলোক তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। নির্জনে যুবতী কন্যা নিজ বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া সকাতরে জানাইল—কুদৃষ্টির ফলে তাহার একটী স্তন একেবারে বিশুষ্ক, অন্যটীও দুগ্ধশূন্য। যুবতীর কাতরতায় তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন কুলদানন্দ।

অতঃপর তাঁহার দর্শন মানসে যুবতী প্রত্যহ নির্জন বাগিচায় আসিতে লাগিল। তাহার রূপলাবণ্যে কুলদানন্দের চিত্ত হইল চঞ্চল, মোহগ্রস্ত।…যুবতীর আগমন প্রতীক্ষায় সাধন হইল ব্যাহত।

দুষ্প্রবৃত্তির প্রবল আকর্ষণে দিশেহারা হইয়া তমালতলা পরিত্যাগ করিলেন তিনি। তবু সাধন ও প্রাণায়াম বন্ধ হইল। একদিকে প্রবল উত্তেজনা, অন্যদিকে বলিষ্ঠ আত্মচেতনা—এই দোটানায় পড়িয়া ঘনান্ধকারে নিদারুণ অনুতাপে ও হতাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন।…সন্ন্যাসের উচ্চাবস্থার পরিবর্তে সম্মুখে যে ঘোর নরককুণ্ড!…গভীর নিশুতি রাত্রি। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা উন্মুক্ত। শুভ্র জ্যোৎস্নায় অর্ধেক শয্যা আলোকিত। অনুতাপের দহনে শয্যায় পড়িয়া তিনি ছটফট করিতে থাকেন। নিরুপায়ে অন্তরে জাগিল আকুল কাকুতিঃ গুরুদেব, তুমি কোথায়?…এবার তুমি দয়া কর। তোমার ঐ মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি অন্তরে রেখে চিরকালের মত সমস্ত উৎপাতের শান্তি ক'রব।…

প্রার্থনান্তে গুরুদেবের পবিত্র মূর্তি ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টনাম জপে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু অজ্ঞাতে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কামিনী-কল্পনায় অভিভূত হইলেন। সহসা কামিনীর কণ্ঠস্বরে মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন যেন।… বলিলেনঃ তুমি কে? এসময়ে এখানে কেন?…

ঃ তোমার অদম্য কামভাবে আমার ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়েছে। তোমার বিকার থাকতে আমার নিস্তার নেই।…

ঃ সেকি!…কিন্তু…কে তুমি?…তোমায় তো দেখতে পাচ্ছিনে …

পায়ের কাছে প্রকাশিত হইল রমণীর অস্পষ্ট ছায়ামুর্তি। শয্যায় অর্ধশায়িতা অবস্থায় কুলদানন্দের পা-দুখানি তিনি জড়াইয়া ধরিলেন। পলকে কুলদানন্দের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইল তড়িৎস্পন্দন।…যুবতী বলিলেন ঃ ছিঃ—কামভাব তুমি ছাড়তে পারলে না!…পরমানন্দে সমাধিতে ছিলাম—শুধু তোমার সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধ হেতু আবদ্ধ রয়েছি।…এবার আমায় মুক্ত করে দাও—তোমার কামনা মিটিয়ে নেও!…

মুগ্ধ আনন্দে উঠিয়া বসিলেন কুলদানন্দ। বলিলেন ঃ তুমি কে!…বল, বল—কে তুমি?…

বাম পার্শ্বে তক্তপোষের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন রমণী। মধুর কণ্ঠে বলিলেন ঃ একবার আমাকে আলিঙ্গন ক'র—পরিচয় পাবে এখন।…

রমণীর কটিদেশ ধারণ করিতেই তাঁহার অলৌকিক রূপের দিব্য বিভায় বিবসাঙ্গ হইয়া পড়িলেন কুলদানন্দ। অপার বিস্ময়ভরে দেখিলেন নীলদ্যুতি-সম্পন্না সুন্দরী শ্যামা সম্মুখে উলঙ্গবেশে দণ্ডায়মান। ষোড়শীর নাভিদেশ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত প্রস্ফুটিত অসংখ্য ঘন নীল বিদ্যুৎ!…চমৎকৃত হইয়া রমণীর দিকে তিনি হস্ত প্রসারিত করিলেন।…

পশ্চাতে কিঞ্চিৎ সরিয়া বলিলেন রমণী ঃ আর কেন—যথেষ্ট হয়েছে।…এবার ভেবে দেখ আমি কে।…এখন যাই।—

শ্যামাঙ্গের প্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক আলোকিত করিয়া উর্ধে উত্থিত হইলেন উলঙ্গিনী কামিনী। প্রতি অঙ্গ হইতে অবিরল স্খলিত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে উদ্ভাসিত হইল দিগদিগন্ত—নিঃসীম নীলিমায় ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেলেন জ্যোতির্ময়ী শ্যামাপ্রতিমা!…

ঃ হায়, হায়—কোথায় গেলে!…কোথায় গেলে!!…চিৎকার করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন কুলদানন্দ।

সেই আকাশের দিকে বিহ্বল চোখে চাহিয়া চাহিয়া অবশিষ্ট সারারাত্রি কাটিয়া গেল কুলদান্দের।…কী অপরূপ, অপ্রাকৃত দৃশ্য! দিবানিশি তিনি মগ্ন রহিলেন উহারই ধ্যানে। আবার কীরূপে দর্শন মিলিবে সেই অনুপমা শ্যামাপ্রতিমার?…

কামকল্পনা ক্রমে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। মনে হইল, হয়ত সাধনভজন করিলে মুর্তিমতী হইবেন লীলাময়ী দেবীপ্রতিমা।…ভাবিয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পিত্তশূল বেদনার দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্রমে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

কণ্ঠনালীতে ক্ষত, পাকস্থলীতে ভীষণ জ্বালা—সেইসাথে প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া বমন দেখা দিল। মানসিক প্রতিক্রিয়া চাপা পড়িয়া গেল—উৎকট দৈহিক যন্ত্রণায় প্রাণ যেন কণ্ঠাগত।…শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন।

॥ সাত ॥

আষাঢ়, ১২৯৭। গুরুদেব আছেন শ্রীবৃন্দাবনে। মন ছুটিয়া গেল সেই পুণ্যধামে—চিরকালের মত একবার চাই তাঁহার অপরূপ পবিত্র মূর্তিদর্শন। তারপর যমুনাসলিলে পাপদেহ বিসর্জন ভিন্ন সুতীব্র যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভের আর বুঝি উপায় নাই। কিন্তু ভাগলপুর হইতে বৃন্দাবন অনেক দূর। অথচ দেহ একেবারে অশক্ত। খরচই বা মিলিবে কোথায় ?

মন তবু মানে না। অগত্যা কাতর প্রাণে গুরুদেবকে প্রাণের আকূতি নিবেদন করিলেন কুলদানন্দ। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয় বৈকি।… হইলও তাহাই—ব্যবস্থা হইয়া গেল অভাবনীয়ভাবে। ভাগিনেয় দিলেন ট্রেণের টিকিট, ভগ্নিপতি মথুরাবাবু ও বিষ্ণুবাবু দিলেন তেরটী টাকা।

গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া রওনা হইলেন কুলদানন্দ। প্রথম পদক্ষেপেই বহুকাল পরে দেখা গেল সেই কালোরূপের ঝিকিমিকি। অবিরত সম্মুখে সেই জ্যোতির্ময় রূপের মধুর প্রকাশ দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন। ষ্টেশনে পৌছিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। সম্বল মাত্র একখানি কম্বল—আর ছেঁড়া ঝোলায় দুখানা জীর্ণ বস্ত্র, গামছা, একটী ঘট, ডায়েরী লিখিবার সরঞ্জাম, ও একখানা হরিবংশ। নগ্ন দেহ, ভিখারী বেশ—সেই বেশেই শ্রীবৃন্দাবনে চলিলেন ভিখারী রাজা। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল অনেক দিনের অনেক স্বপ্ন ও সাধনার ক্ষেত্র ভাগলপুর।

পুণ্যধাম, মুক্তিধাম প্রয়াগ। ষ্টেশনে পৌছাইবার পূর্বেই কুলদানন্দের অন্তরে দেখা দিল বিচিত্র ভাবাবেশ। বসিয়া তিনি নাম করিতে থাকেন। বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্য দিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। এ চলার বুঝি বিরাম নাই— আদি, অন্ত নাই।…

ময়দানের দিকে চাহিতেই কুলদানন্দের মন উদাস হইয়া ওঠে, সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হয়। মনে পড়ে এই পুণ্যধামেই অগস্ত্য, বশিষ্ট, ভরদ্বাজ প্রমুখ মহাতপা

ঋষিদের অবস্থানের কথা। নিরুদ্ধ শোকাবেগে তিনি অভিভূত হইলেন। গুরুনিষ্ঠার সহিত সনাতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য ঋষিদের চরণোদ্দেশে জানাইলেন ব্যাকুল প্রার্থনা, মনে হইল সত্যই যেন প্রসন্নচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন ঋষিগণ। প্রয়াগ ষ্টেশনে নামিয়া অদূরে একটী বৃক্ষতলে তিনি আসনে বসিলেন। যুগযুগান্তে কত মুনিঋষির ধ্যানধারণা সমাধির বিমল আনন্দ পরিব্যাপ্ত এই পুণ্যভূমির আকাশে বাতাসে।· এই তীর্থরাজ প্রয়াগ কত দেবর্ষির অপ্রাকৃত সাধনশক্তির পবিত্র ভাণ্ডার।···ইহার আনন্দঘন প্রতি ধূলিকণায় সঞ্চারিত কত অসাধারণ সাধন-শক্তির বীজ,···কত মহাতপা ব্রহ্মর্ষির পদরেণু।···অভিভূত আনন্দে সেই পুণ্যভূমিতে লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইলেন। অন্তরের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধন্য মনে হইল নিজেকে।

পরদিন প্রভাত। ট্রেণের এক কোণে বসিয়া কুলদানন্দ নামে নিমগ্ন। ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে দুরন্ত বেগে। অধিকতর বেগে তাঁহার মন ছুটিয়াছে শ্রীগুরুদেবের চরণতলে।···ঐ মথুরা, তারপর বুঝি শ্রীবৃন্দাবন। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য লীলাক্ষেত্র। তাঁহার দর্শন মানসে নিতান্ত শৈশবে নির্জন ময়দানে প্রান্তরে কত আকুলভাবে তিনি কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন। শৈশবের মানস-কল্পনার সেই বড় সাধের শ্রীধাম বৃন্দাবন ঐ আগত প্রায়। কুলদানন্দের সারা অন্তর ক্রন্দনবেগে উদ্বেল হইয়া ওঠে। ট্রেণের দুইদিকে বনে প্রান্তরে যেন ঝরিয়া পড়ে অসংখ্য বিদ্যুৎদীপ্তি,—ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয় নিবিড় নীলাভ, কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিপুঞ্জ।···

শ্রীবৃন্দাবন। বেলা প্রায় একটা। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর অবসন্ন। বুকেও উঠিয়াছে অসহ্য বেদনা। ষ্টেশনে নামিয়া প্রখর রৌদ্রতাপে একটী বৃক্ষতলে তিনি বসিয়া পড়িলেন। তবু গুরুদেবের কাছে যাইবার জন্য মনেপ্রাণে জাগিয়াছে ব্যাকুল আগ্রহ। গোপীনাথের বাগ—সে আর কতদূর ?···

সহসা একটী ভদ্রলোক চলন্ত গাড়ীতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন। কিছুদূর গিয়া নামাইয়া দিলেন গোপীনাথের বাগে। ব্রজবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুঞ্জ দেখাইয়া দিলেন। কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন কুলদানন্দ। কুঞ্জদ্বারে বুঝি তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন কলুষনাশন, স্বয়ং শ্রীগুরুদেব।··

মুগ্ধ নয়ন ধন্য হইতে না হইতেই কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল তাঁহার সস্নেহ

আহ্বান : কি কুলদা, এসেছ ! বেশ, বেশ—এসো। একেবারে উপরে এসো।…

গুরুদেবের অনুগমন করিলেন কৃতকৃতার্থ শিষ্য।…দোতলায় উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িলেন তাঁহার অভয় চরণতলে। পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন পাপবিমোচন বিজয়কৃষ্ণ। দেহমনের সকল দুঃখতাপ পলকে সত্যই জুড়াইয়া গেল যেন।…

তেমনি দরদ ঢালিয়া বলিলেন গোসাঁইজী : শরীর অসুস্থ—একটু বিশ্রাম কর। পরে যমুনায় গিয়ে স্নান করে এস। তোমার প্রসাদ রয়েছে।…

অথচ তিনি যে আসিতেছেন তাহা ঘুণাক্ষরেও জানান নাই। তবু এত বেলা অবধি তাঁহার জন্য প্রসাদ রাখিয়াছেন গুরুদেব।…ভাবিতেই সারা অন্তর দুলিয়া উঠিল। আসনে স্থিরভাবে বসিলেন গোসাঁইজী। তাঁহার দিকে এতক্ষণে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। সেই সুন্দর, সুবিশাল দেহের এ কী শোচনীয় অবস্থা !…মুখখানি মলিন,…নধরকান্তি দেহ বিশীর্ণ।…সোনার বরণ ঠাকুরের এ কী আকৃতি !…তাঁহার চক্ষুদুটী ছল-ছল করিয়া উঠিল।…

কুঞ্জের অধিকারী দামোদর পুজারীকে ডাকিয়া গোসাঁইজী বলিলেন : একে যমুনায় স্নান করিয়ে নিয়ে এসো—পরে খাবার যা আছে দিয়ে দিও।

যমুনার শীতল জলে স্নান করিয়া কুলদানন্দের দেহমন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। দেখিলেন ট্যাঁকে গোঁজা টাকার দিকে দামোদরের নজর পড়িয়াছে। কী প্রয়োজন এই উৎপাতের ? টাকাকয়টি দামোদরকে দিয়া বলিলেন : ঠাকুরের সেবায় লাগিয়ে দেবেন।…আশাতীত খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিলেন দামোদর ; তিনিও নিশ্চিন্ত হইলেন।

কুঞ্জে ফিরিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন। নিজের পাতে প্রসাদী ডাল-ভাত, রুটি সবই রাখিয়া দিয়াছেন ঠাকুর।…যথার্থ প্রসাদই বটে।…কী অনন্ত কৃপা !… দেহ অসুস্থ হইলেও সেই অতিরিক্ত প্রসাদ সবই সানন্দে, সাশ্রুনেত্রে গ্রহণ করিলেন।…ঠাকুরের স্বহস্তে রাখা পাতের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া এতদিনে ধন্য মনে হইল নিজেকে।…

কুলদানন্দের আগমনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন শ্রীধর প্রমুখ গুরুভ্রাতারা। কিন্তু বলিলেন : সে-গোসাঁই আর নেই—এখন ভয়ানক শাসন করেন, সর্বদাই বিষম উগ্রভাব ধারণ করে থাকেন। তুমি ভাই একটু সাবধানে থেকো।

শুনিয়া প্রথমে খুব উদ্বেগ বোধ করিলেন কুলদানন্দ। পরে দেখিলেন

গোসাঁইজী স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছেন। প্রয়োজন মত উপদেশও দিতেছেন। তাহাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার চিন্তা দূর হইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গোসাঁইজী বলিলেন: এই অপ্রাকৃত ধামের মাহাত্ম্য বুঝতে হ'লে হিংসা ও পরনিন্দা ত্যাগ করতে হয়, খাদ্যবস্তু নিবেদন করে খেতে হয়, আর যথা সময় নষ্ট না-করে সর্বদা সাধনভজনে থাকতে হয়।

বারদীর ব্রহ্মচারীর দেহরক্ষা সম্বন্ধেও আলোচনা করিলেন। কুলদানন্দ বলিলেন: ব্রহ্মচারী কত ভরসা দিয়েছিলেন……

: আমি আছি কী জন্যে?…যা বলি করে যাও—তোমাদের যা করবার আমিই করব।…সময়ে সবই পূর্ণ হবে।…

ব্রহ্মচারীর ভরসার কথা বলায় লজ্জাবোধ করিলেন কুলদানন্দ। কিন্তু গুরুদেবের নিশ্চিত আশ্বাসে মনে জাগিল পরিপূর্ণ আশা ও আনন্দ। পরক্ষণে মনে হইল: গোসাঁই যদি সবই পূর্ণ করতে পারেন তবে আর এত দুর্ভোগ কেন?…

গোসাঁইজী যেন তাহার জবাব দিলেন: সাধন করে যাও—সময়ে ফল পাবে। সব কিছুর একটা সময় আছে।

: সময়ে সব কিছু হলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে কী লাভ?…

: সদ্‌গুরুর কৃপায় সবকিছু হতে পারে, তবে মর্যাদাবোধের জন্য সাধন চাই। বস্তুর মূল্য বুঝিয়ে দিয়ে তবে সদ্‌গুরু তা দান করেন।…

শুধু গর্ভধারিণী তুল্য শ্রীগুরুর শান্তির জন্য নয়—এতদিনে বুঝিলেন কুলদানন্দ, নিজের জন্যও সাধন অপরিহার্য।‥ বলিলেন: মর্যাদা না বুঝে আমি কিছু পেতে চাইনে। আপনি শুধু আমার ভিতরের সব আবর্জনা দূর করে দিন।….

সস্নেহে বলিলেন গোসাঁইজী: শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করে যাও—প্রথমে বিরক্তি এলেও পরে বড় উপকার পাবে।…

নূতন প্রেরণায় চক্ষু মুদিয়া নামে বসিলেন কুলদানন্দ।

কিন্তু রোগযন্ত্রণা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইল। নিজের সামান্য দুধের অর্ধেকটা তাঁহাকে দিতে লাগিলেন গোসাঁইজী। আপত্তি জানাইলে বলেন: ছেলেবেলা থেকে তোমার দুধ খাওয়া অভ্যাস—এখন না খেলে অসুখ করবে যে।…

যেন জননীর গভীর স্নেহ-আদরে অভিষিক্ত হন কুলদানন্দ।…

প্রত্যুষে যমুনায় স্নান করেন। পরে গুরুদেবের পাশে বসিয়া নাম

করিতে থাকেন। বেলা হইতেই একদিন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পাছে গুরুদেব জানিতে পারেন এই ভয়ে দম ধরিয়া তিনি এক একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় সহসা চমকাইয়া উঠিলেন গোসাঁইজী। সস্নেহে চাহিয়া ছল-ছল চক্ষে বলিলেন: উঃ—তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ!…আচ্ছা—আর তোমায় ভুগতে হবে না।…

দুই-তিনবার কুলদানন্দের দিকে চাহিয়া চক্ষু বুজিলেন গোসাঁইজী। অসীম স্নেহদৃষ্টি বুলাইয়া বুঝি আকর্ষণ করিলেন সুতীব্র রোগযন্ত্রণা।…ধুইয়া মুছিয়া দিলেন এতদিনের সমস্ত দুঃখ-জ্বালা।…তাই তাঁহার মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠিল।…

আহারান্তে হতবাক হইলেন কুলদানন্দ। এতকালের দুরারোগ্য দুঃসহ রোগযন্ত্রণা কি একেবারেই নিরাময় হইল?…গুরুদেবের এ কী আশ্চর্য কৃপা!… এ কী অপরিসীম স্নেহ!…মনের সংশয় ঘোচেনা তবু। রাত্রে ডাল-রুটি, লংকা-টক খাইলেন প্রচুর। তবু পরদিন দেখিলেন আর লেশমাত্র বেদনা নাই। গুরুদেব তবে যে সত্যই সর্বক্লেশহারী অন্তর্যামী।…

কিন্তু একি! গুরুদেবের চেহারা যে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!… বুক ফাটিয়া যায় কুলদানন্দের। চোখের জলে গুরুদেবের পা-দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলেন: আমার যন্ত্রণাভোগ আমাকেই দিন!…

নির্বিকারে পরম স্নেহে সান্ত্বনা দেন গোসাঁইজী: ভোগটোগ কিছু নয়—কার ভোগ কে নেয়?…

তিনি চক্ষু মুদিলেন। আর কুলদানন্দের চক্ষে নামিল বিগলিত ভক্তিধারা। নীরব প্রার্থনা জানাইলেন: ঠাকুর, আমারই জন্যে নিজের বুকে আগুন জ্বেলেছ তুমি—একথা জীবনে-মরণে কখনও যেন না ভুলি।…

ঢাকা হইতে কুঞ্জে আসিয়াছেন জননী যোগমায়া দেবী। সঙ্গে আছেন যোগজীবন ও প্রেমসখী (কুতুবুড়ী)। একদিন সকালে কুলদানন্দকে লইয়া স্নানে যাইবেন, এমন সময় কূয়ার ধার হইতে জননী সহসা অদৃশ্য হইলেন।…বিস্মিত, চিন্তিত হইলেন কুলদানন্দ। মধ্যাহ্ন অতীত হইল—সকলে সারা দেশ ছুটিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না।…দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় অধীর হইলেন সকলে। এখন ঠাকুরকে কে কী বলিবে?…

অগত্যা কুলদানন্দ হাজির হইলেন। কিন্তু…গোসাঁইজী নিশ্চিন্ত।… বলিলেন: পরমহংসজী সূক্ষ্মদেহে তাঁকে নিয়ে গেছেন।…

কৌতূহলভরে সবকিছু জানিবার চেষ্টা করিলেন কুলদানন্দ। বিস্ময় তাহাতে বাড়িয়াই গেল। গোসাঁইজী বলিলেন ঃ আমাদের নিত্যকার জীবন অনিত্য। শুদ্ধ-শান্ত আনন্দময় জীবন তার বহু ঊর্ধ্বে। সেই নিত্য আনন্দধামের সন্ধান পেলে আর ফিরতে ইচ্ছা হয় না।···

ঃ তবে কি মাতাজী আর আসবেন না ?

ঃ কুতুর জন্যে যদি আসেন।

অথচ কুতুবুড়ীও নিশ্চিন্ত। প্রায়ই নাকি জননীর দর্শনলাভ করেন। এতদিন জীবনের স্বপ্নগুলি বিচিত্র মনে হইয়াছে কুলদানন্দের। কিন্তু এ যে স্বপ্নের জীবন—অপূর্ব, রহস্যময়।···

কয়েকদিন পরে ফিরিলেন জননী। কুলদানন্দ জানিলেন, গুরুদেবের নিষেধ সত্বেও তাঁহার আসিবার ফলে এই অঘটন।···জননীর কাছেও শুনিলেন তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানের কথা,···পরমহংসজী ও সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষদের অভাবনীয় যোগৈশ্বর্যের কথা।···তাঁহার মানশ্চক্ষে যেন প্রতিভাত হইল এক দিব্য আনন্দলোক। মাটীর পৃথিবী ছাড়িয়া সেই ঊর্ধলোকে যাইবার এক অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করিলেন।

পিত্তশূল বেদনা সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে। শরীর এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ। ফলে দেখা দিয়াছে আর এক নূতন উদ্বেগ। গুরুদেবের পবিত্র সঙ্গলাভের সৌভাগ্য বেশী দিন হয়ত আর কপালে নাই। বাড়ী গেলে আবার সুরু হইবে সেই পড়াশুনার তাগিদ—তারপর চাকরি ও বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি। যমযন্ত্রণা অপেক্ষাও তাহা দুঃসহ।···এখন গুরুদেবের শরণ লওয়া ভিন্ন আর রক্ষা পাইবার উপায় কী !···

গুরুদেবের নিকট মনের উৎকণ্ঠা সবই প্রকাশ করিলেন। গোসাঁইজী বলিলেন ঃ তোমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে বিয়ে করা একেবারেই উচিত নয়। তবে শরীর বেশ সুস্থ হলে চাকরি করে দাদাদের তো সেবা করতে পার।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন কুলদানন্দ ঃ চাকরি করলেই তো বিষয় নিয়ে থাকতে হবে। তাতে নানা লোভ দেখা দেবে, আপনার কাছেও থাকতে পারব না। তাহলে রক্ষা পাব কী করে ?···আপনি যদি বলেন, চিরকুমার থেকে সাধনভজন করতে পারি।

ঃ তবে তুমি ব্রহ্মচর্য নেও। একটা ব্রতের বন্ধনে পড়লেই নিরাপদ। তিন দিন ভাল করে চিন্তা করে আমাকে বলো’।

অনেক চিন্তা করিলেন কুলদানন্দ। শ্রীধর ও যোগজীবনকে জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহারা সানন্দে সম্মতি দিয়া বলিলেন : মহাপুরুষেরা পাত্র বুঝেই কৃপা করেন।...কিন্তু মাতাজীকে বলিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন : বিয়ে করলে কি আর ধর্মকর্ম হয়না ?...ব্রত নেওয়া অত সহজ নয়—শেষে যদি ভঙ্গ করে ফেল ?...

তাইতো ! ব্রতভঙ্গ করা অপেক্ষা ব্রতগ্রহণ না-করাই ভাল। আবার ব্রতগ্রহণ না করিলে দেখা দিবে চাকরি ও বিবাহের নরককুণ্ড।...এ যে উভয় সংকট।...

তিনদিন পরে শুধাইলেন গোসাঁইজী : কী ঠিক করলে—ব্রহ্মচর্য নেবে ?

: ইচ্ছা খুবই আছে—কিন্তু ব্রত রক্ষা করতে পারব তো ?...নইলে যে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম কলুষিত হবে।...আপনি যদি রক্ষা করেন তবেই গ্রহণ করতে পারি—নইলে দরকার নেই।...

কুলদানন্দের চক্ষে অশ্রুবিন্দু, অন্তরে নির্ভরতার পুষ্পাঞ্জলি।...সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন বিজয়কৃষ্ণ—অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিভাত হইল শিষ্যের অন্তর। প্রসন্ন হাসিতে সমস্ত উদ্বেগ দূর করিয়া বলিলেন : আচ্ছা—তাই হবে।...

গোসাঁইজী জানিতেন, ব্রহ্মচর্য ব্রত ক্ষুণ্ণ করা দূরে থাক নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন কুলদানন্দ।...তাই কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতি লইবার পরিবর্তে নিশ্চিন্তে তাঁহাকে এই পবিত্র ব্রত প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।...

কয়েক দিন পরে সদাচার, নিত্যকর্ম, সন্ধ্যাতর্পণাদি সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। কুলদানন্দ বলিলেন : প্রাচীন ঋষিদের মত আমার ব্রাহ্মণ হতে ইচ্ছা হয়।...দয়া করে আমাকে সেই শিক্ষা দিন।...

: ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে নিয়ম মত চল, তাহলে ঠিক হবে।

দিনস্থির করিয়া দিলেন গোসাঁইজী। গীতা, ভাগবত ও মহাভারতের শান্তিপর্ব পাঠ করিবার উপদেশ দিলেন।

আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি আবাল্য বীতশ্রদ্ধ ছিলেন কুলদানন্দ। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবেই অন্তরে দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। ক্রমে সদাচার ও বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিলেন তিনি। গুরুদেবের সহিত শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশী মহাপুরুষ এবং কেলি-কদম্ব বৃক্ষে ৺রাধাকৃষ্ণ নাম দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।... গুরুদেবের উপদেশে বুঝিলেন—বিশেষ সুকৃতি বলেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করা যায় ; আর সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিলে পরজন্মেও গুরুকৃপালাভ অবধারিত।...

১২ই শ্রাবণ, ১২৯৭। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের মহাযোগ। কুলদানন্দের জীবনেও একটী স্মরণীয় মহাপুণ্য দিন।…

গুরুদেবের নির্দ্দেশে কেশিঘাটে গিয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেন কুলদানন্দ—শিখামাত্র অবশিষ্ট রহিল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিয়া কুঞ্জে ফিরিলেন অবিলম্বে। গুরুদেবের চরণে প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোসাঁইজী তাঁহাকে নিজ আসন ঘরে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বমুখী আসনে বসিলেন কুলদানন্দ। তিনি আজ গ্রহণ করিবেন মুনিঋষিদের পবিত্র ব্রত। সত্যই গুরুদেবের কী অনন্ত কৃপা!…মনে হইতেই তাঁহার চক্ষে দেখা দিল আনন্দাশ্রু।…

ব্রহ্মচর্য ব্রত বারো, তিন বা এক বৎসরের জন্য গ্রহণ করা যায়। আপাতত এক বৎসরের জন্য ব্রতদান করিলেন বিজয়কৃষ্ণ। বলিলেন: নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের নিষ্ঠাই মূল। নিয়মগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলবে:—

: ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সাধন করে শৌচের পর আসনে বসে গায়ত্রী জপ করবে। গীতা অন্ততঃ এক অধ্যায় পাঠ করে আবার সাধন করবে। স্নানের পর গায়ত্রী জপ করে তর্পণাদি করবে। স্বপাক অথবা সদব্রাহ্মণের রান্না সদাচারে পরিমাণ মত আহার করা চাই। বেশী ঝাল, টক, মিষ্টি, মধু, ঘি বা কাম-উত্তেজক কোন কিছু খাবেনা। আহারের পর ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি পাঠ করে নির্জ্জনে বসে ধ্যান করবে। বিকালে ইচ্ছা হ'লে একটু বেড়াতে পার। সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ ও সাধনাদি নিয়মিত করবে। খুব ক্ষুধাবোধ হলে সামান্য কিছু জলযোগ করবে—দুবেলা অন্নগ্রহণ করবেনা। নির্দিষ্ট নিতান্ত সামান্য বসন পরবে, সামান্য শয্যায় শয়ন করবে। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। সাধুসঙ্গ করে সাধুদের উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে। সাধনে বিশেষ নিষ্ঠা থাকে যেন।…

: পরনিন্দা করবেনা, শুনবেনা। কোথাও পরনিন্দা হলে সেস্থান বিষবৎ ত্যাগ করবে। কোনরকম সাম্প্রদায়িক ভাব রাখবেনা, প্রত্যেককে নিজভাবে সাধন করতে উৎসাহ দেবে। কারো মনে কষ্ট দেবেনা—সবাইকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা সকলের যথাসাধ্য সেবা করবে। নিজকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে সকলকে মর্যাদা দেবে। বিচার করে প্রতি কাজ করলে কোন বিঘ্ন হবেনা।…সর্বদা সত্যকথা বলবে, সত্য ব্যবহার করবে। অসত্য কল্পনা মনে স্থান দেবেনা—আর কম কথা বলবে।…যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ করবেনা। দেবদর্শনে, রাস্তাঘাটে বা অজ্ঞাতে স্পর্শ হলে ক্ষতি

নেই। অতি গোপনে নিজের কাজ করে যাবে, সর্বদাই খুব শুচিশুদ্ধ হয়ে থাকবে—পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে বসবে।...

ঃ এই সমস্ত নিয়ম রক্ষা করে চলতে পারলে আগামী বছর আরো নিয়ম বলে দেব।...

অতঃপর গুরুদেবের নির্দেশে তাঁহার সহিত প্রাণায়াম করিতে লাগিলেন কুলদানন্দ। দুর্লভ ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হওয়ায় পরমানন্দে উদ্বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সাধন-জীবনে সুরু হইল এক নূতন মহিমান্বিত অধ্যায়।...

দুইদিন পরে কুলদানন্দ স্বপ্ন দেখিলেন—যেন গঙ্গাস্নান কালে প্রবল আবর্তে ভাসিয়া চলিলেন, ক্রমে নিমজ্জিত হইলেন অতলতলে; সহসা বরদাকান্ত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।...

স্বপ্নকথা গুরুদেবকে বলিয়া জানিলেন, মেজদাদাও দীক্ষালাভ করিয়াছেন। মেজদাদাই ছিলেন দীক্ষালাভের প্রধান পরিপন্থী। এতদিনে আশাতীত আনন্দলাভ করিলেন।

কয়েকদিন পরে কুলদানন্দ আর একটী স্বপ্ন দেখিলেন—যেন নির্জন, মনোরম স্থানে বারদীর ব্রহ্মচারী ও আর চারিজন মহাপুরুষ ধর্মালোচনায় নিমগ্ন; তাঁহাদের নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষেরা বলিলেন: তোমার কর্ম যে এখনও শেষ হয়নি।...তিনি বলিলেন: প্রারব্ধ তো ঠাকুরের হাতে—ঠাকুর যা বলবেন তাইতো কর্ম। গোসাঁইজী ভরসা দিলেন: না না—তোমাকে আর সংসার করতে হবেনা।...অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নের কথা গুরুদেবকে জানাইলে বলিলেন গোসাঁইজী: এসব স্বপ্ন মিথ্যা হয়না—তোমাকে আর সংসার বা ঘর-গৃহস্থালি করতে হবেনা।...গুরুদেবের নিশ্চিত আশ্বাসে পরম নিশ্চিন্ত হইলেন তিনি।

বিজয়কৃষ্ণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের অনেক দর্শনীয় স্থান, বিগ্রহ ও বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ দর্শন করেন কুলদানন্দ। ব্রজরজের মাহাত্ম্য এবং সাধনে অনুভূতির ক্রম সম্বন্ধে উপদেশ লাভে অনুপ্রাণিত হন। গোসাঁইজী বলেন: সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটী একবার ঠিকমত গেঁথে গেলে আত্মদর্শন হয়। শরীর থেকে আত্মা পৃথক জেনে একটু স্থির হতে পারলে সেই আত্মা নানাপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতালাভ করে। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে তা প্রয়োগ করতে গেলে শক্তি তো নষ্ট

হয়ই, ধর্মকর্মও চুলোয় যায়।···সাধন প্রভাবে দেহতত্ত্ব এবং ভগবানের কৃপায় তাঁহার অনন্ত লীলাতত্ত্বের উপলব্ধি সম্বন্ধেও নানা উপদেশ দেন গোসাঁইজী। তিনি আরো বলেন: সাধকের পক্ষে যে সুরাপানের ব্যবস্থা সেটা বাইরের সুরা নয়। ভক্তির ফলে সারা দেহে যে রস জন্মে উহাই অমৃত। ঐ রস টাকরা দিয়ে চুইয়ে জিহ্বায় এসে পড়ে; সেই অমৃত দুই-তিন ফোটা পান করলে এত নেশা হয় যে, অনায়াসে পাঁচ-সাতদিন অনাহারে কাটান যায়।···

প্রতিটী তত্ত্ব ও অনুভূতি সম্পর্কে খুটিনাটি সবকিছু জানিয়া লইবার চেষ্টা করেন কুলদানন্দ। অন্তরে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা, সাধনার মহান প্রেরণা ও গভীর ভক্তি-প্রস্রবণ। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধুর সমন্বয়ের পথে তিনি অগ্রসর হইতে চান বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রাপ্তির মহাতীর্থ পরিক্রমায়।···

ধ্যানমগ্ন, সদাগম্ভীর বিজয়কৃষ্ণের নিকটে অন্যান্য গুরুভ্রাতারা অগ্রসর হইতে পারেন না। অথচ আদরের গোপালের মত নিয়ত তাঁহার মধুর সঙ্গলাভ করেন কুলদানন্দ। আর নানা প্রশ্নে, যুক্তিতর্কে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন! পরম স্নেহময় পিতার ন্যায় গুরুদেবও সকল পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাকে পরিচালিত করেন অধ্যাত্ম সাধনপথে।

এই মধুর গুরুসঙ্গ হইতে কখন বঞ্চিত হইতে হয় কুলদানন্দের মনে সর্বদা সেই আশঙ্কা। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেন: কী চমৎকার অবস্থায় আমাকে রেখেছেন। উত্তেজনার নামগন্ধও যেন নেই।···কিন্তু আপনার সঙ্গছাড়া হলে আবার কত পরীক্ষায় প্রলোভনে পড়তে হবে কে জানে। তখন আমার ব্রহ্মচর্য কী করে রক্ষা হবে?

গোসাঁইজী: সেজন্যে তোমার চিন্তা কী! উত্তেজনা দমনের জন্যই তো ব্রহ্মচর্যের দরকার। নিয়মগুলি পালন করবার চেষ্টা করো, সব ঠিক হয়ে আসবে।

সেই আশ্বাসবাণী—তোমার চিন্তা কী!···অন্তরে নির্ভরতার প্রভাব বর্ধিত হয় চতুর্গুণ। তবু স্বভাববশে ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য, বৈরাগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বুঝাইয়া বলেন: ধর্মের বিরুদ্ধ কর্মই পাপ। সাধন দ্বারা মানুষ সেই পাপ এড়াতে পারে, কিন্তু কর্ম এড়াতে পারেনা। কর্মদ্বারাই কর্মের ক্ষয়—বৈধকর্মই ধর্ম। ধর্মকর্ম দ্বারা বিষয়ে অনাসক্তি হলেই দেখা দেয় বৈরাগ্য।···কর্ম যার যেটুকু আছে, না করে নিস্তার নেই।···

কুলদানন্দের মনে হয়, অদৃষ্টে কত কর্মের বোঝা চাপিয়া আছে কে জানে।···

কিন্তু কর্মক্ষয় ভিন্ন যখন নিস্তার নাই, তখন যত শিঘ্র হয় ততই ভাল। নইলে নিশ্চিন্তে সাধনভজন কিছুই হইবে না ভাবিয়া তিনি গুরুদেবকে বলেন: তবে আমার যেসব কর্ম আছে বলে দিন—সব আমি শেষ করে ফেলি।...

দেরী আর সয় না যেন।...গুরুদেবও বলিলেন: বড়দাদার কাছে চলে যাও—কিছুদিন তাঁর সেবা কর। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী গিয়ে মায়ের সেবা ক'রো। ব্রহ্মচর্য রক্ষা ক'রে মায়ের সেবা করলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।..

শ্রাবণের শেষ। বৃন্দাবন-বাস আপাততঃ শেষ হইল। গুরুদেবের আদেশে ফয়জাবাদ রওনা হইলেন কুলদানন্দ। গুরুভ্রাতা ও দামোদর পূজারীর নিকট বিদায় লইয়া মাতা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন। আশীর্বাদ করিয়া মাতাজী বলিলেন: কুলদা, যোগজীবনের মত তুমিও আমার ছেলে। ভবিষ্যতে তুমিই তার বল-ভরসা। আর, দুঃখের দিনে শান্তিসুধাকে সান্ত্বনা দিও। মা যেন দশজনের গলগ্রহ না হন।...ব্রহ্মচর্য নিয়েছ ভালই—শরীর সুস্থ হ'লে গোসাঁইয়ের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করলে ক্ষতি কী?...তাতে ধর্মকর্ম, সাধনভজনের কোন অনিষ্ট হবে না। আমার কথা কয়টী মনে রেখো।...

আশীর্বাদের সঙ্গে প্রকাশ পাইল জননীর মনের আশা। বুঝিয়াও নীরব রহিলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের নিকট গেলে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন তিনি। কী ইঙ্গিত তাঁহার ঐ প্রসন্ন হাসিতে?...কঠোর পরীক্ষায় অভয় আশীর্বাদ?...সঠিক বুঝিলেন না কুলদানন্দ। চরণতলে প্রণত হইলে মস্তক স্পর্শ করিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: এসো। যা বলেছি করতে চেষ্টা করো। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো—দরকার মত উত্তর পাবে।

শ্রীবৃন্দাবন পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলেন কুলদানন্দ। ভাগলপুর হইতে এখানে আসিবার সময় দেহমনে ছিল দারুণ জ্বালা ও নৈরাশ্য। কিন্তু ফিরিবার সময় দৈহিক শান্তির সহিত মনে রহিল নূতন প্রেরণা। বুঝিলেন সম্মুখের পথ নিঃসন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ; তবু আজ পাথেয় দুর্লভ ব্রহ্মচর্য ব্রত—আর সেইসঙ্গে অনন্ত গুরুশক্তি,..তাঁহার অক্ষয় আশীর্বাদ।...

॥ আট ॥

কানপুর ষ্টেশন। এখানে নামিয়া এক গুরুভ্রাতার বাসায় দুইদিন অবস্থান করিলেন কুলদানন্দ। পরে রওনা হইলেন ফয়জাবাদ।

ষ্টেশনে আসিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এক্কাগাড়ীতে পোলঘাটে পৌছিয়াও শুনিলেন ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখিলেন পাঁচটী টাকা উধাও হইয়াছে। গুরুদেবকে স্মরণ করিতেই দেখিলেন পথে পড়িয়া আছে টাকা কয়টী। এক্কা ভাড়া মিটাইয়া এক ভদ্রলোকের সহিত তিন ক্রোশের পথ হাটিয়া চলিলেন নাওঘাটে। পথে কোমর জলে এক মাইল হাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মুসলধারে বৃষ্টিও নামিল—মাথার বোঝা ভারী হইল চতুর্গুণ। বিষম বিপদে স্মরণ করিলেন গুরুদেবকে। সঙ্গের ভদ্রলোকটী তাঁহার বোঝা লইয়া স্রোতের মধ্যদিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ষ্টেশনে পৌছিতেই ট্রেণ আসিলে ছুটিলেন উর্ধশ্বাসে—কিন্তু প্লাটফরমের গেট বন্ধ। ট্রেণ ছাড়িবার বাঁশি বাজিলে চাহিয়া রহিলেন নিরুপায়ে। সহসা গার্ডসাহেব ছুটিয়া আসিলেন, টানিয়া লইয়া তুলিয়া দিলেন চলন্ত ট্রেণে।

এইভাবে পথে দেখা দিল নানা দুর্বিপাক—আবার গুরুদেবের কৃপায় রক্ষাও পাইলেন আকস্মিকভাবে।...পরদিন ভোরে পৌছিলেন ফয়জাবাদে।

তাঁহার বহুদিনের দুরারোগ্য শূলরোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে শুনিয়া অবাক হইলেন হরকান্ত। বুঝিলেন ইহা গোসাঁইজীর কৃপা।...বলিলেন : এমন সঙ্গ ছেড়ে এলে কেন ?

: তাঁর আদেশে আপনার ও মায়ের সেবা করতে।

: বটে !...আচ্ছা, তাঁর আদেশ মত সাধনভজন কর—তাতেই আমার যথেষ্ট সেবা করা হবে।

সাধনভজন চলিল নিয়ম মত, অবসরকালে চলিল গুরুপ্রসঙ্গ আলোচনা। বেশ আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় বরদাকান্ত আসিলেন ওকালতি করিতে। কুলদানন্দের শরীর সুস্থ দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু বড়দাদাকে একটী চাকরি জুটাইয়া দিতে বলিলেন। হরকান্তও যোগাড় করিলেন ভাল চাকরি।

প্রমাদ গণিলেন কুলদানন্দ। বলিলেন : ব্রহ্মচর্য ব্রতে চাকরি করা নিষেধ।

বরদাকান্ত : চাকরি করতে চাওনা তাই বল। আচ্ছা, দাদার পেটেন্ট ওষুধগুলি ঘরে ব'সে বিক্রী কর।

: সেও তো টাকা আয়ের চেষ্টা।...

: বুঝেছি—সব চালাকি !

সংকটে পড়িয়া গুরুদেবকে পত্র দিলেন কুলদানন্দ। বিষম জ্বরে শয্যাশায়ী হইলেন। হরকান্তের চেষ্টা সত্বেও দেখা দিল বিকার, আর মূর্ছা।...হরকান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

দুই সপ্তাহ পরে আসিল গোসাঁইজীর চিঠি। লিখিয়াছেন : শরীরের যে অবস্থা তাহাতে বিষয়কর্মে রত হইলে পীড়া আরো বৃদ্ধি পাইবে। তোমার দাদাদের বলিবে, সংসারে যে কার্য করিতে পার তাহা যেন তোমাকে দিয়া করান। তাঁহাদের দাসত্ব করিবে। ভগবানের রাজ্যে একমুষ্টি আহার তিনি কোনরকমে দিয়া থাকেন। সকলের একই প্রকার করিতে হয়না। যাকে যেভাবে রাখেন। মনস্থির করিয়া চলিবে, সংসারে কত অবস্থায় পড়িতে হয়। ধৈর্য সম্বল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

অগ্রজেরা পত্র পড়িয়া বলিলেন : চাকরি আর করতে হবে না—এখন ভাল হ'লে বাঁচি।...

নিশ্চিন্ত হইলেন কুলদানন্দ। উনিশ দিনে আরোগ্যলাভ করিলেন। যে বিষয়-সেবা যুগধর্ম, তাঁহার বৈরাগ্যদীপ্ত সাধক-জীবনে তাহাই ছিল অধর্ম।... গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘনও তাঁহার নিকট অভাবনীয়।...ফলে দারুণ উদ্বেগেই বিষম ব্যাধিরূপে দেহমনে দেখা দিল এই প্রতিক্রিয়া ; আর সেই উদ্বেগ দূর হইলে ব্যাধিরও উপশম হইল। অধিকন্তু সাধনভজনে প্রবল স্পৃহা দেখা দিল। প্রাতঃকাল হইতে আবার নিয়মিত চলিল নাম, প্রাণায়াম, পাঠ ও ধ্যান। মধ্যাহ্নে আহারান্তে সাড়ে বারোটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত চলে নামজপ। রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর বারোটা বা একটা পর্যন্ত নিদ্রা যান ; পরে ভোর পর্যন্ত চলে প্রাণায়াম, কুম্ভক, নাম ও ধ্যান। এইভাবে দিনরাত কাটিয়া যায় পরমানন্দে।...

দোতলায় নির্জন ঠাকুর ঘর। আসনে বসিয়া একদিন তাঁহার মনে হইল, সম্মুখে অন্য কেহ প্রাণায়াম করিতেছে।...হরকান্তের নিকট শুনিলেন— বৃন্দাবন যাইবার পথে গোসাঁইজী এখানে আসিলে একটী সদগতিপ্রার্থী প্রেতাত্মা

তাঁহার শরণাপন্ন হয়; তখন হইতে মাঝে মাঝে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

একদা রাত্রি একটায় ধুনির পার্শ্বে শয়ন করিয়া তিনি নাম করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন আসনে বসিয়া আছে ভয়ঙ্কর আকৃতির একটী লোক।... তাহাকে আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিলেন, কিন্তু সে গ্রাহ্য না করায় সজোরে লাথি মারিলেন। অথচ পা গিয়া শুধু দেওয়ালে লাগিল। প্রাণায়ামে দম দিয়া অট্টহাস্য হাসিল প্রেতাত্মা—তাঁহার ভিতরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা ঘরের বায়ু স্তম্ভন করিয়া রাখিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিঃশ্বাস লইতে পারিলেন না। এক প্রবল শক্তি তাঁহার অবসন্ন দেহ শূন্যে তুলিয়া আছাড় দিতে লাগিল যেন। যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে মূর্ছিতপ্রায় অবস্থায় স্মরণ করিলেন গুরুদেবকে।... একটু পরেই চমক ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলেন। বার বার ডাকিয়াও প্রেতাত্মাকে আর দেখিতে পাইলেন না। সেইদিন হইতে প্রাণায়ামের শব্দও বন্ধ হইল।...

একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—এক দস্যু হরকান্তের মস্তকে আঘাত করিতেছে, আর দাদাকে রক্ষা করিতে তিনি ছুটিয়া যাইতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইতেই দাদার ঘরে মহা সোরগোল শুনিতে পাইলেন। ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন বিছানায় বসিয়া হরকান্ত হাত-পা ছুড়িতেছেন,...তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়াছে।... গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া দাদাকে তিনি জড়াইয়া ধরিলেন। ক্ষণকাল পরে দম লইলেন হরকান্ত। সুস্থ হইয়া বলিলেন- স্বপ্নের ঘোরে একটা লোক চাপিয়া ধরায় তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়াছিল।

প্রতি সঙ্কটে এইভাবে গুরুশক্তির ক্রিয়া অনুভব করিয়া বৃদ্ধি পাইল তাঁহার গুরু-নির্ভরতা।

আর একদিন স্বপ্নঘোরে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন—তাঁহার বাম চক্ষু উঠিবে, তবে সারিয়া যাইবে। সত্যই তাঁহার চোখ উঠিয়া কয়েক দিনে সারিয়া গেল। স্বপ্নটী সত্য হওয়ায় আনন্দিত হইলেন।

একদিন সকালে নাম করিবার সময়ে যজ্ঞধূমের অতি পবিত্র সুগন্ধ পাইলেন। ঠাকুরঘরে ছিলেন শালগ্রাম নারায়ণ। হরকান্ত বলিলেন: আমার শালগ্রাম ঠাকুরের গায়ের গন্ধ।...একজন সন্ন্যাসী এই জাগ্রত শালগ্রাম দান করেন। গোসাঁই এখানে এলে সাশ্রুনেত্রে ঠাকুরের পূজা করেন, ঠাকুর প্রকাশ হ'য়ে ভোগ গ্রহণ করেন।...

অবিশ্বাস দূর হইল কুলদানন্দের- অন্তরে জাগিল বিস্ময় ও শ্রদ্ধা।

ভাদ্র মাস, ১২৯৭। ফয়জাবাদে প্রায় দুইমাস কাটিল। বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল হরসুন্দরী খুব অসুস্থ। কুলদানন্দের সাধনভজনে হরকান্ত খুশী হইয়া বলিলেন: ভগবান তোমাকে কর্মপাশ হ'তে মুক্ত করুন। এখন গোসাঁইজীর আদেশ মত বাড়ী গিয়ে মায়ের সেবা কর।

অগ্রজের অনুমতি পাইয়া বাড়ী রওনা হইলেন কুলদানন্দ। পথে কাশী, ভাগলপুর, কলিকাতা ও ঢাকায় কাটিল প্রায় এক মাস।

গুরুকৃপায় ব্রহ্মচর্য-ব্রত লাভ করিয়া ইতিমধ্যেই দুর্লভ অবস্থায় উন্নীত হন তিনি। উপবীত স্পর্শ করিতেই বৈদিক মন্ত্র মনে পড়ে। জপের সময় মনে হয় নামটী যেন একটী সজীব শক্তিশালী মন্ত্র। অন্তরে উচ্ছ্বসিত হয় নিত্য নব ভাবতরঙ্গ। অজ্ঞাতে মনে কামভাব উদয় হইতেই দেখা দেয় বিষম বিরক্তি ও জ্বালা। পবিত্র আনন্দরসে দেহমন যেন সঞ্জীবীত।

কিন্তু একটী পরিচিত ভদ্রলোকের গৃহে অবস্থান করিতে হইল। ভদ্রলোক অন্যত্র যাইতে বাধ্য হওয়ায় গৃহকর্ত্রীর দেখাশুনার ভার পড়িল তাঁহারই উপর। মহিলাটী মধ্যাহ্নে আহারান্তে নিঃসংকোচে তাঁহার আসনের নিকটে শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। নিশ্চিন্ত অবসর—তাহার উপর কুলদানন্দের কন্দর্পকান্তি।...মুগ্ধা যুবতী সরলতার ভাণ করিয়া কামভাবের ছলাকলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিষম বিপদে পড়িলেন কুলদানন্দ। আবার বাধা দিলে আশাহত রমণী হয়ত প্রচার করিবেন নানা অপযশ।...অগত্যা নিজে সংযত থাকিয়া তিনি স্মরণ করিলেন গুরুদেবের অভয় চরণ। তবু কয়েকদিনে বুঝিলেন, দুর্লভ ব্রহ্মচর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। মনে পড়িল গুরুদেবের নির্দেশ—অভিভাবক না থাকিলে কোন বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। অহংকার বশে তাহা অগ্রাহ্য করাতেই এই শাস্তি।...ভদ্রলোক ফিরিলেই তিনি স্থানত্যাগ করিলেন।

কয়েকদিন পরে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন গোসাঁইজীর আদেশে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথে ছাগাদির বিচিত্র ক্রীড়া দেখিয়া দাঁড়াইতেই ধমক খাইয়া আবার চলিলেন। একটী পর্বতে উঠিয়া বহু গুরুভ্রাতাকে দেখিলেন। গুরুদেব সেখানে থাকিতে বলিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। গোসাঁইজী ধমক দিয়া বলিলেন: সকলে যখন যাবে তখন যেয়ো, এখন আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।...গুরুদেব প্রস্থানোদ্যত হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া পড়িলেন।

প্রাণ বড় অস্থির হইল। খুব নিয়মনিষ্ঠার সহিত সাধনে নিমগ্ন হইলেন। অবিলম্বে গুরুদেবের নিকট চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তখন দেখিলেন আরো

দুইটী স্বপ্ন। প্রথমে দেখিলেন—সংকীর্তনে মত্ত বহুলোক 'দয়াল নিতাই' বলিয়া কাঁদিতেছে, আর পতিতপাবন নিতাইকে স্মরণ করিয়া তিনিও কাঁদিতেছেন।··· এই স্বপ্নদর্শনের পর মনে হইতে লাগিল নিজদোষে দুর্লভ অবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখে, অনুতাপে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন সকাতরে গুরুদেবের চরণ স্মরণ করিয়া শয়ন করিলেন। সেইদিন দেখিলেন আর একটী স্বপ্ন—যেন গোসাঁইজী অনেককে লইয়া চলিয়াছেন সংকীর্তনে, আর নিজের দুরবস্থার ম্রিয়মান হইয়া রাস্তার একপাশে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। গুরুদেব ডাকিলেন: সংকীর্তনে চল। আজ তুমি বিশেষ কৃপালাভ করবে। নিজকে পতিত ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলে গুরুদেব সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন।··· কীর্তনস্থলে নামাইয়া দিয়া বলিলেন: দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি। অদূরে একটী সুন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন গোসাঁইজী। তিনিও জাগিয়া পড়িলেন।

গুরুদেবের স্নেহ ও দয়ার কথা ভাবিয়া এবার অনেক শান্তি হইল। তাঁহারই কৃপায় আবার সেই উন্নত অবস্থা লাভ সম্ভবপর। ভাবিয়া একাগ্রচিত্তে সাধন ভজনে তৎপর হইলেন।

বাড়ী যাইবার পথে কাশীতে কয়েকদিন থাকিবার ইচ্ছা হইল। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিবেন স্থির করিলেন। গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন—তীর্থে গিয়া প্রথমে তীর্থগুরু করিতে হয় এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া পাণ্ডার সাহায্যে স্নানদর্শনাদি করিতে হয়। কুলদানন্দের মনে হইল সাধারণের সুবিধার জন্যই শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। স্নানঘাটে ও মন্দিরে পাণ্ডাদের হঠাইয়া দিলেন। বিশ্বনাথ কি আবার ফুল-বেলপাতার প্রত্যাশী ?··· কিন্তু ভীড়ের চাপে বিশ্বেশ্বর দর্শন অসম্ভব হইল। অধিকন্তু ভীড়ের মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী নানা কৌশলে অস্থির করিয়া তুলিল তাঁহাকে।···বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে বাইরে আসিলেন। কমণ্ডলু কিনিতে গিয়া দেখিলেন পরত্রিশটী টাকাও পকেটমার হইয়াছে।···বুঝিলেন গুরুবাক্যে অনাস্থা হেতু এই দুদৈব ও অনুশাসন।···

অবিলম্বে তিনি ভাগলপুর গেলেন। যোগজীবনের সঙ্গে কিছুদিন আনন্দে কাটিল। পরে উপস্থিত হইলেন কলিকাতায়।

দাদার নির্দেশে মাণিকতলার মাতাজীর দর্শনে গেলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন মাতাজী। বলিলেন: মনে হচ্ছে তুমি গোসাঁইয়ের শিষ্য। শিষ্যদের মধ্যে তিনি নিত্যধাম প্রস্তুত করে নিয়েছেন।

যেভাবে ইচ্ছা চল, সময়ে তিনি সমস্তই করে নেবেন।...মাতাজীর কথা খুব ভাল লাগিল। তাঁহার গভীর স্নেহমমতায় ধন্য মনে হইল নিজেকে।

ঢাকা আসিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিনি রহিলেন এক সপ্তাহ। গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গলাভে, বিশেষতঃ লালবিহারীর সহিত গুরুপ্রসঙ্গ আলোচনায় দিন কাটিল বড় আনন্দে। সারদাকান্তের নিকট মায়ের অসুখের কথা শুনিয়া বাড়ী রওনা হইলেন।

বাড়ী পৌছিয়া দেখিলেন পিত্তশূল বেদনা ও আমাশয় রোগে মায়ের শরীর খুব দুর্বল। তবু বৃহৎ সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করিতে হয় তাঁহাকেই। মায়ের দুরবস্থায় প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, সংসারের সমস্ত কাজ ও মায়ের সেবা-শুশ্রূষার ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ দেখিয়া খুব আনন্দ পাইলেন হরসুন্দরী। গোসাঁইজীর কৃপায় রোগমুক্তির কথা শুনিয়া বলিলেন : বাবা, এমন গুরুর সঙ্গ ছেড়ে এলি কেন ?...

: তোমার সেবা করতেই ঠাকুর যে আমায় পাঠিয়েছেন, মা।...

অগ্রহায়ণ মাস, ১২৯৭। বাড়ীতে কুলদানন্দের কাজকর্ম, সেবা-শুশ্রূষা, সাধনভজন সবকিছু চলিল নিয়ম অনুযায়ী। শেষ রাত্রে আসন ত্যাগের পর শৌচ করিয়া স্নানান্তে নাম ও তর্পণ করিতেন। জননীর পদধূলি লইয়া প্রার্থনা করিতেন : আমার সেবায় তুমি সুস্থ হ'য়ে ওঠ, মা—তোমার তৃপ্তি ও আনন্দ হ'ক।...তাঁহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া হরসুন্দরীও আশীর্বাদ করিতেন : তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক—তুই সুখে থাক।...কুলদানন্দের মনপ্রাণ জুড়াইয়া যাইত। নয়টা পর্যন্ত চলিত সাধনভজন ; পরে গীতা ও সূর্যস্তবাদি পাঠ করিয়া জননীকে শুনাইতেন। দশটায় রান্না করিতে গেলে আহ্নিকে বসিতেন হরসুন্দরী। মায়ের জপ ও পূজার পর চরণামৃত লইয়া তাঁহাকে খাইতে দিতেন এবং প্রসাদ পাইতেন। মায়ের তৃপ্তিতে ও প্রসাদ গ্রহণে তাঁহার সে কী আনন্দ।...গুরুদেবের চরণ স্মরণ করিয়া আবার আসনে বসিতেন ; তিনটা পর্যন্ত নাম করিয়া জননীকে রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। অপরাহ্নে চলিত হাটবাজার ও হিসাবনিকাশ ; সন্ধ্যায় মাকে প্রণাম করিয়া ভজন করিতেন বন্ধুদের সঙ্গে। রাত্রে মায়ের জলযোগের পর প্রসাদ পাইতেন ; মায়ের শয়নের পর তৈলমালিশ করিতেন তাঁহার চরণে। পুত্রকে বক্ষে লইয়া সর্বাঙ্গে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিতেন হরসুন্দরী—আর কুলদানন্দের চক্ষে টলমল করিত আনন্দাশ্রু।

আসন ঘরে শয়ন করিয়া কয়েক ঘন্টা নিদ্রা যাইতেন। পরে রাত্রি একটা হইতে ধুনি জ্বালাইয়া আবার বসিতেন সাধনভজনে।

এইভাবে দিন কাটিতে থাকায় আনন্দে, উৎসাহে সাধনস্পৃহাও বর্ধিত হয়। মাতৃসেবায় খুশী হইয়া আশীর্বাদ জানান অগ্রজেরা। গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন সকলেই এখন সন্তুষ্ট। সাশ্রুনেত্রে তিনি গুরুকৃপা স্মরণ করিয়া প্রাণে অনুভব করেন নূতন শক্তি। অন্তরের প্রার্থনা গুরুদেব পূর্ণ করেন—মনে জাগে এই বিশ্বাস।

সারদাকান্ত পত্রে জানাইলেন বুকের যন্ত্রণায় তিনি শয্যাগত, অথচ তাঁহার বি-এ পরীক্ষা আসন্ন। অমনি গুরুদেবের চরণে কুলদানন্দ জানাইলেন সকাতর প্রার্থনা: দাদার রোগযন্ত্রণা আমাকে দিয়ে তাঁকে সুস্থ কর, ঠাকুর।···সেইসঙ্গে আসনে বসিয়া রোগকল্পনায় প্রাণায়ামের প্রতি দমে বায়ু আকর্ষণ করিলেন আর রেচকের সহিত নিজের স্বাস্থ্য ছোটদাদার রুগ্ন দেহে সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রমে বুকে বেদনা দেখা দিলে সাগ্রহে কুম্ভকযোগে তাহা ধারণ করিতে লাগিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন হইল, কিন্তু মনে দেখা দিল মধুর আনন্দ।···তখনই পত্র লিখিয়া জানিলেন, সেইদিন ঠিক সেই সময়ে বেদনার উপশম হইয়াছে সারদাকান্তের।···গুরুকৃপা স্মরণ করিয়া তিনিও বেদনামুক্ত হইলেন।

পরীক্ষার তিনদিন পূর্বে জ্বরে শয্যাগত হইয়া আবার চিঠি দিলেন সারদাকান্ত। শিগ্রই সুস্থ হইয়া তিনি যাহাতে ভাল পরীক্ষা দেন, সেজন্য গুরুদেবের চরণে কুলদানন্দ জানাইলেন আকুল প্রার্থনা। ভিতরের যন্ত্রণায় অস্থির হইলে মনে হইল প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। সেইকথা পত্রে লিখিয়া উত্তরে জানিলেন, সত্যই সুস্থ হইয়া সারদাকান্ত ভাল পরীক্ষা দিয়াছেন।···

এইভাবে প্রতিপদে গুরুকৃপা উপলব্ধি করিয়া অশ্রুসিক্ত হইতে থাকেন কুলদানন্দ।···

গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী নিয়মিত ব্রহ্মচর্য পালন ও সাধনভজন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিবেশী ও দূরবর্তী গ্রামবাসীগণও নানা দুরবস্থা জানাইয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আপদে বিপদে, উৎকট রোগে অনেকে নিষ্কৃতিলাভ করায় চতুর্দিকে তাঁহার প্রচুর সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল ঠাকুরের অলৌকিক ঐশ্বর্যের কণামাত্র তাঁহার

অন্তরে সঞ্চারিত হওয়ায় এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এইরূপ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে নির্জনে যুবতীদেরও প্রাণের কথা নিঃসংকোচে শুনিতে থাকেন।

একদিন এক সুন্দরী যুবতী আসিয়া বলিল: তোমার জন্য ভিতরের জ্বালা আর যে সহ্য করতে পারিনে।···তরুণীটির উপর একদা তাঁহারও ছিল প্রবল আকর্ষণ। আজ তাহার প্রতি অন্তরে জাগিল সমবেদনা—তাহাকে ধর্ম ও সংযম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অবশেষে রতিমন্দিরে মহাশক্তির পূজা করিবার সংকল্প করিলেন। তাহাতে যুবতীর কামবেগ প্রশমিত হইবে, নিজেরও হইবে চরম পরীক্ষা।···তাঁহার প্রস্তাবে যুবতীও সানন্দে সম্মত হইল।

মাঘ মাসের এক পুণ্য তিথিতে দ্বিপ্রহরে যুবতীকে লইয়া এক নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। যুবতীর সম্মুখে আসনে বসিয়া চণ্ডীপাঠ ও গায়ত্রী জপ করিলেন। অগ্নি জ্বালিয়া ধ্যান করিলেন ইষ্টমূর্তি, হোম করিয়া আহুতি দিলেন সাবিত্রীমন্ত্রে। অতঃপর গুরুদেবের চরণে প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন: প্রকৃতিপূজা তোমার অভিপ্রেত না হ'লে কোন বিঘ্ন ঘটিয়ে আমাকে নিবৃত্ত কর, ঠাকুর—পাঁচ মিনিট আমি অপেক্ষা করব।···গুরুদেবের পবিত্র মূর্তি ধ্যানে নির্দিষ্ট সময় নির্বিঘ্নে কাটিল। তাঁহার ইঙ্গিতে যুবতী তখন দাঁড়াইল উলঙ্গিনী মূর্তিতে।···আর জবা, অতসী, অপরাজিতা ও বিল্বদলে অঞ্জলি ভরিয়া সর্বভূতে মা-চণ্ডীর মাতৃরূপ, শক্তিরূপ, শান্তিরূপ, ইত্যাদি ধ্যানমন্ত্রে প্রণাম করিতে লাগিলেন। স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন যুবতীর আপাদমস্তকে,··· চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন উলঙ্গিনীর নাভিস্তর হইতে উরুদেশ পর্যন্ত গোলাকৃতি নিবিড় কালো ছায়া দ্বারা আবৃত।···তাঁহার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল,··· ভগবতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন।···অপূর্ব গুরুকৃপায়, মহামায়ার অদ্ভুত লীলায় স্তম্ভিত, আত্মসমাহিত হইলেন!···

পরক্ষণে দেখিলেন পরমাসুন্দরীর নয়ণকোণে বিলোল কটাক্ষ,···বিম্বাধরে বাঁকা হাসির রেখা।···পলকে তাঁহার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইল কামনার বিদ্যুৎ।··· যুবতী হোমাগ্নির নিকট প্রণাম করিলে তবু তিনি আশীর্বাদ করিলেন: ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।···অতঃপর বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্থান করিল যুবতী, আর অদম্য কামবেগে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।···

এই দুঃসাহসিক প্রকৃতিপূজার ফলে যুবতীর কামবেগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। কিন্তু অহোরাত্র কামাগ্নিতে জর্জরিত হইতে লাগিলেন কুলদানন্দ। পরিত্রাণ লাভের জন্য তিনবেলা স্নান আরম্ভ করিলেন এবং অম্লমধুরাদি রসযুক্ত খাদ্যগ্রহণ

না করিয়া সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইলেন। লোকসঙ্গ, শয়ন ও নিদ্রা একরূপ বর্জন করিলেন। তাহাতে উত্তেজনা প্রশমিত হইলেও চিত্তের অস্থিরতা রহিয়া গেল। তখন গুরুদেবের কৃপা ও শক্তি প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিলেন। উত্তরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিল চারখানা পত্র। যোগজীবন লিখিলেন : বাড়ী থাকবার অসুবিধা হ'লে গোসাঁই তোমাকে গেণ্ডারিয়া গিয়ে থাকতে বলেছেন। আমরাও শিগ্র যাচ্ছি।...শ্রীধর ও যোগমায়া দেবী লিখিলেন : তোমার উপর গোসাঁইয়ের অসীম কৃপা।...কোন চিন্তা নেই—নির্ভয়ে আনন্দ কর।...

শিগ্রই কুলদানন্দের অন্তরে দেখা দিল বিমল আনন্দ। নবোদ্যমে সাধন-ভজনে একাগ্র হইলেন। কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের চরণদর্শনের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দিন কাটিতে লাগিল।...

॥ নয় ॥

১২৯৭ সাল। বহুকাল পরে অর্ধোদয় যোগ আসন্ন। জননীর শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে। তাঁহাকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইবার স্থির করিলেন কুলদানন্দ। এই সুযোগে মায়ের নানা তীর্থদর্শনও হইবে।

যাত্রার সময় হরসুন্দরী বলিলেন : ফিরে এসে তোর বিয়ে দেব।

: গোসাঁইয়ের কাছে আমি যে ব্রহ্মচর্য নিয়েছি, মা। চিরকুমার থেকে সাধন-ভজন করাই তাঁর আদেশ।

: তা...সংসারে জ্বালাই বেশী। তোর ইচ্ছে হলে ধর্মকর্ম নিয়েই থাক।

: ঠাকুর তোমার সেবা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেবায় খুশী হ'য়ে তুমি মত দিলে তবে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারি।

: তোর সেবায় খুবই খুশী হয়েছি, বাবা।...বেশ—তুই গোসাঁইয়ের কাছে গিয়ে থাক। তোরও উপকার হবে, আমারও প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে।

: তবে আমাকে গোসাঁইয়ের চরণে সঁপে দেও, মা। আমার পরম কল্যাণ হবে। আর, তোমারও পুত্রদানের মহাফল লাভ হবে।...

: তাই হ'ক, বাবা—খুশী হ'য়েই তোকে আমি গোসাঁইয়ের হাতে সঁপে দিলাম।...

: জয় মা!...তাহলে গোসাঁইকে জানিয়ে দেও।

: আচ্ছা দিচ্ছি। তবে আমার দুটী কথা মনে রাখিস, বাবা। আমার স্মরণ হ'লে একটি ভুজ্যি তুই ব্রাহ্মণকে দান করিস। আর, আজীবন পেট ভরে খাস।

: পেটভরা খাবার যদি না জোটে, মা ?

: ভগবান তোকে কখনও খাবার কষ্ট দেবেন না।

অফুরন্ত আনন্দে জননীর কোলে লুটাইয়া পড়েন কুলদানন্দ। তাঁহার সাধন জীবনে পরম কল্যাণের পথ আজ নিষ্কণ্টক। গভীর আবেগে স্মরণ করেন :···জয় মা !···জয় গুরুদেব !···

পশ্চিমে রওনা হইলেন হরসুন্দরী। সারদাকান্তও পরীক্ষায় পর বাড়ী আসিলেন। দুই একটী বিষয়ে ভাল লিখিতে না পারায় বলিলেন : এবার পাশ না করলে আত্মহত্যা করব।

কুলদানন্দ ভরসা দেন : গোসাঁই নিশ্চয়ই পাশ করিয়ে দেবেন।

: গোসাঁইয়ের আবার তেমনি শক্তি আছে নাকি ?

: নিশ্চয়ই।

দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে দুই ভাইয়ের তর্ক চলে তিন-চার দিন। সারদাকান্ত বলেন : আচ্ছা, পাশ করলে গোসাঁইয়ের কাছে দীক্ষা নেব।

যথাসময়ে পাশের খবর আসিল। কুলদানন্দ নাছোড়বান্দা। অগত্যা সাধন লইতে সম্মত হইলেন সারদাকান্ত।

ফাল্গুন মাসে খবর আসিল, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জননী যোগমায়া দেবীর বৃন্দাবন-প্রাপ্তি হইয়াছে।···আবার জাতিস্মর গুরুভ্রাতা লালবিহারীও যাত্রা করিলেন পরমধামে। শুনিয়া কুলদানন্দের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। বৃন্দাবনে গুরুদেবের নিকট যাইবার জন্য চিঠি লিখিলেন। উত্তরে জানিলেন গোসাঁইজী গেণ্ডারিয়া আসিতেছেন; এখন হইতে সেখানে গিয়া থাকিতে পারিবেন। সাগ্রহে তিনি গুরুদেবের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

চৈত্র মাস, ১২৯৭। শেষরাত্রে কুলদানন্দ আসনে উপবিষ্ট। সহসা প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। মনে হইল গুরুদেব গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন।···সেইদিনই ছোটদাদাকে টানিয়া লইয়া ঢাকা রওনা হইলেন।

অপরাহ্নে গেণ্ডারিয়া পৌঁছিয়া শুনিলেন গুরুদেব সত্যই আগের দিন আসিয়াছেন। দেখিলেন আশ্রমে লোকে লোকারণ্য—গুরুদেব আমতলায়

উপবিষ্ট। অনেক দিন পরে ঠাকুরের সৌম্য, সুন্দর মুর্তি দর্শনে মনপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পরক্ষণে মনে জাগিল পূর্ব দুষ্কৃতির স্মৃতি—বিষণ্ণ মনে দূরে বসিয়া রহিলেন। জনতার মধ্যে ঠাকুরের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইলনা। অন্তর আজ তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে চায় নির্জনে,…একান্ত আপনার রূপে।…

অদূরে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন কুলদানন্দ। আমতলা একটু নির্জন হইলে ছোটদাদাকে পাঠাইলেন। সারদাকান্ত প্রণাম করিলে গোসাঁইজী বলিলেন : আচ্ছা, কুলদাকে বলব এখন।‥ হতবাক হইলেন সারদাকান্ত। গোসাঁইজী চিনিলেন কী করিয়া ? তাঁহার মনোভাবই বা জানিলেন কীরূপে ?…

আমতলায় দাঁড়াইয়া কুলদানন্দকে ডাকিলেন বিজয়কৃষ্ণ। কুলদানন্দের তৃষিত অন্তর বুঝি এই সাদর আহ্বানের অপেক্ষাতেই ছিল।…ত্বরিতে গিয়া তিনি প্রণত হইলেন গুরুদেবের শান্তিময় চরণতলে। তাঁহার অপার স্নেহে অভিষিক্ত হইলেন।

গোসাঁইজী বলিলেন : তোমার দাদাকে কুঞ্জের বাড়ী নিয়ে এস। এখনই তাঁর দীক্ষা হবে।

অনেকের সহিত সারদাকান্তের দীক্ষা হইল। গোসাঁইজী সমাধিস্থ হইলেন, গুরুভ্রাতা-ভগ্নিরা নানাভাবে অভিভূত ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দিকে উঠিল কান্নাহাসির রোল। গোসাঁইজী ভাবাবেশে বলিলেন : আহা - কী চমৎকার !‥ আজ হ'তে সত্যযুগ আরম্ভ হ'ল।…কুঞ্জবাবুর শ্যালিকা পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া তিব্বতী ভাষায় গোসাঁইজীর স্তবস্তুতি ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।…

স্তম্ভিত, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কুলদানন্দ। দীক্ষার পর ঠাকুরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, একজন বৌদ্ধযোগী বালিকার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।…

: আপনি ঐ ভাষা বুঝলেন কী করে ?

: এই সাধনেই সব হয়।…সুষুম্নাতে প্রবেশ করে সম্বিৎ-শক্তিতে মনটীকে স্থির রেখে শুনতে হয়। তাহলে শুধু মানুষ কেন, সমস্ত জীবজন্তু, বৃক্ষলতারও ভাষা বোঝা যায়।…

গুরুদেবের নিকট বিস্ময়ভরে আরো অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়া বাহিরে আসিলেন কুলদানন্দ। সকলেই ভজন গানে ও নামানন্দে নিমগ্ন। আর, অহেতুকী শুষ্কতার জ্বালায় তিনিই শুধু অস্থির।…গোসাঁইজীর কাছে গিয়া

বলিলেন : সকলের প্রাণেই আনন্দ—অথচ আমাকে পুড়িয়ে মাচ্ছেন কেন ?···

: বহুভাগ্যে এই শুষ্কতা আসে। ··স্থির হয়ে নাম কর।

: ভিতরটা সরস ক'রে দিন—গিয়ে বসে নাম করি।

: রোগী চাইলেই কি ডাক্তার তাকে কুপথ্য দেয় ?···নাম কর গিয়ে।··

দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি নামে নিমগ্ন হইলেন।

প্রথম বৎসরের ব্রহ্মচর্য শেষ হইতে আর তিন মাস বাকি। পয়লা বৈশাখ হইতে ব্রতের এই শেষ তিনমাস হোম করিবার নির্দেশ দিলেন গোসাঁইজী। হোম করিবার বিধি বলিয়া দিয়া একবেলা স্বপাক আহার করিতেও বলিলেন।···

বৈশাখের পূর্বেই বাড়ী গিয়া হোমের জন্য বিশুদ্ধ ঘৃত, কাষ্ঠ ইত্যাদি লইয়া আসিলেন কুলদানন্দ।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা বলিতে গোসাঁইজী যেন পঞ্চমুখ। তাঁহার কাছে বৃন্দাবনের অনেক রহস্য, মাহাত্ম্য, অর্ধকুম্ভ ও বৃন্দাবন পরিক্রমার কথা শুনিলেন কুলদানন্দ। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাপ্লুত হইলেন। মাতাজী যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার বিবরণ এবং সেই প্রসঙ্গে গুরুদেবের অপূর্ব সংযম ও নির্বিকার ভাবের কথা শুনিয়া উদ্বুদ্ধ হইলেন।

একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন : মহাপুরুষেরা কি কারো মৃত্যুতে শোকতাপ ভোগ করেন না ?

: হ্যাঁ, খুবই করেন—ভক্ত বিচ্ছেদে তাঁদের বিষম জ্বালা।

: তাঁদের শোকের কোন লক্ষণ কি প্রকাশ পায়না ?

: মাঝে মাঝে পায় বৈকি। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর একটী শুষ্কপত্র রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়তেই জ্বলে ওঠে।···কুতুকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে আমি তার পিঠে হাত দিতেই সে চমকে ওঠে—পরে ফোস্কার মত পাঁচটা আঙুলের দাগ পড়ে যায়।···

শুনিয়া হতবাক হইলেন কুলদানন্দ।

১লা বৈশাখ, ১২৯৮। শুভ নববর্ষ হইতে আরম্ভ হইল নিত্য হোম। সকালে স্নানান্তে নাম ও প্রাণায়াম করিয়া হোম করিতে বসেন কুলদানন্দ। ১০৮টী বিল্বপত্র দ্বারা মন্ত্রপাঠ করিয়া আহুতি দেন প্রজ্বলিত হুতাশনে।

গোসাঁইজী বলেন : উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হ'য়ে আসনে ব'সে হোম করবে।

নিষ্কাম যা কিছু উত্তরমুখ হয়ে, আর সংকল্পিত কার্য পূর্বমুখ হয়ে ক'রো। হোমধূম শরীরে লাগাতে হয়, নইলে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।

ঃ এই হোমের উপকারিতা কী ?

ঃ উপকারিতা অনেক আছে। ঠিকমত করে যাও, নিজেই অনুভব করতে পারবে।...

গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী হোম-বিভূতি দ্বারা সকালেই কপালে ত্রিপুণ্ড্র ও উর্ধ্বপুণ্ড্র করেন কুলদানন্দ। হোমের ধোঁয়া হাওয়ার দ্বারা শরীরে লাগাইয়া হোমের পর ফোঁটা ধারণ করেন। স্কন্ধে, উভয় হস্তে, কণ্ঠে, বক্ষে, মেরুদণ্ডে, নাভিমূলে সর্বত্র ত্রিরেখা দিয়া থাকেন।

স্নান ও তর্পণ, নাম ও প্রাণায়ামের সহিত এইভাবে মাসাধিক কাল হোম চলিল নিয়ম মত। ফলে আসন ছাড়িয়াও পবিত্র হোমগন্ধ সময়ে সময়ে অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমে প্রায় সর্বদাই যেখানে সেখানে অপূর্ব হোমগন্ধে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। চিত্তের প্রফুল্লতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নাম চলিতে থাকে সুস্পষ্ট ও সরস ভাবে। গন্ধ নামের এবং নাম গন্ধের প্রভাব বৃদ্ধি করে। গন্ধে মাতিয়া মন নিবিষ্ট হয় মধুর নামে। পরে সর্বত্র সর্বদাই হোমগন্ধ পাইয়া দিশেহারা হইয়া পড়েন। আর, এইভাবে হোমের উপকারিতা অনুভব করিয়া ভাবেন ঃ আশ্চর্য ঠাকুরের দয়া।...

একদিন অপরাহ্নে আশ্রমে রান্না করিবার সময় সহসা ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হোমের ভিজা কাঠগুলি ভাল করিয়া শুকাইবার জন্য আসন ঘরের বাহিরে রৌদ্রে দিয়া আসিয়াছিলেন। কাঠগুলি ভিজিয়া গেল ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভিজা কাষ্ঠে পরদিন কী করিয়া হোম করিবেন সেই দুশ্চিন্তায় স্মরণ করিলেন ঠাকুরকে। 'তাঁর দয়া হ'লে সবই সম্ভব'—ভাবিয়া অগত্যা স্থির হইলেন। আহারান্তে রাত্রে আসনঘরে যাইতেই বিস্মিত হইয়া দেখিলেন কাঠগুলি সবই ঘরের মধ্যে সাজান রহিয়াছে।...কাঠগুলি ঘরে আনিল কে ? দুই-তিন দিন সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কোন হদিস মিলিল না। এই তুচ্ছ ব্যাপারেও তাঁহার অন্তরে জাগিল প্রবল আলোড়ন ঃ হায় ঠাকুর ! আমার ব্যস্ততায় শেষে তোমারই এই কাজ ?...

আশ্রমে পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটী বন, তাহার মধ্যে একখানি নির্জন ঘরে তাঁহার আসন। আসনঘরটী আশ্রম হইতে কিছুটা দূরে অবস্থিত। তাহাতে নানা অসুবিধা, বিশেষতঃ রাত্রে ঠাকুরের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

তাই তাঁহার আসন করিলেন আশ্রমের নিকটেই পণ্ডিত দাদার রান্নাঘরে। গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করেন বৃন্দাবনের নানা অপূর্ব কাহিনী। প্রারব্ধ ভোগ, নিষ্কাম কর্ম, গুরুপূজা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুদেবের মহামূল্য উপদেশ গ্রহণ করেন। নিত্য সদগুরু সঙ্গলাভ এবং তাঁহার অমৃত-বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি কৃতার্থ। মনে যখনই যে-প্রশ্ন, যে-সংস্কার জাগে, নিঃসংকোচে তাহা নিবেদন করেন শ্রীগুরুর চরণে। আর তাঁহার সর্ব সংশয় গুরুদেবও নিমেষে দূর করিয়া দেন।

সকালে নিত্যকর্ম শেষ করিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া থাকেন এগারটা পর্যন্ত। আষাঢ় মাসের শেষে গোসাঁইজী একদিন তাঁহাকে রুদ্রাক্ষের মালা ও 'যোগপাট' ধারণ করিতে বলেন। তিনিও কাশীতে তারাকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয়কে একশত আটটী বড় বড় খাঁটি রুদ্রাক্ষ ও যোগপাট পাঠাইতে লিখিলেন।

প্রথম বৎসরের ব্রহ্মচর্য ব্রত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কত প্রলোভন, কত পরীক্ষার মধ্য দিয়াই তিনি রক্ষা পাইয়াছেন গুরুকৃপায়। অহর্নিশ দুর্লভ গুরুসঙ্গে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদে দিন কাটিতে থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করেন: ঠাকুর, এবারও ব্রহ্মচর্য ব্রত দিয়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণের অনুগত সেবক করে রাখ!

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। নির্জনে গুরুদেবকে তিনি বলিলেন: আজ আমার ব্রহ্মচর্যের এক বছর পূর্ণ হবে।

ব্রত উদ্‌যাপনে শিষ্যের সাফল্যে গোসাঁইজী প্রসন্ন। তিনি বলিলেন: কাল থেকে আবার ব্রহ্মচর্য নিও। নিয়ম যা ছিল তাই থাকবে। তবে সেইগুলি আরো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।

১লা শ্রাবণ, ১২৯৮। সকালে ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিলেন কুলদানন্দ। পশ্চাতে সাফল্যের তৃপ্তি, গুরুকৃপার উপর নির্ভরতার আনন্দ।...সম্মুখে পুনরায় ব্রতগ্রহণের অটুট সংকল্প...ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ব্রতপালনের গভীর প্রেরণা।... ঋষিদের পবিত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের প্রথম বর্ষ সমাপ্ত,...দ্বিতীয় বর্ষে শুভ পদার্পণের পুণ্য সন্ধিক্ষণ আসন্ন।...

আর এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য ব্রত প্রদান করিলেন গোসাঁইজী। বাকসংযম অবলম্বন করিবার বিশেষ নির্দেশ দিলেন, এবং সর্বদা পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। এছাড়া, নিত্য তর্পণ, হোম, সন্ধ্যায় নাম ও গায়ত্রী জপ, জীব ও অতিথি সেবা ইত্যাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন।

কুলদানন্দ : ব্রহ্মচর্য কি এক বছর ক'রেই নিতে হয় ?…

: তা নয়, বার বছর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। পাছে ব্রতভঙ্গ হয় এজন্য এক বছর করে দিচ্ছি। ঠিকমত চললে আগামী বছরে আবার পাবে। যেভাবে চলছ, নয় বছরেই তোমার হয়ে যাবে।

: এইবারের ব্রহ্মচর্যে নূতন আর কিছু নেই ?

: এমন কিছু নয়। তবে বছর বছর ব্রত নিয়ে পাঠ বৃদ্ধি করতে হবে। সেজন্য ব্যস্ত হয়ো না।

গভীর ভক্তিভরে আভূমি প্রণত হইলেন কুলদানন্দ।

ব্রহ্মচর্য ব্রতগ্রহণের দ্বিতীয় বর্ষ। প্রারম্ভেই গুরুদেবের হস্তে 'নীলকণ্ঠ বেশ' ধারণ ঠাকুর কুলদানন্দের জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কাশী হইতে রুদ্রাক্ষের মালা আসিল। গুরুদেবকে তাহা দেখাইলেন। মালাগুলি হাতে লইয়া গোসাঁইজী বলিলেন : চমৎকার দানা—সবগুলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিকমত গেঁথে নেও।

কয়েকদিন ধরিয়া ছুঁচ ও শনের দ্বারা রুদ্রাক্ষের প্রতি রন্ধ্রের শিকড়গুলি তুলিয়া ফেলিলেন। পরে মালাগুলি লইয়া গেলেন গুরুদেবের নিকটে। গোসাঁইজী দেবী ভাগবত খুলিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। *

পূণ্য একাদশী তিথি। প্রাতঃকৃত্য অন্তে সাগ্রহে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। সম্মুখে রাখিলেন নূতন উপবীত, যোগপাট ও রুদ্রাক্ষের মালা। প্রিয়তম সন্তানকে স্বহস্তে 'নীলকণ্ঠ বেশ' ধারণ করাইয়া দিলেন গোসাঁইজী। আবেশে, অব্যক্ত আনন্দে নিজেকে ধন্য মনে হইল কুলদানন্দের। তাঁহার সাধক জীবনে এতদিনে সুরু হইল নূতন অধ্যায়।…

নব উদ্যমে অগ্রসর হইলেন সাধনপথে। মনে জাগিল অবিচল নিষ্ঠা, বিধি-নিষেধের দিকে রাখিলেন সদাজাগ্রত প্রহরা। সর্বদা নতমস্তকে পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখিলেন। কয়েক দিন পরে গ্রীবাদেশে দেখা দিল বিষম বেদনা। সেইসঙ্গে চলিল কঠোর বাকসংযম—প্রকারান্তরে মৌনী হইলেন তিনি। বিশ্লেষণপটু কুলদানন্দের প্রতিপদে এত প্রশ্ন, এত যুক্তিতর্ক সবই যেন মন্ত্রবলে আজ নিস্তব্ধ।…

তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে—নির্জনে কোথাও গিয়া চিৎকার করিতে ইচ্ছা

* নবম পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নীলকণ্ঠবেশে শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

হয় যেন। প্রশ্ন পাইবার প্রত্যাশায় গুরুভ্রাতাদের কাছে গেলেও যন্ত্রণার একশেষ। কেহ ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেন, কেহ শিখা ধরিয়া ঘুরপাক দেন, আবার কেহ বা সজোরে চাপিয়া ধরায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া ওঠে।…অথচ বিনা প্রশ্নে কথা বলা নিষেধ; ফলে প্রতিবাদেরও অবসর নাই। অবস্থা বুঝিয়া মাঝে মাঝে দু-একটি কথা বলেন গোসাঁইজী—তবেই উত্তর দিয়া তিনি হাঁফ ছাড়েন।

একদিন গুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেন: আপনার সঙ্গেও কি খুশিমত কথা বলতে পারব না?

গোসাঁইজীর মুখে ফুটিল স্নেহমধুর হাসির রেখা। সন্তানের মনোবেদনা বুঝিয়া আশ্বাস দিলেন: আচ্ছা ব'লো।

: আর, শুধু আপনার দিকে চাইতে পারব তো?

: মাথা না তুলে যদি পার, চাইবে।

এইভাবে চলিতে থাকে তাঁহার কঠোর সাধনা। বীর্যধারণের জন্যও চলে আপ্রাণ প্রয়াস। প্রবুদ্ধ যৌবনে একদিকে প্রকৃতির নিয়মে বীর্যের অধোগতি, দেহমনে ক্ষণে ক্ষণে দারুণ উত্তেজনা—অন্যদিকে অন্তরে ঊর্ধ্বরেতা হইবার দুর্জয় সংকল্প।…অমোঘ গুরুশক্তির আশ্রয়ে অনুগত শিষ্যের কী অবিচল নিষ্ঠা।…

তবু প্রথম দিকে বীর্যরক্ষা হয় না কিছুতেই। তাহা না হইলে ব্রতনিয়ম, সাধনভজন সবই যে বৃথা।…গুরুদেবের নিকট নিজের অবস্থা ও অশান্তি তিনি অকপটে প্রকাশ করেন।

উৎসাহ দিয়া গোসাঁইজী বলেন: নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল, ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসবে।

ক্রোধ, স্নায়বিক দুর্বলতা ও অপরিমিত আহারনিদ্রা সম্পর্কে সাবধান হইবার নির্দেশ দিলেন গোসাঁইজী। তাঁহার নির্দেশে সন্ধ্যার পর ঘুমাইয়া রাত্রি প্রায় বারোটা হইতে সারারাত্রি নাম করিতে থাকেন কুলদানন্দ। বীর্যরক্ষা তবুও সম্ভব হইয়া ওঠেনা। তখন ঊর্ধ্বরেতা হইবার সাধন প্রণালী সাগ্রহে জানিতে চাহিলেন। শুধাইলেন: নিয়ম মত চললে ঊর্ধ্বরেতা হ'তে কত কাল লাগে?

স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে গোসাঁইজী বলেন: ঊর্ধ্বরেতা হওয়া বড়ই কঠিন। তবে ঠিক নিয়ম ধ'রে চলতে থাক—বেশী সময় তোমার লাগবে না।

প্রস্রাবের সময় ঘন ঘন বেগধারণ, সেই সঙ্গে নাম ও কুম্ভক, সংযম দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিয়া কুম্ভক দ্বারা ঊর্ধ্বদিকে বীর্য আকর্ষণ—এইসব প্রণালী বলিয়া দিলেন গোসাঁইজী। শিষ্যের উৎকণ্ঠায় ভরসা দিয়া বলিলেন: আমিও তো

তোমাদেরই মত ছিলাম।··· এখন কাম যে কী, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। ঊর্দ্ধরেতা হ'লে তোমারও এমনি হবে।···

নব উৎসাহে সাধন প্রণালী ধরিয়া অগ্রসর হইলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের সঙ্গে ভিন্ন কথাবার্তা বন্ধ। সারা দিনে আহার শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত। আর রাত্রি বারোটা হইতে সারারাত্রি চলিল নাম সাধন।

একদিন বৃষ্টিতে শ্রীধর অত্যধিক লম্ফঝম্ফ করায় বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন কুলদানন্দ। অমনি শ্রীধর গালি দিয়া পা দেখাইলে তিনিও জ্বলিয়া উঠিলেন। শ্রীধর বলিলেন ঃ এ লাফানি আর কী থামাবি – তোর উত্তেজনার সময় ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য যদি থামাতে পারিস, তবেই না বুঝি তুই বামুন !···

অপ্রিয় হইলেও রূঢ় সত্য।··· লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন কুলদানন্দ। গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিতে গিয়াই এই বিপত্তি। সারাদিন মনোকষ্টে কাটিল। শ্রীধরও জ্বর ও পা ব্যথায় কয়েকদিন অচল হইয়া রহিলেন। কুলদানন্দ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ অভিমান কিসে নষ্ট হয় ?

ঃ অভিমান নষ্ট ! বড় সহজ কথা নয়। সকলের অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করতে হয়। সাধন ভজন নিয়ে থাকলে কোন উৎপাতে পড়তে হয় না।

ঃ পাহাড়-পর্বতে থাকলে হয়ত অভিমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ঃ তা বটে, কিন্তু আহার ত্যাগ না হ'লে পাহাড়ে শান্তিতে থাকা যায় না। আহার ত্যাগ হ'লে রিপুদমনেও বিশেষ উপকার হয়।

ঃ আমি কি আহার ত্যাগ করতে পারব ?

ঃ কেন পারবে না ? প্রণালী মত ধীরে ধীরে অভ্যাস করে যাও।

আহার কমাইবার প্রণালী বলিয়া দিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন ঃ বীর্য ধারণই সমস্ত সাধনার মূল। বীর্যধারণ করতে পারলে সবই সহজ হয়ে আসে।

আশ্বিন মাস। শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীর সমাধি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মহাষ্টমী পূজার দিনে কুলদানন্দকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে বলিলেন গোসাঁইজী।

বুড়ীগঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি করিলেন কুলদানন্দ। মালা-তিলক ধারণ করিয়া গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিলেন সমাধি-মন্দিরে। জননী যোগমায়া দেবীর মূর্তি ধ্যান করিয়া ইষ্টনাম ও গায়ত্রী জপ করিলেন। সচন্দন পুষ্প, তুলসী ও পুষ্পমালায় সুসজ্জিত করিলেন জননীর আলেখ্য ও ৺নামব্রহ্মের পট।

মহাষ্টমী পূজালগ্নে ভাবাবেশে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন গোসাঁইজী। চণ্ডীপাঠ অন্তে জননীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন কুলদানন্দ। পরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সুরু করিলেন বজ্ঞাহুতি। নানা বিচিত্র বর্ণের সেই অগ্নিশিখার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হইল পরিচিত এক জ্যোতির্ময় মূর্তি।... শ্রদ্ধায়, আনন্দে তিনি অভিভূত হইলেন—প্রত্যক্ষ করিলেন গুরুদেবের অপূর্ব কৃপা। নৈবেদ্য নিবেদন, মঙ্গল আরতি ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম অন্তে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। মনে মনে বলিয়া উঠিলেন ঃ জয় ঠাকুর—তোমারই জয়।...

•

কার্তিক মাসে বাড়ী গেলেন কুলদানন্দ। সাত আট দিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে।

একদিন গুরুদেবকে বলিলেন ঃ আপনার সঙ্গে থেকেও তো দেখি প্রতিপদে নানা সন্দেহ। এর উপায় কী ?

ঃ সংশয়ের মাঝেই বিশ্বাস দেখা দেয়। মানুষের কিছু ক্ষমতা নেই, তাঁর কৃপাই সার।

বুদ্ধদেবের তপস্যার কথা বর্ণনা করেন গোসাঁইজী। তাঁহার বিচিত্র অধ্যাত্ম জীবনের কথাও মনে পড়ে কুলদানন্দের। বুঝিতে পারেন, ঈশ্বরের অপার করুণাই গুরুদেবের ধর্ম-জীবনের মূল ভিত্তি।...

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সহসা শান্তিপুর রওনা হইলেন গোসাঁইজী। উন্মাদিনী জননীকে রক্ষক অত্যন্ত প্রহার করায় তিনি পুত্রের নাম করিয়া মূর্ছিতা হন। ধ্যানযোগে তাহা শুনিতে পাইয়াই শান্তিপুর ছুটিয়া আসেন গোসাঁইজী। সঙ্গে আসেন কুলদানন্দ এবং সাত আট জন শিষ্য।

বহু আত্মীয়স্বজন গোসাঁইজীকে দেখিতে আসিতেন। একটী তরুণী ব্রাহ্মণ বিধবাও সর্বদা আসিতেন। তিনি কুলদানন্দকে নিজ গৃহে লইবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন গুরুদেবের অনুমতি লইতে বলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজীও আপত্তি না করায় তিনি সমস্যায় পড়িলেন।... বিধবার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গুরুদেব অনুমতি দিয়াছেন ভাবিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিধবাটীর গৃহে গিয়া দেখিলেন একটী মাত্র ছেলে ভিন্ন আর কেহ নাই। বিধবাটীও আদর আপ্যায়ণ করিতে গেলে তিনি বাধা দিলেন ; তখন সম্মুখে বসিয়া তরুণী নানা পরিচয় লইতে লাগিলেন। যুবতীর রূপলাবণ্যে

ও হাবভাবে কুলদানন্দের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।…সহসা ভীতভাবে তিনি উঠিয়া পড়িলেন, যুবতীর অনুরোধ ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন।

গোসাঁইজী শাসন করিয়া বলিলেন : ধর্মলাভ করতে হ'লে লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়তে হবে। কারো মানরক্ষা বা মনোকষ্টের দিকে তাকালে চলবে না। যিনি যত উন্নত হন না কেন, স্ত্রীলোক হ'তে সর্বদা দূরে থাকতে হবে।…উর্ধরেতা হ'লেও স্ত্রীলোক হতে ভীষণ অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আহত অভিমানে বলেন কুলদানন্দ : নিয়ত সদগুরুর সঙ্গলাভেও এসব কুপ্রবৃত্তি কি কিছুতেই যাবে না ?

: সদ্‌গুরুর সঙ্গ ! সে তো অনেক দূরের কথা। ঠিক মত সৎসঙ্গও তোমরা ক'চ্ছনা – করলে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।

: সৎসঙ্গ কাকে বলে ?

: সাধুর সঙ্গে ধর্মকথা বলাই সৎসঙ্গ নয়। তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার খুব ধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। ধীরে ধীরে নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে ও ধিক্কার জন্মে। স্বভাবের বিকৃত ভাবও নষ্ট হ'য়ে যায়।

সেইভাবে সৎসঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন কুলদানন্দ।

একদিন গোসাঁইজীর সহিত সকলে গেলেন অদ্বৈত প্রভুর ভজন-স্থান বাবলায়। সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে মন্দির প্রাঙ্গনে বসিলেন সকলে। গোসাঁইজী বলিলেন : এই স্থানের প্রভাব বড়ই চমৎকার—একটু স্থির হয়ে নাম করলেই বুঝতে পারবে।

স্থিরভাবে নাম করিতে লাগিলেন সকলে। ক্ষণকাল পরে কুলদানন্দ শুনিতে পাইলেন, একটী মহা সংকীর্তন ধ্বনি ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। পুলকে চিত্ত নাচিয়া উঠিল—কুলদানন্দ এবং আরো কয়েকজন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, সংকীর্তনে যোগদান করিবার জন্য মন্দিরের বাহিরে গিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দু-এক মিনিটেই বিলুপ্ত হইল সেই সুমধুর ধ্বনি। হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহারা।

গোসাঁইজী বলিলেন : ছেলেবেলায় এখানে এলে এই ধ্বনি শুনে আমিও ছুটাছুটি করতাম। স্থিরভাবে নাম করলে ওতে আরো যোগ দিতে পারতে। তোমরা খুব ভাগ্যবান—মহাপ্রভুর সংকীর্তনের ধ্বনি শুনেছ।…

বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন সবই গুরুদেবের কৃপা।…

বহুকাল হইতে একজন হিন্দুস্থানী সাধু আছেন এখানে। তাঁহার সম্পর্কে

গোসাঁইজী বলিলেনঃ এই ভাবে মরার মত প'ড়ে না থাকলে কি আর ধর্ম লাভ হয়?·· অভিমান একেবারে নষ্ট না হ'লে ধর্মের অঙ্কুর জন্মায় না—এটা নিশ্চয় জানবে; জ্যান্তে মরা হ'তে হবে।···

এতদিনে যেন নির্মম সত্যের সম্মুখীন হইলেন কুলদানন্দ।···

শান্তিপুর আসিয়া তুই দিন হোম ও স্বপাক আহার বন্ধ ছিল। গুরুদেবের আদেশে নানা অসুবিধা সত্বেও আবার তাহা আরম্ভ হইল। কৈশোর হইতে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় জাতিভেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন কুলদানন্দ। এ ছাড়া গুরুপরিবারে রান্না করেন এক ব্রাহ্মণ কন্যা। তবু স্বপাক আহারের কঠোর ব্যবস্থা কেন? গুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেনঃ আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা থাকা কি ভাল?

মৃদু হাসিয়া বলিলেন গোসাঁইজীঃ প্রকৃতিগত এবং সত্ব, রজঃ ও তমো এই গুণগত জাতিভেদ ব্রহ্মাণ্ড ভরা।··· যার তার হাতে খেলেই জাতি বুদ্ধি যায় না। বরং পাচকের দেহমনের সমস্ত ভাব খাদ্যের সঙ্গে ভিতরে সংক্রামিত হয়। একমাত্র পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে সর্বত্র অমৃত ভোজন করা যায়।···

স্বপাক আহারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সে-বিষয়ে যত্নবান হইলেন কুলদানন্দ।

এই সময়ে গুরুদেবের নিকট তাঁহাদের গৃহদেবতা ৺শ্যামসুন্দর, এবং সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী ও মহাত্মা শ্যামাক্ষেপা সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনেন তিনি। ফলে তাঁহার পৌত্তলিকতা-বিরোধী ভাবও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। গোসাঁইজীর সংস্পর্শে তাঁহার বিচিত্র ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে ক্রমশ নূতন দৃষ্টি লাভ করেন—গুরুদেবের উপর শ্রদ্ধাভক্তি গভীরতর হয়। গুরুদেবকে একান্তভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য মনে হয় নিজেকে।

ঠাকুরের লীলাভূমি মধুর ধাম শান্তিপুর। সেই শান্তিপূর্ণ ধামে পরমানন্দে দিন কাটিল কুলদানন্দের। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে তিনি গোসাঁইজীর সহিত কলিকাতা রওনা হইলেন।

সুরেশচন্দ্র দেব মহাশয়ের মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিলেন সকলে। এখানে জল-পায়খানা, রান্না ও থাকার নানা অসুবিধা। কয়েকদিন পরে শ্যাম-বাজারে একটা বাড়ীর ত্রিতলে ঘর লওয়া হইল। প্রকাণ্ড হল ঘর—দক্ষিণে বিস্তৃত ছাদ, পশ্চিমে বড় রান্নাঘর। বাসা সকলেরই ভাল লাগিল। গোসাঁইজীর আদেশে তাঁহার আসনের নিকটে আসন করিলেন কুলদানন্দ।

রাত্রি প্রায় দুইটা। হল ঘরে সকলে নিদ্রিত। গোসাঁইজীও নিজ আসনে সমাধিস্থ। শুধু কুলদানন্দ শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন। মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস মিলাইয়া যায় মহাশূন্যে। তাঁহার মনে হয়ঃ ঠাকুর ব্রহ্মচর্য দিয়েছেন; কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে এখনও যে তার ধ্যানে মগ্ন থাকতে ভাল লাগে।... সুতরাং এ ব্রহ্মচর্যে লাভ কী?

কাণে বাজে গোসাঁইজীর কণ্ঠস্বরঃ এক রাজ্যে দুই রাজার মঙ্গল হয় না। নিজে ম'রে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে দেহমনের রাজা করতে হবে। বৃক্ষের বীজ পচলেই অঙ্কুরিত হয়—অভিমান নষ্ট হ'লে তবেই চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ পাবে।...

হতবাক হইলেন কুলদানন্দ। মনের জ্বালায় নিজেই জ্বলিতেছেন শুধু। অথচ সমাধিস্থ থাকিয়াও ঠাকুর তাহা অনুভব করিলেন?... পরক্ষণে ঠাকুরের সতর্কবাণী হৃদয় দিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন।

পুনরায় ধ্বনিত হইল গোসাঁইজীর মধুর উপদেশঃ গভীর রাতে নিজের ভিতর সন্ধান করলে ক্রমে জানা যায় আমি কী।... ব্রহ্মচর্যই সমস্ত সাধনের মূল—আর, একমাত্র গুরুকৃপায় তা লাভ হয়। আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য।...

মনের দ্বন্দ্ব ও জ্বালা বুঝিয়া যেন অমৃত বর্ষণ করিলেন গোসাঁইজী। ফলে কুলদানন্দের অভিমান ও অন্তর্দাহ দূর হইল। গভীর ভক্তিতে তাঁহার চক্ষে ফুটিল আনন্দাশ্রু। বাকি রাতটুকু গুরুদেবের কৃপার কথা ভাবিয়াই কাটিয়া গেল।

এইভাবে দুর্লভ ব্রহ্মচর্য ব্রতের দুর্গম পথে কুলদানন্দকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন বিজয়কৃষ্ণ। কত বাধাবিঘ্ন, চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়া গুরুদেবের সহিত অনুগত শিষ্যের সুরু হইল পথ-পরিক্রমা। সেই পথে কুলদানন্দ কখনও চলিয়াছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে, কখনও নীলকণ্ঠ বেশে উধাও তাঁহার যাত্রাপথে। গুরুদেবের কঠোর শাসনে হৃদয়ে জাগিয়াছে হতাশার জ্বালা; আবার তাঁহারই করুণায় শুষ্ক অন্তর উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে নব উৎসাহে। ক্ষত-বিক্ষত চরণেও তাই অপূর্ব ছন্দবৈচিত্র্যে অব্যাহত রহিল তাঁহার অগ্রগতি।...

পার্ক ষ্ট্রীটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অসুস্থ। সশিষ্যে বিজয়কৃষ্ণ গেলেন মহর্ষি ভবনে। 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়'...বলিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন মহর্ষি। মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। মহর্ষির চোখেও দেখা দিল অশ্রুধারা। তিনি আবৃত্তি করিলেনঃ

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।

নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ

পরম বিনীত ভাবে বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন : আপনিই তো আমার গুরু।... আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

: এখন তুমিই গুরুর গুরু! তোমার জয় হোক।

অভিভূত হইলেন কুলদানন্দ। তাঁহার কর্ণে ঝংকৃত হইতে থাকে : "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা..."। সকলে প্রণাম করিলে মহর্ষি আশীর্বাদ করিলেন : গোসাঁইকে কখনও ছেড়ো না—ইনিই তোমাদের অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।...

সেই আশীর্বাণী কুলদানন্দের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অতঃপর সশিষ্যে কালীঘাটে ৺কালীদর্শনে গেলেন গোসাঁইজী। বলিলেন : জগন্নাথের রূপের সঙ্গে কালীরূপের মিল আছে। মায়ের কত দয়া।...

কুলদানন্দের ধারণা ছিল এই সমস্ত বিগ্রহাদি মনুষ্য নির্মিত। আজ তাঁহার নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল।

দ্বারভাঙ্গা গিয়া যোগ জীবন অসুস্থ শান্তিসুধাকে লইয়া আসিলেন। প্রবল জ্বরে ও পেটের অসুখে শান্তিসুধা মৃতপ্রায়। সারদাকান্ত এম-এ ও আইন পড়িতেছিলেন। অসাধারণ ধৈর্যের সহিত বিকারগ্রস্ত রোগিণীর সেবায় তিনি নিযুক্ত হইলেন। ভেদবমি পরিস্কার করিতে লাগিলেন দিব্য নির্বিকারে।...

একদিন চোখের জলে গোসাঁইজী বলিলেন : যথার্থ মায়ের মত সেবা করতে সারদাই পারেন। এমনটি আর দেখা যায় না।

কুলদানন্দের মনে ধিক্কার জন্মিল। এতকাল সাধন ভজন ও ঠাকুরের কত সেবা করিলেন ; আর ছোট দাদা দুই-পাঁচ দিন রোগের একটু সেবা করায় ঠাকুর অনেক বেশী প্রসন্ন হইলেন।...

ভাবিতেই গোসাঁইজী বলিলেন : স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যেসেবা, সে সেবা একপ্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা।

লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন কুলদানন্দ। এই ভাবে প্রতিপদে তাঁহার অভিমান দূর করিতে লাগিলেন গোসাঁইজী।

বড়দাদার আজো দীক্ষা না হওয়ায় কুলদানন্দের বড় অশান্তি। গুরুদেবের দীক্ষাদান লাগিয়াই আছে। এবার নিশ্চয় ঠাকুরের দয়া হইবে। ভাবিয়া বড়দাদাকে তিনি আসিতে লিখিলেন। ফয়জাবাদ হইতে আসিয়া হরকান্তও উপস্থিত হইলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তাঁহার দীক্ষা হইলে এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলেন কুলদানন্দ।

হরকান্ত তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলিলেন : একটা মেম যেন খাবার নিয়ে ভোগ দিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন।··· এ স্বপ্ন কেন দেখলাম ?

গোসাঁইজী বলিলেন : লক্ষ্মী এখন সাহেবদের ঘরে।··· যেখানে স্ত্রীলোকের মর্যাদা নেই, লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এদেশে দ্রৌপদীর যে লাঞ্ছনা দেখা দিয়েছিল, আজো তার ষোল আনা প্রায়শ্চিত্ত হয়নি।···

কুলদানন্দ উপলব্ধি করিলেন—লক্ষ্মী স্বরূপিণী নারী ভোগ-বিলাসের সামগ্রী নন, প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রী।···

কুলদানন্দ একাগ্রচিত্তে ব্রতপালনে নিমগ্ন। নিয়ম নিষ্ঠায় তিনি অতীব কঠোর। স্বভাবেও দেখা দেয় রুক্ষতা। কোন ত্রুটি বা নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহার নিকট অসহ্য। ফলে পূর্বের ছোট বাসায় নানা অসুবিধার জন্য গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদের সহিত কলহ সুরু হইয়াছিল।

একদিন বহু কষ্টে ভিজা কাষ্ঠ জ্বালাইয়া তিনি হোম করিতে ব্যস্ত। অতিরিক্ত ধোঁয়ায় অস্থির হইয়া একজন প্রতিবাদ করিলে জ্বলিয়া উঠিলেন : তোমাদের জ্বালা হয় ব'লে নিত্যকর্ম বন্ধ ক'রব নাকি ?···বাঃ !—

অমনি শোনা গেল গোসাঁইজীর আদেশ : কে আছ—আগুণে জল ঢেলে দেও। একটা সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি নেই !···

হোমের আগুণ নিভাইতে হইল, কিন্তু মনের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল চতুর্গুণ। সিঁড়ি ঘরে গিয়া তিনি হোম করিলেন। লজ্জায় ও ক্ষোভে সারাদিন ছটফট করিয়া কাটিল।

প্রদোষে ছাদে আসিয়া গোসাঁইজী বলিলেন : এখানে হোমের যায়গা ঠিক ক'রে নিয়েছ ? বেশ অপরকে কষ্ট দিয়ে কি কিছু করতে আছে। বিশেষতঃ বালকবৃদ্ধ, রোগী ও গর্ভবতীর সুবিধা দেখতে হবে সবার আগে। যাও এখন গিয়ে রান্না কর।

গুরুদেবের স্নেহমধুর বচনে সমস্ত দুঃখ-জ্বালা নিমেষে জুড়াইয়া গেল।

এ বাসায় তত অসুবিধা নাই। কিন্তু এক বেলা স্বপাক আহারের ব্যবস্থা—অথচ পূজা-পাঠ, জপ-তপ, হোমাদির পর বেলা তিনটার পূর্বে উনুন ধরাইবার সময় হইয়া ওঠে না। আহার শেষ করিতেও প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। ঐ সময়ে গুরুদেবের সঙ্গসুখ ও উপদেশাদি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলে দিনলিপির কিছু অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

বাধ্য হইয়া আহার-পর্ব সংক্ষিপ্ত করিবার সংকল্প করেন। একদিন সরকারী পাকের পরেই সেই উনুনে ভাতে সিদ্ধ ভাত রান্না করিলেন; ঘরের এক কোণে উহা রাখিয়া গুরুদেবের নিকটে আসিয়া বসিলেন। সাড়ে তিনটায় গিয়া পবিত্র ভাবে আহার করিতে প্রস্তুত, সহসা একজন গুরুভগ্নি পীড়িতা শান্তিসুধার জন্য পথ্য তৈয়ার করিতে উপস্থিত হইলেন। ধৈর্যহারা হইয়া ধমক দিলেন তিনি: আমি নির্জনে আহার করি জাননা? আমার অন্ন নষ্ট হ'ল—আজ আমি আর আহার করব না।…

বলিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন—আর অপ্রস্তুত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন গুরুভগ্নিটী। সেই মুহূর্তে গুরুদেবের আহ্বানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। সব শুনিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: আচ্ছা, যাও—সেই অন্নই খেয়ে নাও।

আহারান্তে গুরুদেবের নিকট গিয়া বসিলেন। গোসাঁইজী বলিলেন: মেজাজ একটু ঠাণ্ডা রেখে চ'ল—নইলে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর, শূদ্রের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। যাঁরা সত্বগুণী, তাঁরাই ব্রাহ্মণ। গুণ দ্বারা জাতিবিচার ক'রো—নইলে সংকীর্ণ হ'য়ে পড়বে।…

নত মস্তকে নীরব রহিলেন কুলদানন্দ। গুণ ভেদেই যে প্রকৃত জাতি বিচার, এই উপদেশে এতদ্দিনে স্বস্তি বোধ করিলেন।

: অন্যের পাক করা অন্ন খাবে না এই তোমার নিয়ম। রান্না হ'লেই নিবেদন করে খেয়ে নেবে। রেখে দিলে ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টি পড়ে। কুকুর-বিড়ালের স্পর্শও হতে পারে। সর্বদা বিচার ক'রে চলবে।

: যে সব নিয়ম দিয়েছেন, সেই ভাবে চললে কতকালে সিদ্ধিলাভ করতে পারব?

: শক্তিলাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর? একটি বৎসর বীর্যধারণ ক'রে চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সত্য হ'তে পারলে অনেক ঐশ্বর্য লাভ হবে; কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন প্রতিক্ষণে স্বতঃই ভগবানের নাম করবে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জানবে।… নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।…

এইভাবে সস্নেহ শাসন ও উপদেশে কঠোর সংযম ও নিয়মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন কুলদানন্দ। তবু মনে হয়—এত সংগ্রাম ও সাধন ভজন করিয়াও জীবনে উন্নতি হইতেছে কই? বাল্যের কুঅভ্যাস আজো

মজ্জাগত। গুরুদেবের অনন্ত কৃপায় দুরন্ত কামরিপু স্তিমিতপ্রায়—কিন্তু পরিবর্তে দেখা দিয়াছে নিদারুণ লোভ। একবেলা মাত্র ভাতে সিদ্ধ ভাত বরাদ্দ। কিন্তু প্রত্যহ গুরুদেবের আদেশেই নানা সুখাদ্য ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতে হয়। ফলে লোভাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে।… সকলের অজ্ঞাতে সুস্বাদু সামগ্রী গোপনে আহার করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত দেখা দিতেছে।… একদিন প্রাতে সাধনকালে প্রাণে দেখা দিল বিষম জ্বালা। গুরুসঙ্গও অরুচিকর মনে হইল যেন।…

পরে মনে জাগিল দারুণ অনুতাপ! দুর্লভ গুরুসঙ্গ লাভেও বিরক্তি!… প্রাণের দুঃসহ জ্বালায় গুরুদেবকে বলিলেন: আমি আর সহ্য করতে পারিনে। চেষ্টার কোন ত্রুটি কচ্ছি কিনা আপনি তো দেখছেন—এখন আর কী ক'রব?

: সেজন্য তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ব'সে ব'সে তাঁর নাম করো। ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাত কেটে যাবে।…একবার যদি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতে পার—'প্রভো! আমি আর পারলাম না, তুমি আমাকে রক্ষা কর'—তিনি রক্ষা করবেন!…এ ভিন্ন আর উপায় নেই।…

কুলদানন্দ বুঝিলেন এই তো পূর্ণ আত্মদান। ইহা সম্ভব হইলে তবে সর্ব জ্বালা ও বন্ধন হইতে দেখা দিবে মহামুক্তি। কিন্তু এত বিচার, এত চেষ্টা সত্ত্বেও অভিমান তবু দূর হয় কই?…

কয়েক দিন পরে কুলদানন্দ পুনরায় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন: চেষ্টা করে কি পাপের মূল নষ্ট করা যায় না?

: না—এবিষয়ে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই বললে হয়। একমাত্র ভগবানের দর্শনলাভ হ'লে তাঁরই কৃপায় পাপের মূল নষ্ট হয়ে যায়।

: তাহ'লে অমনি পড়ে থাকি—তাঁর কৃপা যদি কখনও হয় তো হবে।

: কাজ না করে কি নিস্তার আছে? চেষ্টা করেও মানুষ যখন নিজেকে অপদার্থ ব'লে বুঝতে পারে, তখনই সে ঠিক স্থানে এসে দাঁড়ায়।…

তবু মনের আকাশে ঘুরে বেড়ায় নানা সংশয়ের মেঘ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: প্রকৃত ধর্ম কী?

: ধর্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। যা দোষ বলে জান, আগে তা ত্যাগ কর। ত্রিতাপ অতীত হলে ধর্ম কী বুঝবে। ভগবানই ধর্ম।…

কথাটা আপন মনে আলোচনা করেন কুলদানন্দ। সংকীর্তনে গুরুভ্রাতাদের ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেন। মনে হয়—সকলেই তো বিষয়কর্মে ব্যস্ত, আর তিনি

সারাদিন নামজপে নিমগ্ন। তবু তাঁহার অন্তরে এত শুষ্কতা কেন? ভাবোচ্ছ্বাস সাধন সাপেক্ষ হইলে সর্বপ্রথমে তাঁহারই তো উচ্ছ্বসিত হইবার কথা; আর, কৃপা সাপেক্ষ হইলে ভগবানের কেন এই অবিচার?…

বস্তুতঃ, তখনও অভিমান শূন্য হইতে পারেন নাই তিনি। অন্তরে পরিপূর্ণ নির্ভরতাও দেখা দেয় নাই। তবু চিত্তের এই ব্যাকুলতাই তখন তাঁহার সাধন-জীবনের পরম সম্পদ। দারুণ শুষ্কতা অন্তরে উদ্রিক্ত করিয়াছে রসের পিপাসা, গভীর প্রেম ও অনুরাগ লাভের প্রেরণা।…

॥ দশ ॥

পৌষ মাসে সংবাদ আসিল যোগজীবনের স্ত্রীর অবস্থা অতি শোচনীয়। শিষ্যগণ সহ ঢাকা রওনা হইলেন বিজয়কৃষ্ণ। স্থানীয় গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়িয়া গেল—কুলদানন্দের চোখেও ফুটিল বিদায় অশ্রু। মনে হইল: হায়—ঠাকুরের জন্য যদি এমনি করে কাঁদতে পারতাম!…

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পৌঁছিলেন সকলে। গোস্বামী প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার পুত্রবধূ বসন্তকুমারী যাত্রা করিলেন অনন্তের পথে। আশ্রমে পাচক ব্রাহ্মণ নাই—চাকর মাত্র একজন। শান্তিসুধাও রোগে দুর্বল। কাজেই এখন একমাত্র সম্বল বৃদ্ধা দিদিমা। দিনরাত হয়রাণ হইয়া তিনি সুরু করিলেন বকাবকি, গালিগালাজ। অভাব বশত খাওয়ার কষ্টও আরম্ভ হইল। ফলে আশ্রমে দেখা দিল অশান্তি, পরনিন্দা ও ঝগড়াবিবাদ।

কুলদানন্দ ও গুরুভ্রাতারা বলিতেন, সর্বদা গুরুসঙ্গ করিতে পারিলে সহস্র কষ্ট বা অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না তাঁহারা। এবার সেই অভিমান চূর্ণ হইতে লাগিল। স্বপাক আহার করেন বলিয়া কুলদানন্দ নিশ্চিন্ত; কিন্তু গুরুভ্রাতাদের অধঃপতনে তাঁহার অন্তরে জাগিল গর্ববোধ। গুরুভ্রাতারা তাঁহার সঞ্চিত কাষ্ঠ গোপনে লইয়া ধুনি জ্বালাইতে লাগিলেন; আর ডাল, লবণ, তরকারি প্রভৃতি চুরির অপবাদ রটাইতে লাগিলেন তাঁহারই নামে। অথচ গুরুদেব নির্বিকার! অবশেষে অত্যধিক বিরক্ত হইয়া বাদানুবাদে লিপ্ত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের প্রতি দেখা দিল অশ্রদ্ধা। আর ধারণা হইল, সদ্‌গুরুর আকর্ষণে ধর্মলাভের উদ্দেশ্যে একমাত্র তিনিই সেখানে রহিয়াছেন।

কিন্তু তিনি ঠাকুরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র কিনা জানিবার জন্য প্রাণে জাগিল গোপন আকাঙ্খা। একদিন ঠাকুরকে বলিলেন : সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করে কেউ বা নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে চলেছে, কেউ বা উল্টা পথে যাচ্ছে। কিন্তু কারো সামান্য দোষে গুরুতর শাসন ক'চ্ছেন, কারো বা গুরুতর অপরাধও উপেক্ষা ক'চ্ছেন। এরকম ক'চ্ছেন কেন ?...

: মানুষের প্রকৃতি ও অবস্থা বুঝে তাকে চালাতে হয়—সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা চলে না। আর, যার যেটী সে সেইটী নিয়ে থাকবে। আমার মত না চললে কারো কিছু হবেনা—এটা মনে করা অত্যন্ত ভুল।

কুলদানন্দ বুঝিলেন তাঁহার ভুল কোথায়। তবু সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন : সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করলে সকলের কি একই অবস্থা লাভ হবে ?

: তা হ'তেই হবে। দশটী লোক ট্রেণে চাপলে তারা জেগে বা ঘুমিয়ে থাক, ঝগড়া করুক বা তাস-পাশা খেলুক, সকলকে একই স্থানে পৌছাতে হবে।

: তবে আর নিয়মাদি পালন করে লাভ কী ?

: লাভ খুবই আছে। যাবে সকলে একই স্থানে—তবে কেউ পালকিতে ব'সে, আর কেউ বা পালকি ঘাড়ে নিয়ে।...চলার পার্থক্য এই মাত্র।

মনে বেশ আনন্দলাভ করিলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা সত্যই সার্থক। তাছাড়া, গুরুদেব যে নীলকণ্ঠ বেশ দিয়াছেন একমাত্র তাঁহাকেই। তাইতো তাঁহার ক্ষেত্রে গুরুদেবের এত কঠোর নির্দেশ ও অনুশাসন।...

তাঁহার সূক্ষ্ম আত্মাভিমান তবু দমিত হইলনা। গুরুভ্রাতাদের উপর তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ পাইল, আর নিজের অবস্থায় তিনি স্ফীত হইয়া উঠিলেন। হোম ও পাঠ, মালা-তিলক ও নীলকণ্ঠ বেশ ধারণ—এইসব বাহ্যিক ক্রিয়ার দিকে দেখা দিল অধিকতর আগ্রহ। আর নামানন্দ ক্রমে অন্তর্হিত হইল। দেহে সুরু হইল নানা উপসর্গ, ঘন ঘন বীর্যক্ষয়—মনে জাগিল অরুচি ও বিরক্তি। রুদ্রাক্ষ ধারণ স্থানে জ্বালা যন্ত্রণার সৃষ্টি হইল, মস্তিষ্কেও আগুন ধরিয়া গেল যেন।... দুঃসহ যন্ত্রণায় গুরুদেবকে বলিলেন : আমার এমন দুর্দশা হল কেন ?

: দুর্দশার আর হয়েছে কি! ধর্মটী তামাসার জিনিষ নয়—ধর্মের পথ সকলের পায়ের তলা দিয়ে।...ধর্মের বেশভূষা ধারণ করে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠার ভাব মনে এলেই সব ত্যাগ করতে হয়—নইলে সর্প হ'য়ে দংশন করে।...দেহ

মন ঠাণ্ডা না হ'লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ্য হবে না। এখনই গিয়ে রুদ্রাক্ষ মালা তুলে রাখ—শুধু তুলসীর মালা ধারণ কর।

লজ্জায় ও অনুতাপে সেই আদেশ পালন করিলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন ধর্মের অভিমানও সাধন পথের প্রধান অন্তরায়। সেই অভিমানের প্রতিক্রিয়ায় দেহমনে দেখা দিয়াছে এই তীব্র জ্বালা।

ধর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া সদ্‌গুরুসঙ্গে বাস করিবার বিশেষ সৌভাগ্যলাভ করেন তিনি। আর প্রতিপদে গুরুদেবের নিকট অকপটে প্রকাশ করেন দেহমনের সমস্ত দুর্বলতা ও সংশয়। অনুগত শিষ্যের প্রতি গোসাঁইজীরও ছিল সদাসতর্ক দৃষ্টি। তাই অপরের দোষত্রুটি উপেক্ষা করিলেও প্রতি দুর্বল মুহূর্তে কুলদানন্দকে তিনি জানাইয়াছেন সস্নেহ অনুশাসন।

তিনি বলিলেন: শরীর বিকারশূন্য না হলে সাধনভজন হয়না। বিশুদ্ধ সাত্বিক আহার দ্বারাই দেহ শুদ্ধ হয়। আগে দেহটাকে ঠিক করে নেও।

আহারের মাত্রা ও শুচিতা রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিলেন কুলদানন্দ। ঠাকুরের প্রসাদ সহ শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত আহার করিতে লাগিলেন।

রুদ্রাক্ষ মালা খুলিয়া রাখায় কিছু দিনেই শরীর নিস্তেজ ও মন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। নিয়মনিষ্ঠা সত্বেও এলোমেলো স্বপ্ন দেখার তবু বিরাম নাই। একদিন স্বপ্নঘোরে একটী তরুণী আত্মীয়ার সহিত প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করায় স্বপ্নদোষ হইল। অবসর মত গোসাঁইজীকে তাহা জানাইয়া বলিলেন: ঐ মেয়েটীকে তো একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম, তবু কেন এমন হ'ল?

স্বপ্নঘোরেও প্রকাশিত মানসিক দুর্বলতার সহিত সংগ্রাম চলিয়াছে অনুগত শিষ্যের।...গোসাঁইজী বলিলেন: স্বভাবদোষ তো ফুটে বের হবেই—মেয়েটীর উপর বহুকাল যে তোমার আসক্তি ছিল। কল্পনাতেও কামভাব না এলে এই প্রবৃত্তি নষ্ট হয়েছে বুঝবে। অষ্টপ্রকার মৈথুনই ত্যাগ করতে হবে। বীর্যরক্ষার জন্যে ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা চাই।...কোন অসৎ কল্পনা মনে এলে চিৎকার করে গান অথবা পাঠ ক'রো।

কুলদানন্দ বুঝিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত সত্যই কত কঠোর! নিদ্রায় জাগরণে কোন মুহূর্তেই ফাঁকি চলিবেনা, অমনই সেই ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিবে কালসর্প। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম-জপ মহামন্ত্র দ্বারা সেই দুর্জয় রিপু বশীভূত করিতে হইবে। আর, এই দুর্গম সাধনপথে ত্যাগ করিতে হইবে সর্ব অভিমান ও অহংকার।...

দুর্বলতা তবু ঘুচিতে চায়না। পূর্বে যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইয়াছে, এখন তাহাই ঘিরিয়া ধরিয়াছে অক্টোপাশের মত। স্বভাবের বিন্দুমাত্র দোষ এখন যেন অপার সিন্ধু হইয়া উঠিয়াছে।...

হতাশ হৃদয়ে গুরুদেবকে তিনি বলিলেন : এত চেষ্টা ক'রে একটা দোষও তো ছাড়তে পারলাম না।

সহানুভূতির সহিত বলেন গোসাঁইজী : স্বভাবদোষ কি সহজে যায়? বিধি পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জনই কঠিন। নিয়মগুলি পালন করে যাও—দোষ আপনিই যাবে।

: নিয়ম পালন ও নিষেধ বর্জন করতে না পারলে কি অপরাধ হয়?

: না—সব পারলে তো সিদ্ধই হ'তে। যতটা পার করে যাও। হঠাৎ যা হয়ে পড়ে, তা নিজে করলে মনে কর কেন? সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব ক'চ্ছেন ও করাচ্ছেন—এটী বুঝলেই শান্তি।

: এত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে তখন যে অনুতাপ হয়।

: পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম কিছুই আমরা বুঝিনে। ওসব একটা সংস্কার মাত্র।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় বলিলেন : আমরা প্রত্যেক দিন কত অপরাধ করি ; সেই সঙ্গে আমাদের যে আরও বিপন্ন করলেন।

: কেন?

: আপনার বিধি-নিষেধ মেনে চলা তো অসম্ভব ; তাই গুরু-আদেশ লঙ্ঘন ক'রবার গুরুতর অপরাধও যোগ করে দিয়েছেন।

: এ সম্বন্ধে কী ভেবেছ?

: কতকগুলি উচ্চ লক্ষ্য আমাদের সামনে ধ'রে দিয়েছেন ; সেই দিকে দৃষ্টি রেখে সাবধানে চেষ্টা করলে ক্রমে সেই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে আমরা ধন্য হব—এই বোধ হয় আপনার ইচ্ছা।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিকই বলেছ।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন কুলদানন্দ। স্বেচ্ছায় কোন অন্যায় করা চলিবে না ; সার্থকতার প্রশ্নও অবান্তর। আন্তরিক প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে স্থির লক্ষ্যপথে—আর সম্বল শুধু গুরু-গোবিন্দের অনন্ত কৃপা ও আশীর্বাদ।...

কিছুদিন হইল গুরুদেবের আদেশে কুলদানন্দকে আশ্রমস্থ সকলের সেবা ও কাজকর্ম করিতে হয়। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত কাজ করিয়া আর অবসর

মেলেনা। সময় সময় নাম করিতে বিরক্তি বোধ হয়, বাহিরের কাজকর্মও ভাল লাগে না। তখন গুরুদেবের সহিত তিনি কথাবার্তা বলেন।

একদিন স্বপ্নযোগে একজন মহাত্মা বলিলেন: গুরুর আদেশ মত কাজ করে যাও, কখনও নিরুৎসাহ হ'য়োনা। কর্মটী ত্যাগ করতে নেই—বৈধ-কর্ম দ্বারাই রজ-তম গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

স্বপ্নের কথা জানাইলে গোসাঁইজী বলিলেন: নাম ক'রতে বিরক্তি এলে বাইরের কাজই করতে হয়। জোর ক'রে নাম করতে গেলে আরো শুষ্কতা আসে।

: জোর করে নাম বা পাঠ করলে কি বেশী উপকার হয় না?

: না—লক্ষ্য স্থির রেখে কাঁথা সেলাই কর আর নাম কর, একই কথা। তোমার এখনও জীবনের একটা দিক ঠিক হয়নি—হ'লে একধারা কর্ম করবে। সকলের তো এক পথ নয়। বসে থাকতে নেই—তাহলে ক্রমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।...

আবার স্বপ্ন দেখিলেন: আকাশে বাতাসে যেন দেখা দিয়াছে ভীষণ প্রলয়। অমনি 'জয়গুরু' বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। একটু পরে দেখিলেন চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ।...নিদ্রাভঙ্গের পর মনে হইল, তাঁহার হৃদয়-আকাশে অমনি প্রলয় দেখা দিবে কিনা কে জানে—দিলেও একমাত্র সম্বল শ্রীগুরুর পাদপদ্ম।...

কয়েকদিন পরে আরো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখিলেন: গুরুদেব যেন দেহত্যাগে উদ্যত হইয়া সকলকে কিছু একটা দিলেন। তাঁহাকেও একটা জিনিষ দিলে মাথায় রাখিয়া ভাবাবেশে নৃত্য সুরু করিলেন। পরে সেই বস্তুর উপর আসন করিয়া নাম করিতে লাগিলেন।...

স্বপ্নকথা গুরুদেবকে জানাইয়া তিনি বলিলেন: যা মাথায় পেলে ধন্য হওয়া যায়, তা মাটিতে ফেলে আসন ক'রবার প্রবৃত্তি হ'ল কেন?

: ওটী হ'চ্ছে শক্তি। ভগবানের নাম ক'রতে হলে শক্তির উপরই তো ব'সতে হয়।...

স্বপ্নগুলির গুরুত্ব অনুভব করিয়া উৎসাহ ভরে নিয়মনিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। কিন্তু আশ্রমের দক্ষিণের ঘরে সকলে আসিয়া গল্প করায় সাধন করার বড়ই অসুবিধা হইল। সেকথা গুরুদেবকে জানাইলে অন্যত্র যাইবার নির্দেশ দিয়া তিনি বলিলেন: নাম করা নিয়েই কথা—তা তো যেখানে সেখানেই হ'তে

পারে। দশজনে আনন্দ ক'রলে তাদের বাধা দিয়ে নিজের সুবিধা দেখতে নেই।...

ঃ যদি বলেন, আশ্রমের দক্ষিণ-পুব কোণে ছোট ঘর বেঁধে নিতে পারি।

ঃ তারপর ? কোথাও চ'লে গেলে ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে ?...

ব্যথিত হইলেন কুলদানন্দ। ঠাকুর একথা বলিলেন কেন ?

পরে তাঁহার সম্পর্কে গোসাঁইজী জনৈক শিষ্যকে বলিলেন ঃ অনেক চেষ্টায় একশত টাকা জমিয়েছে। কোনরকমে তা খরচ করিয়ে দিতে পারেন ? কৃপণতাই সংকীর্ণতা কিনা।...

সেই সঙ্গে সারদাকান্তের উদারতার প্রশংসা করিলেন। তাঁহার কথা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন কুলদানন্দ। ঠাকুরের উপর বড় অভিমান হইল। এই তুচ্ছ সঞ্চয় তো বিলাসিতার জন্য নয় ; অভাব অভিযোগে মন অশান্ত হইলে সাধনভজন হইবে কীরূপে ? ঠাকুর এত বোঝেন, আর এইটুকু বুঝিলেন না ? তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সত্যই কি স্বভাবে সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছে ?..

উত্তর মিলিল দু-চা'র দিনেই। আশ্রমে ঘৃত বাড়ন্ত, তাই গুরুদেবের সেবায় প্রত্যহ অর্ধ ছটাক ঘৃত দিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে লক্ষ্য করিলেন আশ্রমে আর ঘৃত আসিতেছে না। মনে হইল ঃ এত কষ্টের ঘি—এভাবে দিলে তো এক মাসের হোমের ঘি দশ দিনেই শেষ হ'য়ে যাবে।

সেই দিনই গোসাঁইজী শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে বলিলেন ঃ খাবার সময় ওর ঘি আমাকে দেবেন না—হজম হবে না।...

চমকিয়া উঠিলেন কুলদানন্দ। সারা অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে গুরুদেবকে বলিলেন ঃ আমার সংকীর্ণতা কিসে যাবে ? টাকাগুলি দান ক'রে ফেলব ?

সস্নেহে হাসিয়া গোসাঁইজী বলিলেন ঃ সাময়িক ভাবের বশে কিছু করতে নেই—পরে অনুতাপ হ'লে নরক ভোগ করতে হয়।.. দাদারা যা দেন ব্যয় ক'রো। যে পথে চলেছ, সঞ্চয় করতে নেই।

ঃ ব্যয় করব অপরের জন্যে, না নিজের দরকারে ?

ঃ তোমার আবার কিসের দরকার ? আজ থেকে খাবার জন্যে ভিক্ষা ক'রবে। টাকা কারো কাছে চাইবে না। দিনে যা দরকার তার বেশী নেবে না, বা রান্না করবে না। কেউ বেশী দিলে বিলিয়ে দেবে। ভিক্ষা যেদিন না

জুটবে ভাণ্ডার থেকে নেবে। এইভাবে চ'লে যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে, তবেই তো সন্ন্যাস।···

নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন কুলদানন্দ। তিনি যে 'গর্ভস্থ সন্তান'—পরম কল্যাণের জন্য তাই বুঝি গুরুদেবের এত মমতা, অথচ এত কঠোর ব্যবস্থা। গভীর শ্রদ্ধায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ভিক্ষা কত বাড়ী করব ?

ঃ তিন বাড়ী পর্যন্ত।

ঃ কোন্ কোন্ জাতির বাড়ী ভিক্ষা করা যায় ?

ঃ চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ী করা যায়। শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন সর্বদাই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাই ব্যবস্থা।

প্রথম দিন যেরূপ ভিক্ষা মেলে, সারা জীবন নাকি ভিক্ষা লাভ হয় সেই ভাবেই। উপনয়ণের সময় প্রথম ভিক্ষা লইতে হয় জননীর হস্তেই। ভাবিয়া কুলদানন্দ বলিলেন ঃ জীবনে প্রথম ভিক্ষা তাহলে আপনার কাছেই ক'রব।

পরম স্নেহে একগাল হাসিয়া বলিলেন গোসাঁইজী ঃ বেশ তো—আমিই আজ তোমায় ভিক্ষা দেব।

সেদিন গোস্বামী প্রভুর সেবার জন্য আশ্রমে আসিল প্রচুর উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। প্রসাদী পলান্ন, ছানার ডালনা প্রভৃতি কুলদানন্দকে দিয়া গোসাঁইজী বলিলেন ঃ আজ এই তোমার ভিক্ষা। রেখে দেও—সময় মত খেয়ো।

নিজেকে ধন্য মনে হইল। কিন্তু ভাবিলেন ঃ হায় ঠাকুর ! প্রথম ভিক্ষার এমন উৎকৃষ্ট প্রসাদ—গরম থাকতে একটু তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দিলে না !···

চার-পাঁচ ঘন্টা পরে অপরাহ্নে আহার করিতে বসিয়া চমকিয়া উঠিলেন। একি—প্রসাদী সবকিছুই যে চমৎকার গরম !··· তাঁহার চক্ষে ফুটিল অশ্রু বিন্দু।··· হে দয়াল—তোমার এতই দয়া !···

সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলেন—সংকল্প মাত্রেই বিহঙ্গের মত তিনি উড়িয়া চলিয়াছেন শূন্য মার্গে,···অনন্ত আকাশে।···

২৩শে ফাল্গুন, ১২৯৮। কুলদানন্দের ধর্মজীবনে আজ বাহিরে প্রথম ভিক্ষার স্মরণীয় দিন। পথে বাহির হইয়া মনে হইল, দূর হইয়া যাক সমস্ত সংকীর্ণতা ও অভিমান। ভিক্ষা করিয়া অন্তরে জাগিল নূতন তৃপ্তি ও আনন্দ।···

কিন্তু টাকাগুলি ব্যয় করা চাই। শ্রীবৃন্দাবনে জননী যোগমায়া দেবী গোসাঁইজীকে মহাভারত দিতে চাহিয়াছিলেন। ভাবিলেন গুরুদেবকে এবার

মহাভারত দিবেন। টাকা আনিবার জন্য বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গোসাঁইজী বলিলেন : বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা ক'রো না, মায়ের কষ্ট হবে—মা-ঠাকরুণের প্রসাদ পেয়ো।

বাড়ী যাইবার পথে বহুবার ধূপ-চন্দনের সুরভিতে তিনি বিস্মিত হইলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিলেন। জননীকে পঁচিশ টাকা দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। চল্লিশ টাকা দিয়া গুরুদেবকে মহাভারত কিনিয়া দিলেন, আট-দশ টাকার বইও কিনিলেন। কিন্তু বাকি টাকা দিয়া কী হইবে? এ উৎপাতের শান্তি হইবে কী করিয়া? পরদিন টাকাগুলি গোসাঁইজীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে দিয়া বলিলেন : দিদিমা, এই টাকা ইচ্ছামত ব্যয় ক'রবেন। আশ্রমের ভাণ্ডারে আমি দিলাম।

প্রকৃত দানব্রতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গোসাঁইজী বলিলেন : প্রতিষ্ঠা অথবা উৎপাত শান্তির জন্য যে দান, তা দানই নয়। যার প্রয়োজন, শ্রদ্ধা ও দরদের সঙ্গে তাকেই দান করতে হয়।

লজ্জিত হইলেন কুলদানন্দ, কিন্তু উপলব্ধি করিলেন গুরুদেবের উপদেশ।

অবিচ্ছিন্ন সদ্গুরু সঙ্গে দিন কাটিয়া যায়। সেই সঙ্গে চলে কঠোর সাধনভজন ব্রতনিয়ম, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ। তবু স্বভাবদোষ যাইতে চায় কই? ধর্মজীবনে এ কী বিড়ম্বনা?...

একাদশী তিথি। নিরম্বু উপবাসের সহিত চলিয়াছে সংযম সাধন। সন্ধ্যার পর কতকগুলি বালিকা আসিয়া গল্প বলিবার বায়না ধরিল। দু-একটী গল্প বলিয়া তিনি তাহাদের বিদায় করিলেন। কিন্তু রাত্রে দেখা দিল স্বপ্ন দোষ।... বারোটা হইতে বাকি রাত্রি দারুণ আক্ষেপে ছটফট করিয়া কাটিল। মনে হইল, সবই বৃথা—শুধুই পণ্ডশ্রম!...শ্রীগুরুর ব্যবস্থামত এতকাল চলিয়াও সামান্য একটা দুর্গতির অবসান হইল না?...তবে প্রকৃত ধর্মলাভ ও ভগবৎপ্রাপ্তির আশা কোথায়?

গুরুদেবের উপর বিশ্বাস ভিন্ন সাধনপথে অগ্রগতি দুরাশা মাত্র। তবু অত্যধিক চিত্তচাঞ্চল্যে সে আস্থা আর রহিল না। গুরুদেব কেবলই ভরসা দেন সময়ে সব হইবে; কিন্তু কিছুই তো হইতেছে না।...অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় দিন গোনা যায় আর কতদিন?...তিনি মরিয়া হইয়া উঠিলেন যেন। মনে হইল ঠাকুরকে শেষ প্রণাম করিয়া বিদায় হইবেন।...

প্রত্যূষে স্নান ও নিত্যকর্ম সারিয়া লইলেন। গুরুদেবের চা-সেবার পূর্বে ঘরের বাহিরে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন—উঠানে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। 'হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম!'—মনে হইতেই সারা অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল, চোখে দেখা দিল অশ্রুধারা।...

নিমেষে সেই নীরব ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হইল শ্রীগুরুর হৃদয় আকাশে।... দুই মিনিটকাল তিনিও রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: হরিবোল—হরিবোল!... কুলদানন্দ মাথা তুলিতেই পশ্চাতে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন গোসাঁইজী। ছলছল চক্ষে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন: আহা! কাল নিরম্বু উপবাস ক'রে এখনও কিছু খাওনি! এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাণ্ডা হও গিয়ে।...

পলকে শতধারে অমৃত বর্ষণ হইল যেন! তাঁহার মমতাভরা সুমধুর অর্ধস্ফুট কণ্ঠস্বর তরঙ্গায়িত হইল কুলদানন্দের হৃদ্-যমুনায়।...রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।...গোসাঁইজী কিছু মিষ্টি ও ফল হাতে দিলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কেবলই মনে হইতে লাগিল: আহা! এত স্নেহ আর কার? এত দরদের চক্ষে এ জগতে দেখবে আর কে?...

জলযোগ সারিয়া একটু পরে গুরুদেবের নিকট গিয়া বসিলেন। গোসাঁইজী পাঠ বন্ধ করিলে বলিলেন: অনেক সময় অনেক কথা আপনাকে ব'লব মনে করি কিন্তু কাছে এলে ভুলে যাই।

: ব'লবার কী আছে? কাজ ক'রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎ তো মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ সোনার পাত্রে না রাখলে নষ্ট হ'য়ে যায়। আধারটী ঠিক ক'রে নিয়ে মহাত্মারা বস্তু দেন। অবস্থালাভের জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না, সময়ে ঠিকই হ'য়ে যাবে।...

কিছু না বলিতেই সংশয়ের মেঘ অপসারিত করিয়া দিলেন অন্তর্যামী গুরুদেব। আশ্বস্ত হইয়া কুলদানন্দ বলিলেন: আশা পেলেই তো নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।...

সান্ত্বনার সুরে বলিলেন গোসাঁইজী: এখনই যদি উচ্চ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট হবে—তুমি স্থির থাকতে পারবে না। সেই ঐশ্বর্যের গৌরবে সমস্ত সংসার ছারখার করে সর্বনাশ করবে! অভিমানটী নষ্ট হ'লে তবে ঐসব ঐশ্বর্যলাভ নিরাপদ। এখন ওসব দিকে খেয়াল না রেখে কাজ ক'রে যাও।

কুলদানন্দের মনে হইল সুদুর্গম ধর্মপথে অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, হিতে বিপরীত হইবে। শিশুর হস্তে ইন্দ্রের বজ্র দিলেই দেখা দিবে মহাপ্রলয়।... সাধনপথে ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করিয়া তবেই অতুল ঐশ্বর্যলাভের যোগ্য অধিকারী হইতে হইবে।...

তেমনি সস্নেহে বলিলেন গোসাঁইজী : ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্ত্রীলোকের সহিত কোনপ্রকার সংস্রব রাখলে চলবে না। বৃদ্ধা বা বালিকা হ'লেও সর্বদা তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকবে। 'বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি'—বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ মুক্ত পুরুষকেও আকর্ষণ করে।...শাস্ত্রের অনুশাসন সর্বদা মনে রাখবে।

আশ্চর্য মানুষের মন।...জ্যোতির্ময় সূর্যালোকেও সংশয়ের মেঘজাল ছিন্ন হইতে চায় না।...গোসাঁইজী মহাভারত পাঠ করিলেন, কুলদানন্দের মনের উদ্বেগ তবু দূর হইল না। সংশয় চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া প্রকারান্তরে প্রশ্ন করিলেন : গুরু তো ভগবান—তবে কি ভগবানের কথাও মিথ্যা হয়?...

: না—তাঁর ইচ্ছা, কার্য, বাক্য সবই সত্য।...

এবার সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন কুলদানন্দ : শ্যামবাজারে বলেছিলেন, দুই ঘণ্টা স্থির হ'য়ে বসে নাম করলে স্বপ্নদোষ হবে না। আমি তো প্রত্যহ পাঁচ-সাত ঘণ্টা বসে নাম কচ্ছি, কিন্তু স্বপ্নদোষ তো বন্ধ হ'ল না।...তবে আপনার কথা বিশ্বাস করব কী করে?...

ঊর্ধরেতা হইবার জন্য কী গভীর ব্যাকুলতা,...সরল শিশুর মত অনুগত শিষ্যের কী অকপট দাবী।...তবু তাঁহার মধ্যে উকি দিল অভিমান ও দোষদর্শন প্রবৃত্তি। হয়ত সেইজন্য গোসাঁইজী গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন : তুমি স্থির মনে দু-ঘণ্টা নাম ক'রে থাক?

: করব কী করে? মন তো সব সময় অস্থির। আসনে দু-ঘণ্টারও তো বেশী সময় একভাবে ব'সে নাম করি।

: আসনে অপরের চেয়ে একটু বেশী সময় ব'সে থাক, এতেই তোমার এত অভিমান? কী ভয়ানক!...কোন চেষ্টা বা নাম না করে শুধু বিশ্বাস বলে এমন অবস্থা লাভ করা যায়, বহুকাল সাধনভজন করেও যা সম্ভব নয়। অপরের চেয়ে সর্বদা সর্ববিষয়ে নিজেকে ছোট মনে করো—নইলে অভিমান থাকতে হাজার সাধনভজনেও কিছু হবে না।...

নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের উপর চাপ দিতে গিয়া প্রকট হইয়া উঠিল নিজেরই দুর্বলতা। অধিকন্তু গুরুর প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করায় অন্তর যেন শূন্য শ্মশানে পরিণত হইল—আর, সেখানে একাকী প্রেতের মত তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন! দুই দিনেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন দুঃসহ যন্ত্রণায় চুল ছিড়িয়া, মাথা ঠুকিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন

অস্থিরভাবে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা তো আত্মহত্যাও শ্রেয়।...

পাঠ বন্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গোসাঁইজী বলিতে লাগিলেন: হরিবোল—হরিবোল। আত্মগ্লানির অনলে পুড়িয়া কুলদানন্দও হইয়া উঠিলেন শুচিশুদ্ধ।... তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: কাল থেকে আবার তুমি রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ক'রো।...

অনুশোচনার তীব্র অনলে শান্তিবারি সিঞ্চন করিলেন গোস্বামী প্রভু।.... আবার নীলকণ্ঠ বেশ ধারণ করিয়া দয়াল গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন কুলদানন্দ। ধীরে ধীরে দূর হইল সমস্ত যন্ত্রণা ও অস্থিরতা। শুচিসুন্দর নিভৃত অন্তরে লাভ করিলেন নিবিড় শান্তি।...

॥ এগারো ॥

গভীর নিশুতি রাত্রি। গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে কুলদানন্দ নিজ আসনে উপবিষ্ট। সহসা ধ্বনিত হইল গুরুদেবের রুদ্ধকণ্ঠ:

"সেই এক পুরাতনে পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে—
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে।"...

ব্রহ্মসংগীত গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত নাম চলিল দ্রুতবেগে। শরীরেও অনুভব করিলেন এক অস্বাভাবিক যোগক্রিয়া। ক্রমশ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যেন কী এক প্রবল শক্তি উদর মধ্যে হস্তপদ ও মস্তক সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুচড়াইয়া যেন কুণ্ডলাকৃতি করিয়া ফেলিল। অন্তর বাহিরে শুনিতে লাগিলেন শুধু ইষ্টনাম।...সর্বাঙ্গে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নামের বেগ প্রশমিত হইল, চেতনালাভ করিয়া আপন চেষ্টায় হাত-পা সোজা করিয়া বসিলেন। সারা দেহমনের উপর দিয়া একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল যেন।...

মধ্যাহ্নে গুরুদেবকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: ঠাকুর! আমার হঠাৎ এ কী হ'ল?

ভরসা দিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: অমনি হয়—শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম হ'লে ক্রমে ঐ নাম চলতে থাকে প্রতি শিরা-উপশিরায়; তখন হাত-পা, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতর দিকে টেনে নেয়। ঐ সময়ে নাম ছেড়ে দিলে বিষম সংকটে প'ড়তে হয়।

: নাম ক'রতে ক'রতে শরীরে ভয়ানক জ্বালা হল কেন ?···

: দেহশুদ্ধির জন্য ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। এখন মহাপুরুষেরা কৃপা করে নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ করে নেন। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম হতে থাকলে এই জ্বালার আরম্ভ হয়। ক্রমে এই জ্বালায় পাগলের মত ছুটাছুটি করতে হয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে গোসাঁইজীর অন্তরে এই নামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়; নিজ গুরুদেবের আদেশে তখন জ্বালামুখী গিয়া সাধন করেন। কুলদানন্দকে সেই কথা তিনি বুঝাইয়া দিলেন।

সাধনপথের প্রধান অন্তরায় আত্মতুষ্টি। কুলদানন্দের সাধন-জীবনে সেই আত্মতুষ্টির স্থান নাই; বরং তাঁহার অন্তরে অস্থিরতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। লক্ষ্যবস্তু লাভের উন্মাদনায় তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন অবিরাম গতিতে। "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ" গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন নিজের সেই অসন্তুষ্টি ও প্রতিটী দুর্বলতা। নৈরাশ্য ও অনুশোচনায় তাঁহার আত্মজীবনী ভারাক্রান্ত।···কিন্তু বনবীথির মধ্যদিয়াও প্রতিভাত হয় প্রদীপ্ত সূর্যালোক। তেমনি সর্ব দুর্বলতা ও অস্থিরতার মধ্যদিয়াও বিচ্ছুরিত তাঁহার নিগূঢ় অন্তরের শুভ্র জ্যোতিঃপুঞ্জ।···বাহিক সর্ব বিচ্যুতির মধ্য দিয়াও সাধনজীবনে ক্রমোন্নতির কত উচ্চস্তরে তিনি ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত, অন্তরে নামাগ্নির এই দহনজ্বালা তাহার সার্থক পরিচয়।···

কিছুদিন পরে তর্পণ করিতে যাইয়াও প্রকাশিত হয় তাঁহার এই ক্রমোন্নতি। অষ্টমী-স্নানের দিন বুড়ীগঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করিতে গিয়াছেন। সহসা মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে ঐ জল নাকি রুধির হইয়া যায়; তাই পিতার মৃত্যুদিনে এক গণ্ডুষ জল দিতে না পারিয়া অন্তরে খুবই ব্যথিত হইল তিনি। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া জানাইলেন সকাতর প্রার্থনা: ঠাকুর, দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য এ বৃষ্টি থামিয়ে দাও।···নদীতে নামিয়া পিতৃপুরুষের এক-এক জনের নামে পনের কুড়িটী ডুব দিলেন। উঠিয়া সানন্দে দেখিলেন সত্যই বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গিয়াছে।···দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ শেষ করিতেই পুনরায় মুসলধারে বৃষ্টি আসিল। বুঝিলেন গুরুদেবের কী অনন্ত কৃপা!···সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সুগন্ধ পাইয়া তাঁহার চিত্ত বড়ই প্রফুল্ল হইল।··

অবসর মত গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন: দিনেরাতে, আসনে ব'সে, কখনো বা রাস্তাঘাটে হঠাৎ খুব চমৎকার গন্ধ পাই। এরকম হয় কেন ?

উৎসাহ দিয়া বলেন গোসাঁইজী : দেবদেবী, মুনিঋষি, বা মহাপুরুষেরা দয়া করে এলে তাঁদের কৃপায় এই গন্ধ পাওয়া যায়।…তখন তাঁদের ভক্তিভরে প্রণাম করে খুব নাম ক'রতে হয়। তাতে তাঁদের খুব আনন্দ হয়, ক্রমে তাঁদের আরও কৃপা প্রত্যক্ষ করা যায়।…

গুরুদেবের কথা শুনিয়া তিনি তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিলেন গোপন মনে।…

ক্ষণে ক্ষণে আবার দেখা দেয় নৈরাশ্য ও অস্থিরতা। মনে পড়ে ব্রাহ্মসমাজে সেই অতীত দিনের স্মৃতি—ধর্মকর্মে প্রবল উৎসাহ, আত্মোন্নতির জন্য আপ্রাণ প্রয়াস। সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস ও অবিচল অনুরাগ—সবই ছিল তখন। আত্ম-বিশ্লেষণের ফলে বুঝিতে পারেন, সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভের ফলে আর ঠিক সে অবস্থা নাই—অগ্রগতির পথে আজ তাঁহার সঠিক পদক্ষেপ।·· তবু মাঝে মাঝে কেন দেহে আসে এত ক্লান্তি ?…কেন মনে জাগে এত ক্ষোভ ও হতাশা ?

মনের ক্ষোভ গুরুদেবের নিকট তিনি প্রকাশ করেন : সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়ে আমার উন্নতির পরিণাম কি এই হ'ল ?…

গোসাঁইজী বলিলেন : এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই এই অবস্থা। আমার উন্নতি আমিই করতে পারি—এই ভাব থাকতে মানুষ ভগবানের দিকে তাকায় না। সেই অভিমান নষ্ট ক'রবার জন্যই এই অবস্থার প্রয়োজন।

একটু পরে ভাবাবেশে বলিতে থাকেন গোসাঁইজী : গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম করতে বলেছেন।…যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্ত হয়ে যখন চারিদিক অন্ধকার দেখবে, তখন সাধক বুঝবে সে নিতান্তই অসার।·· তখন একান্ত মনে ভগবানের শরণাপন্ন হ'লেই আরম্ভ হয় ভক্তিযোগ।…জীবনে এই সংগ্রাম আসাও মহা সৌভাগ্য। সংগ্রামের সূচনাতেই ধর্মজীবনের সূত্রপাত।·· নিজেকে অতি দীন, কাঙাল ব'লে অনুভব করলেই ভগবানকে প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারবে।… খুব সংগ্রাম করো—নিরাশ হবার কিছু নেই।…

নিপুন শিল্পী এইভাবে গড়িয়া তুলিতে থাকেন ব্রহ্মচর্য বিগ্রহ। স্বপ্ন ও সাধনায় ফুটিয়া ওঠে তরুণ সাধকের ভাস্বর জ্যোতি। কুলদানন্দের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় : সাধকের জীবন সংগ্রামের লীলাক্ষেত্র।…

সংগ্রামই জীবন। কুলদানন্দের জীবনও সত্যই যেন কুরুক্ষেত্র। বহিঃ-প্রকৃতির সহিত তাঁহার সংস্রব খুবই কম। জীবনের হাটে অন্তরপ্রকৃতি লইয়াই

প্রতিপদে তাঁহার কারবার। এজন্য সমাজ ও সংসারের সহিত তাঁহার সংঘাত নিতান্ত বিরল। কিন্তু অতি শৈশব হইতে প্রতি দুর্বল মুহূর্তে চলিয়াছে নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। যৌবনে দুর্জ্জয় কামরিপু, প্রলোভন ও অহমিকার সহিত দেখা দিয়াছে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সংঘাত। হয়ত সেই দিকে উৎসাহ দিবার জন্যই সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন গোস্বামী প্রভু। বস্তুতঃ, কুলদানন্দের বিচিত্র জীবন অক্লান্ত সংগ্রাম ও সাধনার অপূর্ব ইতিহাস! এইজন্যই কুলদানন্দের এত অন্তর্দাহ।... গুরুদেব যতই ভরসা দিন না কেন, তাঁহার অস্থিরতা ঘুচিতে চায় না।

দ্বিতীয় বর্ষের ব্রহ্মচর্য ব্রত সমাপ্তপ্রায়। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন মত সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া—এই দুইটী নিয়মের দিকে এই বৎসর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলেন গুরুদেব। অথচ কোনটাই অক্ষুন্নভাবে প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করার ফলে স্ত্রীলোক দর্শনের কামনা সংযত হইয়াছে, কিন্তু দেখা দিয়াছে নূতন আর একটী উপসর্গ।

একে অনিন্দ্য দেহকান্তি, তাহার উপর নীলকণ্ঠ বেশ—লাবণ্য যেন শতধারে বর্ষিত। নিজের সেই সৌন্দর্যের প্রতি অন্তরে জাগে সূক্ষ্ম আকর্ষণ। বিশেষতঃ মহিলারা তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর ব্রহ্মচারী রূপ দর্শন করুক—এমনি একটা স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। মালা-তিলকে সাজিয়া সুন্দর বেশভূষা করেন তিনি।

গোসাঁইজীর তাহা নজর এড়ায় না। বলেন: ব্রহ্মচারি! আয়নায় মুখ না দেখে পার না? · ব্রহ্মচারীর ওটা করতে নেই।..

কুলদানন্দ লজ্জিত হইয়া বলিলেন: মুখ না দেখলে তিলক ক'রব কী করে?

: বাঁ হাতের তেলোর দিকে চেয়ে তিলক করবে। ক্রমে তাতে নিজের মুখ দেখতে পাবে।

আন্দাজে ত্রিপুণ্ড্র। ঊর্ধ্বপুণ্ড্র আঁকিতে লাগিলেন। আর তাহা বাঁকা হওয়ায় গুরুভ্রাতারা উপহাস করিতে লাগিলেন। তিলক-বিভ্রাটে মুখের শোভা নষ্ট হইল ভাবিয়া অস্বস্তি দেখা দিল। সেই উদ্বেগে সাধনেও আসিল বিরক্তি—নাম, ধ্যান সব ছুটিয়া গেল। আবার রুদ্রাক্ষ ধারণে জ্বালার সৃষ্টি হইল। রুদ্রাক্ষ তুলিয়া রাখিয়া তুলসী মালা ধারণ করিতে বলিলেন গোসাঁইজী।

রুদ্রাক্ষ বর্জনে বিলুপ্ত হইল ব্রহ্মচারীর সেই প্রদীপ্ত রূপ—একেবারে নিরীহ বৈরাগীর মত হইয়া গেলেন কুলদানন্দ। নির্জীব, নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন যেন। পাছে এই কদাকার চেহারা কেউ দেখিয়া ফেলে এই আশংকায় নতশিরে

থাকিতে চান সকলের দৃষ্টির বাহিরে। এইভাবে সদ্‌গুরু চূর্ণ করিলেন তাঁহার রূপের গরিমা।...

তাঁহার বেশ পরিবর্তনে আশ্রমে সুরু হইল নানা আলোচনা। সতীর্থরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধে তাঁহার এই দণ্ড। ব্রহ্মচারী বড় মেয়েমানুষ ঘেঁসা—এমন অপবাদও রটিল। তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, তবু তিনি নিরুপায়।

কামিনী-ত্যাগের পুনরুক্তি করিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: কায়মনোবাক্যে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা দরকার। বীর্যধারণ ও সত্যরক্ষাই যথার্থ সংযম, ব্রহ্মচর্য ও ধর্মলাভের প্রধান সোপান।...

কুলদানন্দ শুনিয়াছেন ব্যবস্থানুরূপ তীর্থ পর্যটন করিলে খুব সহজে সংযম অভ্যস্ত হয়। গুরুদেবের নিকট এই বিষয়ে জানিতে চাহিলে সমস্ত নিয়ম তিনি বলিয়া দিলেন। বলিলেন: দীক্ষাগ্রহণ করে যৌবনেই তীর্থ পর্যটন ক'রতে হয়।...পর্যটন কালে ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, পরনিন্দা বিষবৎ ত্যাগ করা কর্তব্য। চিত্ত প্রসন্ন রেখে একমাত্র সত্যকেই অবলম্বন ক'রে চ'লতে হয়।...তীর্থ পর্যটন ক'রলে আরও অনেক প্রকার কল্যাণ দেখা দেয়।

কুলদানন্দ শুনিলেন তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কথা জানিয়া জননী হরসুন্দরী কান্নাকাটি করিতেছেন; অর্ধাশনে, অনশনে তাঁহার শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে। শুনিয়া মমতাবোধ করিলেন। চা'ল, ডা'ল, ঘৃত, গুড় ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন হরসুন্দরী। 'স্থূলভিক্ষা' গ্রহণ করা নিষেধ, নিত্য ভিক্ষাই ব্রহ্মচর্য ব্রতের ব্যবস্থা। কিন্তু জিনিষগুলি না লইলে বৃদ্ধা জননীর বুকে শেল বিদ্ধ হইবে; আবার লইতে গেলেও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতে হয়। অবশ্য তাঁহার ধারণা, জননী অপেক্ষাও গুরুদেব অধিক ভালবাসেন।...তাছাড়া মুনিঋষিদের পরম আদরের পবিত্র ব্রহ্মচর্য ব্রত লঙ্ঘন করা অসম্ভব। তাহা হইলে মাতাপিতা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এমনকি পূর্বপুরুষ পর্যন্ত নরকভোগ করিবেন। ভাবিয়া অগত্যা হোমের জন্য ঘৃত এবং একদিনের মত চা'ল-ডাল রাখিলেন। বাকি সবই অর্পণ করিলেন ঠাকুরের ভাণ্ডারে।

ঐ চাল দেওয়া হইল গুরুদেবের সেবায়। খুশী হইয়া বলিলেন গোসাঁইজী: এই চালের ভাত এত মিষ্টি যে শুধু নুন দিয়ে খাওয়া যায়। ভাতে যেন ঘি মাখা। মাঝে মাঝে এই চাল্ আমার জন্য দেশ থেকে এনো।

বড়ই আনন্দলাভ করিলেন কুলদানন্দ। নিজের জননীকেও ধন্য মনে হইল। গুরুদেব স্বহস্তে প্রত্যহ পৃথকভাবে প্রসাদ তুলিয়া রাখেন তাঁহার জন্য। খাদ্যবস্তুতে পূর্বেই দেখা দিয়াছিল প্রলোভন। একদিন উৎকৃষ্ট ছানার ডালনা পাইয়া বড়ই লোভ হইল। পাছে কেহ খাইয়া ফেলে এইজন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তখনই তাহা খাইয়া ফেলিলেন। পরে গুরুদেবের নিকট গিয়া বসিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হইল—ভিতরে কেমন একটা জ্বালারও সৃষ্টি হইল।…ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলেন, নামে অরুচি ও বিরক্তি জন্মিল। সারাদিন ছটফট করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাস করিলেন।

অবসর মত গুরুদেবকে বলিলেন : লোভের যন্ত্রণা আমি যে আর সহ্য করতে পারিনে।…

: যা খেতে ইচ্ছে হয় খেয়ে নিও।

: তাহলে যে একাহারের নিয়ম রক্ষা হয় না!

: যা নিতান্ত ইচ্ছা হয় খেয়ে নেবে। আর যে-সব বস্তুতে খুব লোভ, তা পরিতোষ করে নিকটে বসে কাউকে খাওয়াবে। আর নুন ত্যাগ করবে। লোভের স্থূলবস্তুর সঙ্গ হেতু ক্রমে জীব জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য মুনিঋষিরা কঠোর তপস্যা করেছেন। অসংযত জিহ্বা দ্বারা উৎকট পাপের সৃষ্টি হয়—এজন্য ঋষিরা মৌনী হতেন। স্তুতিবাদ, শাস্ত্রপাঠ ও নামকীর্তন দ্বারা জিহ্বা ভদ্র, শুদ্ধ ও সংযত হয়।…

সেইভাবে চলিবার সংকল্প করিলেন কুলদানন্দ।

একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আমার কি আরো কর্ম বাকি?

: কর্ম আর হয়েছে কই! সবই তো বাকি।

: মা-দাদাদের নিকটে আমার কী কর্ম?

: তোমার সেবায় মা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তবে যথেষ্ট হয়নি। যদি রোগে কষ্ট পান, নিজহাতে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে হবে। দাদাদেরও আপদে বিপদে সর্বদা দেখতে হবে। কর্তব্য করে বৈরাগ্য জন্মে; নইলে আবার সংসারে প্রবেশ করতে হয়।

: আমার তো বিয়ের কল্পনাও হয় না।

: তোমার সে পরীক্ষা ভবিষ্যতে। তখন যদি স্ত্রী-সঙ্গ কাকবিষ্ঠাবৎ মনে কর তবেই রক্ষা। ভবিষ্যতে অনেক পরীক্ষা।…

: কী উপায়ে উত্তীর্ণ হব?

ঃ একমাত্র উপায় শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করা। নামে রুচি জন্মালে কোন পরীক্ষাই কিছু করতে পারবে না।…

১লা বৈশাখ, ১২৯৯। প্রত্যূষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন কুলদানন্দ, এ বৎসর খুব নিয়মনিষ্ঠার সহিত পালন করিবেন শ্রীগুরুর আদেশ। দুই-চারি দিন পরে দেখিলেন তাঁহার সমস্ত সংকল্পই বিফল হইতে চলিয়াছে। খুব দৃঢ়তার সহিত সারাদিন নাম করিতে বসেন; কিন্তু দু-চার ঘণ্টা পরেই অন্যমনস্ক হইয়া যান। সারারাত্রি নাম করিবার সংকল্প করিতেই অতিরিক্ত নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়েন।

নিজের দুর্দশা গুরুদেবকে জানাইলেন। গোসাঁইজী বলিলেন ঃ উপায় ঐ এক—বীর্যধারণ ও সত্যরক্ষা ক'রতে পারলে নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপালাভ করতে পারবে।

কয়েক দিন কাটিল। গোসাঁইজী কথায় কথায় বলিলেন ঃ রুদ্রাক্ষে উৎসাহ, নিষ্ঠা ও তেজ বৃদ্ধি করে। শরীরও খুব গরম রাখে। তোমার শরীর রুদ্রাক্ষের তেজ ধারণ করতে পারতো না বলে মালা তুলে রাখতে বলেছিলাম। কাল থেকে আবার নিয়মিত রুদ্রাক্ষ ধারণ করো।

বড় আনন্দ হইল। পর দিনের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন অধীর আগ্রহে।

নানা পরীক্ষার মধ্যদিয়াই অগ্রসর হইলেন কুলদানন্দ। আশ্রমে সুখাদ্য সামগ্রী দ্বারা গুরুদেবের ভোগের আয়োজন দেখিলে আনন্দের পরিবর্তে নিরুৎসাহ বোধ করেন। উৎকৃষ্ট সুখাদ্য বস্তু সকলকে পরিবেশন করিতে হয় গুরুদেবের আদেশে। ইহা শুধু লোভ দমনের পন্থা নয়, তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু নিজে এক কণাও গ্রহণ করিতে না পারায় মাঝে মাঝে দারুণ সৃষ্টি হয় যন্ত্রণা।

একদিন গুরুদেবকে একটু বেশী পরিবেশন করিতেই বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন ঃ ব্রহ্মচারি! প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় বেশী খাবার দিলে উচ্ছিষ্ট বস্তু দেওয়া হয়।

গুরুভ্রাতারাও কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। শিষ্যদের পংক্তিতে গুরুদেবের বিশেষত্ব তো থাকিবেই। তাছাড়া, একটু বেশী না দিলে প্রসাদ রাখিতে গিয়া ঠাকুরের আহারই যে কমিয়া যাইবে। তবু সকলের সমক্ষে গুরুদেবের এই শাসন কেন?…

কিন্তু আহারান্তে গোসাঁইজী স্বহস্তে তুলিয়া রাখিলেন সুস্বাদু প্রসাদ।... কুলদানন্দের চোখে অশ্রু দেখা দিল।...অথচ লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না—মধ্যাহ্নেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বসিলেন। অমনি শরীরে জ্বালা সুরু হইল। সেই অন্তর্দাহে সারাদিন নামে আর মন বসিল না।

অনুভব করিলেন ইহা নিয়মভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত। তাই পূর্ব হইতেই সাবধান করিয়াছিলেন দয়াল গুরুদেব।...কিন্তু এই লোভ কি কিছুতেই যাইবে না?

বিশ্বামিত্র মুনির কঠোর তপস্যার উদাহরণ দিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন: কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর হাত থেকে একেবারে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। সেইজন্যেই তো মুনিঋষিদের এত কঠোর তপস্যা। একমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম দ্বারাই এদের গতি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তখন তারা ভজনের সহায় হয়ে দাঁড়ায়।...

কয়েক দিন সাধনভজনে মন বসিতেছে না। অবিরত মনে পড়ে মায়ের কথা। হঠাৎ কেন এমন হইল?

অপরাহ্নে রোহিনীকান্তকে লইয়া বাড়ী হইতে আসিলেন সারদাকান্ত। তাঁহাদের কাছে শুনিলেন মা কান্নাকাটি করিতেছেন। ব্রহ্মচর্য রক্ষা হইবেনা এই আশংকায় সম্প্রতি বড়দাদার ছেলে সজনীর বিবাহে তিনি যান নাই। তাহাতেই মায়ের অস্থিরতা। নিজের উদ্বেগের কারণও ধরা পড়িল। মায়ের চরণধুলি লইয়া আসিবার জন্য মন আরো অস্থির হইয়া পড়িল।

দীক্ষা হইল রোহিনীকান্তের। স্বীয় দীক্ষাগ্রহণ কালে মেজদাদা ও ছোটদাদা ঘোর বিরোধী হইলে সংকল্প করেন—সকল ভ্রাতাকেই টানিয়া আনিবেন গোসাঁইজীর চরণে। এতদিনে সেই সংকল্প পুর্ণ হওয়ায় তিনি আজ নিশ্চিন্ত।

রোহিনীকান্তের বিবাহ। রোহিনীকে লইয়া বাড়ী চলিলেন সারদাকান্ত। কুলদানন্দকেও পুনঃপুনঃ বাড়ী যাইতে বলিলেন, বিশেষতঃ জননী খুব ক্লেশবোধ করিতেছেন। কিন্তু তিনি সর্বদা কাঁদেন, আর গোসাঁইকে দোষারোপ করেন—শুনিয়া মায়ের উপর বড় অভিমান হইল কুলদানন্দের। ভাবিলেন: আর মা'র মুখ দেখব না।...

অথচ বৃদ্ধা জননীকে শান্ত করিবার জন্যও মন অস্থির হইয়া উঠিল। আবার বিবাহের ঝামেলায় মধ্যে বাড়ী গেলে ব্রহ্মচর্য ব্রত রক্ষাও অসম্ভব। উভয় সংকটে গুরুদেবের নিকটে গিয়া বসিলেন।

উৎসাহ দিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: না গিয়ে খুব ভালই করেছ। রোহিনীর

বিবাহ হ'য়ে গেলে একবার বাড়ী গিয়ে মা-ঠাকুরুণের প্রসাদ পেয়ে এসো।

ঃ বহুকাল কঠোর তপস্যার পর উন্নত অবস্থা লাভ ক'রেও অনেকে সামান্য অপরাধে পতিত হয়েছেন। নিরাপদ স্থান তবে কি নেই?

ঃ সদ্‌গুরুর আশ্রয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই নিরাপদ।

ঃ তবে ঐ সব মহাত্মারা কি সদ্‌গুরু লাভ করেননি?

ঃ সদ্‌গুরু লাভ কি এতই সহজ? বহু জন্ম সিদ্ধিলাভ করে একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই সদ্‌গুরু লাভ হয়।...তখন কোন অবস্থা থেকেই আর পতিত হ'তে হয় না।...সদ্‌গুরু লাভ হলেই সম্পূর্ণ নিরাপদ।...

একটু পরে বলিলেন গোসাঁইজী: যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল। গৃহস্থদের মধ্যে এই দুর্লভ সাধন গ্রহণ এবারই প্রথম। কিন্তু এই সাধনে কারো নিষ্ঠা নেই।...যদি কিছুই না করা হয়, তবে এ সাধন নেওয়া কেন? মুনিঋষিদের পরম আদরের সাধন-পথ তাতে বৃথাই কলুষিত করা হয়।...আমাদের সাধনে মাত্র তিনটী কথা—অহিংসা, সত্য, ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।...ঐ তিনটী লাভ হ'লেই হ'য়ে গেল। আর একটীতে শৈথিল্য এলে সংকীর্তনে ভাবোচ্ছ্বাস হ'ক, আর নামে অশ্রুপাতই হ'ক—তাতে কিছুই হয় না।...

এই মহাবাণী দাগ কাটিয়া বসিল কুলদানন্দের মনে।

॥ বারো ॥

বৈশাখের শেষে বাড়ী রওনা হইলেন কুলদানন্দ। ধলেশ্বরীর কাছে গিয়া সহসা দেখা দিল প্রবল ঝড়। শান্ত নদী গর্জিয়া উঠিল প্রবল তরঙ্গে। পালের নৌকা বেসামাল হইতেই আরোহীরা চিৎকার করিয়া উঠিল, মাঝীরা ডাক ছাড়িল 'বদর, বদর'।...

কুলদানন্দ একান্ত মনে স্মরণ করিলেন গুরুদেবের অভয় চরণ। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ও কে—স্বয়ং গুরুদেব?...উল্লাসভরে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন: ভয় নেই, ভয় নেই—ঠাকুর নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করবেন।

নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে সত্যই রক্ষা করিলেন দয়াল ঠাকুর। সহসা তুফানের ঝাপটায় পালটী দ্বিখণ্ডিত হইল। অমনি সোজা হইয়া নৌকাও নক্ষত্র বেগে ছুটিল তীরের দিকে। দুর্গা দুর্গা বলিয়া নিশ্চিন্তে পারে উঠিলেন সকলে।

আকাশে তখনও প্রলয়ের ঘনঘটা। সকলে দোকানঘরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কুলদানন্দ দেখিলেন সম্মুখে উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতিঃপ্রকাশ।···সকলের নিষেধ সত্বেও নির্ভয়ে যাত্রা করিলেন সেই দুর্যোগের মধ্যে—দেড় ঘণ্টা হাটিয়া বাড়ী পৌছিলেন। জননীর পদধূলি লইতেই দূরে গেল সমস্ত শ্রান্তি।

ক্ষণকাল পরেই মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বুঝিলেন সবই ঠাকুরের কৃপা। ভজন-কুটীরে গিয়া নিমগ্ন হইলেন নামসাধনে। বিবাহ উপলক্ষে সমাগত আত্মীয়স্বজন দলে দলে তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন—নাম চলিল আপন গতিতে। প্রত্যহ জপ. পাঠ হোমাদি চলিতে লাগিল। অপরাহ্নে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্বপাক আহার করিতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধব, গ্রামবাসীরা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাদের কথার জবাব দিতেন নতশিরে, শান্তভাবে।

বাড়ী থাকিয়া খুবই তৃপ্তিলাভ করিলেন ছোটদাদার আদরযত্নে। জননীও আদর করিয়া নানা খাবার খাওয়াইলেন। বলিলেন: মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাস। আমার দেওয়া খাবার নিসনি শুনে গোসাঁইয়ের উপর রাগ করেছিলাম। আমার মনোভাব বুঝে তিনি ক্ষমা করেছেন।···মায়ের কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হইল।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ মন অস্থির হইয়া পড়িল। নামে আর মন বসে না; নামশূন্য অবস্থায় অনুভব করিলেন বিষম যন্ত্রণা। পরদিনই ঢাকা রওনা হইলেন। অপরাহ্নে গেণ্ডারিয়া পৌছিতেই অনুভব করিলেন নূতন আনন্দ ও উৎসাহ।

বাড়ী হইতে ভাল ঘৃত আনিয়াছেন। বালকের মত হাসিমুখে তাহা চাহিয়া লইয়া নিজে খাইলেন গোসাঁইজী। খুবই প্রশংসা করিলেন বিক্রমপুরের ঘৃতের। নিজেকে ধন্য মনে করিলেন কুলদানন্দ।···

উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আশ্রমে আসিলেন। মন্দির প্রাঙ্গনে সংকীর্তন আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীগণ গোসাঁইজীকে বেষ্টন করিরা সুরু করিলেন উদ্দাম নৃত্য—গোসাঁইজী ও গুরুভ্রাতারাও কীর্তনে মত্ত হইলেন। সেই মহাভাবের বন্যায় কুলদানন্দই শুধু ধীর ও স্থির। প্রাণে তাঁহার নিদারুণ শুষ্কতা। মনে হইতে লাগিল সকলেই তাঁহার অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।···আত্মাভিমানী শিষ্যকে গোসাঁইজী বারংবার বলিয়াছেন: নিজেকে সবার চেয়ে অধম মনে ক'রবে।···এতদিনে সেই ভাব প্রকটিত হইল।

অবসর মত বলিলেন : কোন দিকেই আমার কোন উন্নতি হচ্ছেনা কেন ?

শিষ্যের মনোভাব বুঝিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন : উন্নতি সবারই হচ্ছে। ভগবানের রাজ্যে একটী বস্তুও এক অবস্থায় থাকে না।...উন্নতি হচ্ছে এটা নিশ্চয় জেনো।

অসহিষ্ণু হইয়া বলেন কুলদানন্দ : কিসে বুঝব আমার উন্নতি হ'চ্ছে ? আগে যেসব পাপ কাজ করতাম না, এখন তা করি। যেসব চিন্তা ও কল্পনা ঘোর অপরাধ মনে করতাম, এখন তাতে সুখ অনুভব করি। সব দিকেই তো অবনতি দেখছি।...

: পাপ-পুণ্য সংস্কার মাত্র।...স্বভাবে যা করাবার করিয়ে নিক—শুধু দেখে যাও। অশান্তি কর কেন ? কামক্রোধাদি আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল।...

কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন কুলদানন্দ। তবু স্বস্তিবোধ করিতে পারেন কই ?

মধ্যাহ্নে সকলের সহিত আহারে বসিয়াছেন গোসাঁইজী। সহসা উত্তর দিকে চাহিয়া রহিলেন অপলকে। কুলদানন্দ জানিলেন, সকলের আহার দেখিয়া মুনিঋষি, দেবদেবীরা কত আনন্দ করিয়া গেলেন।...সবিস্ময়ে গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আমাদের আহার দেখে দেবতারা আনন্দ করেন ?

: তা ক'রবেন না ! তোমরা কি সাধারণ ?...আমরা যাকে চাই, কত যোগী-ঋষি, দেবদেবী, ভক্ত-অবতার তাঁর চারিদিকে ঘুরছেন।...সেই অন্তবিহীন, মহান, পুরাণ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। অবিরাম সেই দিকেই আমরা চ'লব।... সর্বত্রই আমরা আনন্দ ক'রব—কোথাও দাঁড়াব না, কারো নিন্দা-প্রশংসায় ধরা দেব না। কোথাও বদ্ধ হব না—তাহলেই বিপদ।...

একটু থামিয়া আবার বলিলেন : এই সাধনপথে চ'ললে ভগবানের অনন্ত বিভূতি, যাবতীয় লীলা ক্রমশ প্রকাশ হ'তে থাকবে। নৌকায় চলার মত দুইপাশে কত দর্শন ক'রবে। আসক্ত হ'লেই সেখানে বদ্ধ হ'য়ে প'ড়বে। অগ্রসর না হ'লে নূতন দর্শন হয় না, নূতন কোন অবস্থাও লাভ হয় না।...

অপূর্ব, মহা মূল্যবান উপদেশ।...বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকেন কুলদানন্দ। সমস্ত লীলা ও বিভূতির অতীত, অজ্ঞাত মহান পুরুষের দিকে অবিরাম আমাদের গতি।...সেই গতিশীল নামে স্থিতিই আমাদের উন্নতির অবস্থা। তাই কথায় কথায় ঠাকুর বলেন : শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর।—নামেই সমস্ত লাভ হয়।...ভাবিয়া নব উৎসাহে ও প্রেরণায় তিনি ভাসিয়া চলিলেন নাম-প্রবাহে।

কয়েকদিন পরে আবার দেখা দিল সেই ক্লান্তি, শুষ্কতা ও ব্যর্থতার জ্বালা। পদাঙ্গুষ্টে দৃষ্টি স্থির রাখা, লোভ দমন করা, বাকসংযম রক্ষা করা—ঠাকুরের সমস্ত আদেশই আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পালন করা দুরূহ। এক একবার মনে জাগে দারুণ অনুতাপ; তখন বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও সংকল্প সাধন সম্ভব হয় কই? তাঁহার ধারণা হইল: আপন প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র—নিজের ইচ্ছার উপর আছে আর একটা অধিকতর ক্রীয়াশীল ইচ্ছাশক্তি।...ঠাকুরের সেই ইচ্ছাতেই তবে কি প্রতিপদে প্রমাণিত হইতেছে আপন অসারত্ব?...

এই অনুভূতির ফলে প্রাণে জাগে নূতন আনন্দ। অন্তর হইতে উৎসারিত হয় আকুল প্রার্থনা: গুরুদেব, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। দয়া করে শক্তি ও শুভ মতি দিয়ে আমায় রক্ষা কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত যে কিছুই হয় না—যে-কোন অবস্থায় ফেলে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেও। আমি নিশ্চিন্তে তোমার পানে তাকিয়ে থাকি। আমি যে আর পারিনে, ঠাকুর!...

এতদিনে কুলদানন্দ উপলব্ধি করেন—নিজের চেষ্টায় কোন উন্নত অবস্থা লাভ করা যায় না,.. আবার গুরুদত্ত কোন অবস্থাই রক্ষা করাও অসম্ভব।... আত্মাভিমান তবু যাইতে চাহে না। নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিলে কৃতকার্য হওয়া যায় সহজেই। কিন্তু তাঁহার আদেশের উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে যাইতেই যত দুর্দশা।...মনে হইয়াছিল: স্ত্রীলোক দর্শন না করাই পদাঙ্গুষ্টে দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্য; তবে তো নত মস্তকে চলিলেই হইল।...সেই মুহূর্তে হইল সর্বনাশের সূচনা—শিথিল দৃষ্টি গিয়া পড়িল স্ত্রীলোকের পায়ে, ক্রমে তাহাদের নানা অঙ্গে।...গুরুদেবের সহজ বাক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে যাইতেই অনর্থের সৃষ্টি।..

গুরুদেবের নিকট নিজের তুচ্ছ বিচার ও বিড়ম্বনার কথা খুলিয়া বলিলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বলিলেন: গুরুবাক্যের অর্থ বোঝা কি সহজ? ঠিক গুরুবাক্য মতে চলতে হয় তবেই ক্রমে তার তাৎপর্য বোঝা যায়।...

কুলদানন্দের মনে পড়িল গুরুগীতার কথা: 'মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং'।...সমস্ত মন্ত্রের বা শক্তির মূলই গুরুশক্তি।...গুরুবাক্য ধরিয়া চলিলে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অসার সংসারে গুরুবাক্যই সার।...

মধ্যাহ্নে আহারান্তে আমতলায় বসিয়া আছেন গোসাঁইজী। কাছে বসিয়া হাওয়া করিতেছেন কুলদানন্দ। ধ্যানস্থ অবস্থায় গোসাঁইজী বলেন: সাধনা না করে কেবল 'গুরু করবেন' বললে কিছু হবে না। গুরুকে বিশ্বাস করা কি

সহজ? গুরুকে বিশ্বাস করলে ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটান যায়।...যতকাল অহংকার ও পুরুষকার আছে, ততকাল নিজেদের সাধ্যমত খাটতে হবে। তবে গুরু সাহায্য করেন। গুরুবাক্য পালন করলে গুরুকৃপা লাভ করা যায়। ..সর্বদা খুব সাধন কর—শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর। সমস্তই লাভ হবে—অভাব কিছু থাকবে না।...

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। গোসাঁইজী সমাধিস্থ। সেই অবস্থায় তিনি বলিলেন—আগামী ১০ই আষাঢ় পর্যন্ত তাঁহার জীবন-সংশয় পীড়া; মহাপুরুষেরা সর্বদা তাঁহাকে আসনে থাকিতে বলিয়াছেন।...শুনিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল কুলদানন্দের। সময় কাটিতে লাগিল নিদারুণ উদ্বেগে। ভাবিলেন সারা দিনরাত গুরুদেবের নিকট থাকিবেন।

মধ্যাহ্নে গোসাঁইজী বলিলেন: এখন থেকে তিতিক্ষাটা বেশ অভ্যাস করে নেও। মাত্রা ও সময় ঠিক রেখে মাত্র একবার আহার ক'রবে। এক তরকারী-ভাত অভ্যাস হলে শুধু ভাতে-সিদ্ধ ভাত খাবে। সেটা অভ্যাস হলে নুন দিয়ে জলভাত খাবে। ক্রমে নুন ত্যাগ করবে, পরে জলরুটি খেতে পার। দেহের জন্য মনের অধিকাংশ বিকার ও চঞ্চলতা।...তীর্থ পর্যটন জমাতের সঙ্গে মিশেই ভাল—রাস্তার সমস্ত ভয় ও প্রলোভন দূরে যাবে।...কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের কাজ করে যাও।...

গুরুদেবের উপদেশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন কুলদানন্দ।

কিন্তু সত্যই ঠাকুরের দেহত্যাগ হইলে তখন কী গতি হইবে? ভাবিয়া সর্বদা তাঁহার বুক কাঁপিতে থাকে। নিজেকে অসহায় মনে হয় যেন।

মনের উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করেন: আপনি কখন যে দেহ রাখেন তার ঠিক নেই। এরপর কী করব?...আগে তো তিনবার ব'লেছেন আমাকে ঘর করতে হবে না। তার কি অন্যথা হবে?...

: কেন, তোমার কি বিবাহ করতে ইচ্ছা হয়?

: ও-কথা শুনলেই আমার ভয় হয়। স্ত্রীসঙ্গে আমার খুব অশ্রদ্ধাও আছে। তবে কামভাব তো রয়েছে!

: তা থাক, তোমার আর ঘর-গৃহস্থালি হবে না। স্ত্রীসঙ্গে অশ্রদ্ধা থাকলে তো কথা নেই। আমার দেহত্যাগ হলেও বা কি? সব কথা মনে রাখলেই হবে। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য হয়ে গেলে মনের গতি কোন দিকে যায় বুঝবে। তখন গৈরিক

আর কৌপীন নিয়ে তীর্থ পর্যটন করবে। অর্থ কারো নিকট চাইবে না। যতদিন আছ হোমটী ও উপবীত ত্যাগ কর না। রুদ্রাক্ষ চিরকাল ধারণ করো। তীর্থ হয়ে গেলে একস্থানে আসন করে বসো—কাশীতেই ভাল। ব্রহ্মচর্য, সত্য, অহিংসা ও বীর্যধারণ প্রধান সাধন—সন্ন্যাসে বাসনা ত্যাগ ও সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করা উদ্দেশ্য। নিন্দা-প্রশংসায় অটল থাকলে বুঝবে বাসনা নষ্ট হয়েছে। এসব কথা মনে রেখে চল—কোন বিঘ্ন ঘটবে না।...

: চিরকাল কি ভিক্ষা করে খেতে হবে ?

: একস্থানে বসে পড়লে যে যা দেবে তাই নেবে। কামিনী-কাঞ্চন বিষয়ে সর্বদা খুব সাবধান থাকবে।

কয়েক দিন পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন কুলদানন্দ : ব্রহ্মচর্য সফল হ'ল কখন বুঝব ?

: স্ত্রীসঙ্গের কল্পনাও যখন মনে আসবে না, স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত ঘৃনিত কার্য বলে মনে হবে—তখন ব্রহ্মচর্য ঠিক হলো বুঝবে।

: হোম করার যদি সুবিধা না হয় ?

: ফল, মূল, পাতা বা পবিত্র খাদ্যবস্তু মন্ত্রপূত করে আহুতি দেবে। প্রত্যহ অগ্নিসেবা চাই !

: তীর্থ করার পর আপনি কাশীধামে থাকতে বললেন। যদি পাহাড়ে থাকতে ইচ্ছা হয় ?

: তবে তো খুব ভাল। গ্রীষ্মকালে বদরিকা আশ্রমে আর শীতকালে হৃষিকেশে থেকো। কোন অসুবিধা হবে না।

আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত নাই কুলদানন্দের। সরল, অবোধ শিশুটী যেন; প্রতিপদে পিতার হাত ধরিয়া চলিতে চান। পিতা-মাতা, বন্ধু-ভ্রাতা, স্বয়ং ব্রহ্ম—সবই যে তিনি।...সেই পরম নির্ভর গুরুদেব ভিন্ন নিজের অস্তিত্ব যে কল্পনা করিতে পারেন না !

অনন্ত আগ্রহ ও একান্ত নির্ভরতা লইয়া তিনি বলেন : এরপর কীভাবে চ'ললে আপনাকে দেখতে পাব ? কিসে আমাকে কখনও আপনার অভাব ভোগ করতে হবে না ? ..

অসীম স্নেহময় শ্রীগুরুদেব অমিয় স্নেহধারা বর্ষণ করিয়া বলেন : দেহত্যাগ হলই বা—যা বলেছি তাই ক'রো, কোন কিছু অপূর্ণ থাকবে না। তখন যেখানে সেখানে সর্বদা খুব ঘনঘন দেখতে পাবে।...

নিশ্চিন্ত ভরসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন কুলদানন্দ। বলেন : মুক্তি কী জানি না। আমি অন্য কিছুই চাই না। শুধু আমাকে যেন কখনও আপনার বিচ্ছেদ সহ্য করতে না হয়।…আপনার আদেশ মত চ'লতে পারব কিনা জানি না, তবে নিশ্চয় চেষ্টা করব। যদি ইচ্ছা করে অবাধ্য হই, যত খুশি শাস্তি দেবেন। কিন্তু যদি চেষ্টা করি, তাহলে আমাকে দয়া করবেন তো ?

প্রতিটী কথায় আন্তরিকতার নিখাদ সুর প্রতিধ্বনিত।…পরম দয়াল গুরুদেবও তাই নিশ্চিত আশ্বাস দিয়া বলেন : হ্যাঁ, তাই। পার না পার চেষ্টা ক'র। তাহলে আর ভাবনা থাকবে না—নিশ্চয় জেনো।…

এতদিনের যন্ত্রণা ও উদ্বেগ প্রশমিত হইয়া আসে। গুরুবাক্য পালনের আন্তরিক প্রচেষ্টা সর্বদা সদ্‌গুরুসঙ্গ লাভের উপায়। সুতরাং গুরু দেহরক্ষা করিবেন কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর—গুরুবাক্য পালনই সার, অবশ্য কর্তব্য।

—

শিষ্য যতদিন গুরুর অধীনে থাকেন, তাঁহার ইষ্ট-অনিষ্ট সবকিছুর জন্য গুরু দায়ী। সাধারণ গুরুর পক্ষে না হইলেও সদ্‌গুরুর পক্ষে ইহা অবধারিত। শিষ্যের আচরণ নিন্দনীয় হইলে সেই অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে সদ্‌গুরুকে।…

প্রত্যহ প্রত্যূষে বুড়ীগঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করেন কুলদানন্দ। পরে নিজ আসনে বসিয়া হোম ও পাঠ অন্তে নাম ও গায়ত্রী জপ করেন। একদিন অনুদয়ে স্নান হইয়া উঠিল না—কাছেই এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে সহসা চোখে পড়িল ঘাটের অপর পারে পরমা সুন্দরী তিনটী তরুণী। চঞ্চলা, অসংবৃতা যুবতীরা নিক্ষেপ করিল ঘনঘন দৃষ্টিবাণ।…যেন আচ্ছন্ন, মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন তরুণ ব্রহ্মচারী। স্নানরতা যুবতীদের অসামান্য রূপলাবণ্যে চাহিয়া রহিলেন অপলকে।…অঙ্গে অঙ্গে বহিয়া গেল তড়িৎস্পন্দন।…

পরক্ষণে আত্মসচেতন হইয়া উঠিলেন।…তিনি নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী—তবু একি চিত্তবিকার !…উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে সংযত করিয়া দ্রুতপদে আশ্রমে ফিরিলেন।

নিত্যক্রিয়া অন্তে গুরুদেবের নিকট গিয়া বসিলেন। ধ্যানস্থ গোসাঁইজী বলিতে লাগিলেন : পরমহংসজীই গুরু।…যে যা কর সব দেখছেন।…ফাঁকি দেওয়ার যো নেই—সাবধান !…শিষ্যের অপরাধে গুরুকে ভুগতে হয়,…বেত খেতে হয়।…

সচকিত হইলেন কুলদানন্দ। মনে পড়িল পুকুরঘাটে চিত্তবিভ্রমের কথা—লজ্জায় ও ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিলেন: শিষ্যের অপরাধে গুরুকে বেত খেতে হয়!...

নীরব ইঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশ দেখিতে বলিলেন গোসাঁইজী—চাহিয়া রহিলেন মমতাপূর্ণ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে।

চমকিয়া উঠিলেন কুলদানন্দ। চাহিতে যাইয়াও আর চাহিতে পারিলেন না।...হৃদয় আর্তনাদ করিয়া উঠিল: হায় দয়াল ঠাকুর! তুমি এ কী করলে!... হতভাগ্য সন্তানের পাপের গুরুদণ্ড নিজে এমনি করে পিঠ পেতে নিলে! .. অথচ তাকে কোন দণ্ড দিলে না?...একটী রূঢ় কথাও বললে না?...

না বলিলেও শিষ্যকে দণ্ড অবশ্য পাইতে হইল। এ দণ্ড ক্রোধের বা হিংসার নয়—পরম স্নেহের, অসীম ক্ষমার।...অপরাধীকে পাপের পল্বল পঙ্কে নিক্ষেপ করিবার জন্য নয়,...কামভাবের মালিন্য দূরীভূত করিয়া শুচিশুদ্ধ করিবার জন্য। তাই সারাদিন ছটফট করিয়া কাটিল দুঃসহ যন্ত্রণায়, তীব্র অনুশোচনায়।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে আমতলায় বসিয়া আছেন গোসাঁইজী ও কুলদানন্দ।

স্বচ্ছ আকাশ। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র। অথচ শিশির বিন্দুর মত অবিশ্রান্ত কী যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। গোসাঁইজী বলিলেন: আম গাছ হ'তে আজ মধুক্ষরণ হ'চ্ছে। দেখতে পাচ্ছ?...

আমতলার শুষ্ক পত্রে সত্যই মধুর আস্বাদ পাইয়া হতবাক হইলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজীর নিকট শুনিলেন, বৃক্ষতলে বহুদিন নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করিলে সেই বৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণ হয়।...কয়েক দিন পরে জানিলেন, গোসাঁইজীর জটারাশি ও শ্রীঅঙ্গ হইতেও মধুক্ষরণ হইতেছে।...মনে হইল, ঠাকুরের সব কিছুই অদ্ভুত।...অন্তরে জাগিল অপার বিস্ময় ও গভীর ভক্তি।...

একদিন শেষরাত্রে তন্দ্রাবস্থায় দেখিলেন: আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করিয়া নাম করিতেছেন, সহসা ঝিকিমিকি করিয়া নিজের রূপ প্রকাশিত হইল— আরসিতে নিজের প্রতিচ্ছবি যেন। দেখিলেন মুণ্ডিত-মস্তক, কান্তিমান পবিত্র ব্রাহ্মণ মূর্তি চাহিয়া আছেন তাঁহার দিকে।...দেখিতে দেখিতে বিহ্বল আনন্দে জাগিয়া পড়িলেন।

সমস্ত দিন অন্তর সরস ও প্রফুল্ল হইয়া রহিল। গোসাঁইজী বলিলেন:

একেই বলে আত্মদর্শন। জাগ্রত অবস্থায় যখন ওরূপ দর্শন হবে, তখন ঠিক হ'লো বুঝবে।···

: গৈরিক বসন পরা আঙ্গুল পরিমান যে অস্পষ্ট মানুষের আকৃতি হোমের আগুনে দেখতে পাই······

: চিত্ত যত শুদ্ধ হবে ততই তা পরিষ্কার দেখতে পাবে।

: সর্বক্ষণ যে উজ্জ্বল জ্যোতি চোখে লেগে আছে······

: চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ উজ্জ্বল ও নানা প্রকার জ্যোতি দেখতে পাবে। চিত্ত মলিন হ'লে তা অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

: কিছুকাল থেকে কথা বলতে গেলে মনে এসে পড়ে 'সত্য বলছি কিনা'—

: এই তো প্রণালী—ঐ ভাবে চললে সত্যাশ্রয়ী হওয়া যায়। প্রণালী মত চলাই তোমার কর্তব্য। অবস্থা যখন ভাল হবার হবে—সেজন্য উদ্বেগ ভোগ করো না।

উন্নত অবস্থা লাভ সাধন সাপেক্ষ নয়, কৃপা সাপেক্ষ। গুরুদেব পরম দয়াল, মহা শক্তিমান। গুরুর আদেশ পালন করাই শিষ্যের কর্তব্য, ফলদাতা তিনি। কর্তব্য পালনে অক্ষমতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু সদ্‌গুরুর কার্যে অন্যথা হইবার উপায় নাই। তবু তাঁহার কৃপা আকাঙ্ক্ষা করার অর্থ গুরুর সেবা ভোগ করা।··· কুলদানন্দের মনে হইল, অনুগত ভক্তেরা এইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শুধু গুরুর আদেশ পালন ও সেবাতেই লাভ করেন পরমানন্দ।···

এই প্রসংগে স্মরণীয় গীতার মহাবাণী: "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন···"। তাঁহার গুরুভক্তি ও জীবন-দর্শন সত্যই অপূর্ব। গুরুদেবের নানা উপদেশ অনেক সময় তাঁহার নিকট মনে হইয়াছে আপাতবিরোধী। সমস্যার গোলক ধাঁধায় তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।···তখন কৌতুহলী শিশুর মত প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কখনও বা বিচার ও বিশ্লেষণের পথে নিজের মনে খুজিয়া পাইয়াছেন তাহার সহজ সমাধান।··· কুলদানন্দের উক্ত সিদ্ধান্ত এমনি মনন শক্তির প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর।···

॥ তেরো ॥

সাধকের জীবনে দেখা দেয় অনেক বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ। ফলে আশ্চর্য ভাবে পরিবর্তিত হয় তাঁহার জীবনের গতি। কুলদানন্দের জীবনেও দেখা দিল এমনি একটী ঘটনা।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার কালে গোসাঁইজীকে পরিবেশন করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা একটী বোলতা বাম হস্তে দংশন করিল। অসীম ধৈর্যের সহিত তিনি সহ্য করিলেন সেই তীব্র যন্ত্রণা। গোসাঁইজীর আহারান্তে আর একটী বোলতা দংশন করিল ঠিক একই স্থানে।...হাতখানি ফুলিয়া অবশ হইয়া গেল। একটু পরে মহাভারত পাঠের উদ্যোগ করিলে আবার একটী বোলতা ঐ হাতের উপরেই উঠাপড়া করিয়া উড়িয়া গেল।...

অতি তুচ্ছ ঘটনা। তবু তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। গোসাঁইজীকে জানাইলে তিনি বলিলেন: ভগবান সর্ব ভূতে রয়েছেন। কোন প্রাণীকে কষ্ট দিতে নেই।...আজ তুমি প্রাণী হিংসা করেছ তাই ভগবান বোলতার ভিতরে থেকে তোমাকে জানিয়ে দিলেন।...

কুলদানন্দের মনে পড়িল, আসনে অসংখ্য পিঁপড়া দেখিয়া বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁড়ু দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুদেবের জন্য চিনি বাছিতেও কতক গুলি পিঁপড়ার হাত-পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।...অমনি মনে জাগিয়া উঠিল শৈশবে কেঁচো উদ্ধারের জন্য পিঁপীলিকা হত্যা এবং অসতর্ক মুহূর্তে একটী গর্ভবতী বিড়াল হত্যার স্মৃতি। সেই সব কথা গুরুর নিকটে তিনি অকপটে বর্ণনা করিলেন।

গোসাঁইজী বলিলেন: বোলতার কামড়ে তোমার সকল অপরাধের শাস্তি হয়ে গেল। এখন থেকে খুব সাবধানে চল'। একটী গাছের পাতাও বৃথা ছিঁড়বে না, কারো প্রাণে আঘাত দেবে না। কটু বাক্য দ্বারা কারো প্রাণে আঘাত দেওয়াও প্রাণী হিংসার তুল্য পাপ। একথা মনে রেখো।

বোলতার দংশন জ্বালা ভুলিয়া গেলেন কুলদানন্দ। দেহমনে বহিয়া গেল আনন্দের হিল্লোল। বুঝিলেন, ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিতে হইতেছে। সারা জীবনের পুণ্যফলেও একটী দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অথচ বোলতার দংশন উপলক্ষ করিয়া সমস্ত অপরাধ ধুইয়া মুছিয়া দিলেন গুরুদেব। গভীর বিস্ময়ে ও আনন্দে তিনি ভাবিতে লাগিলেন: সত্যই ঠাকুরের কী অপরিসীম দয়া!...

আষাঢ় মাস। সকলের মনে সর্বদা বিষম আতংক। ঠাকুরের কখন কী হয় কে জানে!…

বেলা প্রায় একটা। গোসাঁইজী সমাধিস্থ। তাঁহার দেহ স্থির, নিশ্চল। কুলদানন্দ সহসা সভয়ে দেখিলেন গুরুদেবের শ্বাস-প্রশ্বাসের চিহ্ন মাত্র নাই। তবে কি অন্তিম সময় আসন্ন?…তাঁহারও হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া আসিল যেন।… পাঠ বন্ধ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে গুরুদেবকে হাওয়া করিতে লাগিলেন। আর নিরুপায়ে তদ্‌গত চিত্তে স্মরণ লইতে লাগিলেন গুরু-গোবিন্দের। তিনটার সময়ে গোসাঁইজীর ধ্যানভঙ্গ হইল। বলিলেন—নানা মুনিঋষি, দেবদেবী আসিয়া তাঁহাকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু পরমহংসজী আবার তাঁহাকে দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গেলেন।…

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িলেন কুলদানন্দ। গুরুদেব ভিন্ন আপন সত্তা আজ তাঁহার চিন্তা ও ধারণার বাহিরে। দেহ, মন, আত্মা—সবই যে প্রতিক্ষণে গুরুময়।…গুরুদেবের ভরসায় ও আশ্বাস বাণীতে তাই তিনি পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। বরং তাঁহার পবিত্র, মধুর সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকায় বুকে যেন চাপিয়াছিল জগদ্দল পাথর। এতদিন পরে তিনি পরম নিশ্চিন্ত।…

অতঃপর স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে লাগিল। নামে আর জ্বালা বা শুষ্কতা নাই। নামানন্দে অভিভূত হওয়ায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। মনে হয়—নাম আপনিই চলিতেছে, তিনি শুধু শ্রোতা মাত্র।…গুরুর আদেশে গায়ত্রী জপের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আনন্দ ও উপকারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাগবত পাঠ কালে মনে হয় তাহা সচ্চিদানন্দের অঙ্গ বিশেষের উপাসনা। ঋষিবাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য লইয়া মতবিরোধ নাই, কেবল মাত্র আবৃত্তি ও শ্রবণে মধুর তৃপ্তি।…

সাধক জীবনে এই অবস্থা প্রচুর অধ্যাত্ম উন্নতির পরিচয়। তবু সেদিকে তিনি কিছুমাত্র আলোকপাত করেন নাই; বরং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকেই তাঁহার সজাগ দৃষ্টি। এত কৃচ্ছ্রসাধন সত্ত্বেও নিজের বিন্দুমাত্র দুর্বলতার উপর সর্বদা তিনি খড়্গহস্ত—নিয়ত আত্মবিচার ও ইন্দ্রিয়-দমনে যত্নবান। এই আন্তরিকতা উদ্রিক্ত করিয়াছে তাঁহার নিরলস সংগ্রাম; গুরুনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় মহিমান্বিত করিয়াছে তাঁহার সাধক জীবন। অন্ধকার আলোকেরই নিশ্চিত পূর্বাভাষ। তাঁহার বাহ্যিক প্রতিটী বিচ্যুতির পশ্চাতে লুক্কায়িত অন্তরে

মনিদীপের ভাস্বর দ্যুতি।…বস্তুতঃ, অনুগত শিষ্যের অন্তর-বাহির সর্বদা ছিল গোসাঁইজীর নখদর্পণে। একদিন তিনি বলিলেন : নিজের দোষগুলি যেমন দেখবে, উন্নতি কতটা হ'ল তাও তেমনি দেখতে হবে।

: নিজের উন্নতি দেখা নাকি ক্ষতিকর ?

অহমিকা ও অভিমান ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন গুরুদেব। পাছে অভিমান আসিয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি ফিরিয়াও তাকান না আত্মোন্নতির দিকে। এই সংশয় দূর করিয়া গোসাঁইজী বলিলেন : তা হবে কেন ? অভিমানই ক্ষতিকর। নিজের যথার্থ উন্নতি না দেখলে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হয়।…সাধন-ভজনেও উৎসাহ থাকে না।

এইভাবে শিষ্যের অন্তরে শান্তি ও সমতা বিধান করিলেন গোস্বামী প্রভু। কুলদানন্দ যে প্রকৃত উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছেন, গোসাঁইজীর এই উপদেশ তাহার সুস্পষ্ট ইংগিত।…

মধ্যাহ্নে আহারান্তে মহাভারত পাঠকালে গোসাঁইজী যেন অমৃত-পানের নেশায় বিভোর হইয়া পড়েন। তখন বসিয়া তাঁহার জটা হইতে উকুণ, পিঁপড়া ছারপোকা ইত্যাদি বাছিতে থাকেন কুলদানন্দ।

একদিন কিছুক্ষণ জটা বাছিয়া গোসাঁইজীর পাশে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে ঢুলুঢুলু অবস্থায় হাত পাতিয়া অস্পষ্ট স্বরে গোসাঁইজী বলিলেন : ন্যাস দেও—ন্যাস।…বলিয়া ভাবাবেশে আবার ঢলিয়া পড়িলেন।

বৃষ্টির মধ্যে ছুটিলেন কুলদানন্দ। ত্বরিতে গিয়া কিনিয়া আনিলেন এক কৌটা নস্য।…

একটু মাথা তুলিয়া আবার বলিলেন গোসাঁইজী : দিলে না ? দেও—ন্যাস দেও।…

কতকটা নস্য গোসাঁইজীর হাতে দিলেন কুলদানন্দ। আবার ধ্যানস্থ হইলেন গোসাঁইজী। একটু পরে মাথা তুলিলে কুলদানন্দ বলিলেন : নস্য আপনার হাতে দিয়েছি—একবার নাকে টেনে দেখুন।…

অভিভূত অবস্থায় আঙ্গুলের টিপে নস্য লইয়া নাকে টানিলেন গোসাঁইজী। অমনি সুরু হইল হাঁচির পর হাঁচি।…ভাবের নেশা ছুটিয়া গেল—দশ বারোটী হাঁচির পর সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন : এ কী দিয়েছ ?

: আপনি চেয়েছিলেন—তাই নস্য এনে দিয়েছি।…

অমনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন গোসাঁইজী। যেন ভাবেভোলা ভোলানাথ ছড়াইয়া দিলেন উচ্চহাসির ফোয়ারা। রহস্য কিছু না বুঝিলেও সেই প্রবল হাসির তরঙ্গে কুলদানন্দও দুলিতে লাগিলেন।…গুরুদেবের সহিত এইভাবে হাসিবার চিন্তাতীত সুযোগ তাঁহার জীবনে এই প্রথম।…মনে যেটুকু সংকোচের বাঁধ ছিল, প্রাণখোলা হাসির বেগে পলকে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন: তোমার কাছে ন্যাস চেয়েছি, আর তুমি নস্য এনে দিয়েছ?…বেশ—তুমি যেমন বোকা।…

এবার নিঃসংকোচে উত্তর দিলেন কুলদানন্দ: দেখেশুনে আপনি নস্য টেনে নিলেন, আর বোকা হ'লাম আমি! ন্যাস আবার কী? আমি তো নস্য মনে করে……

: ন্যাস কি জান না? অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস—তোমার তা আছে।

: আমার তো কিছুই নেই।

অপূর্ব সংলাপ গুরু-শিষ্যের।…গোসাঁইজীর নির্দেশে শ্রীমদ্‌ভাগবত আনিলেন কুলদানন্দ। পাঠ করিলেন একাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়।

গোসাঁইজী বলিলেন: অর্পণকে ন্যাস বলে—তুমি প্রত্যহ এইভাবে ন্যাস ক'রো।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-স্পর্শাদি এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিবার প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন: কাল থেকে রোজ প্রথমে ন্যাস ক'রবে। ন্যাসের পর তন্ময় হয়ে নিজেকে ধ্যান ক'রবে।…শিক্ষার কত বিষয় রয়েছে। এ সব করায় যে কত উপকার, করলে বোঝা যায়। কিন্তু শিক্ষা দিবার মত কাউকে আর পেলাম কই!…

বলা বাহুল্য, কুলদানন্দ তাহার একমাত্র ব্যতিক্রম। তাই মনের দুঃখ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন গোস্বামী প্রভু। কুলদানন্দও সানন্দে গ্রহণ করিলেন এই নূতন নির্দেশ। তাঁহার মনে হইল, এই সাধন দিবার ব্যবস্থা গুরুদেব পূর্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অভয় চরণে শরণলাভের জন্য নিজেকে ধন্য মনে হইল। গুরুদেবের উপর নির্ভরতাও পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। আপন মনে তিনি বলিলেন: যা ইচ্ছা দয়া করে শিক্ষা দাও। আমি শুধু প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাব—ফলাফল তোমারই হাতে।…

কয়েক দিন পরে একটী চমৎকার স্বপ্ন দেখিলেন: যেন একটী চৌরাস্তা

হইতে গুরুদেবের আদেশে সোজা পথে চলিলেন। সহসা ব্যাঘ্রের গর্জনে একটী প্রাচীরের উপর উঠিলেন—ব্যাঘ্রটী অন্য শিকারের পিছু ছুটিল। গুরুদেবও অভয় দিয়া চলিয়া গেলেন। পরে একটী বিপন্ন শিশু দেখিয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। অমনি সম্মুখে আসিয়া পড়িল আর একটী ব্যাঘ্র। বিপদ বুঝিয়া পশ্চাতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন শিশুটীকে—আর গুরুদেবের নামে ব্যাঘ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্রটী বিড়াল হইয়া গেল এবং দুই-এক আঘাতে তাহার মৃত্যু হইল।...পরক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

গোসাঁইজী বলিলেন: ঠিক দেখেছ। ছেলেটী সংসার—বাঘে সংসারীকে মেরে ফেলে। আবার ঐভাবে দৃষ্টি করায় বাঘও বিড়াল হয়।...খুব তীব্র বৈরাগ্য না হ'লে সংসার কাউকে ছাড়ে না।...খুব সাবধান!...

সর্বোৎকৃষ্ট আধারে গুরুকৃপার ফলও দেখা দিল চমৎকার। একদিন স্বপ্নে গুরুগীতা পাঠ করিলেন কুলদানন্দ; প্রণাম-মন্ত্র শেষ হইলে স্বপ্ন টুটিয়া গেল। আর একদিন স্বপ্নযোগে ভাগবদ্গীতা পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাযোগে তাঁহার প্রাণায়াম ও কুম্ভকও চলিতে লাগিল।...এইভাবে দেখা দিল সার্থকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

খুব উৎসাহ দিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: নিত্যকর্মগুলি ঘুমের ঘোরে হ'লেই ঠিক হ'লো। এর ফলে বাসনা কামনা নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমে ঘুমের ঘোরে নামও চলতে থাকে।...এসব প্রকাশ করো না।...

২০শে শ্রাবণ, শুক্লা দশমী—১২৯৯। ব্রহ্মচর্য ব্রতের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। পশ্চাতে রহিল সাময়িক ব্যর্থতা ও উত্তেজনার গ্লানি। আন্তরিক প্রয়াসে, সংগ্রামের গৌরবে সার্থক হইয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার স্বপ্ন ও সাধনা।...

প্রত্যূষে স্নান করিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে আনিলেন নূতন উপবীত ও স্ফটিকের মালা। অন্তরে তাঁহার নূতন করিয়া ব্রত গ্রহণের ব্যাকুল আগ্রহ।

গোসাঁইজী আবার ব্রহ্মচর্য দিলেন তাঁহাকে। কিন্তু এবার আর এক বৎসরের জন্য নয়। চার বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য দিয়া বলিলেন: ছয় বছরেই তোমার ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হবে।...ইচ্ছা হ'লে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবে।

ফলাফল সম্বন্ধে বলিলেন: ছয় বছর ঠিকমত ব্রহ্মচর্য ক'রলে এরপর অন্যান্য সাধন স্পর্শমাত্র হয়ে যাবে।.. ইন্দ্রিয়-সংযম ব্রহ্মচর্য ব্রতের প্রধান সাধন।...

কাম অপেক্ষাও ক্রোধ ভয়ানক, ক্রোধটিকে একেবারে দমন করার চেষ্টা কর।··· এখন থেকে অধ্যয়ন কমিয়ে দেও। সর্বদা নামে ডুবে থাকবে। নামে রুচি হলে আর কিছু না করলেও হয়।···

আরো নির্দেশ দিলেন—গুরুগীতা ও ভাগবদ্‌গীতা নিত্য পাঠ্য, গীতার একটী করিয়া শ্লোক প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, আহার পূর্বের ন্যায় চলিবে এবং ব্রাহ্মণ অথবা দীক্ষাপ্রাপ্ত যে-কোন ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা চলিবে।

গোসাঁইজী দুই-তিন মিনিট নীরবে ধরিয়া রাখিলেন উপবীত ও স্ফটিকের মালা। পরে তাঁহার নির্দেশে প্রণাম করিয়া উহা ধারণ করিলেন কুলদানন্দ।

প্রথম বৎসরে গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হয় অন্ততঃ বারো বৎসর। দ্বিতীয় বর্ষে বলিয়াছিলেন নয় বৎসরে হইবে। কিন্তু আজ বলিলেন ছয় বৎসরেই হইয়া যাইবে। গুরুদেবের অসাধারণ কৃপায় চমৎকৃত হইলেন কুলদানন্দ।···বুঝিলেন ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা সর্বাধিক প্রয়োজন। একাগ্র মনে প্রার্থনা জানাইলেন—শ্রীগুরুর চরণ ব্যতীত অন্য কিছুতে যেন তাঁহার আনন্দ ও আকর্ষণ না থাকে,···নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যই তাঁহার জীবনের অবলম্বন হয় যেন।···মনে হইল একমাত্র সার সর্বগুণাধার সদ্‌গুরুর উপাসনা। সসীম জীবনে অসীম অনন্তের ধ্যান-ধারণা কল্পনা বিলাস।···গণ্ডুষমাত্র জলে পিপাসার নিবৃত্তি হইলে সাগর শোষণ করিবার কী প্রয়োজন?

বারো বৎসরের পরিবর্তে ছয় বৎসরে ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হইবে—গোসাঁইজীর এই নির্দেশ বিশেষ অর্থপূর্ণ। ইহা অনন্ত গুরুকৃপা ও ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা উভয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয়।··কিন্তু প্রদীপ্ত সূর্যালোকে ফুল্ল জ্যোৎস্না নিতান্তই স্তিমিত। তাই অভিভূত কুলদানন্দ একেবারে ভুলিয়াছেন নিজের অস্তিত্ব ও সার্থকতা। এমনকি আশৈশব যে ভগবৎপ্রাপ্তির আগ্রহ তাঁহার এত প্রবল, আজ তাহাও যেন লুপ্তপ্রায়। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে মনে হইয়াছে নিরাকার ব্রহ্ম একমাত্র উপাস্য। কিন্তু আজ গুরুপূজা তাঁহার নিকট সার্থক আরাধনা। সান্তের মাধ্যমে তিনি চান অনন্তের রসাস্বাদন।·· গুরুদেবকে প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীভগবানের প্রতিভূ রূপে। সেই গুরুদেব আজ তাঁহার সর্বস্ব, স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ।···গুরু-উপাসনার মাঝে একাকার হইয়া গেল ভগবানের আরাধনা।··

কুলদানন্দের এই মনোভাব তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর দার্শনিক জ্ঞানের আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সময় ইহাও তাঁহার মনে হইয়াছে, সমস্ত বাসনা

নিবৃত্তির অর্থ নিজের অস্তিত্ব মাত্র অনুভূতিতে পরিতৃপ্তি।...অবশ্য, ভগবৎলাভ করিতে হইলে এই পৃথিবীর সবকিছু পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বিশ্বের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে গেলে যে বিপন্ন ও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে আপন অস্তিত্ব।...অথচ বাসনা নিবৃত্তিও অপরিহার্য—বিশেষতঃ, ইহা শ্রীগুরুর আদেশ। এই আপাতবিরোধী ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি গুরুদেবকে মনে করেন 'সত্যস্বরূপ', আর চেতনার অপূর্ব দীপ্তিতে লাভ করিতে চাহেন পরমানন্দ। ফলে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তিনি চাহেন সচ্চিদানন্দের পরম উপলব্ধি।...তাই প্রার্থনা জানান ঃ গুরুদেব! দয়া কর—তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে চিত্ত নিবিষ্ট কর; সমস্ত বাসনার উপশমে যেন চিরশান্তি লাভ করি।...

। চৌদ্দ ।

শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আহারান্তে গোস্বামী প্রভু আশ্রমের পূর্বদিকের ঘরে উপবিষ্ট।

অন্যান্য দিনের মত গুরুদেবের নিকটে অপরাহ্ন পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়া গেল; দিনের শেষে খিচুড়ি রান্না করিলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজীর নির্দেশ—রান্নার পরই নিবেদন করিয়া আহার করিতে হইবে। উনান হইতে খিচুড়ি কলাপাতায় ঢালিলেন এবং নিবেদন করিয়া প্রণাম করিলেন। উত্তপ্ত খিচুড়ি নাড়াচাড়া করিলেন একটু। পরে আহার করিতে উদ্যত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন।... বেড়ার ফাঁক দিয়া প্রসারিত হইল গোসাঁইজীর পদ্মহস্ত! তিনি বলিলেন ঃ ব্রহ্মচারি! তোমার রান্না অন্ন এক গ্রাস দাও—আমি খাবো।...

কুলদানন্দ হতবাক!...যন্ত্রচালিতের মত নিজের মুখের গ্রাস তুলিয়া দিলেন ঠাকুরের শ্রীহস্তে। আরও দিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঃ কী চমৎকার স্বাদ! তোমার মত সুস্বাদু অন্ন এদেশে কেউ খায় না।... দেরি করো না, প্রসাদ খাও।...

ঠাকুরের কথামত আহারে প্রবৃত্ত হইলেন অভিভূত কুলদানন্দ। গোসাঁইজী অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কন্যাদের নিকট অন্নের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্যাপারটি এতক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন কুলদানন্দ। ঠাকুর আজ স্বয়ং হাত পাতিয়া অন্নগ্রহণ করিলেন?...ভিখারী বেশে স্বয়ং ভোলানাথের

একি অদ্ভুত লীলা!…এই দুরাচার পাষণ্ডের উপর তাঁহার একি অপরিসীম করুণা!…ভাবিতেই সারা অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল।· দরদর ধারে গণ্ডদেশে নামিল অব্যক্ত আনন্দের ধারা।…

রহিয়া রহিয়া যেন ধ্বনিত হইতে থাকে : কী চমৎকার স্বাদ! তোমার মত সুস্বাদু অন্ন এদেশে কেউ খায় না।…তাঁহার জন্য বরাদ্দ শুধু ভাতে-সিদ্ধ ভাত, খিচুড়ি, অথবা জলভাত। অথচ গুরুর আদেশে পরিবেশন করিতে হয় কত সুস্বাদু, উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। সেজন্য মনে দেখা দিয়াছে লোভ ও ক্ষোভ, আর প্রলোভন জয় করিতে নিত্য কত না প্রচেষ্টা। সেই ক্ষোভ দূর করিতে ও লোভ জয় করিতে সাহায্য করিবার জন্যই শ্রীগুরুর এই বিচিত্র লীলা।…তাঁহার কৃপায় সামান্য খিচুড়ি সত্যই যেন আজ পরমান্ন,·· সারা দেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।…আহার করিতে করিতে তাঁহার বার বার মনে হইতে লাগিল, এত দেখিয়াও মনটা আজো গুরুমুখী হইল না?…

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অন্তর কত বেশী গুরুমুখী হইয়াছিল, ঘটনাটী তাহার অপূর্ব নিদর্শন।…তবু নিজের জন্মগত বিচারবুদ্ধি একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; মজ্জাগত সংস্কার ও বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ বিধিদত্ত অহংকার মাঝে মাঝে পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়।…ফলে তখনও নিজেকে উজাড় করিয়া ডালি দিতে পারেন নাই শ্রীগুরুর চরণে।…আপশোষ তাঁহার সেই-জন্যই।…তবে, সর্বকর্ম ও চিন্তা, সাধনভজন ও ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই আত্মদানের পথে।…আর, সর্ব ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—বাহিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করিয়া চিত্তকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য গুরু দিয়াছেন ন্যাসের ব্যবস্থা!…এইভাবে সাধন জীবনে সব্যসাচীর মত তিনি চলিয়াছেন ক্রমোন্নতির পথে। আর, সেই আলোর রথে তাঁহার সারথী স্বয়ং সদ্‌গুরু গোস্বামী প্রভু।…

মধ্যাহ্নের পাঠ সমাপ্ত। প্রতিদিনের ন্যায় গোসাঁইজীর পাশে বসিয়া জটা বাছিতেছেন কুলদানন্দ।

সম্মুখস্থ বড় জটাটীর গোছার মধ্যে অসংখ্য ছারপোকার বাসা। ছারপোকা, উকুন ও পিঁপড়ার কামড়ে অস্থির হইয়া পড়েন গোসাঁইজী। বাধ্য হইয়া প্রত্যহ প্রাণীবধ করিতে হয়। উপায় কী! ব্যাধির উপশমের জন্য দেহের অসংখ্য বীজাণু ও কীটানু বধ অনিবার্য। গুরুদেবের দৈহিক স্বস্তির জন্যও ইহা

অপরিহার্য। তবে এই প্রাণীহত্যা হিংসা বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা বশে নয়—কাজেই মনে পাপ স্পর্শ করে না।…বরং দেহরক্ষার তাগিদে ইহা কর্তব্য।…

জটা বাছিতে বাছিতে মনে চলিতেছে এমনি বিচার ও বিশ্লেষণ।…এমন সময় বলিলেন গোসাঁইজী : তামাক খেয়ে এসেছ ?…বড় দুর্গন্ধ !…

সহসা লজ্জায় ও দুঃখে মরমে মরিয়া গেলেন কুলদানন্দ। নীরবে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলেন নিজ আসনে। স্থির করিলেন : কাল থেকেই ধূমপান ত্যাগ করব—নইলে আর ঠাকুরের অঙ্গসেবা ক'রব না।…

প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিয়া ধুইয়া আনিলেন হুকা-কলিকা; ফুলজলে তাহার পূজা করিয়া নমস্কার করিলেন। পরে দুইটী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন।…

খুব উপহাস করিলেন গুরুভ্রাতারা। কিন্তু শিষ্যের দুঃখ, লজ্জা ও দৃঢ়তা ধরা পড়িল গুরুদেবের কাছে। বুঝিলেন তামাক খাইতে না পারিয়া কষ্টও হইতেছে। কুলদানন্দকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন : হুঁকা কলকে ভেঙ্গে ফেলেছ ! কেন ?… মুখ ধুয়ে নিও—আর গন্ধ থাকবে না। সুগন্ধ তামাক খেলেও তো পার।…তামাক খেতে তো নিষেধ নেই। যাও—এখন গিয়ে এক ছিলিম তামাক খাও।…

অবাক হইয়া ভাবিতে থাকেন কুলদানন্দ : আশ্চর্য !…স্নেহময়ী জননীর মত সন্তানের এতটুকু কষ্টও কি তাঁর বুকে শেল হয়ে বেঁধে ?…

ঘটনাটী উপলক্ষ করিয়া দেখা দিল মধুর লীলা। গোসাঁইজী বলিলেন : হুঁকা পেলে আমিও তামাক খেতাম।…অমনি ছুটিলেন দুই-তিন জন, কিনিয়া আনিলেন হুঁকা ও সুগন্ধি তামাক। কিন্তু তামাক সাজিয়া দিলে টান দিতেই গোসাঁইজী অস্থির। বলিলেন : বাবা ! এই নেও—রক্ষা কর।…

কুলদানন্দের মনের জমাট মেঘ সত্যই উড়িয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনি কখনও তামাক খেয়েছেন ?

: হ্যাঁ। আমি যে আগে তামাকখোর ছিলাম।…

গোসাঁইজী গল্প করিলেন, কীভাবে এক দ্বারোয়ানের কাছে তামাক খাইতে গিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। সেইদিন হইতে ধূমপান ত্যাগ করিয়াছেন।

গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন কুলদানন্দ—পূর্বজন্মেও তিনি সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।…শুনিয়া চোখে অন্ধকার দেখিলেন। মনে হইল, তবে এজন্মে

আবার ঠাকুর ব্রহ্মচর্য দিলেন কেন?…মুনিঋষিদের পবিত্র সম্পদ ব্রহ্মচর্য ব্রত এবারও তাঁহার দ্বারা কলুষিত হইবে?…দুই বৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা চিত্তবিকার আজো দূর হইল না। কঠোর বৈরাগ্য বা তীব্র সাধনভজন তো সামর্থ্যের বাহিরে। প্রাণে প্রকৃত আকুলতা, গুরুদেবের উপর একান্ত নির্ভরতা—কিছুই নাই। ভাবিয়া দারুণ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। চোখের জলে প্রার্থনা করিলেন: ঠাকুর—রক্ষা কর।

সমাধিস্থ ছিলেন গোসাঁইজী। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন: সাধনভজন শুধু জেগে থাকবার জন্য। তিনি স্বপ্রকাশ—কৃপা হলে তাঁকে পাওয়া যায়।…তাঁর কৃপাই সার।…কাতরভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাক।…

শ্রীগুরুর নির্দেশে কিছুটা শান্ত হইলেন কুলদানন্দ।

কয়েক দিন পূর্বে গোসাঁইজী চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী ন্যাস করিয়া মনে হইল, ইহা এক অদ্ভুত প্রণালী। ন্যাসের সময় দেহের প্রতি অঙ্গে উদিত হয় শ্রীগুরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্মৃতি। নাম করিবার সময় তাহা আরো সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, চিত্ত তাহাতে নিবিষ্ট হয়। তখন গুরুদেবের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছু থাকে না। একমাত্র দর্শন-অনুভূতি নাম সংযোগে সংলগ্ন হয় ইষ্টমূর্তিতে। নাম, নামী ও নামকারী এক হইয়া যায়—অন্তরে উৎসারিত হয় পরমানন্দ।…সারাদিন তখন ন্যাস লইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। পুষ্পচন্দনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূজা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে মনেপ্রাণে।

গোসাঁইজীকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন: নিত্যক্রিয়ার প্রথমে ন্যাস করতে হয়। অন্তরে সর্বদা ন্যাসের ভাব রাখতে হয়।

গুরুপূজার সার্থকতাও অনুভব করিতে লাগিলেন কুলদানন্দ। কয়েক দিন পরে কুঞ্জ ঘোষের বাড়ীতে গোসাঁইজীর কথামত মনসা পূজা করিতে গেলেন। গুরুদেব বলিয়াছেন: ইষ্টনামে পূজা করো, ঐ নামে তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর পূজা করতে পার।…তিনি পূজায় বসিলে কুঞ্জবাবু বিরক্তি প্রকাশ করায় আহত হইলেন; তবু মনসা দেবীকে আহ্বান করিয়া ইষ্টমন্ত্রে দেবীমূর্তিতে পূজা করিলেন ইষ্টদেবের।…

অপরাহ্নে কুঞ্জবাবু আসিয়া বলিলেন: পূজার পর ঘরখানা আশ্চর্য সুগন্ধময় হয়েছে। স্বয়ং দেবী যেন অবির্ভূতা। আশ্চর্য!…

সানন্দে কুলদানন্দ বুঝিলেন ইহা ঠাকুরের কৃপা। প্রার্থনা করিলেন: ঠাকুর, সর্বঘটে তোমার অধিষ্ঠান বুঝে তোমার পূজা করে যেন ধন্য হই।…

পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন কুলদানন্দ। মনে হইল, আহারে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতাই ইহার কারণ। সকালে একবার একটু মাত্র চা পান করেন। আর সন্ধ্যার সময় শুধু লবণ দিয়া জলভাত খাইয়া থাকেন। ফলে শরীর বড় দুর্বল বোধ হয় তাঁহার। সাধনভজনে আর তেমন উৎসাহ নাই যেন—চলাফেরা করিতেও কষ্ট বোধ হয়।

শুনিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: অভ্যাসটী খুব ধীরে ধীরে করবে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জলভাত খাওয়া ছেড়ে দেও। খিচুড়ি বা ভাতে-সিদ্ধ ভাত খেতে আরম্ভ কর। আর শোওয়ার সময় একপোয়া করে এক বলকা দুধ খেয়ে নিও।

কুলদানন্দের মনে হইল ইহা হটকারিতার দণ্ড।...

সূর্যাস্তের পূর্বে রান্না করা চাই। নানা কাজে একদিন দেখিলেন রান্নার সময় অতীতপ্রায়। অথচ বেশ ক্ষুধা পাইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রান্না করিতে গেলেন। মনে পড়িল এঁটো বাসন পড়িয়া রহিয়াছে; তখন বাসন মাজিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রান্না ও আহার শেষ করা অসম্ভব। বাধ্য হইয়া আহারের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। বারান্দার এক কোণে এঁটো বাসন রাখিয়া দিয়াছিলেন, শুধু মাজিয়া রাখিবার জন্য তাহা আনিতে গেলেন। গিয়া দেখেন বাসনপত্র পরিষ্কার ঝকঝকে।

অবাক কাণ্ড তো! এঁটো বাসন কে মাজিয়া রাখিল?...আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলে বলিল কেউ জানে না।

সত্যই বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। রান্নার সময় অতিক্রান্ত, তবু মনে হইল তাঁহার আহার করা ঠাকুরের অভিপ্রেত। খিচুড়ি রান্না করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।...সারা রাত বার বার শুধু মনে হইতে লাগিল, এঁটো বাসন পর্যন্ত ঠাকুর মাজিয়া রাখিলেন!...

ভরা ভাদ্র। সকালেই বেশ বৃষ্টি নামিয়াছে। হোম ও পাঠ অন্তে আসনে বসিয়া আছেন কুলদানন্দ। সহসা মনে হইল, বাড়ী থাকিলে এ সময়ে চালভাজা খাওয়া যাইত।...পাঁচ-সাত মিনিট গিয়াছে মাত্র—সহসা একবাটী গরম চালভাজা, লংকা ও কাঁঠালের বিচি সম্মুখে হাজির।...পাড়ার একটী মেয়ে বলিল: মা আপনাকে খেতে দিয়েছেন।...

একদিন আহারের পূর্বে কলা খাইবার ইচ্ছা হইল। একজন গুরুভ্রাতা পাঁচটী মর্তমান কলা আনিয়া বলিলেন: দিদিমা আপনাকে দিয়েছেন।...

আবার একদিন সকালে সুরু হইল মুষলধারে বৃষ্টি। আসনে বসিয়া মনে হইল: ঠাকুর! এ সময়ে গরম চা হ'লে কত আরাম হ'ত।...পাঁচ-ছয় মিনিট পরে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় বৃষ্টিতে ভিজিয়া হাজির। বলিলেন: গোস্বামী মহাশয় আপনার জন্য এই চা ও মোহনভোগ পাঠিয়ে দিলেন।...

দিনের পর দিন ঘটে এমনি ঘটনা। অতি তুচ্ছ, অথচ অলৌকিক।... অন্তর বলে: সবই ঠাকুরের খেলা, তাঁর অনন্ত কৃপা।...বুদ্ধি তবুও বোঝাতে চায়: এ অন্ধ বিশ্বাস, মিথ্যা কল্পনা। বর্ষার দিনে ভালবেসে সকলে এসব পাঠিয়ে দিয়েছেন।...অমনি আপশোষ জাগে: হায়রে মূঢ় মন, এত দেখেও দৃষ্টি খুলল না?...এত বুঝেও অবিশ্বাস ঘুচল না?...

আহারান্তে গোসাঁইজী ধ্যানমগ্ন। কাছে বসিয়া হাওয়া করিতেছেন কুলদানন্দ।

আনমনে বলিলেন গোসাঁইজী: যোগ বড় কঠিন কথা। আমাদের এই পন্থা যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়ে সর্বপ্রথম যে সাধন করেছিলেন, 'তপ-তপ' বাণী শ্রবণ ক'রে যেভাবে তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করেছিলেন—আমাদের এই সাধনা তাই। আমাদের সাধন সমস্তই ভিতরের ক্রিয়া, বাইরের কিছু নয়।...সর্বদা শম, সন্তোষ, বিচার ও সৎসঙ্গ চাই।

মনের সাম্য অবস্থাই শম। সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা সর্ব অবস্থায় মন থাকিবে শান্ত, অচল ও অটল। অন্তরে থাকিবে সন্তোষ, চিত্ত রহিবে সদা প্রফুল্ল। নইলে কোন কার্য সুসম্পন্ন হয় না। চিত্তের অস্থিরতা ও অশান্তিই নরক।...এছাড়া সর্বদা চাই সদসৎ বিচার। সর্বকার্যের লক্ষ্য সেই এক ভগবান। তিনি একমাত্র সত্য ও নিত্য—আর সব অসৎ, অনিত্য।...সেই ভগবৎসঙ্গ সৎসঙ্গ। ভগবৎ আশ্রিত সাধুসঙ্গ, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ—ইহাও সৎসঙ্গ।

সবকিছু বুঝাইয়া দিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন: এই চারটীর সঙ্গে রক্ষা করা চাই আরও চারটী নিয়ম—স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ ও দান।

স্বাধ্যায় শুধু অধ্যয়ন নয়, গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র শ্বাসপ্রশ্বাসে জপ করাই প্রকৃত স্বাধ্যায়। শীত-উষ্ণ, মান-অপমান—সর্ব অবস্থায় চিত্ত রহিবে অবিচলিত। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সকল প্রকার তাপ ও জ্বালার মধ্যে ধৈর্যই তপস্যা।...আর, দেহমনে পবিত্রতাই শুচি। দেহ পবিত্র না থাকিলে চিত্তশুদ্ধি

হয় না—চিত্তশুদ্ধি না হইলে নামে যথার্থ রুচি ও ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মে না। এছাড়া দয়া, সহানুভূতি ও সুমিষ্ট বচন—ইহাই প্রকৃত দান।

প্রত্যহ এই কয়টী নিয়মের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিলেন গোসাঁইজী।…নিয়মগুলি মনে প্রাণে গাঁথিয়া রাখিলেন কুলদানন্দ।

এতদিনে কুলদানন্দের জীবনে দেখা দিল অগ্নি-পরীক্ষা। তিনি সম্মুখীন হইলেন ভীষণ প্রলোভনের। সাময়িক লোভ নয়—তরুণ ব্রহ্মচারীর সম্মুখে বিবাহের প্রলোভন।··পাত্রী স্বয়ং গুরুকন্যা প্রেমসখী—আর প্রস্তাবক গুরুপুত্র যোগজীবন। গত বৈশাখ মাস হইতে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন। এখন উপরোধ পরিণত হইয়াছে সস্নেহ দাবীতে।

শ্রীবৃন্দাবন থাকিতে জননী যোগমায়া দেবীও একদিন ঠিক এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোসাঁইজীর সম্মুখে তিনি একদিন ধরিয়া বসেন : কুলদা, তুমি কুতুকে (প্রেমসখী) বিয়ে কর। আমার কথা শোন, কল্যাণ হবে। বিয়ে করলে কি ধর্ম হয় না? গোসাঁই তো বিয়ে করেছেন, তাঁর ধর্ম হয় নি?…

যুক্তি অকাট্য। দেহত্যাগের পূর্বেও কুতুকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রকারান্তরে তিনি আবেদন জানাইয়াছিলেন।…তবু অন্তর সাড়া না দেওয়ায় নীরবে অধোমুখে বসিয়াছিলেন কুলদানন্দ।

জননীর সেই অন্তিম ইচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যোগজীবন : কুতুকে তুমি বিয়ে কর মায়েরও সেই ইচ্ছে ছিল। ওকে বিয়ে ক'রলে তোমার ধর্মলাভের কোন ক্ষতি হবে না, বরং অনেক সাহায্য হবে। এমন অসাধারণ মেয়ে সংসারে আছে কিনা সন্দেহ। তুমি যেমন ব্রহ্মচারী, কুতুও তেমনি· ব্রহ্মচারিণী থেকেই তোমার সহধর্মিনী হবে। তাছাড়া, গোসাঁই তো চিরকালের জন্য তোমাকে ব্রহ্মচর্য দেন নি; ব্রত উদ্‌যাপন করে কুতুকে তুমি বিয়ে ক'রো।…

কুলদানন্দ পড়িলেন উভয় সংকটে। প্রেমসখী নিতান্ত ছেলেমানুষটী আর নন, বিবাহযোগ্যা। নানা আলোচনায় তাঁহার মনে আসিয়াছে লজ্জা-সংকোচ। যোগজীবনের পুনঃপুনঃ অনুরোধে তাঁহার নিজেরও মন চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে।…অবশ্য প্রেমসখী সত্যই অতুলনীয়া, স্বাভাবিক ভক্তি ও সদ্‌গুণের জীবন্ত প্রতিমা। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং গুরুদেবের মূর্তিমতী আশীর্বাদ।…তবুও, সেই গুরুদেবের নিকট হইতে তিনি যে গ্রহণ করিয়াছেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য,… আজীবন কৌমার্য ব্রত।…প্রেমসখীকে গ্রহণ করিলে গুরুদেবের প্রতি সেই

একনিষ্ঠা কিরূপে থাকিবে? প্রেমসখী নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ রত্ন; তবু একমাত্র গুরুদেব ভিন্ন ত্রিভুবনের আর কোন অমূল্য সম্পদে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে তিনি যে হইবেন পতিত, লক্ষ্যভ্রষ্ট।...

তাঁহার মনে পড়িল কিছু দিন পূর্বে গুরুদেবের ভবিষ্যৎবাণী: বিবাহের প্রলোভন তোমার ভবিষ্যতে। তখন উহা কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করতে পারলেই হ'ল।...পরে তাঁহার চিত্তে জাগিল নূতন প্রশ্ন—ব্রহ্মচারিণী প্রেমসখী যদি সহধর্মিনী হন, তবে কি সেই অনাসক্ত পরিণয়ে সর্ববিষয়ে তিনি লাভবান হইবেন না?... কিন্তু সর্বপ্রথমে গুরুদেবের চরণে জানান চাই ঊর্ধরেতা হইবার প্রার্থনা।...

আসনে বসিয়া একান্ত মনে নাম করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের চরণে জানাইলেন প্রার্থনা: গুরুদেব! কিসে আমার যথার্থ হিত, কিসে অহিত—কিছু বুঝি না। দয়া করে আমাকে ঊর্ধরেতা করে তোমাতেই একনিষ্ঠ করে নেও!...প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে বহিল অশ্রুধারা।

সহসা পূর্বদিকের ঘর হইতে ভাসিয়া আসিল গোসাঁইজীর আহ্বান। অমনি ছুটিয়া গেলেন কুলদানন্দ।

তাঁহার দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন গোসাঁইজী: ব্রহ্মচারি, খুব সাবধান! প্রার্থনা করলে কিন্তু সেটী মঞ্জুর হবে। কিসে ভাল, কিসে মন্দ, কিছু যখন বোঝ না—তখন প্রার্থনা ক'রতে খুব সাবধান।...

বলিয়া ভাগবৎ পাঠে নিমগ্ন হইলেন। ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন কুলদানন্দ। মাথা ঘুরিয়া গেল যেন। আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন: আত্মার যাতে পরম কল্যাণ, তাই তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কচ্ছিলাম; তবু ঠাকুর এমনি করে শাসন করলেন কেন?...

গোসাঁইজী শাসন করিলেন ঠিক সময় মত। তিনি যে অন্তর্যামী—অনুগত শিষ্যের মনপ্রাণ তাঁহার নখদর্পণে। শিষ্যের হৃদ্-যমুনায় কখন ওঠে কোন্ কামনার তরঙ্গ, কোন্ প্রার্থনার আবর্ত—সমস্ত জানিতে পারেন। কুলদানন্দের ক্ষণকাল পূর্বেকার প্রার্থনায় তরঙ্গায়িত সেই কামনার আবিলতা।...প্রেমসখীকে তিনি গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন—দেহে নয়, মনে।...তবু তিনি ধরা পড়িয়াছেন যোগজীবনের যুক্তিজালে। বাঁধা পড়িয়াছেন লাভজনত, ব্রহ্মচারিণী প্রেমসখীর অতি সূক্ষ্ম আকর্ষণে। নিজের অজ্ঞাতে অবচেতন মনের গহনে জাগিয়াছে কামনার আবেগ। তাহা হইতেই উৎসারিত ঊর্ধরেতা হইবার প্রার্থনা।...

নামে নিমগ্ন হইলেন কুলদানন্দ। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে চলিল মধুর ইষ্টনামের অবিরাম প্রবাহ।...ক্ষণকাল পরে তিনি বুঝিলেন নিজের দুর্বলতা।... এছাড়া, ঠাকুরের উপর গভীর শ্রদ্ধা ও অখণ্ড নির্ভরতা কোথায়? হিতাহিত, পাপপুণ্য সবকিছুর মালিক তো তিনি।.. কেন তবে অন্তরে জাগে সকাতর প্রার্থনা?...সে তো কামনার নামান্তর।...বিবাহ করা ন্যায় কি অন্যায়, কী প্রয়োজন সেই বিচার ও সিদ্ধান্তের?...সর্ব বিষয়ে চাই গুরুদেবের উপর পূর্ণ নির্ভরতা। সর্ব অবস্থায় চাই গুরুদেবের শ্রীচরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।... প্রার্থনা সেখানে শুধু অবান্তর নয়, অহমিকার পরিচয়।...

এতদিনে বুঝিলেন কুলদানন্দ, প্রার্থনা করাও তাঁহার পক্ষে গুরুতর অপরাধ! নিজের হিতাহিত বিচারের ক্ষমতা তাঁহার কতটুকু?...অথচ কোনকিছু প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হইবে, ডুবিতে হইবে স্বখাত সলিলে।...তাইতো গুরুদেব জানাইয়াছেন সতর্কবাণী, এমনি সস্নেহ শাসন। মনে মনে বলিলেন: ঠাকুর! প্রার্থনা করে অপরাধ করেছি। দয়া করে ক্ষমা কর।...

প্রত্যুষে উঠিয়া ন্যাস, স্নান, তর্পণ ও হোম সম্পন্ন করিয়াছেন কুলদানন্দ। আসনে বসিয়া নাম করিতেছেন একাগ্র চিত্তে। সহসা বড়দাদা হরকান্তের কথা মনে পড়িল। মনও অস্থির হইয়া উঠিল—অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

অথচ দাদার নিকট হইতে কোন আহ্বান আসে নাই, গুরুদেবও বলেন নাই কোনকিছু। অবিচ্ছেদ সদ্‌গুরুসঙ্গে যেরূপ আনন্দে আছেন, সংসারে আর কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র নিতান্ত দুর্লভ। তবু কেন এই অকারণ চঞ্চলতা? তবে কি প্রারব্ধ শেষ হইবার পূর্বে অন্তরে দুষ্টা সরস্বতী ভর করিল? অথবা কোন কল্যাণকল্পে ইহা সর্বনিয়ন্তা গুরুদেবের অভিপ্রায়?...

ভাবিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধ্যানস্থ গোসাঁইজী একটু পরে ফিরিয়া চাহিলে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন: এটা কি আমার দুর্মতি, না আপনার ইচ্ছা?

: হ্যাঁ, কিছুদিন গিয়ে থাকলে তাঁর বড় ভাল হয়। তাঁর প্রতি তোমারও কর্তব্য শেষ হবে। শীঘ্র তোমার সেখানে যাওয়া দরকার।

: কিন্তু আপনাকে ছেড়ে আমি যে কোথাও গিয়ে থাকতে পারি নে।...

: সেটাও মায়া, বদ্ধতা। গুরু যে বস্তু, তা তো এই দেহ নয়—এই দেহের ভিতর অন্য কিছু। তিনি জড় নন।...

: ভিতরে কী আছে আমি তো দেখি নি, জানিও না। তাই এই রূপের ধ্যান করি। তবে কি সব বৃথা?...

: বৃথা নয়। ভিতরে আছে সচ্চিদানন্দরূপ—এই দেহ তারই ছায়া। এই রূপের ধ্যানে সেই সচ্চিদানন্দরূপ চোখে পড়ে। ছায়া না ধরলে সে কায়া পাবে কী করে?...

: যখন আমার যে-রূপ ভাল লাগে, তাই আমি ধ্যান করি।

: তাই কর, তাতেই হবে। সবই নিত্য।...

: আপনার সঙ্গ ছেড়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হব?

: নিত্যকর্মটী নিয়ম মত ক'রো। আর, কারো কাছে গিয়ে কোন উচ্চ অবস্থা লাভের মোহে প'ড় না। হঠাৎ একটা কিছু লাভ করতে গেলেই বিপদ।... দৃষ্টি সর্বদা অধো দিকে রেখো। ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি ঠিকমত রক্ষা করে চ'লো—তাহলেই নিরাপদ।

ঠাকুরকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মন ছটফট করিলেও উপায় নাই। ভাবী কল্যাণের তাগিদে এ দুঃখ বরণ করিতে হইবে। কল্যাণ যদি কিছু নাও বা থাকে, তবু ইহা পরম দয়াল ঠাকুরের নির্দেশ, অমোঘ বিধান।...ভাবিয়া দিনের পর দিন নিজের অস্থির চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে আবার বলিলেন গোসাঁইজী: বাড়ী গিয়ে ম'র সঙ্গে দেখা করে পশ্চিমে চ'লে যাও। চণ্ডীপাঠ ও হোমটী নিয়ম মত করে যেয়ো।

: দাদার কাছে থাকার সময়েও কি ভিক্ষা করতে হবে?

: শুধু ভিক্ষা কেন, সমস্ত নিয়ম রক্ষা করে চ'লবে। কোথাও ভিক্ষা না জুটলে দাদার কাছে ভিক্ষা ক'রো।...সর্বদা স্বপাকে খেয়ো।...

গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী দাদাকে তিনি চিঠি দিলেন।

॥ পনের ॥

প্রত্যুষে শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিয়া বাড়ী রওনা হইলেন কুলদানন্দ।

মাতৃদেবীকে দর্শন করিয়া বড় আনন্দলাভ করিলেন। মায়ের আনন্দের জন্য তাঁহার কাছে রহিলেন সাত-আট দিন। আহারের নিয়ম আর রহিল না—মায়ের তৃপ্তির জন্য আহার করিলেন তাঁহার দেওয়া সবকিছু। সাধনে উৎসাহ ও আনন্দ বৃদ্ধি পাইল।

মায়ের অনুমতি লইয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। গুরুকৃপায় পথে অনেকের অযাচিত সাহায্য পাইলেন। পরদিন প্রভাতে পৌছিলেন শিয়ালদহ।

সারদাকান্তের বাসার ঠিকানা স্মরণ নাই। আনমনে চলিলেন সহরের দিকে। পথিকৃৎ স্বয়ং যেন গুরুদেব।··আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখন যাইবেন কোন পথে?··সহসা সারদাকান্ত আসিয়া উপস্থিত। একি! ভোজবাজী নাকি?··বুঝিলেন ইহাও গুরুকৃপা।···

ছোড়দাদার সহিত ঝামাপুকুরের বাসায় পৌছিলেন। আসন করিলেন নীচে একখানি নির্জন ঘরে। নিত্যক্রিয়া চলিল নিয়ম মত।

ন্যাস, হোম, পাঠ ও গায়ত্রী জপ চলে বেলা এগারটা পর্যন্ত। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর অপরাহ্ন চা'রটা পর্যন্ত নাম চলে অবিরাম। বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়—বিহ্বল আনন্দে যেন প্রত্যক্ষ করেন গুরুদেবের অপরূপ রূপমাধুরী। গণ্ড প্লাবিত হয় অবিরল অশ্রুধারায়।···কাহারও আহ্বানে উত্তর দিতে বিলম্ব হয়, বেশ কষ্ট বোধ হয় আসন ত্যাগ করিতে। কথাবার্তায়, চলাফেরায় সর্বদা মনে জাগরূক থাকে গুরুদেবের অনুপম রূপস্মৃতি।···

কুলদানন্দ অনুভব করেন, দূরে থাকিয়া এইভাবে গুরুদেবের সঙ্গলাভ আরও সুমধুর। এতদিন নিরন্তর সান্নিধ্য হেতু চিত্ত ছিল নিরুদ্বেগ—কাছে থাকিয়াও তিনি যেন ছিলেন দূরে। এখন বিরহেই দেখা দিয়াছে অপূর্ব মিলন.···অনুভূত হইতেছে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গলাভের অতুলনীয় মাধুর্য।' তিনি লিখিয়াছেন: গুরুদেব! তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে চাহিয়াছিলাম না। তাই কি তোমার এই বিরহের অপূর্ব মাধুরী বুঝাইয়া দিলে?···

দিনরাত কাটিয়া যায় অভিভূত আনন্দে। তিনদিন পরে মনে হয় এই তো স্বাভাবিক; এখন শুধু সম্ভোগে মত্ত না থাকিয়া এই ভাবের চাই উৎকর্ষ সাধন।

সেজন্য প্রয়োজন সর্বদা আন্তরিক প্রচেষ্টা—শ্বাসপ্রশ্বাসে নামই তাহার একমাত্র উপায়। তবে সম্ভব হইবে গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শানুভব। ভাবিয়া ঠাকুরের রূপের ধ্যানে নিবিষ্ট চিত্তকে টানিয়া আনিলেন, সংলগ্ন করিলেন শ্বাসপ্রশ্বাসে। ঠাকুরের রূপমাধুরী ম্লান হইল, ক্রমে মিলাইয়া গেল। শ্বাসপ্রশ্বাসে চলিল শুধু শুষ্ক নাম। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, আর শ্বাসে বা নামে নিবিষ্ট হইতে চায় না অস্থির চিত্ত। সাধনচ্যুত হইয়া চারিদিক শূন্য মনে হইল, ভিতরে দেখা দিল অসহ্য জ্বালা।…

বুঝিলেন, ঠাকুরের কৃপায় তিনি লাভ করিয়াছিলেন বহু তপস্যার অতীত সম্পদ; আপন প্রচেষ্টায় তাহা বৃদ্ধি করিতে গিয়া এই বিপত্তি। এ তো আয়াসলব্ধ ধন নয়, বড় কৃপার দান।…সেজন্য হৃদয়ে চাই ভক্তি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পুরুষকার বা অভিমানের ছোঁয়াচ তাহাতে সহিবে কেন?…মনে জাগিল সকাতর প্রার্থনা: দয়াল ঠাকুর! আমাকে পুড়িয়ে নিয়ে আবার তোমার চরণতলে ঠাঁই দাও।…

কলিকাতায় আসিলে প্রথম দিন রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন ছোটদাদা ও গুরুভ্রাতা কুঞ্জ গুহ। পরদিন ভিক্ষা পাইয়াছিলেন অচিন্ত্য দাদার বাসায়। উনানে খিচুড়ি চাপাইয়া তাঁহার সহিত বলিতে লাগিলেন ঠাকুরের কথা। কথা তো নয়—কথামৃত।…মনপ্রাণ ডুবিয়া গেল অপার আনন্দে।…

এদিকে খিচুড়িতে চটপট শব্দ হইতে লাগিল, ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল—খিচুড়ি পুড়িয়া দুর্গন্ধ ছুটিল। তখন 'সর্বনাশ হল'—বলে কপালে করাঘাত করিলেন অচিন্ত্যবাবু। তাইতো! কখন কী হইয়া গেল?…এখন আর উপায়ই বা কী!…অগত্যা সেই পোড়া খিচুড়ি নামাইয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন কুলদানন্দ। পরে হোম সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলেন অচিন্ত্য দাদাকে; আরও কেহ কেহ কিছু প্রসাদ নিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য! খিচুড়ির সুগন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত হইল। শুধু তাই নয়, খিচুড়ির এ কি অদ্ভুত আস্বাদ!…অচিন্ত্য দাদার চোখে অশ্রুধারা বহিল। কুলদানন্দ বুঝিলেন, ঠাকুরের কৃপায় শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন আজ অমৃতে পরিণত।…

আর একদিন ভিক্ষা পাইলেন মহেন্দ্র দাদার বাড়ীতে। তিনি সানন্দে রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। কুলদানন্দ খিচুড়ি চাপাইলে জিজ্ঞাসা করিলেন: আর কী চাই?

: এখন আর তা কি যোগাড় হবে? খিচুড়িতে নারকেল কুচি প'ড়লে বড় চমৎকার হ'ত।

: আগে বললে না কেন? এখন তো নারকেল আনতে খিচুড়ি হ'য়ে যাবে।

হইয়াও গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন কুলদানন্দ। হোম অন্তে আহার করিতে বসিলেন, মহেন্দ্র দাদাকেও কিঞ্চিৎ দিলেন। পরক্ষণে দুজনেই অবাক!...গ্রাসে গ্রাসে বিস্ময় বাড়িয়া চলে;...প্রতি গ্রাস খিচুড়িতে যে নারিকেল খণ্ড!...

নীরবে উভয়ে চাহিলেন পরস্পরের দিকে। ঠাকুরের একি অদ্ভুত লীলা?... কিন্তু তাহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। আহার চলিল পরমানন্দে—আর সরস নামানন্দে চিত্ত হইল নন্দিত।...সহসা মনে হইল কুলদানন্দের: আহার করিতেছেন তিনি নন,...তাঁহার মুখে স্বয়ং গুরুদেব!...পলকে সবই একাকার হইয়া গেল যেন—দূরে গেল স্বাদগন্ধ, ভুলিয়া গেলেন নিজেকে।...সারা দেহ যেন গুরুময়,...আর হৃদয় যেন শ্রীবৃন্দাবন।...সেই মধুর ধাম হইতে উঠিল শত জয়ধ্বনি: জয় গুরুদেব!...ধন্য গুরুদেব!!...

সেদিন সেই অপার্থিব আহার শেষ করিতে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল।...

সহসা ভাগলপুর যাওয়ার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। পরদিন রওনা হইলেন কুলদানন্দ।

স্টেশনে পৌঁছিলেন রাত্রি একটায়। কুলী সঙ্গে লইয়া চলিলেন পুলিনপুরী। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার—ময়দানের ভিতর দিয়া পথ। দুই দিকে দৈত্যাকৃতি বড় বড় বৃক্ষ। একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইতেই চমকিয়া উঠিলেন। নির্জন অন্ধকার প্রান্তরে সহসা এ কাহার বুকফাটা আর্তক্রন্দন? উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ কোন মুমূর্ষুর দুঃসহ যন্ত্রণাধ্বনি যেন।...নিদারুণ আশংকায় কুলী দৌড় দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু কুলদানন্দ চলিলেন ধীর পদক্ষেপে—অন্তরে চলিল নামপ্রবাহ। প্রায় দুই মিনিট পিছু পিছু আসিয়া স্তব্ধ হইল সেই ক্রন্দনধ্বনি। কুলীর নিকট শুনিলেন, এইসব বৃক্ষে একসময়ে বহুলোকের ফাঁসি হইয়াছিল। গভীর রাত্রে অনেকবার শোনা গিয়াছে এমনি বিকট শব্দ।...দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন কুলদানন্দ, অন্তর দিয়া অনুভব করিলেন দেহমুক্ত প্রেতাত্মার সেই অব্যক্ত বেদনা।...কী বলিতে চাহিয়াছিল সে, এতক্ষণে বুঝিলেন যেন।.. প্রেতের সুস্পষ্ট আর্তনাদ তিনি শুনিলেন জীবনে এই প্রথম!

ভাগলপুরে মহাবিষ্ণু বাবুর সঙ্গে কয়েক দিন কাটিল বড় আনন্দে। একদিন তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে 'কর্ণগড়ে' গেলেন। কলিঙ্গাধিপতি দাতাকর্ণের রাজধানী কর্ণগড়। পরিখাবেষ্টিত বহুবিস্তৃত উচ্চভূমি। সেই গম্ভীর প্রশান্ত পরিবেশে তিনি বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। মনপ্রাণ উদাস হইয়া গেল। কোথায় আজ সেই দানবীর, মহাবীর কর্ণ?···অনন্ত জলধিবুকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটী বুদ্‌বুদের কতটুকু মূল্য?···

পরে সরকারী বাগানে দেখিলেন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। উহার একটী শাখা ধরিয়া ঝাঁকানি দিলে ঝড়ের বেগে আন্দোলিত হয় সমস্ত বৃক্ষটি।···কোন সিদ্ধ ফকির নাকি পাহাড় হইতে এই বৃক্ষে চড়িয়া এখানে আসিয়াছিলেন।

ফিরিবার সময় পথপ্রান্তে দেখিলেন একটী কালীমন্দির। ৺মা-কালীর অলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া কোন এক সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির, দেবীপূজার স্থায়ী ব্যবস্থাও করেন। তখন হইতে চলিয়া আসিতেছে কালীমাতার নিত্য সেবাপূজা।···পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী একজন খৃষ্টানের পক্ষে নিঃসন্দেহে ইহা এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। * ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া তিনিও একদিন ছিলেন এই পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। এমনকি, গোসাঁইজীকে দেবী আবাহনে উদ্‌ভ্রান্ত দেখিয়া মনে জাগিয়াছে কত আক্ষেপ। একজন বিধর্মীর এই অমর কীর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ মনে উদয় হইল সেই অতীত স্মৃতি। বুঝিলেন সত্যই ধর্মের পথ কত বিচিত্র, কত না মধুর।

ভাগলপুর হইতে রওনা হইলেন বস্তি'তে। খরচপত্র পাঠাইতে লিখিলেও বড়দাদা কিছু পাঠান নাই। সেখানে তাঁহার উপস্থিতি হয়ত বড়দাদার অভিপ্রেত নয়। তবু যাইতে হইবে, গুরুদেবের আদেশ।

বস্তি পৌছিতেই বড়দাদার অসন্তোষের কারণ বুঝিলেন। হরকান্ত বলিলেন: তুমি নাকি ভিক্ষে করে খাও? আমার এখানে তা কিন্তু হবে না, এজন্যে তোমার খরচ পাঠাইনি।

আবার সংকটে পড়িলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের আদেশে এখানে আসিয়াছেন; তিনি বলিয়া দিয়াছেন দাদার জন্য কিছুদিন এখানে অবস্থান করা প্রয়োজন। আবার, ভিক্ষালব্ধ স্বপাক আহারও তাঁহারই আদেশ। এখন

* এই প্রসঙ্গে বহুবাজারে 'ফিরিঙ্গি কালী'র কথা উল্লেখযোগ্য। কবিয়াল এন্টনী সাহেব বিবাহ করেন এক ব্রাহ্মণকন্যা, প্রতিষ্ঠিত করেন এই কালীমন্দির।

কোন দিকে যাইবেন ? ··অগত্যা ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া দাদার সঙ্গে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

তাঁহার বস্তি আসিবার কারণ জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন হরকান্ত। হাসপাতালের কাজকর্মের পর অবশিষ্ট সময় তাঁহার সঙ্গে কাটাইতে লাগিলেন। গুরুদেবের প্রসঙ্গে বড়দাদার আনন্দ দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন।

মহাষ্টমী পূজার দিন। নিরম্বু উপবাস করিয়া জপ, হোম ও চণ্ডীপাঠে অতিবাহিত হইল সারাদিন। নবমীর দিনও সাধনভজনে বড় আনন্দে কাটিল। সন্ধ্যার পর আহারান্তে বাহিরের আঙিনায় বসিয়া দাদার সঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিতেছে। সহসা ভাসিয়া আসিল আরতির দিব্য ঘণ্টাধ্বনি ও ধূপগন্ধ। নিকটে কোথাও যেন মহা সমারোহে মায়ের আরতি হইতেছে। কোথা হইতে আসিতেছে এই পবিত্র সুগন্ধ ?···তিন দিকে ধূ-ধূ করিতেছে উন্মুক্ত প্রান্তর, এক দিকে শুধু বড় রাস্তা। নিকটে লোকালয় নাই কোথাও। তবু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল সেই স্নিগ্ধ, পবিত্র সুরভি। বুঝিলেন ইহা মায়ের অপ্রাকৃত প্রসাদ।···প্রায় দেড়ঘন্টা এই সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন তাঁহারা। মনে হইল যেন নিমগ্ন আছেন শ্রীগুরুসঙ্গে।···

দাদার কাছে আসিয়া কয়েক দিন ভিক্ষা বন্ধ আছে। সেজন্য প্রতিদিন আহারের সময়ে অন্তরে জাগে ক্রন্দনের আবেগ। নিজের নিরুপায় অবস্থা গুরুদেবকে মনে মনে সকাতরে জানাইতে লাগিলেন। ভিক্ষান্ন বন্ধ হওয়ায় আহারে তৃপ্তি দূরে থাক, ভজনে উৎসাহ নাই, মনেও নাই শান্তি।

দাদা কথায় কথায় বলিলেন : আচ্ছা, তুমি ভিক্ষা করে খাও কেন ? ভিক্ষায় কী লাভ ?

: লাভালাভ ঠাকুর জানেন। তবে ভিক্ষান্নে যে তৃপ্তি, ঘরে তা নেই। ঘরের অন্ন খেয়ে উৎসাহ কমে আসছে। মনে সর্বদাই উদ্বেগ।

: তাহলে আজ থেকে আবার ভিক্ষা আরম্ভ কর। ঠাকুরের যখন আদেশ, করতেই হবে। তবে সহরে তুমি ভিক্ষা ক'রো না।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন কুলদানন্দ। তিন-চার মাইল দূরে পল্লীগ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। একাদশীতে গিয়াছে নিরম্বু উপবাস। দ্বাদশীতে অন্ন গ্রহণ করেন নাই, লুচি ভোগ দিয়াছেন। ত্রয়োদশীতে ঘট হস্তে পথে বাহির হইলেন ঠাকুরের নামে। অপরিচিতের নিকট জীবনে ভিক্ষা করা এই প্রথম। পথ চলিতে চলিতে স্মরণ হইল ভগবান বুদ্ধদেবের কথা। মনে হইল

স্বয়ং গুরুদেব যেন বুদ্ধদেব রূপে চলিয়াছেন পুরোভাগে। পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাইলেন কুলদানন্দ -চিত্ত হইল উদাস, ভাবমুগ্ধ। মনে পড়িল বুদ্ধদেব-রূপী গুরুদেবের উদার বৈরাগ্যের মহান দৃষ্টান্ত।

ঘুরিতে ঘুরিতে এক গৃহস্থ-বাড়ীর সন্ধান মিলিল; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জানিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সশ্রদ্ধায় প্রচুর চাউল, আলু ও লবণ আনিয়া দিলেন। নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলেন তিনি।

এতদিনে ভিক্ষান্ন আহার করিয়া লাভ করিলেন পরম তৃপ্তি। প্রথম দিনে ব্রাহ্মণের হস্তে শ্রদ্ধার অন্ন পাইয়া ভরসা অনেক বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু পরদিন দেখা দিল বিড়ম্বনা। দুই ক্রোশ পথ ঘুরিয়া প্রথমে গেলেন এক কলাইয়ের বাড়ী, তারপর এক মেথরের বাড়ী। ভিন্ন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন এক গৃহস্থ-বাড়ীতে, ভুল বুঝিয়া তাহারাও তাড়া করিল।...

অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষা করিলেন দাদার ঘরে।

ভিক্ষার দুর্দশা শুনিয়া পুরাতন বস্তির বাজারে ভিক্ষা করিতে বলিলেন হরকান্ত। বাজারে ভিক্ষা করিয়া প্রত্যহ উৎকৃষ্ট বস্তু মিলিতে লাগিল। সাধারণ ভিক্ষুকের লোভ ও কামনার অন্ত নাই; কিন্তু নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুস্বাদু বা মুল্যবান কোনকিছু গ্রহণ করেন না কুলদানন্দ। নির্লোভ সাধকের এই নিস্পৃহভাব জয় করিল সকলের অন্তর। সকলে প্রচুর পরিমাণে দিতে লাগিল দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, রাবড়ি ও তরকারী। ভিক্ষা নয়, পরম শ্রদ্ধার দান। পূর্ব হইতে অনেকে যেন নৈবেদ্য সাজাইয়া তাঁহার প্রতিক্ষা করিত। ফলে মাঝে মাঝে তাহাদের এড়াইয়া যাইতে হইত পল্লীগ্রামে। ভিক্ষান্ন গ্রহণ ও আহার করিয়া তিনি অনুভব করিলেন আশাতীত তৃপ্তি ও আনন্দ।

এইভাবে গুরুকৃপা উপলব্ধি করিলেন। এই সূত্রে গোসাঁইজী যেন বুঝাইয়া দিলেন পর্যটনের আশ্চর্য উপকারিতা। ভ্রমণকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয় স্থূল ও দীর্ঘ—তাহাতে সহজে চিত্ত হয় আবিষ্ট। আসনে বসিয়া অভ্যাস বশে মন বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু ভ্রমণকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিযুক্ত থাকে সেইদিকে। ফলে চৈতন্য নিবিষ্ট হয় শ্বাসপ্রশ্বাসে। তখন সহজে প্রতিপদে চলে নামপ্রবাহ। কুলদানন্দ বুঝিলেন সাধুসন্ন্যাসীরা এই জন্যই পর্যটনের এত পক্ষপাতী।

এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল, যাঁহারা সারাদিন ভ্রমণ করেন তাঁহাদের সাধন ভজন নিরর্থক। এইবার গুরুদেব সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। জয় গুরুদেব!...

রাত্রে নামে নিমগ্ন অবস্থায় লুটাইয়া পড়েন নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে। প্রবল

ঝাঁকানিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়—থর থর কম্পিত হয় সারা দেহ। প্রায় এক মিনিট কে যেন সর্বশরীরে ঝাঁকানি দিতে থাকে। তখন অন্তরে নাম চলে প্রবল বেগে।

ভয়ের পরিবর্তে অন্তরে জাগে আনন্দ। মনে হয়, তাঁহারই কল্যাণকামী কোন শক্তিশালী ফকির বা মহাত্মার এই কার্য। গেণ্ডারিয়ার গুরুদেবের নিকট বসিয়া নাম করিবার সময়েও এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইরূপ ঝাঁকানিতে কাঁপিয়া উঠিত আসন সহ সমস্ত শরীর। গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন, এরূপ হওয়া খুব ভাল। এখানেও তিনি অনুভব করিলেন অলক্ষ্যে এমনি কোন শক্তির প্রভাব।

হরকান্ত বলিলেন, এসব প্রেতের উপদ্রব—হাসপাতালে অনেক উৎপাত আছে। কিন্তু কুলদানন্দ নির্ভীক, নিশ্চিন্ত। ভূতপ্রেতও তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী, ইষ্টমন্ত্র প্রভাবে উদ্ধত ফণীও তাঁহার নিকট অবনত।...

একটা স্বপ্ন দেখিয়া গুরুদেবের নিকট যাইতে মন অস্থির হইয়া উঠিল। অথচ দাদাকে কিছু বলিতে পারেন না, হরকান্ত এখন সর্বদা তাঁহার সঙ্গলাভে উন্মুখ। এই অবস্থায় ঠাকুর যদি একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ?...

ব্যবস্থাও হইয়া গেল। ভাগলপুর হইতে টেলিগ্রাম আসিল—ভগ্নিপতি মথুরবাবুর বাসায় আবার শুরু হইয়াছে নানা আভিচারিক উৎপাত। তাঁহাদের বিশ্বাস কুলদানন্দ থাকিলে যাদুকরেরা কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। মথুর বাবুর তার পাইয়া হরকান্তও তাঁহাকে ভাগলপুর পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। বস্তিতে বড়দাদার সাহচর্যে প্রায় এক মাস কাটিল বড় আনন্দে। সাধনভজনে বহুদিন এমন মধুর অবস্থা দেখা দেয় নাই। ঠাকুর যেন নিত্য সহচর—তাঁহাকে স্মরণ করিতেই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, উজ্জ্বল হইয়া ওঠে তাঁহার মধুর স্মৃতি।...

দাদাকে একাকী রাখিয়া যাইতে মন যেন সরে না। অকস্মাৎ ফরক্কাবাদ হইতে হরকান্তকে দর্শন করিতে আসিলেন ৺মাধুদাস বাবার শিষ্য কানাইয়া লালজী। নিশ্চিন্তে ভাগলপুর রওনা হইলেন কুলদানন্দ।

অযোধ্যাপুরী। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি। ভাগলপুর যাইবার পথে এই পুণ্যভূমি দর্শন করিবার আগ্রহ জন্মিল কুলদানন্দের। অপরাহ্নে ট্রেন হইতে নামিলেন সরযূতীরে 'লকরমণ্ডি' ঘাটে।

ক্ষুৎপিপাসায় দেহমন অবসন্ন। এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন : বাবাজি, কিছু খাবেন ? পুরী, কচুরি, লাড্ডু...

: ওসব আমি খাই না। অযোধ্যায় গিয়ে হনুমানজীর প্রসাদ পাব।

: হনুমানজীর প্রসাদ!...তবে বুঝি স্বয়ং হনুমানজী আপনার জন্যেই পাঠিয়েছেন।...

সানন্দে ব্রাহ্মণ মাটির হাড়ি হইতে বাহির করিলেন উৎকৃষ্ট বরফি। ভক্তরাজ হনুমানজীর এত দয়া! চক্ষু অশ্রুসজল হইল কুলদানন্দের। জয় মহাবীর!

সভক্তি প্রণাম জানাইলেন তিনি। প্রাণ ভরিয়া আহার করিলেন প্রসাদী উৎকৃষ্ট বরফি, আর সরযূ নদীর শীতল জল।...

পুণ্যসলিলা সরযূ। বিশাল বক্ষে বিস্তীর্ণ চর। চাহিয়া দেখিতেই যেন পাষাণ চাপিয়া বসিল নিজবক্ষে।...সরযূর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চরের উপর দিয়া চলিলেন। প্রাণে জাগিল গভীর শ্রদ্ধা ও বেদনা।...

গুরুদেব বলিয়াছেন অযোধ্যা এখন সরযূর গর্ভে। কত ধর্ম-কর্ম, বেদনা ও আনন্দের লীলাক্ষেত্র—কত সংগ্রাম ও শান্তি,...ত্যাগ ও মহত্ত্বের পবিত্র তীর্থ। এই নদীর কূলে কূলে একদিন প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল স্বয়ং ভগবানের অসীম বেদনা।...এই পূত সলিলে মিশিয়া গিয়াছিল জনক-দুহিতার অশ্রুবন্যা।...আজ কোথায় সেই জননী সীতা?...কোথায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র?...

গভীর শোকাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিল কুলদানন্দের উদাস অন্তর। অন্তস্থল হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল: হা রাম! হা রাম!...সরযূবক্ষে বসিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন শিশুর মত।...সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন সরযূর অপার্থিব বালুরাশি! আর অন্তরে নাম চলিল অবিরাম।...

পরক্ষণে মনে হইল, সেই স্বচ্ছ-শুভ্র বালুরাশিতে প্রতিভাত যেন নবদূর্বাদল শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ্যুতি।...সরযূর বুকে সর্বত্র সেই স্নিগ্ধ শ্যামজ্যোতির ঝিকিমিকি। দূর হইতে ভাসিয়া আসিল জনৈক ভক্তের মধুর সংগীত: এখনও আছেন শ্রীরামচন্দ্র—সানন্দে বিচরণ করিতেছেন অযোধ্যার বন-উপবনে, সরযূর নির্জন শ্যামল তীরে।...ছায়াসম সঙ্গে আছেন নিত্যসঙ্গিনী সীতা ও অনুজ লক্ষণ।...

নিরুদ্ধ বেদনার অবসান হইল, প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল সেই মহাসংগীতে।... সত্যই তো—তিনি ছিলেন, এখনও আছেন এই সরযূর বুকে; থাকিবেন সর্বযুগে, সর্বভূতে।...

তবু রহিয়া গেল রাম-বিরহের বেদনা।...নৌকাযোগে সরযূ পার হইয়া অযোধ্যায় পৌঁছিলেন। দেখিলেন অযোধ্যা নীরব, নিস্তব্ধ।...মনে হইল পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাস যেন রামশোকে আচ্ছন্ন, অভিভূত।...

ভাগলপুরের পথেই কাশী। কুলদানন্দ পৌঁছিলেন মনিকর্ণিকায়।

স্নান-তর্পণ শেষ হইল। শ্রাদ্ধ করিতে জিদ ধরিল পাণ্ডা ও গঙ্গাপুত্রেরা। তাহাদের কটুক্তি ও উৎপীড়নে অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, ঠাকুর শক্তি দিলে এখনই দিতেন উপযুক্ত প্রতিশোধ।...

সচেতন হইলেন পরক্ষণে। মনে পড়িল গুরুদেবের কথা: এখন যদি তোমার যোগৈশ্বর্য লাভ হয়, সংসার তুমি ছারখার ক'রবে।...মনে হইয়াছিল—ঠাকুর কি আমাকে এতই হীন, নীচাশয় মনে করেন? আজ ঠাকুর চূর্ণ করিলেন সেই অভিমান।...

একজন পাণ্ডা বলিল: বাবাজি, রাগ করবেন না। তীর্থের কাজ আপনারাই তো রক্ষা ক'রবেন; আপনারা মর্যাদা না দিলে সাধারণে দেবে কেন?...

লজ্জিত হইলেন কুলদানন্দ। মনে পড়িল গুরুদেবের নির্দেশ—তীর্থদর্শনে তীর্থগুরু ও পাণ্ডাদের আশ্রয় গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। পাণ্ডাকে নমস্কার করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

অনেক চেষ্টার পর হঠাৎ তারাকান্ত বাবুর বাসার সন্ধান মিলিল! সেখানে আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন গঙ্গাস্নানের পর প্রবেশ করিলেন কেদার মন্দিরে; বিগ্রহ স্পর্শ করিতেই সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। মনে হইল যেন গুরুদেবকে স্পর্শ করিতেছেন। মনে মনে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন: জয় শিবকেদার—জয় ঠাকুর! তুমিই আমার চিরকালের ধন!...আমি যেন দূর থেকে তোমাকে দর্শন ক'রে কৃতার্থ হই।..

কয়েক দিন পরে একটী উদাসী সাধু তাঁহাকে ভাগলপুরে যাইতে বলিলেন। সাধুর নির্দেশে শ্বেত সরিষা ও মরিচ সংগ্রহ করিয়া রওনা হইলেন।

ভাগলপুর ষ্টেশানে পৌঁছিলেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে। কুলী লইয়া পুলিনপুরী চলিলেন। ময়দানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় গতবারের ন্যায় আবার ধ্বনিত হইল প্রেতের আর্তনাদ; প্রেতাত্মার শান্তির জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস আসিতে চায় না, মনের সংস্কার এমনই বদ্ধমূল।..

রাত্রি একটায় পৌঁছিলেন পুলিনপুরী। মহাবিষ্ণুবাবু, অশ্বিনীবাবু ও ছোটদাদার সাক্ষাৎ পাইয়া বড় আনন্দ হইল। হাতমুখ ধুইয়া বারাণ্ডায় গেলে ছোটদাদা এক কলকি তামাক রাখিয়া যাওয়ায় অবাক হইলেন। শুনিলেন গুরুভ্রাতা মহেন্দ্র মিত্র একবার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘর্মাক্ত হইলে তাঁহাকে হাওয়া

করেন স্বয়ং গোসাঁইজী।…কত মমতা, কী অসীম স্নেহ! দরদের সেবাই যথার্থ সেবা।…

ভাগলপুরে যথারীতি দিন কাটিতে লাগিল। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান অন্তে চলে নিত্যক্রিয়া ও সৎসঙ্গ। শ্বাসপ্রশ্বাসে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে স্বতই কুম্ভক শুরু হয়। মন একাগ্র হয় মধুর নামে—নাম যেন জীবন্ত শক্তি।…সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাত হয় ঠাকুরের অপরূপ রূপমাধুরী। অন্তরে লাভ করেন ঠাকুরের নিত্যসঙ্গ, তাঁহার গভীর ভালবাসা।…মনে হয়ঃ আমি তাঁর,…তিনি আমার!…ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত কৃষ্ণজ্যোতি প্রকাশে মনপ্রাণ হয় আবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ।…

সুলতানগঞ্জে জহ্নুমুনির আশ্রম—জাহ্নবীর উৎপত্তি স্থান। সেখানে উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। গঙ্গাতীরে সুগোল মন্দিরাকৃতি পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলেন প্রতি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত দেবদেবীর মূর্তি। গঙ্গাস্নান করিয়া জহ্নুমুনির চরণোদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন। একটী ভজন-কুটীরের সম্মুখে বসিয়া নামজপে মগ্ন হইলেন।

গঙ্গাতীরে জঙ্গলের মধ্যে দেখিলেন বহু পুরাতন একটী ভগ্ন মসজিদ। কৃশকায় এক বৃদ্ধ ফকির নিবিড় অরণ্যে ধ্যানমগ্ন। কুলদানন্দের মনপ্রাণ উদাস হইয়া উঠিল। মনে হইলঃ ঠাকুর! কবে আমিও এমনি নির্জনে তোমার সাথে দিনরাত আনন্দে কাটাব?….

শ্রীমতী মনোরমা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সহধর্মিনী। অপূর্ব তাঁহার গুরুভক্তি স্বামী ও পাঁচ-সাতটী সন্তান সহ নিঃসম্বল অবস্থায় আসিয়াছেন, দিন কাটিতেছে অর্ধাশনে, অনশনে তবু সম্বল একমাত্র গুরুকৃপা।…তাঁহাদের সঙ্গলাভে খুব আনন্দ লাভ করিলেন কুলদানন্দ।

ভগ্নিপতি মথুরবাবু মফঃস্বল হইতে আসিলেন। কুলদানন্দকে দেখিয়া নিশ্চিন্তে শোচনীয় দুর্ঘটনা জানাইলেন। গৃহকর্মে নিযুক্ত এক আত্মীয়া সর্বেসর্বা হইবার বাসনায় গোপনে এক যাদুকরের সাহায্য গ্রহণ করে; তাহার আভিচারিক কার্যের ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে রক্তস্রাবে ভগ্নির মৃত্যু হয়। অতঃপর ভাগিনেয় আসিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিলে তাহারও প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে দুষ্টা আত্মীয়াটী।…শুনিয়া মর্মাহত হইলেন কুলদানন্দ। হোম ও চণ্ডীপাঠ দ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ করিয়া আপদের শান্তি করিবার মনস্থ করিলেন। বুঝিলেন আর্তব্যক্তির উদ্ধারের জন্য যথাবিহিত শাস্ত্রকার্যের অনুষ্ঠান গুরুদেবের অভিপ্রেত।

পুণ্য চতুর্দশী তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলেন, ন্যাস অন্তে সর্ব আপদ শান্তির সংকল্পে আসনে বসিয়া চণ্ডীপাঠ সমাপন করিলেন। শ্বেতকরবী, সর্ষপ প্রভৃতির দ্বারা ১০৮ বার আহুতি দিলেন প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে। অমাবস্যাতেও এই প্রকার হোম, চণ্ডীপাঠ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হোমধুমের গন্ধ সহ্য হইল না আত্মীয়াটীর, দুইদিন সে অবস্থান করিল পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে। কুলদানন্দের মনে হইল বিপদ উহার খুব সন্নিকট। অচিরে কলিকাতায় রওনা হইলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া কয়েক দিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আনন্দে কাটিল। একদিন জানিলেন কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে ভাগলপুরের দুষ্টা স্ত্রীলোকটীর। কুলদানন্দের বক্ষ স্পন্দিত হইল। আপদের শান্তি হইল বটে; তবু তিনিই কি উহার অপমৃত্যুর হেতু?…

॥ ষোল ॥

তিন মাস পরে আবার গেণ্ডারিয়া ফিরিয়া আসিলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের দর্শন মানসে মনপ্রাণ ব্যাকুল। আম্রবৃক্ষ তলে উপবিষ্ট গোসাঁইজী। দূর হইতে দেখিলেন সেই নয়নানন্দ দিব্যরূপ। কম্পিত পদে অগ্রসর হইলেন—সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িলেন ঠাকুরের চিরশান্তিময় শ্রীচরণতলে।…

সেই আকুলতা স্পন্দিত হইল গোসাঁইজীর মমতাপূর্ণ হৃদয়তটে। তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ভাণ্ডার হইতে জিনিষপত্র লইয়া পাক করিতে বলিলেন। মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত হইল কুলদানন্দের; গুরু-ভ্রাতাদের দেখিয়াও বড় আনন্দলাভ করিলেন।

পরদিন নিত্যক্রিয়া অন্তে ঠাকুরের নিকট গিয়া বসিলেন। গত রাসপূর্ণিমা হইতে গোসাঁইজী মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। পরমহংসজীর আদেশে মৌনী থাকিবেন ছয় মাস।…শুনিয়া বড় কষ্ট হইল কুলদানন্দের। এই দীর্ঘদিন ঠাকুরের মধুর বাণী শ্রবণে বঞ্চিত রহিবেন! কিন্তু গোসাঁইজী অপূর্ব উপায়ে আকারে, ইঙ্গিতে ও কণ্ঠতালুর সাহায্যে অতি অস্ফুটে মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন কুলদানন্দ।…কখনও বা লিখিয়াও উত্তর দিতে লাগিলেন।

গোসাঁইজীর আহারান্তে অপরাহ্ণ আড়াইটায় তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করিতে বলিলে পাঠ করিলেন প্রায় দুই ঘণ্টা। গোসাঁইজী বস্তি ও ভাগলপুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। ভাগলপুরের দুর্ঘটনা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আমিই কি তবে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর কারণ? আমার কি অপরাধ হয়েছে?

: না—তুমি তো কারো অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে করনি, আপদ শান্তির জন্য শাস্ত্রের ব্যবস্থা মতে করেছ।

অতঃপর হস্তের অনামিকায় সর্বদা কুশাঙ্গরী ধারণ করিতে বলিলেন গোসাঁইজী। আর উপবীত ধারণ করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তের উপর বাম হস্ত স্থাপন করিয়া হোম করিতে বলিলেন।

গোসাঁই-জননী অতিশয় পীড়িতা। সর্বদা ক্ষিপ্ত অবস্থা, রাত্রে থাকেন গোসাঁইজীর ঘরে। কুলদানন্দকে রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকিতে বলিলেন গোসাঁইজী। আহারান্তে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত বিশ্রাম করিয়া সারারাত্রি ঠাকুরমার খামখেয়ালী হুকুম তামিল করেন কুলদানন্দ।

ঠাকুরমার অসুখ বৃদ্ধি পাইল। কুঞ্জবাবু খাবার আনিলে গোসাঁইজী সেবা করিতে আপত্তি জানাইলেন; সকলে মনে করিলেন আশ্রমে অশান্তি ইহার কারণ।...বিশেষতঃ দিদিমা কলিকাতা হইতে আসিয়া জগদ্বন্ধু বাবুর সহিত ভীষণ ঝগড়া বাধাইয়াছেন। রাত্রি দশটায় কুলদানন্দকে আমতলায় ধুনি জ্বালিতে বলিলেন গোসাঁইজী। জানাইলেন শ্যামসুন্দর বলিয়া গিয়াছেন আজ মায়ের ভীষণ ফাঁড়া; তাই গাছতলায় মায়ের নিকট থাকিবেন।

শ্রীধর, যোগজীবন প্রভৃতি গোসাঁইজীর নিকট থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলকে নিষেধ করিয়া গোসাঁইজী কুলদানন্দকে থাকিতে বলিলেন। নিজের আসন লইয়া গোসাঁইজীর পাশে বসিলেন কুলদানন্দ, নাম করিতে লাগিলেন পরমানন্দে। রাত্রি বারোটায় গোসাঁইজীকে খাবার দিলেন। রাত্রি দুইটার পর দেখিলেন আসন কুটীরে ঠাকুরমা সংজ্ঞাশূন্য। কিছুক্ষণ তাঁহার সেবা করিয়া নিজের আসনে আসিলেন।

রাত্রি তিনটা। সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন—গোসাঁইজীর বাম অঙ্গ বাহিয়া উঠিল প্রকাণ্ড একটী কৃষ্ণসর্প, মস্তকে উঠিয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিল। এ কী ভয়ংকর দৃশ্য! অথচ দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারেন না, আশংকা

রূপান্তরিত মুগ্ধ বিস্ময়ে।…যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটায় শোভিত সুন্দর কৃষ্ণ সর্প।…সত্যই কী অপরূপ!…পৌরাণিক কাহিনী নয়—একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য।…হিংসা, কুটীলতা সবই ভুলিয়াছে নাগিনী ভোলানাথের বিভোল টানে। স্বয়ং যেন বাসুকি মস্তকের উপর ফণা ধরিয়াছেন। তিনি চাহিয়া রহিলেন অপলকে, অপার আনন্দে।…

ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া সর্পরাজ আবার অবতরণ করিলেন। গোসাঁইজী বলিলেন: ইনি আসনের জাত সাপ, সুবিধা পেলে আসেন। মাথার উপর কিছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চ'লে যান।…বলিয়া কমণ্ডলু হইতে জলপান করিলেন।

: ওকি! ঐ জল খাচ্ছেন? ওতে যে এক্ষুনি সাপে মুখ দিয়ে গেলেন।…

: সর্পরাজ কমণ্ডলুর জলে অমৃত দিয়ে গেলেন! তুমি একটু খাবে?…

গোসাঁইজী কমণ্ডলু হইতে এক গণ্ডুষ জল ঢালিয়া দিলেন। পান করিয়া দেখিলেন কুলদানন্দ, উহা ডাবের জলের মত মিষ্ট ও সুগন্ধী। ভীষণ বিষধর সর্প—অথচ তাহার মুখেও অমৃত।…জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অভাবে দুনিয়ার কত সত্য, কত রহস্যই না আমাদের নিকট একেবারে অবাস্তব। জলটুকু পান করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ভিতরে নাম চলিল সরসভাবে।

: সাপটী মার কাছেও গিয়েছিলেন। মা এবার বেঁচে গেলেন—ফাঁড়া কেটে গেল।…

নিশ্চিন্ত হইলেন কুলদানন্দ। জিজ্ঞাসা করিলেন: সাপ এসে আপনার গায়ে মাথায় ওঠেন কেন?

: প্রাণায়াম সরুনালে স্বাভাবিক ভাবে চললে বড় সুন্দর একটী শব্দ হয়। দূর থেকে তার আকর্ষণে সেই সুর ধরতে গিয়ে সাপ গায়ে মাথায় উঠে পড়েন, ফণা বিস্তার ক'রে সেই সুর শুনতে থাকেন। মাঝে মাঝে নিজের শিস মিলিয়ে দিয়ে বড় আনন্দ পান। মহাদেবের মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ওভাবে সাধন ক'রলে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে। ঐ সাপে অনিষ্ট করে না, বিস্তর সাহায্য করে; প্রাণায়াম বন্ধ হলে আবার চলে যায়।…

কুলদানন্দ আজ প্রত্যক্ষ করিলেন অপ্রাকৃত দৃশ্য! আর গুরুদেবের শ্রীমুখ নিসৃত অপূর্ব ব্যাখ্যায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হইলেন। মৌনী ও ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এসব কথা বলিলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দের মনে হইল ইহা গুরুদেবের বিশেষ কৃপা।

পরে কাশীধামে মানিকতলার মাতাজীর দর্শনলাভের কথা বলিলেন। সর্বদা তাঁহার উচ্চ অবস্থা, তবু তাঁহার সহিত বিতর্ক হয় কুলদানন্দের। সমাধিভঙ্গের পর মাতাজী নানা সাংসারিক প্রশ্ন তুলিলে কুলদানন্দ বলেন এসব কথা শুনিতে আসেন নাই। মাতাজী তখন ধর্মের বেশভূষা ত্যাগ করিবার উপদেশ দিলে কুলদানন্দ জানান—নীলকণ্ঠ বেশ, মালা-তিলকাদি ধারণ করিয়াছেন গুরুদেবের আদেশে। অভিমান বশে অনিষ্ট হয় এই অজুহাতে তবুও মাতাজী গুরুদত্ত বস্তুর উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। অমনি ধৈর্যহারা হইয়া রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেন কুলদানন্দ। তখন মাতাজী বলেন: ওরে, তোকে পরীক্ষা কচ্ছিলাম। কুলদানন্দ বলেন: আপনার স্পর্ধা ও সাহস তো কম নয়! সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্রকে পরীক্ষা করতে আসেন?···

গোসাঁইজী বলিলেন: সকলের কাছে বিনয়ী হবে। কেউ গুরুদত্ত বস্তুতে অবজ্ঞা দেখালে, গুরুনিষ্ঠা নষ্ট করতে চাইলে বজ্রের মত কঠোর হবে; নইলে সর্বদা ফুলের মত কোমল হবে—এই ঋষিবাক্য।

ঘটনাটি কুলদানন্দের গভীর গুরুনিষ্ঠার নিদর্শন। শ্রীধর বলিলেন বারদীর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহারও ঝগড়া হয়। গোসাঁইজীকে ছাড়িয়া ব্রহ্মচারীর নিকট যাইতে বলায় শ্রীধর ভীষণ কটূক্তি করেন। তখন তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করেন ব্রহ্মচারী। নিকটে একটা কুকুর বমি করিতেছিল—ব্রহ্মচারী বলেন: ঐগুলি খা' তো, দেখি কেমন ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে!···অমনি সেই বমি খাইতে থাকেন শ্রীধর। তখন তাঁহাকে সাদরে বসাইয়া ব্রহ্মচারী একসঙ্গে আহার করেন। বলেন: গুরুনিষ্ঠা হ'লে আর কি কিছু বাকি থাকে!···

কুলদানন্দ: আচ্ছা ভাই, তুমি বমি খেলে কী ক'রে?

শ্রীধর: আরে রাম! দেখলাম চমৎকার ক্ষীরমাখা চিড়ে!···স্বাদও ঠিক তেমনি।···এসব কি গোসাঁইয়ের কৃপা ছাড়া হয়?···

অভিভূত হইলেন কুলদানন্দ। কী বিচিত্র গুরুভক্তি,···আর কী অপূর্ব গুরুকৃপা!···আপন মনে বলিলেন: ধন্য গুরুদেব! তোমার পদাশ্রিতদের সর্বত্র জয়-জয়কার হ'ক।···

একদিন ভাগবত পাঠের পর গোসাঁইজী বলিলেন: তুমি তো প্রায়ই সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখ। এখান থেকে গিয়ে কিছু দেখেছ?

: কয়েকটা বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। বস্তিতে একদিন স্বপ্ন দেখলাম—যেন

বহু দেশ ঘুরে গেণ্ডারিয়া এলাম। এক সাধু বললেন, যেখানে গুরু সেখানেই তো সকল তীর্থ। আমি বললাম সেটা তো জানা চাই। সাধু বললেন, আচ্ছা মাটীতে দৃষ্টি রেখে ঠাকুরের কাছে যাও তো। সেই ভাবে আপনার কাছে এসে দেখলাম মাটীর উপর অসংখ্য নীল জ্যোতি, মনে হ'ল গেণ্ডারিয়া শ্রেষ্ঠ তীর্থ।...আপনি আমার দিকে সস্নেহে তাকালে একটা কাক উড়ে এসে কাছে পড়ল। আপনি বুকে তুলে নিলে কাকটী নীলবর্ণ হ'য়ে গেল, পুচ্ছের দিকে ফুৎকার দিলে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে লাগল। 'ঠিক হ'য়েছে, চলে যাও' -- বলে আপনি ছেড়ে দিলে কাকটা একটু গিয়ে চেয়ে রইল। আপনার আদেশে বেড়ায় খবরের কাগজ টাঙিয়ে দিলাম। আপনি বললেন—ঐ দেখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-কালী। দেবদেবী দর্শন করে পাখিটা সুন্দর নাচতে লাগল। আমি জেগে উঠলাম। কিছুক্ষণ বুঝতে পারলাম না, আমি সত্যি জেগে আছি কিনা।...

সানন্দে বলিলেন গোসাঁইজী : বড় চমৎকার স্বপ্ন !...লিখে রেখো।

: আর একদিন স্বপ্ন দেখলাম—গুরুভাইরা আপনাকে নিয়ে সংকীর্তনে মেতে উঠল, আপনিও ভাবে বেহুঁশ হ'লেন ; একা আমি শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে। নিজের দুরবস্থায় বড় ধিক্কার এল, চোখের জলে পতিতপাবন নিতাইকে স্মরণ করলাম। পাগলের মত ছুটে এসে আপনি আমাকে ধরলেন, উপরে তুলে মাটীতে সজোরে আছাড় দিলেন। আমার সর্বাঙ্গ চুরমার হ'য়ে গেল, আর তার উপর দাঁড়িয়ে আপনি দিব্যি নাচতে লাগলেন।...আমার প্রতি লোমকূপ থেকে সাবান-জলের মত ফেনা বের হ'তে লাগল, আপনি গণ্ডুষ ভ'রে তাই নিয়ে 'অমৃত ...অমৃত...' ব'লে চারিদিকে ছিটাতে লাগলেন।....আনন্দে সবাই কেঁদে উঠল।...আর সেই কান্না শুনতে শুনতে আমি জেগে উঠলাম।...

স্বপ্ন নয়—যেন সত্য। জাগরণেও রহিয়া যায় মধুর স্মৃতি।· গোসাঁইজীর অন্তরেও দেখা দিল অপূর্ব প্রতিক্রিয়া। সবিস্ময়ে কুলদানন্দ দেখিলেন, নত মস্তকে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন গুরুদেব।...মানুষ গুমরিয়া কাঁদে দুঃখ-বেদনায় ; কিন্তু গোসাঁইজীর এ ক্রন্দন অপার্থিব, অমৃতময়।...আবর্ত তুলিয়া ছুটিয়াছে কলস্বিনী, মহানন্দে মিশিয়াছে সাগর সঙ্গমে। মলয় হিল্লোলে সেই প্রশান্ত সাগরবুকে পলকেই ওঠে তরঙ্গ বিক্ষোভ।...তাই স্বপ্নের তাৎপর্যে গোসাঁইজীর এই আবেগ-মধুর বিহ্বলতা, আকুল আনন্দে অন্তরাত্মার স্বর্গীয় ক্রন্দন !...

কুলদানন্দের মনে হইল এতদিনে স্বপ্ন-দেখা, স্বপ্ন-বলা সত্যই আজ সার্থক। তাঁহার মনোমন্দিরে অক্ষয় হইয়া রহিল গুরুদেবের এই অব্যক্ত ক্রন্দনের স্মৃতি।...

গোসাঁইজীর ইঙ্গিতে আরও একটী স্বপ্নের কথা কুলদানন্দ বলিলেন: কয়েক দিন আগে স্বপ্ন দেখলাম—গুরুভ্রাতারা অনেকে এই ঘরে আছেন, আপনার সঙ্গে রাত্রি কাটাবার জন্যে তাঁরা নিজের আসনে বসলেন; জায়গা অভাবে আমি সাষ্টাঙ্গে আপনাকে প্রণাম করলাম। মাথায় সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আপনি আশীর্বাদ ক'রে বললেন—তোমার স্থান আমার পায়ের নীচে, কারো কথায় তুমি কখনও এ স্থান ছেড়ে যেয়ো না।...ঠাকুরমা'র দরকারে তখন হাতে তালি দিয়ে আপনি আমায় জাগিয়ে দিলেন।

স্বপ্নগুলি সত্যই অপূর্ব—তেমনই মধুর ইহাদের তাৎপর্য।...সদ্‌গুরুসঙ্গ প্রকৃত মহাতীর্থ, আর গোসাঁইজীর পুণ্যস্পর্শে তুচ্ছ একটী কাকের দেহ হইল অপরূপ, সে লাভ করিল দিব্য শক্তি ও মাধুর্য।...আবার, গোসাঁইজীর নৃত্য ভঙ্গে কুলদানন্দের দেহ চুরমার হইলে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল—তবে সেই বিচূর্ণ দেহ হইতে নিঃসৃত হইল অমৃত।...শেষের স্বপ্নে গুরুদেবের নিকট লাভ করিয়াছেন অক্ষয় আশীর্বাদ, তাঁহার শ্রীচরণতলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়।...

মনে তবু সংশয় জাগে। কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করেন: স্বপ্নগুলি কি সত্যি? এসব স্বপ্নের অর্থ কী?

তেমনই নীরব রহিলেন গোসাঁইজী, কারণ প্রকৃত তাৎপর্যের অনুভূতি সাধন সাপেক্ষ। ইঙ্গিতে বলিলেন: তা বলতে নেই। লিখে রাখো, পরে বুঝবে।

গোসাঁইজীর বৃদ্ধা জননীর উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইল। সর্বাঙ্গে তাহার অসহ্য বেদনা। অথচ সেবা-শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই; ভয়েও অনেকে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে চান না। এজন্য কুলদানন্দকে জননীর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন গোসাঁইজী।

কুলদানন্দের মনে হয় ইহা ঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি না দেখিলেই বা ঠাকুর এত উপদ্রব সহ্য করিবেন কীরূপে?...সন্ধ্যায় দুই ঘন্টা বিশ্রাম অন্তে সারারাত্রি প্রফুল্ল চিত্তে সেবা করেন ঠাকুরমায়ের। সর্বাঙ্গে তৈল ও পুরাতন ঘৃত মালিশ করেন, ধুনির আগুনে সেঁক দেন প্রতি ঘন্টায়, তিন-চার বার ঔষধ খাওয়ান। ঠাকুরমায়ের চিৎকার ও গালাগালি সহ্য করিতে হয়, পালন করিতে হয় নানা খেয়ালের হুকুম, ঘরের সর্বত্র কফ ও থুতু নির্বিকারে পরিষ্কার

করিতে হয়। ভোর না হইতে রান্না ঘরে গিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমাকে ভাত-ডাল, তরকারি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। আবার পছন্দসই রান্না না হইলেই সর্বনাশ।...

তবু এই সেবার মধ্য দিয়া তিনি লাভ করেন গভীর আনন্দ। মনে হয়, ঠাকুরমায়ের দেহে থাকিয়া স্বয়ং ঠাকুর কৃপাভরে গ্রহণ করেন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা।...গোসাঁইজী বুঝাইয়া দিয়াছেন এই সেবাব্রত সত্যই মধুর ও সার্থক।...

একদিন সহসা অগ্নিশর্মা হইয়া ওঠেন জননী স্বর্ণময়ী। বলেন: ছেলে হ'য়ে বাপের রূপ! দুর্গা পিছু পিছু চলেন!...বের হ' আশ্রম থেকে—আজ তোকে ঝাঁটা মেরে তাড়াব।...

হতবাক হইয়া যান কুলদানন্দ। দুর্গা পিছু পিছু চলেন!...বলেন কী ঠাকুরমা?

ততক্ষণে ঝাঁটা হস্তে ঠাকুরমা ছুটিয়া আসিলে পলায়ন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার কথাটী পিছু লাগিয়া থাকে যেন। হয়ত পাগলের খেয়াল—তবু বারবার কেন ধ্বনিত হয় সেই অদ্ভূত কথা?...

গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন: ঠাকুরমা যা বলেন তা কি সত্যি—না পাগলামি?

: মা ঠিক বলেছেন—ভগবতী তোমার পিছু পিছু চলেছেন!...

পলকে শিহরিয়া ওঠেন কুলদানন্দ।...শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হয় অভিনব বিদ্যুৎ।...ভগবতী চলেছেন পিছু পিছু!... কিন্তু কেন?...কোন দোষ ত্রুটি দেখেই কি বুকে ত্রিশূল হানিতে চান?...

গোসাঁইজী: না—নীলকণ্ঠ বেশের মর্যাদা দিতে!...

অমনি যেন শত ঝংকারে বাজিয়া ওঠে হৃদয়বীণা।...নিজ অস্তিত্বের ভিত্তি মূল পর্যন্ত কম্পিত হয় প্রবল বেগে।...সঙ্গে সঙ্গে যেন নিমজ্জিত হন এক বিচিত্র অনুভূতির নিঃসীম গভীরে!...

পরক্ষণে ক্রন্দনাবেগে ভাঙ্গিয়া পড়েন, মহামায়াকে স্মরণ করিয়া বার বার নিবেদন করেন সভক্তি প্রণাম।...হায়—শুধু অসীম কৃপায় গুরুদেব দিয়াছেন এই মহাযোগির বেশ।...কিন্তু তিনি যে পাপী, ঘোর দুরাচারী। তবু তাঁহার পশ্চাতে মুনিঋষি-বন্দিতা, সর্বশক্তিময়ী স্বয়ং মহাদেবী!...একমাত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ব্যতীত উদয়াস্তে মা ভগবতীকে তো একবারও স্মরণ করেন না—তবু দয়াময়ীর এত অনন্ত কৃপা?...

প্রথম জীবনে দেবদেবীর আরাধনা তাঁহার নিকট ছিল কুসংস্কার। কিছুদিন পূর্বেও এসব তিনি বিশ্বাস করিতেন না। গুরু আদেশ বেদবাক্য—তাই সম্প্রতি আরম্ভ করিয়াছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ। তাঁহারই নিকট জানিলেন নিজের উপর দেবীদুর্গার এই অপার করুণা। তাই আত্মহারা কুলদানন্দ আজ যেন অভিষিক্ত হইলেন সুমহান মাতৃমন্ত্রে।···

আহারান্তে গোসাঁইজী আম্রবৃক্ষ-তলে আসন গ্রহণ করেন। সম্মুখে ধুনি জ্বালাইয়া একঘন্টা ভাগবত পাঠ করেন কুলদানন্দ। অতঃপর স্বাভাবিক প্রাণায়ামের সহিত নাম করিয়া লাভ করেন গভীর আনন্দ।

কিছুকাল যাবৎ নামজপের সময় দর্শন করেন নানাবিধ চক্র। শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোক রেখা দ্বারা সেগুলি চতুষ্কোণ, অষ্ট কোণ, কখনও বা দ্বাদশ কোণাঙ্কিত। চক্রগুলির মধ্যস্থিত কৃষ্ণ অংশে মাঝে মাঝে অদ্ভুত জ্যোতি বিকশিত হইয়া বিলুপ্ত হয় পরক্ষণে। মনে হয়, চক্রের কেন্দ্রস্থলে দৃষ্টি স্থির হইলে জ্যোতিও নিশ্চল হইবে।···গুরুদেব বলিয়াছেন প্রতি চক্রমধ্যে অবস্থিত অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী! ফলে এই জ্যোতি মধ্যে দেবতা প্রকাশিত হইবেন।···একদা স্বতই প্রকাশিত হয় চির অজ্ঞাত, কল্পনাতীত বস্তু।···সুতরাং নিজস্ব চেষ্টা দ্বারা আর মূল সন্ধানের কী প্রয়োজন? সবই এখন ঠাকুরের কৃপা সাপেক্ষ।···

সাধন জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আপন প্রচেষ্টায় সমধিক নির্ভরশীল ছিলেন কুলদানন্দ। প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ফল প্রয়াসে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সেই অভিমান এতদিনে বিলুপ্তপ্রায়—আজ মনে প্রাণে তিনি নির্ভর করিতেছেন গুরুদেবের উপর। ইহা তাঁহার ক্রমোন্নতির সার্থক পরিচয়।

নামজপ কালে আর একদিন প্রত্যক্ষ করেন মধুর দৃশ্য : গুরুদেবের মস্তকের উপর শূন্য মার্গে নীলাভ কৃষ্ণচক্র বেষ্টিত অনুপম ওঁকার মূর্তি।···তাহার আদিতে, মধ্যে, অন্তে জ্যোতির্ময় বিন্দুত্রয়ে প্রোজ্জ্বল শুভ্র ছটায় গঠিত একটি মনোহর ত্রিভঙ্গ আকৃতি।···পরক্ষণে অদৃশ্য হইলে পুনরায় সেই অপূর্ব ছবি দেখিবার বড় বাসনা জাগিল; কিন্তু গুরুদেবের দর্শনে তাহার নিবৃত্তি হইল।···

: এ কী দেখলাম! এরূপ দর্শন হ'ল কেন?

গোসাঁইজী : তুমি শালগ্রাম পূজা কর—বিশেষ উপকার পাবে।

বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। প্রথমে উপাস্য ছিলেন নিরাকার পরব্রহ্ম; পরে তাঁহারই প্রতিভূ রূপে স্বয়ং গুরুদেবের পূজা করিতেছেন। কিন্তু এ কী

অদ্ভূত নির্দেশ ?…অথচ গুরুবাক্যে আজ তাঁহার একান্ত নির্ভরতা—তাই পূর্বের ন্যায় আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন না। শুধু বলিলেন : ভগবানের কোন রূপ আমি ভাবতে পারব না ওসবে আমার কোন আগ্রহ নেই। ঈশ্বরের যে রূপ প্রত্যক্ষ কচ্ছি, শালগ্রাম বা যে-কোন আধারে তাঁরই ধ্যান করতে পারি।…

স্নেহপুত্তলি শিশু সন্তানের মধুর আবদার যেন—একান্ত অনুগত শিষ্যের অকপট দাবী।…অন্য কোন 'রূপ' নয়, তাঁহার উপাস্য একমাত্র গুরুরূপী পিতা।…তিনিই জগৎ-পিতার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ—"মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু…"।…

পরম স্নেহে বলিলেন গোসাঁইজী : তুমি তাই করো'।…শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। ন্যাস অন্তে শালগ্রাম পূজা শাস্ত্রবিধি মতে করিবার ব্যবস্থাও দিলেন।

সাধুদের জিনিষপত্রের দিকে তীক্ষ্ন নজর ছিল কুলদানন্দের। সব কিছুর বিশ্লেষণও ছিল তাঁহার স্বভাবধর্ম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন : সাধুরা আসনের কাছে ধুনি রাখেন কেন ?

গোসাঁইজী : ধুনির সাধন আছে—অগ্নিই ইষ্টনাম এইরূপ ধ্যান রেখে সাধুরা কাম-ক্রোধাদি তাতে আহুতি দেন।

: সাধুদের চিমটা, কমণ্ডলু, ত্রিশূলেরও কি সাধন আছে ?

: এক একটা পরীক্ষা পাশ করে এসব গ্রহণ করতে হয়। জিহ্বা সংযত হ'লে চিমটা, অন্তর স্থির ও সাম্য ভাবে পূর্ণ থাকলে কমণ্ডলু, আর সত্ব-রজো-তম এই ত্রিগুণ আয়ত্ব হ'লে ত্রিশূল—এইভাবে এসব ধারণের অধিকারী হওয়া যায়।

মুল্যবান তথ্যগুলি অবগত হইয়া উৎসাহিত হইলেন কুলদানন্দ।

একদিন ভাল একটী শ্রীফল পাইয়া পূজার ভোগে লাগাইতে ইচ্ছা হইল। ঘোল দিয়া বেলের পানা ঠাকুর বড় ভালবাসেন। কিন্তু ঘোল মিলিবে কোথায় ? সহসা এক গোয়ালিনী আসিয়া বিনা পয়সায় দেড়সের ঘোল দিয়া গেল।… ঠাকুরকে বেলপানা নিবেদন করিলেন প্রচুর পরিমানে।

গুরুদেব বলিয়াছিলেন, প্রার্থনা করিলেই মঞ্জুর হইবে। আজ বুঝিলেন—প্রার্থনার অপেক্ষাও রাখেন না, প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা জাগিতেই তাহা পূর্ণ করেন দয়াল গুরুদেব।…কিন্তু মন যে সর্বদা বহির্মুখ—নিত্য নূতন বিষয়লাভে প্রাণের আনন্দ। কাজেই বাসনা মাত্রেই ঠাকুর তাহা পূর্ণ করিলে তো সর্বনাশ! পরমার্থ ভুলিয়া অবোধ মন যে বিষয়েতে জড়াইয়া পড়িবে!…

ভাবিতেই অন্তর হইতে প্রার্থনা উঠিল : মঙ্গলময় ঠাকুর! তোমার ইচ্ছা কিছু বুঝি না—তোমার হাত সর্বত্র এটা পরিষ্কার দেখলে নিশ্চিন্ত। নতুবা বাসনার নিবৃত্তি নেই, পরম শান্তি লাভেরও উপায় নেই।...

গুরুদেবের আদেশ মত ন্যাস অন্তে হোমাগ্নিতে পূজা করেন কুলদানন্দ। পূজার উপকরণ সংগ্রহে এবং বিধি মত পূজায় তাঁহার বড় আনন্দ। পরে গুরুদেবের নিকট ভাগবত পাঠ করেন—গভীর আবেগে কণ্ঠরোধ হয় মাঝে মাঝে। নামজপ কালে মনে প্রাণে বহিয়া যায় আনন্দ হিল্লোল। অপূর্ব শক্তিযুত এই নাম—ভক্তি সহকারে জপ করিলে তাহাকে যেন পরিণত করা যায় যে-কোন রূপে, গুণে ও আকারে।...

একদিন মনে হইল নামই যেন পুষ্প আর তুলসী-চন্দন। নামরূপী পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন গুরুদেবের শ্রীচরণে। প্রবল বেগে চলিল ইষ্টনাম,...সচন্দন তুলসীপত্রে গুরুদেব যেন সমাচ্ছন্ন।...

গোসাঁইজী ধ্যানমগ্ন। তিনি এক একবার চমকাইয়া উঠিলেন। অপাঙ্গে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন অন্তরতম সন্তানের দিকে, ঈষৎ হাস্যমুখে মস্তক আন্দোলিত করিলেন।...কুলদানন্দের আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল চতুর্গুণ।...

সন্ধ্যার পর তিনি জপে নিমগ্ন। গুরুদেব আজ বড় প্রফুল্ল। শিশুর মত চলিল তাঁহার অভিনয় ও আব্দার, নৃত্য ও নানা খেলা। খেলা তো নয়—বিচিত্র লীলা।...একনিষ্ঠ সেবকের নামপূজায় সদ্গুরু প্রসন্ন,.. আর গুরুদেবের প্রসন্নতায় শিষ্য আজ ধন্য।...

আসন গ্রহণ করিলেন গোসাঁইজী। গোয়ালিনীর ঘোল দেওয়ার কথা কুলদানন্দ জানাইলেন। গোসাঁইজী অস্ফুটে বলিলেন : টাকা না জমালে অভাব কখনো হবে না—ভগবান সমস্ত চালিয়ে নেবেন। যা পাবে এমনি দুহাতে বিলিয়ে দেবে, তাহলে অজস্র আসছে দেখতে পাবে।...

কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া আবার বলিলেন : খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এক। খ্রীষ্টের ক্রুশ, কৃষ্ণের চূড়া, আর মহাদেবের ত্রিশূল—এই তিনে ওঁকার রয়েছে।...

এই অপূর্ব বাণী আনমনে ভাবিতে থাকেন কুলদানন্দ। এ যে বড় মধুর তত্ত্ব—তাহার অনুভূতির অভাবেই তো এত ভেদবুদ্ধি।...

অপরাহ্ণ দুইটা। আম্রবৃক্ষ তলে গোসাঁইজী উপবিষ্ট। সর্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, সম্মুখে প্রজ্বলিত ধুনি। গুরুদেবের ভস্মমাখা রূপ দেখিবার একান্ত বাসনা আজ পরিপূর্ণ। কুলদানন্দের আনন্দ আজ অফুরন্ত।

ভাগবত পাঠ অন্তে নামজপে আত্মস্থ হইলেন। গুরুদেব সাক্ষাৎ সদাশিব, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কোটি বিশ্বের অনন্ত বিভূতি।···মনে হইল ইষ্টনাম যেন গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র, নামরূপ সেই অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন নামরূপী গুরুদেবের শ্রীচরণে। অন্তরের মণিকোঠায় ঠাকুর অধিষ্ঠিত,·· মনের সাধে তাঁহার পূজায় ও ধ্যানে তিনি আত্মসমাহিত।·· তেমনি ঠাকুরের ঈষৎ হাস্যে, ক্ষণে ক্ষণে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে যেন বিকীর্ণ হয় মোহন দ্যুতি ; আর পুলক প্রবাহে আন্দোলিত হয় কুলদানন্দের প্রবুদ্ধ অন্তর।···সত্যই কী অপার আনন্দ,···কী স্বপ্নাতীত সার্থকতা !···তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া পুলকাশ্রু ঝরে অঝোর ধারায়—সময় কাটিয়া যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে।···

দীক্ষাগ্রহণের পর ষষ্ঠ বর্ষ আজো উত্তীর্ণ হয় নাই, তবু নামপূজা ও নাম-সাধনায় এই ক্রমোন্নতি সবিশেষ লক্ষ্যনীয়। নামই অমোঘ গুরুশক্তি, সেই পবিত্র নামেই আবার পরমারাধ্য শ্রীগুরুর মানসপূজা।··পুষ্প-চন্দন নাই, নাই কোন পদ্ধতি বা অনুষ্ঠান—শ্বাসপ্রশ্বাসে আছে শুধু মধুর নাম-প্রবাহ, আর প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীগুরুদেব সেই নামেরই বিচিত্র রূপায়ণ !···সমাহিত অন্তরের অন্তস্থলে গঙ্গাজলেই এই অপূর্ব গঙ্গাপূজা,·· আর অশ্রুবন্যায় প্রাণযমুনার আত্মনিবেদন !···

কুলদানন্দ বুঝিতে পারেন গুরু-সেবাতেও নানা বিঘ্ন অনিবার্য। বিশেষতঃ গুরুর একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হইলে ঈর্ষান্বিত হন গুরুভ্রাতারা। তখন সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পল্লবিত হইয়া পরিবেশিত হয় শ্রীগুরু চরণে।

রাত্রি জাগরণে, অপরিমিত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর খুবই শ্রান্ত ও কাতর। একদিন সন্ধ্যায় শয্যাগত হইলেন, ঠাকুরমায়ের নিয়মিত সেবাযত্ন ব্যাহত হইল। সমস্ত বুঝিলেন সর্বদর্শী গোসাঁইজী, কয়েকদিন বাড়ী গিয়া তাঁহাকে মায়ের নিকট থাকিবার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং বাড়ী যাইবার মনস্থ করিলেন কুলদানন্দ।

সহসা কয়েকজন গুরুভ্রাতা গোসাঁইজীর সম্মুখে কুলদানন্দকে বলিলেন : মশাই ! ব্রহ্মচর্য করেন—আপনার আবার অসুখ হয় কেন ?···ঠিকমত চলতে না পারেন, ব্রহ্মচর্য ছেড়ে দিন না ! এতে ঠাকুরের যে কলঙ্ক হয়।

—ঠাকুরের কলঙ্ক ! তিনি যে অকলঙ্ক, জ্যোতির্ময়।···তাঁহার ভাস্বর দীপ্তি প্রতিক্ষণে বিদুরিত করিতেছে গোপন মনের যত মালিন্য, সারা দুনিয়ার সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা।···এছাড়া শিষ্যের ব্যর্থতা-সার্থকতা, দুর্নাম-সুনাম—সবকিছুর মালিক তো তিনিই। তবু তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই পবিত্র নামে এমনি কলঙ্ক ! ইহা যে গুরুনিন্দার নামান্তর।

দৃঢ় কণ্ঠে কুলদানন্দ বলেন : ব্রহ্মচর্য দিয়ে ঠাকুর যদি অটল রাখতে পারেন তবে তা দিন—এই সর্তে আমি ব্রত নিয়েছি। যদি ব্রতভঙ্গ হ'য়ে থাকে তবে সে ত্রুটি স্বয়ং ঠাকুরের।…সেজন্য তাঁকেই শাসন করুন!…

স্মিত হাস্যে তাঁহার দিকে চাহিলেন গোসাঁইজী, মস্তক দোলাইয়া সমর্থন জানাইলেন। লজ্জিত ও নীরব হইলেন শিষ্যবৃন্দ।

একজন তবুও বলিলেন : সকালে এমন সুন্দর ফুলগুলি তুলে আপনি গাছের শোভা নষ্ট করেন কেন? গাছেরও কি ওতে কষ্ট হয় না?

: আমাদের জন্যে তুললে কষ্ট হত বৈকি—কিন্তু আমি তুলি ঠাকুরের চরণে দেবার জন্য, গাছের তাতে বরং আনন্দ হয়।…কাছে গেলে মনে হয় তারা সাগ্রহে আমার দিকে চেয়ে আছে।

: ওসব ভাবের কথা ছেড়ে দিন। হিংসা দিয়ে কি পূজা হয়?

: হিংসা কাজে নয়, ভাবে। ফুল-তুলসী দিয়ে পূজা করা ঋষিদের ব্যবস্থা, আমাদের নয়। আর, ফুল তোলার কথা কী বলছেন—অনায়াসে মাথা কেটে চরণে দিতে পারি, যদি জানি ঠাকুর আনন্দ পাবেন!…

আত্মদানের নিখাদ সুরে কম্পিত হয় মধুর কণ্ঠ—আর প্রতি অন্তরে, দিকে দিকে অনুরণিত হয় সেই মহাসংগীত।…গোসাঁইজী ধ্যানস্থ হইলে আত্মস্থ হইলেন কুলদানন্দ। আর, হতবাক হইয়া রহিলেন মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্যবৃন্দ।…

নিত্য শালগ্রাম পূজা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন গুরুদেব। কোথায় মিলিবে লক্ষণযুক্ত শালগ্রাম? গুরুদেব বলিয়াছেন শত সহস্র শালগ্রাম আছেন অযোধ্যার এক মন্দিরে। বড়দাদাকে লিখিলেও এ পর্যন্ত সন্ধান মিলে নাই লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রের। অথচ শালগ্রাম পূজার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে দিনে দিনে। পুষ্প-চন্দন, তুলসী-বিল্বদলে ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করিবার সৌভাগ্য হইবে কিনা কে জানে। হয়ত বাধা দিবেন গুরুদেব নিজেই। তাই তো শালগ্রামে মনের সাধে গুরুপূজা করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবেন।…গুরুদেব দয়া করিয়া শালগ্রাম শিলা মিলাইয়া দিবেন কতদিনে?…

বেলা দশটা। জনৈক গুরুভ্রাতা অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত। গুরুপদে অঞ্জলি দিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, নিষ্ক্রান্ত হইলেন ধীরে ধীরে।

নির্জন কক্ষে গুরুপূজার এই তো সুবর্ণ সুযোগ! পুষ্প-চন্দন, তুলসীপত্রাদি লইয়া অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ—করজোড়ে সকাতরে দাঁড়াইয়া

রহিলেন গুরুদেবের পার্শ্বে। এ তো প্রতিমা পূজা নয়, সাক্ষাৎ গুরুগোবিন্দের চরণ বন্দনা! সহসা মনে হইল : এমন কী পুণ্য করেছি যে ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করব?…

চক্ষে নামিল অশ্রুধারা—ভক্তি-পুষ্প বিকশিত হইল পূর্ণ শতদলে। শ্রীগুরু ধ্যানমগ্ন, শিষ্য শ্রীচরণ পূজার ব্যাকুল আগ্রহে অশ্রুসিক্ত।…মনে হইল : অন্তর্যামী ঠাকুর কৃপা ক'রে গ্রহণ করবেন, তবেই তো সার্থক হবে এ অধমের দীন পূজা।…

পরক্ষণে ধ্যান ভঙ্গ হইল গোস্বামী প্রভুর। পরম স্নেহে চাহিলেন প্রাণাধিক সন্তানের দিকে। অস্ফুটে বলিলেন : কী—পূজা করবে?…বেশ—কর।…যদি কিছু পেতে চাও চরণে দেও—আর, আমাকে যদি কিছু দিতে চাও, আমার মাথায় দেও।…

অপূর্ব নির্দেশ গুরুদেবের। এ যে অগ্নিপরীক্ষা!…অথচ তিনি আজ দিয়াছেন অখণ্ড অধিকার। সঙ্গে সঙ্গে জটাশোভিত শিরোভাগ বাড়াইয়া দিয়াছেন যেন।… অনুগত শিষ্যের সর্বস্বার্থ, সর্বকাম্য সমর্পিত শ্রীগুরুচরণে—তাই বুঝি ভক্তের আত্মদান, ত্রিদিব-বন্দিত ভক্তি-অর্ঘ্য সাগ্রহে শির পাতিয়া গ্রহণ করিতে উন্মুখ। গুরুগত প্রাণ শিষ্যবরকে কৃতকৃতার্থ করিতে গোসাঁইজীর কী বিচিত্র লীলা!…

কুলদানন্দের স্পন্দিত অন্তরে ঝংকৃত হয় শত বেণুবীণা। মনে হয় : কী আর চাইব শ্রীগুরু চরণে? পরম দয়াল অনন্ত কৃপা করে দিয়েছেন সেরা সম্পদ, সে যে বিশ্বস্রষ্টার অক্ষয় ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি।…তাই কি জগৎগুরু আজ নিজে শির পেতে দিয়েছেন?…কিন্তু তাঁকে দেবার মত ভক্তি অনুরাগ কিছুই যে আমার নেই—সত্যি যে আমি দীন-হীন, সর্বহারা রিক্ত কাঙাল।…কী ধন আজ অঞ্জলি দেব জগন্নাথকে?…

আত্মহারা শিষ্যের অন্তরে গুমরিয়া উঠিল নিরুদ্ধ প্রার্থনা : ঠাকুর! জন্ম-জন্মান্তরে যদি আমার কখনো কিছু সুকৃতি থাকে, আর তোমার সঙ্গলাভে, সাধন ভজন ও সেবাপূজায় যা কিছু ফল দিয়েছ ও দেবে—তা সমস্তই আমি তোমায় নিবেদন করলাম;…দয়া করে গ্রহণ কর।…পরক্ষণে পুষ্পাঞ্জলি বক্ষে ধারণ করিয়া কম্পিত করে অর্পণ করিলেন গুরুদেবের শিরোদেশে। যেন দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে হৃদয় নিঙড়াইয়া প্রদান করিলেন প্রেম-ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য,…নিঃশেষে উৎসর্গ করিলেন সর্বলোকের সর্বসম্পদ।…ধর্ম-মোক্ষ,

সমস্ত আশা ও আকূতির ঊর্ধ্বলোকে দীনভক্ত আজ স্বয়ং বিশ্বপিতার বরপুত্র।···
স্নেহস্নিগ্ধ সুমধুর দৃষ্টিতে চাহিলেন গোসাঁইজী—আর তাঁহার শ্রীচরণতলে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িলেন কুলদানন্দ।···

শ্রীনামে নিহিত গুরুশক্তি—সেই নামের মধ্যদিয়া রূপায়িত শ্রীগুরুর দিব্যরূপ। শাস্ত্র অধ্যয়নে বা গুরুবাক্য শ্রবণে এই ধারণা জন্মে নাই, উপলব্ধির গভীর স্তরে কুলদানন্দ সাক্ষাৎকার লাভ করেন এই মধুর তত্ত্বের। শাস্ত্রমতে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ঋষিকল্প। সেই হিসাবে সাধন জীবনের বর্তমান অবস্থায় তিনিও ঋষিতুল্য, ··মুনিঋষিদের ন্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে জীবনগঠনে সবিশেষ যত্নবান। ব্রহ্মচর্য গ্রহণের পূর্বে গুরুদেবের নিকট নিবেদন করেন সেই প্রার্থনা, ইতিমধ্যে তাহা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সাধারণ ব্রহ্মচারী নন—তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। এই ব্রতপালনে তাঁহার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় কত না গভীর। ইষ্টমন্ত্র ঈশ্বরের নাম, সেই নামে প্রকাশিত সাকার পরমেশ্বর। তাঁহার নামের মধ্যে রূপায়িত গোস্বামী প্রভু—গুরুই প্রত্যক্ষ ভগবান।···নাম, নামদাতা ও ইষ্টদেবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সুন্দর সমন্বয়।···ইহার মধ্যে লুক্কায়িত তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শন ও উপলব্ধির পরম তত্ত্ব, তাঁহার গুরু-গোবিন্দের নিগূঢ় রহস্য।···

সাধক কুলদানন্দের জীবনবেদের এই ক্রমপর্যায় সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বাপর অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার বিচারে ছিলেন মহাপুরুষ। গোসাঁইজীর অসাধারণ গুণ ও অপ্রাকৃত শক্তির পরিচয়ে বর্ধিত হয় তাঁহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস - অসীম স্নেহ ও অনন্ত কৃপায় ক্রমে গভীরতর হইতে থাকে তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ। তিনি হইলেন মন্ত্রমুগ্ধ—গুরুসঙ্গ তাঁহার নিকট হইল চিরকাম্য, শ্রীগুরুর বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে দুঃসহ। এই নিবিড় প্রেমভক্তির মাঝে বিলিন হইল তাঁহার দুর্জয় অভিমান ও স্বকীয় সত্তা। সাফল্যের প্রশ্ন তখন অবান্তর, ব্যর্থতা দেখা দিলেও সেজন্য দায়ী গুরুদেব।···অতঃপর দেখা দিল স্বচ্ছতর আত্মদর্শন, আর শ্রীনামের মধুরতর ক্রমবিকাশ। অভিভূত আনন্দে প্রত্যক্ষ করিলেন গুরুদেবের জটারাশিতে মূর্তিমান সর্পরাজ,···মস্তকের উপর শূন্যমার্গে কালোচক্র বেষ্টিত ওঁকার মূর্তি - মধ্যস্থলে শ্রীগুরুর মনোহর ত্রিভঙ্গ আকৃতি।···তখন নামরূপ পুষ্পচন্দনে সুরু হইল নামদাতা ইষ্টদেবের মানসপূজা,···শালগ্রাম পূজা করিবার নির্দেশে প্রত্যক্ষ শ্রীগোবিন্দের আরাধনা!···অপ্রাকৃত স্বপ্নদর্শন ও অপরূপ জ্যোতিপ্রকাশ এই সচ্চিদানন্দ উপলব্ধির সার্থক সূচনা। ধ্যানমূর্তি

পরব্রহ্ম গুরুমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবনে। অনন্ত হইলেন সান্ত, আর নিরাকার হইলেন সাকার রূপে পরম আপনার। ভগবানের অন্য কোন নাম বা রূপ নয় - একমাত্র শ্রীগুরু সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া স্বয়ং বিশ্বনাথ রূপে বিরাজিত।…

শান্ত, দাস্য, মধুরাদি শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি তাই সঞ্চারিত হইতে থাকে তাঁহার অন্তরে। আর গোস্বামী প্রভুও আলাপে আচরণে প্রাণপ্রতিম শিষ্যবরের মনেপ্রাণে বিস্তার করেন অসীম শক্তি, ভক্তি ও মাধুর্য। এইজন্য সহসা একদিন স্বহস্তে খিচুড়ি গ্রহণ করিলেন - বলিলেন ইহা শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ইষ্টনামে সন্তানের মানসপূজায় অপাঙ্গে চাহিয়া চাহিয়া প্রকাশ করিলেন সুস্নিগ্ধ, স্বর্গীয় স্মিতহাস্য। আর শিষ্য যখন পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তখন ইঙ্গিতে হরণ করিলেন সর্বকাম্য—সাগ্রহে শির পাতিয়া গ্রহণ করিলেন অমূল্য আত্মদান। ভক্তি-রসামৃত পান করিয়া যেন ধন্য হইলেন গুরুদেব, আর অসীম কৃপাসিন্ধুতে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন শিষ্যপ্রবর। পলকে ভক্তিসাগরে একাকার হইয়া গেলেন ভক্ত ও ভগবান।…যেন ভক্তচূড়ামণি সুদামকে বক্ষে ধারণ করিলেন স্বয়ং গোলকপতি।…গুরু-শিষ্যের এই অভূতপূর্ব লীলারহস্য সত্যই অনুপম সুষমায় ভাস্বর,…স্বর্গীয় মাধুর্যে ভরপুর।…

॥ সতের ॥

গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করিলেন কুলদানন্দ। গুরুনির্দেশ অনুযায়ী যাত্রা করিলেন দেশের বাড়ীতে।

ভগ্নির জন্য কিছু মিষ্টসামগ্রী লইয়া যাইবার বাসনা হইল। অথচ সম্বল মা ত্র দুইটী পয়সা। অগত্যা তাহাই লইয়া এক দোকানে গেলেন, আর বিনা দামে ময়রা সানন্দে সাজাইয়া দিল অনেক কিছু। ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার প্রসাদ মনে করিয়া গ্রহণ করিলেন।

নৌকায় স্নান-তর্পণের পর পিপাসার্ত হইলেন। মনে হইল, আশ্রম হইতে ছোলা-আদা খাইয়া আসা উচিত ছিল। সহসা এক বাল্যবন্ধু নদীতীরে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করিলেন ; জলখাবার দিলেন আদা, ছোলা ও গুড়। কুলদানন্দের স্মরণ হইল আশ্রমে বর্ষার মাঝে ইচ্ছামাত্রেই চা-মুড়ি, মর্তমান কলা ইত্যাদি

পাইবার কথা। প্রার্থনা দূরে থাক, বাসনা মাত্র তাহা পূরণের জন্য গুরুদেবের কী অপূর্ব ব্যবস্থা।···

যথাসময়ে গৃহে পৌছিলেন—প্রণত হইলেন জননীর পদতলে। সানন্দে ভগ্নির হাতে দিলেন প্রসাদী মিষ্টসামগ্রী।

নিত্যক্রিয়া চলিল নিয়ম মত। একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা যেন মহানন্দে সাজাইতেছেন একটী সুশ্রী, সুগোল শালগ্রাম শিলা। পরদিন স্বপ্ন দেখিলেন: যেন ভক্তি সহকারে পূজা করিতেছেন গৃহদেবতা শ্রীগোপাল ঠাকুরকে—এমন সময় সিংহাসন কম্পিত হইতে লাগিল, তিনটী পায়া শূন্যে উত্থিত হইল। মনে হইল বুঝি গোলকে যাত্রা করিলেন গোপাল ঠাকুর—পরক্ষণে লক্ষ্য করিলেন ঠাকুর হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়া শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। সহসা গোপাল যেন ভূমিতলে অবতরণ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন—অমনি তিনিও পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল।

গুরুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলে ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসে সাধন ভজনের আনন্দ ও উৎসাহ। গত কয়েকবার তিনি লাভ করিয়াছেন এই অভিজ্ঞতা। এবারেও বাড়ী আসিয়া একই অবস্থার সম্মুখীন হইলেন। নিয়মিত নিত্যকর্ম সত্বেও একাগ্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। এছাড়া, গৃহে সৎসঙ্গের বিশেষ অভাব; আবার সর্বদাই বিষয়ী ও মহিলাদের আনাগোনা। পাছে বিষয় বাসনায় চিত্ত কলুষিত হয়, নিরন্তর এই আশংকা। নিজস্ব সতর্কতা সত্বেও অপরের প্রকৃতি ও মনোভাবে চঞ্চল হইয়া ওঠে তাঁহার অন্তর। এখনও যদি এত ভয় ও দুর্বলতা, এযাবৎ সাধনভজনে কী ফললাভ হইল? গুরুদেবেরই বা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এতদিনে?···

প্রকৃতিবশে চলিবার ফলাফল কী তাহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল কুলদানন্দের। আহারের নিয়ম স্থগিত রহিল, মহিলাদের সহিত সময় কাটাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে উচ্চ অবস্থা হইতে পতন ঘটিল—কয়েকদিন পরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এই পরিবেশ অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। অনুভব করিলেন সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় সদ্‌গুরুসঙ্গ কত অপরিহার্য। গুরুদেবের দর্শনলাভ মাত্রেই দেহমন পুনরায় শুদ্ধ, সুস্থির ও নির্মল হইল। আপন মনে বলিলেন: ঠাকুর! দয়া করে এইভাবে ফেলে-তুলে নেও—তোমার অসীম মাহাত্ম্য তুমি না বোঝালে কে বুঝবে?···

বীর্যধারণের উপায় ও উপকারিতা সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন: গৃহস্থদেরও বীর্যরক্ষা করা বিশেষ দরকার, নতুবা সাধন পথে বিঘ্ন দেখা দেয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে নামই চিত্তবৃত্তি দমনের প্রধান উপায়। সেই সঙ্গে চাই প্রাণায়াম—'নাস্তি প্রাণায়ামাৎ বলং', এ ঋষিবাক্য। ঊর্ধরেতা হ'লে অপূর্ব আনন্দ হয়, কিন্তু তাকে ব্রহ্মানন্দ মনে ক'রে অনেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। মূলকথা—গুরুর উপর নির্ভর করা চাই, আর ভগবানে চাই শ্রদ্ধাভক্তি।

এই উপদেশে অস্থির হইয়া উঠিলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন মনোমুখী হইয়া প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়াছেন। গুরু-নির্ভরতার নামে অমান্য করিয়াছেন গুরুনির্দেশ। বাড়ী গিয়াই দেখা দিয়াছে এই বিপত্তি। আহারের নিয়ম পালনে অবহেলা করায় লোভী ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির না রাখাতে নজরে পড়িতেছে স্ত্রীমূর্তি, ফলে নিস্তেজ কামরিপু পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নাম, কুম্ভক ও বাক-সংযম অভাবে পণ্ড হইয়াছে মনের স্থিরতা ও প্রফুল্লতা।

ধর্মবুদ্ধিতে এভাবে অধর্মের উদয় হইল কেন? এখন এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কী? জানিলেন অনেক গুরুভ্রাতার জীবনে এমনি দুরবস্থা ও অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন সকলে।

গোসাঁইজী বলিলেন: বাইরে যেমন গ্রহাদির প্রভাব, ভিতরেও তেমনি। যারা সাধন ভজন করেন তাঁরা মাঝে মাঝে এটা অনুভব করেন। ঋষিরা একে বলতেন 'ইন্দ্রদেবের অত্যাচার'—মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা বলেন 'শয়তান'। কাম-ক্রোধ, বাসনা-কামনা এমনকি ধর্ম রূপেও এটা সাধকের সর্বনাশ করে। এর একমাত্র ঔষধ ধৈর্য ধ'রে পড়ে থাকা, আর শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা। প্রহ্লাদের মত অগ্নিকুণ্ডে প'ড়েও নাম করতে হবে।...চারিদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত—সহায় কেবল হরিনাম। এসব অগ্নিপরীক্ষা—যত পোড়া যাবে ততই বিশুদ্ধ হবে। এই যন্ত্রণায় আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম; পরমহংসজী রক্ষা করেন। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ দগ্ধ করতে অনেক অগ্নির প্রয়োজন—এই যন্ত্রণাই মুক্তির হেতু। পাপ সত্বেও যদি ধর্মের আনন্দ হয় সেটা বিড়ম্বনা। যন্ত্রণায় শুকিয়ে শুকিয়ে নীরস হবে, বিষয়-রস এক বিন্দু থাকতেও ব্রহ্মানন্দ আসে না।...এই যন্ত্রণার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে—সময়ে সব কিছু প্রকাশ পাবে। এখন শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর—সমস্ত যন্ত্রণার অবসান তাতেই হবে।...

সাধন জীবনে ক্রমোন্নতি কঠোর হইতেও কঠোরতর। সাধারণ জীবন

অপেক্ষা সাধকের জীবনে রিপুর আক্রমণ আর বাধাবিপত্তি চতুর্গুণ।... প্রতি পদে দুঃসহ দহন-জ্বালার মধ্য দিয়া তবে সাধক নিখাদ সোনায় পরিণত হইবেন। কুলদানন্দ বুঝিলেন এই অগ্নি পরীক্ষাই মুক্তি ও সার্থকতার সোপান। গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী তিনি নিমগ্ন হইলেন নামজপে—শ্বাসে প্রশ্বাসে।...

পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহ। আমলকী দ্বাদশীর ব্রত করিবেন জননী হরসুন্দরী। তাঁহার ইচ্ছায় গুরুদেবের অনুমতি লইয়া পুনরায় বাড়ী উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দ। ব্রতের অনুষ্ঠান চলিল মহা সমারোহে। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী পৌষ-সংক্রান্তি হইতে সুরু হইল রামায়ণ পাঠ; সর্বসম্মতিক্রমে তিনি হইলেন তাহার শ্রোতা।

কিছুদিন হইল উচ্চ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তবু তাঁহার ধারণা—কামরিপুর উত্তেজনা হইতে এখন তিনি একেবারে মুক্ত; নানা দুরবস্থা সত্ত্বেও একজন সাধারণ গুরুভ্রাতা অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক উচ্চাবস্থায় রাখিয়াছেন গুরুদেব।...অচিরে সুরু হইল এই দম্ভের প্রতিক্রিয়া। স্বপ্নযোগে সুন্দরী যুবতীদের দর্শন করিয়া মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অনুতাপের কশাঘাতে প্রার্থনা জানাইলেন: ঠাকুর, এখন কী করে রক্ষা পাই?

পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন—গুরুদেব দীক্ষাদান সময়কার সেই বেশে ঈষৎ হাস্যমুখে সম্মুখে উপস্থিত। পবিত্র, তেজস্বী মূর্তিতে তিনি তাকাইয়া আছেন যেন।...তাঁহাকে নমস্কার করিতেই জাগরিত হইলেন।...একটু পরে তন্দ্রাঘোরে তাঁহার কর্ণগোচর হইল গুরুদেবের আদেশ: বাক্য দ্বারা জিহ্বা নষ্ট হয়—তুমি মৌনী হও।...অতঃপর শ্রীগুরুর বর্তমান জটাশোভিত প্রসন্ন রূপ অন্তর্হিত হইল পরিবর্তে মানশ্চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল স্বপ্নদৃষ্ট পূর্বের মুণ্ডিত-মস্তক গম্ভীর মূর্তি।...নিঃসংশয় হইলেন তন্দ্রাঘোরে প্রাপ্ত নির্দেশ স্বয়ং গুরুদেবের—আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পরদিন মস্তক মুণ্ডণ করিয়া মৌনী হইলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় খুব ব্যথিত হইলেন আত্মীয়-স্বজন।

সমারোহে ব্রতের অনুষ্ঠান চলিল তিন সপ্তাহ। সদাচারী ব্রাহ্মণের মুখে রামায়ণের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহা আনন্দ লাভ করিলেন কুলদানন্দ। ব্রত সাঙ্গ হইলে জননী ব্রতফল অর্পণ করিলেন ভগবৎ-চরণে। কুলদানন্দও রামায়ণ শ্রবণের ফল অর্পণ করিলেন শ্রীগুরু চরণে—ধন্য মনে হইল নিজেকে।..

মাঘ মাসের শেষে আসন্নপ্রসবা মেজ বৌদিদি এবং রোহিনী কান্তের স্ত্রীকে লইয়া ঢাকা রওনা হইলেন। তাঁহারই আগ্রহে ও চেষ্টায় গোসাঁইজীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন সকলে।

শালগ্রাম পূজা করিবার আদেশ দিয়াছেন গুরুদেব। আজও তাহা পালিত না হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়িয়া চলিয়াছে। অযোধ্যা হইতে শালগ্রামের পরিবর্তে আসিল লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি। তাহাতে চিত্ত ভরিল না কুলদানন্দের ; গুরুদেবকে দেখাইয়া বলিলেন : আমার মূর্তিপূজা করবার ইচ্ছা একেবারে নেই।

: বেশ—লক্ষণযুক্ত স্বাভাবিক শালগ্রাম পূজা ক'রো।

: ঠাকুরের পূজা যে শিলায় করব, তা সুশ্রী না হলে তৃপ্তি হবে না।

: লক্ষণযুক্ত খুব সুশ্রী শালগ্রাম তুমি পাবে—তাই পূজা ক'রো।

নিশ্চিত আশ্বাস গুরুদেবের। কুলদানন্দ নিশ্চিন্ত হইলেন।

জননীর ব্রত উপলক্ষে মৌনী ছিলেন সতের দিন। তখন চিত্ত ছিল অন্তর্মুখী, নামজপে বিভোর। পুনরায় সেই অবস্থা লাভের জন্য মৌনী হইলেন।

আলাপ আলোচনার সময় বিরক্ত হইলেন গোসাঁইজী। বলিলেন : তুমি কি মৌনী হয়েছ ?

: স্বপ্নে আপনি তো মৌনী হ'তে বলেছিলেন।

স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির বিবরণ শুনিয়া গোসাঁইজী বলিলেন : আমি নই, তোমার প্রকৃতি—তোমারই ভিতরের রূপ তোমার নিকটে প্রকাশ হয়ে ও-রকম বলেছিল।—

অপলকে চাহিয়া রহিলেন কুলদানন্দ। এ অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। মনে হইল : নিজের রূপই নিজেকে যদি ধর্মের নামে অধর্মের পথে চালিত করে, তবে আর উপায় কী !

বস্তুতঃ, অন্তরে অভিমান তখনও নির্মূল হয় নাই। ফলে স্বপ্নঘোরে এই আত্ম-রূপায়ণ—আর অহংকারের নির্দেশ গুরুআদেশ রূপে পালন করায় সাধনপথে পুঞ্জিত হইল বিঘ্ন ও অহমিকা। গোসাঁইজী আদেশ দিলেন—তাঁহার বর্তমান রূপ স্বপ্নে দৃষ্ট হইলে কোন নির্দেশ গুরুআদেশ রূপে মান্য হইবে ; আর গুরু বিদ্যমান থাকিতে মৌখিক আদেশ সর্বদা পালনীয়। বলিলেন : বীর্যধারণ না হওয়া পর্যন্ত মৌনী হওয়া ঠিক নয়, মাথা খারাপ হয়ে যায়। মৌনী হয়ো না, বাকসংযম অভ্যাস কর।…

একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন : ভিতরের কুচিন্তা, সংশয় কিসে যাবে?

গোসাঁইজী : শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর।

: সে কি আপনার কৃপা ভিন্ন হবে! আর, আমার কী ক্ষমতা আছে?

: ওসব ভাবুকতা ছেড়ে দেও। বেশী ভক্তি দেখালে নিজের ক্ষতি—কৃপার কথা অনেক পরে। যতদিন সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ, মান-অপমান আছে, নিজে চেষ্টা করতে হবে। নিজের চেষ্টায় নাম করাই সাধন।

কুলদানন্দের মনে হইল ভাবুকতার প্রশ্রয় দিয়া তিনিও নিজের ক্ষতি করিয়াছেন। গুরুআদেশ অনুযায়ী আত্মপ্রচেষ্টা মুখ্য, অতি ভক্তির অজুহাতে নিষ্ক্রিয়তা বর্জ্জনীয়।

অন্য গুরুভ্রাতা বলিলেন : সন্দেহ আর অবিশ্বাসে কষ্ট পাচ্ছি। ভগবানে অচলা ভক্তি কিসে হবে?

: শ্রদ্ধার সাথে শাস্ত্রপাঠ ও সৎসঙ্গ করলে বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা আসে—তবে সদ্‌গুরুর উপদেশ মত সাধনভজন করলে ভগবান কৃপা করে দর্শন দেন। তখন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মনি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

আমি সাধু, ভক্ত এই অভিমান দেখা দিলে ঘোর পাপে ডুবতে হয়। এজন্য লোকচক্ষে যত হীন ও মলিন হওয়া যায় ততই মঙ্গল। সেজন্য প্রতিদিন স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সাধন চাই।

আর একজন বলিলেন : আমি তো কিছুই করতে পারিনে। ধর্ম কীভাবে লাভ হবে?

: জীবনটাকে নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত করতে হবে। প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্যও নাম ও প্রাণায়াম করা দরকার। এইভাবে অভ্যাস হলে সহজে ধর্মলাভ হয়।

কুলদানন্দ বুঝিলেন, গুরুকৃপাই যে সার তাহা বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন মত তাঁহাদের লইয়া চলিয়াছে গুরুদেবের বিচিত্র ভাঙ্গা-গড়া; তবে তো গুরুকৃপার উপর জন্মিবে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভরতা। সেই কৃপালাভের জন্যই প্রয়োজন গুরুআদেশ অনুযায়ী আত্মপ্রচেষ্টা।...তাই ভক্তি-বিশ্বাসের শৈথিল্য সম্পর্কে গুরুদেব বলিয়াছেন—তোমাদের চেষ্টা থাকবে পুনঃপুনঃ গঠন ও স্থাপন, আর আমার চেষ্টা 'ভাঙ্গন'।...ইহাও এক বিচিত্র রহস্য।...বস্তুত এই ভাঙ্গন প্রতিপদে জীবন গঠনের জন্যই। আদেশ পালনে সফলতায় মনে জাগে দম্ভ; অমনি

গুরুকৃপায় শুরু হয় শাস্তি ও অবদমন। ব্যর্থ নিরাশায় তখন স্বীকার করিতে হয় শ্রীগুরুর সর্বময় কর্তৃত্ব,…আর অশ্রুধারায় বিগলিত হয় দম্ভ ও অভিমান। শ্রীগুরুর উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলিবে এই দম্ভ ও তাহার দণ্ড—গুরু-শিষ্যের মাঝে ইহা যেন এক অপূর্ব দেবাসুর সংগ্রাম!

স্বয়ং মহেশ্বর বলিয়াছেন: 'মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং'—গুরুবাক্য সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের মূল। ব্যাখ্যা, যুক্তি ও বুদ্ধির অপচেষ্টা অনর্থের হেতু—গুরুবাক্য গুরুশক্তির প্রকৃত বাহক। অতএব সর্বান্তঃকরণে শুধু গুরুআদেশ পালন করিলে তাঁহার সহিত স্থাপিত হইবে পূর্ণ যোগাযোগ। সেই গুরুবাক্যের সার: গুরুই ভগবান। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করিলে গুরুর মাধ্যমে বিকশিত হইবে ভগবানের অনন্ত রূপ ও বিভূতি।…সদাশিব আরো বলিয়াছেন: 'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তি'। নামজপে নিমগ্ন হইয়া কুলদানন্দের অন্তরেও প্রতিভাত হইয়াছে শ্রীগুরুমূর্তি—তাই তিনি ধ্যান করেন সদ্‌গুরুর সচ্চিদানন্দ রূপ। গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ মন্তব্য করেন: তুমি কল্পনার উপাসনা কর।…এ বিষয়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলেন। জানিলেন: অগ্নি সর্বত্র বিদ্যমান—তবু চুল্লী, প্রদীপ প্রভৃতি হইতে তাহা গ্রহণ করা বিধেয়। তেমনি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও বিশেষ আধারে তাঁহার উপাসনা প্রয়োজন। অতএব ভগবৎ-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুর সেবাপূজা ও আদেশ পালন ভগবৎ দর্শনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।…

এইরূপ ধারণার পর প্রার্থনা জানাইলেন কুলদানন্দ: ঠাকুর—দয়া করে সুমতি দেও, সংশয় দূর কর। তোমার আদেশ সাধ্যমত যেন পালন করবার চেষ্টা করি। যদি লোকালয় এমনকি তোমার সঙ্গ ছেড়েও পাহাড়-পর্বতে যেতে হয়, তবুও যেন পিছিয়ে না পড়ি।…

এইভাবে অধোমুখী স্রোত ভিন্নমুখী হইল। পুনরায় উচ্ছ্বসিত হইল পরিপূর্ণ প্রাণের জোয়ার।…

মধ্যাহ্নে আম্রবৃক্ষ-তলে গোসাঁইজী ধ্যানমগ্ন। ভাগবত পাঠ অন্তে নিকটে বসিয়া নামজপ করেন কুলদানন্দ। অন্তরে মূর্ত হইয়া ওঠে ঠাকুরের মনোহর মূর্তি। নাম চলে মহানন্দে—নানাবিধ চক্রের ভিতর লক্ষিত হয় প্রোজ্জ্বল শুভ্রজ্যোতি। দৃষ্টিসাধনের ক্রম ও প্রণালী জানিতে চাহিলে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন গোসাঁইজী।

আসন-কুটীরের দেওয়ালে তিনি স্বহস্তে লিখিয়াছেন: এইসা দিন নেহি রহেগা।…তাহা লক্ষ্য করিয়া কুলদানন্দের মনে হয়: গুরুরূপে অবতীর্ণ

ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেও চিনতে পারলাম কই? এই শুভদিন তবে কি আর অচিরে ভাগ্যে জুটবে না?…তাহলে সময় থাকতে প্রাণভরে তাঁকে দেখে নিই। ভাবিতেই অস্থির হইয়া ওঠে সারা অন্তর, অশ্রুপূর্ণ চক্ষে প্রার্থনা করেন: ঠাকুর! তোমার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা দেও। আর অবিচ্ছেদে যেন তোমার চিরমধুর সঙ্গলাভ করি—দয়া করে শুধু এই আশা পূর্ণ কর।…

প্রাতঃকাল। কুলদানন্দ স্থিরভাবে উপবিষ্ট। মুদিত নয়নে তিনি যেন উধাও কোন্ সুদূর ঊর্ধলোকে।

সহসা শ্রীধর আসিয়া হোমাগ্নিতে ঢালিয়া দিলেন বোতলের ঘৃতটুকু। লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। চক্ষু মেলিতেই ব্যস্তভাবে ধরিয়া ফেলিলেন ঘৃতের বোতলটা, কিন্তু পনের দিনের হোমের ঘৃত নিঃশেষ হইয়াছে ততক্ষণে।… নিমেষে উত্তেজিত হইয়া খুব তিরস্কার করিলেন; কিন্তু দু-একটি কথার পর শ্রীধর নয়ন মুদিয়া বসিলেন দিব্য নির্বিকারে।

এই উপেক্ষায় ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল—প্রহারের ভঙ্গিতে হাতনাড়া দিলেন কুলদানন্দ। অমনি হাতখানি দোয়াতে লাগায় খানিকটা কালি পড়িল শ্রীমদ্-ভাগবতের উপর!…সচেতন হইয়া প্রমাদ গণিলেন—গামছা দিয়া ঐ কালি তুলিবার চেষ্টা করিলেন যথাসাধ্য; তবু ভাগবতের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।…

বেলা একটায় নিত্যপাঠের সময় গুরুসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ভাগবতের দিকে চাহিতেই বলিয়া উঠিলেন গোসাঁইজী: ওকি!—

সংকুচিত হইয়া উত্তর দিলেন কুলদানন্দ: হঠাৎ দোয়াতে হাত লাগায় কালি পড়ে গেছে।…

: ভাগবতে কালির দাগ!

সভয়ে নীরব রহিলেন কুলদানন্দ।…সবই তো অন্তর্যামী গুরুদেবের নখদর্পণে। ধীরে ধীরে পাঠ আরম্ভ করিলেন। পরে হাওয়া করিতে লাগিলেন।

কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত হইলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে কাহার কী বিঘ্ন প্রকাশ করিলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দ সম্পর্কে বলিলেন: এর একটু প্রতিষ্ঠার ভাব আছে - নইলে খুব সুন্দর অবস্থা লাভ হ'ত।…

দারুণ লজ্জিত হইলেন কুলদানন্দ। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলেন: এই প্রতিষ্ঠার ভাব কিসে নষ্ট হবে?

ঃ শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর—সমস্ত দোষ কেটে যাবে। প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা! প্রতিষ্ঠার ভাব একটা রোগ—একথা সর্বদা মনে রাখবে।

পরক্ষণে বলিলেন ঃ তুমি পশ্চিমে গিয়ে কিছুকাল থাক না—উপকার পাবে।

অপলকে তাকাইলেন কুলদানন্দ। পুনরায় গুরুদেবের চিরকাম্য, চির মধুর, সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে?…কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন ঃ আপনার সঙ্গ ছেড়ে কোথাও থাকতে আমার ইচ্ছে হয় না। স্বামী হরিমোহনের মত বার বার যাওয়া-আসা—সে বৈরাগ্যে লাভ কী!…

বিরক্তভাবে ধমক দিলেন গোসাঁইজী ঃ স্বামীজিকে সামান্য মনে করো না। তোমাকেও তাঁর মত অনেকবার যাওয়া-আসা করতে হবে। বৈরাগ্য লাভের অবস্থা পেতে ঢের দেরী।…ভাগবত দেখাইয়া বলিলেন ঃ এই কালির দাগ তুলতে বহুকাল যাবে। এখনও হয়েছে কী!…

লজ্জায়, ভয়ে ও দুঃখে নীরব রহিলেন কুলদানন্দ। ভাগবতের ঐ মসীচিহ্ন যে তাঁহারই কলঙ্ক-কালিমা।…মনের কালি ঘুচাতে তবে কি অনেক বাকি?…

গোসাঁইজী বলিতে লাগিলেন ঃ প্রতিটী বস্তু গ্রহণ, রক্ষা ও ত্যাগে সর্বদা বিচার চাই। ভগবৎ উদ্দেশে না হলে যাই হক না কেন, দূরে ফেলে দেবে। আর তাঁর উদ্দেশে রাখলে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হলেও কিছুতেই তা ত্যাগ করবে না।… জটা, মালা, তিলকাদি ধর্মের উদ্দেশ্যে রাখলেও যদি অভিমান ও প্রতিষ্ঠার হেতু হয়, তৎক্ষণাৎ দূর করে দেবে।··ধর্মের অভিমান বড় ভয়ানক! অন্য অপরাধের পার আছে—কিন্তু ধর্মের অভিমানের পার নেই। খুব সাবধান!…

কুলদানন্দ তেমনই নীরব। অন্তরে সহসা যেন শুরু হইল কাল বৈশাখী! সারা অন্তর মাথা কুটিতে লাগিল গুরুদেবের রাতুল চরণে।…

সেই আবেগ প্রতিহত হইল গোসাঁইজীর হৃদয়দ্বারে। সন্তানকে শান্ত ও সংযত হইবার অবসর দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সস্নেহে বলিলেন ঃ এখন পশ্চিমে গিয়ে সাধন কর—কাশী বা চিত্রকূটে থাকতে পার। দু-চার মাস এক এক স্থানে থেকে সাধনভজন করবে।

এবার অস্ফুটে বলিলেন কুলদানন্দ ঃ আমার ভালর জন্যে যেখানে যেতে বলবেন যাব। তবে আমার আপনার কাছে থাকতে ইচ্ছে হয়—আর মনে হয় তাতেই বেশী উপকার।

ঃ কিছু নয়—এখন দূরে থাকলে তোমার বরং বেশী উপকার হবে। নিকটে দূরে কিছু নয়।…

কুলদানন্দের স্মরণ হইল বস্তি ও ভাগলপুরের কথা। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া তখন অবিচ্ছেদে লাভ করিয়াছেন চিরমধুর সঙ্গ। ঠাকুরের কথায় এখনও সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট এবং তাঁহার নির্দেশ সর্বদা পরম কল্যাণকর। অতএব গুরুআদেশ অনুযায়ী পশ্চিমে যাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

তবু গুরুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনায় প্রাণে সঞ্চিত হইল নিদারুণ বেদনা। এতকাল নিত্যসঙ্গে রাখিয়া ঠাকুর কি এবার নির্বাসন দিবেন? পরদিন নিত্যক্রিয়া অন্তে পড়িয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। মধ্যাহ্নে গুরুদেবের নিকট এক অধ্যায়ের বেশী ভাগবত পাঠ করিতে পারিলেন না। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় অন্তরে উঠিল আকুল ক্রন্দন।...

ধ্যানমগ্ন গোসাঁইজী চক্ষু মেলিয়া সস্নেহে বলিলেন : ভাগবতখানা দেও তো—

ভাগবতের সেই মসীচিহ্নের দিকে অপলকে চাহিয়া বলিলেন : দেখেছ—কী সুন্দর! কাল তো এমনটী দেখিনি। চমৎকার একটী পাহাড়ের চিত্র—নীচে নদী, আর শৃঙ্গে সুন্দর একটা মন্দির।...

ভাগবতের উপর মসীচিহ্ন এ পর্যন্ত ছিল শুধু কলঙ্কের স্বাক্ষর। এ চিহ্ন তুলিতে বহুকাল যাইবে—গুরুদেবের এই কথায় আরো ম্রিয়মান হইয়াছিলেন কুলদানন্দ। সেই কলঙ্কের পঙ্কে অকস্মাৎ প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল—মসীরেখায় রূপায়িত গিরিচূড়ায় সুন্দর দেবালয়। শিষ্যের ক্লেশ ও কলঙ্ক ঘুচাইতে সদ্‌গুরুর কী মধুর লীলা!...

মুগ্ধ কুলদানন্দকে বলিলেন গোসাঁইজী : এমনি পাহাড় যেখানে দেখবে, সেখানে আসন করবে।

অসংখ্য পাহাড় ভারতবর্ষে। কতকাল ঘুরিলে তবে মিলিবে এই পাহাড়ের সন্ধান?....গুরুভ্রাতাদের অনেক সাধ্য-সাধনায় গোসাঁইজী বলিলেন : হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়। সেখানে ওকে যেতে হবে বলে এই চিত্র পড়েছে।...দেখ—কোন্ সূত্রে কী হয়।...

অদ্‌ভূত সূত্রই বটে—মসীচিহ্নের কী আশ্চর্য পরিণতি!...বিস্ময়ের অবধি নাই কুলদানন্দের। ইহা গুরুআদেশ, তাঁহার বিচিত্র বিধান। ভাবিয়া মনোকষ্ট দূর হইল, চণ্ডীপাহাড়ে যাইবার জন্য উৎসাহ বোধ করিলেন।

গোসাঁইজী বলিলেন : এখনও সেখানে শীত—এই মাসের পরে যেয়ো।

মাতৃদেবীর অনুমতির জন্য তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন গোসাঁইজী।

বাড়ী গিয়া মায়ের অনুমতি চাহিলেন। পাহাড়-পর্বতে কী করিয়া একাকী

থাকিবেন ভাবিয়া প্রথমে হরসুন্দরীর দুশ্চিন্তা হইল। কুলদানন্দ বলিলেন: ঠাকুর সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবেন।...আমার সমস্ত ব্যবস্থা গোসাঁই সেখানে করে রেখেছেন। পাহাড়ে আমার কোন কষ্ট হবে না।...

যখন গুরুবাক্য, যাইতেই হইবে। সম্মতি দিয়া বলিলেন জননী: গোসাঁই যেমন বলেন, তেমনি চল। আশীর্বাদ করি, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। মাঝে মাঝে আমাকে পত্র লিখিস।

মায়ের অনুমতি পাইয়া ঢাকা রওনা হইলেন কুলদানন্দ। বাড়ীতে উঠিল ক্রন্দনের রোল। ধর্মপরায়ণা হরসুন্দরী অন্ধ স্নেহবশে বিচলিত হইলেন না। বুকের ধনকে যে সঁপিয়া দিয়াছেন গোসাঁইজীর হাতে। তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া সকলকে তিনি শান্ত করিলেন। বলিলেন: যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলতে নেই—অমঙ্গল হয়।...

জননী গর্বে নিজেকে ধন্য মনে করিলেন কুলদানন্দ। সানন্দে, নিশ্চিন্ত মনে ঢাকায় পৌছিলেন।...

আশ্রমে মহানন্দে মদনোৎসব পালিত হইল। পরদিন দীক্ষালাভ করিলেন কুলদানন্দের বৈমাত্র ভ্রাতা সজনীকান্ত এবং ভাগলপুরের মহাবিষ্ণু যতী।

মধ্যাহ্নে ভাগবত পাঠের পর গোসাঁইজীর নিকট বসিয়া আছেন কুলদানন্দ। মহাবিষ্ণু বাবু উপস্থিত হইলেন। দীক্ষিত হইলেও ব্রাহ্মণ সন্তানেরা আজকাল সন্ধ্যা করে না বলিয়া অভিযোগ করিলেন। কুলদানন্দকে বলিলেন: কি ব্রহ্মচারি! তুমি সন্ধ্যা কর না কেন?

গুরুদেবের সম্মুখে এমনি অভিযোগে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হইলেন কুলদানন্দ। পরে বলিলেন: সন্ধ্যা করিনে কী রকম? সন্ধ্যা তো মন্ত্র, তার মূল সদ্‌গুরুর বাক্য—ঠাকুরের আদেশ মতই তো চলতে চেষ্টা কচ্ছি।

গোসাঁইজী বলিলেন: সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম, অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যহ সন্ধ্যা ক'র।

আব্‌দারের সুরে বলিলেন কুলদানন্দ: সন্ধ্যা-টন্ধ্যা আমি করতে পারব না। যা বলে দিয়েছেন, তাই পারিনে—আবার সন্ধ্যা!···গায়ত্রী জপেই তো সব হয়।

: না, শুধু গায়ত্রী জপে ঠিক হয় না। সন্ধ্যা করলে ইষ্টনাম জপ করার মত উপকার হবে। সাধনে যে শীঘ্র তেমন উপকার হয় না, তার কারণ ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য সন্ধ্যার প্রয়োজন আছে।...

অগত্যা গুরুদেবের আদেশ মত সন্ধ্যা করিবার স্থির করিলেন। বলিলেন : আমি ইষ্টদেবতার রূপ অন্তরে রেখে সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করব।···

: তাই ক'রো—ওতেই হবে।

শালগ্রাম পূজার কথা মনে পড়িল কুলদানন্দের। লক্ষণযুক্ত শালগ্রাম মিলিলে গায়ত্রীজপে অভিষিক্ত করিয়া প্রণালী মত পূজা করিতে বলিলেন গোসাঁইজী। ছোট কণ্ঠ-শালগ্রাম সর্বদা সঙ্গে রাখিবার নির্দেশ দিলেন।

সর্ব বিষয়ে গোসাঁইজীর নির্দেশ জানিয়া লইলেন কুলদানন্দ। অবিলম্বে চণ্ডীপাহাড় যাইতে মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দুইদিন পরে হরিদ্বার রওনা হইবার সংকল্প করিলেন। স্বপ্ন দেখিলেন : যেন পাহাড়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়া গুরুদেবের চরণে বিদায়-নমস্কার করিলেন। আর তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে একটী কবচ পরাইয়া দিয়া বলিলেন গুরুদেব—তোমাকে এই অভয় কবচ দিচ্ছি ; পাহাড়-পর্বতে যেখানে ইচ্ছা গিয়ে থাক, আর ভয় নেই।

স্বপ্নের কথা শুনিয়া খুব খুশী হইলেন গোসাঁইজী। সানন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন : স্বচ্ছন্দে চ'লে যাও, কোন ভয় নেই।

পরদিন অনুক্ষণ গুরুদেবের নিকটে বসিয়া রহিলেন। আর ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ, সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন গোসাঁইজী। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় দুই চক্ষে বহিল অবিরল অশ্রুধারা। আজ শেষরাত্রে যাত্রা করিতে হইবে—ছাড়িয়া যাইতে হইবে গুরুদেবের পবিত্র-মধুর সঙ্গ।···

শেষরাত্রে লুটাইয়া পড়িলেন গুরুদেবের শ্রীচরণে। অশ্রুজলে ধৌত করিলেন চরণকমল।···তাঁহার অক্ষয় আশীর্বাদ পাথেয় করিয়া রওনা হইলেন হরিদ্বার।···

॥ আঠারো ॥

গুরুদেবের আদেশে মাত্র গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাইবার খরচ লইয়াছেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বলিয়াছেন—কোন ভয় নাই, সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।...গুরুদেবের আশীর্বাদ তাঁহার একমাত্র ভরসা।

সন্ধ্যার পর পৌছিলেন গোয়ালন্দ। রিক্ত হস্ত, কোথায় যাইবেন স্থিরতা নাই। ষ্টেশনের অদূরে একটী বৃক্ষতলে আসন করিয়া বসিলেন। রাত্র নয়টায় আসিল এক হিন্দুস্থানী সিপাই—চোর মনে করিয়া লইয়া গেল কুলী ডিপোয়। নামধাম জিজ্ঞাসার পর একটী বাবু বাড়ী লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিলেন : একি—দাদা!...

পিস্‌তুতো ভগিনীর দেখা মিলিল ঠাকুরের কৃপায়। সানন্দে আহার ও বিশ্রাম করিলেন কুলদানন্দ। পরদিন ভগ্নিপতি কলিকাতা যাইবার টিকিট করিয়া দিলেন। কলিকাতায় উঠিলেন ভাগিনেয়র বাসায়। তিন-চার দিন কাটিল বেশ আনন্দে।

বাবা তারকনাথের দর্শন মানসে রওনা হইলেন। তারকেশ্বর ষ্টেশনে পৌছিলে ষ্টেশন মাষ্টার কথাবার্তার পর আহার-নিদ্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সকালে উঠিয়া মন্দিরে গেলে ঠাকুরের আরতি দর্শন হইল। স্নান-তর্পণের পর জল ও বিল্বপত্রে ৺তারকনাথের পূজা করিলেন মনের সাধে। একটি ভদ্রলোক আহারের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার বৈদ্যনাথ যাইবার অভিপ্রায় জানিয়া ষ্টেশন মাষ্টার টিকিট করিয়া দিলেন।

রাণীগঞ্জে আছেন এক গুরুভ্রাতা। সেখানে গেলে হরিদ্বার যাইবার উপায় হইবে ভাবিয়া রাণীগঞ্জে নামিলেন—এক ক্রোশ পথ হাটিয়া বহুকষ্টে পৌছিলেন তাঁহার বাড়ী। কিন্তু গুরুভ্রাতা নাই—এদিকে ষ্টেশনে যাইবার উপায় কী? শেষে গোমস্তা খুব আদরযত্ন করিলেন। পরদিন সকালে নিত্যক্রিয়ার সময় অনেকে কিছু কিছু প্রণামীও দিলেন। দেখিলেন ঠাকুর গয়া পর্যন্ত যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

গয়া পৌছিলেন সকাল নয়টায়। গুরুভ্রাতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার বাসার সন্ধান করিয়া হয়রাণ হইলেন। সহসা এক ভদ্রলোক তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, হোমাদিরও যোগাড় হইল। গয়াতে যে

কয়দিন থাকিবেন, এখানে আসন রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সকলের আন্তরিক আদর-যত্নে মুগ্ধ হইলেন কুলদানন্দ। নিরুপায় অবস্থার মাঝেও প্রতি পদে ঠাকুরের কেমন আশ্চর্য সুব্যবস্থা।...

অপরাহ্নে গেলেন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে। সিদ্ধ রঘুবর বাবাজীর দর্শনলাভ করিয়া প্রণাম করিলেন। পরিচয় পাইয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন বাবাজী। এই পুণ্যতীর্থেই অলৌকিকভাবে দীক্ষিত হন গোস্বামী প্রভু। এগার দিন, এগার রাত্রি অবিচ্ছেদে চলে তাঁহার ভাব-সমাধি। নিকটস্থ একটী স্থানে তিনি অনেক দিন সাধনভজনে অতিবাহিত করেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পরমতীর্থ দর্শন করিলেন কুলদানন্দ। বহুক্ষণ নামযোগে বসিয়া রহিলেন অভিভূত ভাবে।...অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি বাবাজীর সহিত দর্শন করিলেন। বাবাজী এখানে থাকিয়া সাধনভজন করিতে বলিলে কুলদানন্দ জানাইলেন, গুরুদেবের আদেশে তাঁহাকে যাইতে হইবে হরিদ্বার।

রওনা হইবার সময় বাবাজীর নিকট তিনি চাহিলেন একটী সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম। নখপরিমিত সর্পাঙ্কিত একটী শিলাচক্র দেখাইয়া বলিলেন বাবাজী: এটী বড় উৎকৃষ্ট চক্র। নেপালের নরসিংহ নদী থেকে নিজে আমি এনেছিলাম। দুর্লভ বস্তু ব'লে এতকাল গোপনে রেখেছি। ইচ্ছে হ'লে নিতে পার।

কালো কষ্টিপাথরের উপর সুনিপুণ কারিগরের দ্বারা অঙ্কিত সর্পাকৃতি। বাবাজীর কথায় সাদরে শিলাটী গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন গুরুভ্রাতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন: ফল্গুতে জল এসেছে। চলুন, স্নান করে আসি।

অন্তঃসলীলা ফল্গুনদী। উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে একটু খুঁড়িতেই পাওয়া যায় সুশীতল জলধারা। মহাপুরুষের অন্তর যেন—বাহিরে 'বজ্রাদপি কঠোরানি' অন্তরে 'কোমলানি কুসুমাদপি'।...বিধাতার সৃষ্টিতে চির বিস্ময়, চির মনোরম।

সেই নদীতে স্নান করিতে গেলেন কুলদানন্দ। শীতল জলে বহুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া স্নান ও তর্পণ করিলেন। তিন মুষ্টি বালি লইয়া প্রদান করিলেন পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে। তাঁহাদের কল্যাণার্থে বিষ্ণুপদে যাইয়া পূজা করিলেন। অন্তরে লাভ করিলেন গভীর তৃপ্তি।

অপরাহ্নে মুন্সেফ্, সাবজজ প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রমহোদয় দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ধর্ম আলোচনায় দিন কাটিল।

ফল্গুতে বহুক্ষণ স্নান করায় শরীর অসুস্থ বোধ হইল। তবু মনোরঞ্জন বাবুর সহিত রওনা হইলেন বুদ্ধ-গয়ায়। পথে তাঁহার জ্বর হইল—কোনরকমে বুদ্ধ-গয়ার মন্দির দর্শন করিয়া গিয়া বসিলেন বোধিদ্রুম তলে। একান্ত মনে স্মরণ করিলেন ভগবান বুদ্ধদেবকে। গভীর শ্রদ্ধাভরে দর্শন করিলেন নূতন মন্দিরে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত মূর্তি।

ফিরিয়া প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইলে বাবুরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। পাঁচ-সাত দিনে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আরায় কুঞ্জবাবুর নিকট যাইতে ব্যস্ত হইলে বাবুরা টিকিট করিয়া দিলেন। কুঞ্জবাবুর নিকটে কয়েক দিন কাটিল; কিন্তু শরীর ভাল হইল না। তখন কাশী যাইবার সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট হয়ত পছন্দ মত শালগ্রাম মিলিবে। কিন্তু দুর্বল শরীরে বস্তিতে দাদার নিকট যাইতে বলিলেন কুঞ্জবাবু। তাঁহার কথায় সম্মত হইলে কুঞ্জবাবু টিকিট কাটিয়া দিলেন।

পরদিন সকালে পৌছিলেন বস্তিতে। দাদাকে দেখিয়া অবাক হইলেন কুলদানন্দ। সাত্ত্বিক বৈষ্ণবের মত উজ্জ্বল তাপস মূর্তি।···সশ্রদ্ধায় তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন; কিন্তু হরকান্ত পদস্পর্শ করিতে দিলেন না। তাঁহার সস্নেহ, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণ জুড়াইয়া গেল।

গতবারে যে ঘরে ছিলেন সেখানে আসন করিলেন। নিত্যক্রিয়া চলিল ঠিক নিয়ম মত। ভোর হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত বিভোর হইয়া থাকেন গুরুদেবের নামে ও ধ্যানে। বার বার মনে হইতে থাকে: কবে নির্জন পাহাড়ে গিয়ে দিনরাত ঠাকুরের মনোহর রূপের ধ্যানে ডুবে থাকব? কবে ঠাকুর আমার চারিদিক শূন্য ক'রে তাঁর চিরশান্তিময় শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন?···

কিন্তু দাদার ইচ্ছায় কয়েক দিন থাকিতে হইল। দুর্বল শরীরে ভিক্ষা বন্ধ হইল। হরকান্তের যত্নে ও ঔষধ-পথ্যে ছয়-সাত দিনে শরীরও সুস্থ হইল। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে একটী তুলার আলখিল্লা তৈরী করিয়া দিলেন হরকান্ত। আরও দিলেন কন্দমূল খুঁড়িবার জন্য একখানা বড় চিমটা, আর শালগ্রাম রাখিবার জন্য সুন্দর একটী রূপার কৌটা।

রঘুবর বাবাজীর শৈব-চক্রটির পূজা আরম্ভ করিলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী নিত্য ত্রিসন্ধ্যাও আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাপাঠ কালে চক্ষে ভাসে গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের সুস্পষ্ট ছবি, মনে প্রাণে দেখা দেয় অব্যক্ত আনন্দ। সারা দিন কাটিয়া যায় যেন শ্রীগুরুর উপাসনায়।···

হরকান্তের নিকট জানিলেন এই বস্তি সহরই নাকি প্রাচীন কপিলাবস্তু, গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি। ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধারকল্পে সর্বত্যাগী রাজপুত্র গহন অরণ্যে ব্রতী হইলেন কঠোর তপস্যায়—যোগাভ্যাস করিলেন বিভিন্ন প্রণালীতে। নির্বাণলাভের অভিনব পন্থা উদ্‌ভাবন করিয়া প্রচার করিলেন সারা জগতে। সেই সত্য, প্রেম ও অহিংসার পথে যুগে যুগে মানুষ চলিয়াছে মুক্তি সাধনায়।…

গোসাঁইজী যে সাধন প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধ-সাধনের সহিত অনেকাংশে তাহা একমত। বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণালীতে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাধন করাই প্রশস্ত। অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা নির্জনে পদ্মাসনে বসিয়া চলিবে এই সাধন। সর্বসংস্কার নির্মূল করিবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে 'অনিত্য দুঃখ, অনাত্মা' বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। তখন দেখা দিবে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, অবশেষে নির্বাণ।…

নাম করিতে করিতে ধ্যানের চরম অবস্থায় মনে হয়—শ্বাসপ্রশ্বাসই নাম, নামই শ্বাসপ্রশ্বাস। তখন নাম চলে আপন গতিতে—সাধক তখন মাত্র নীরব দর্শক, নিশ্চেষ্ট সাক্ষ্য। আর্য ঋষিরা ইহাকেই বলিয়াছেন 'অবাঙ-মনসগোচর' অর্থাৎ ইহা বাক্য ও মনের অতীত। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন ইহা 'অচিন্তেয়ানি ও অচিন্তিতব্যানি'—অর্থাৎ ইহা চিন্তাতীত।…

মনোরঞ্জন বাবুর স্ত্রী মনোরমা দেবী দিবারাত্র সমাধিস্থ থাকিতেন। এ-বিষয়ে গোসাঁইজী বলেন: মাত্র নামানন্দে মগ্ন আছেন, এখনও হয়েছে কী? আস্তিক্য বুদ্ধিই জন্মে নাই।…

ভাবাভাব রহিত শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া চাই—তবেই দেখা দিবে প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ। তাহার পূর্বে তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা বাতুলের প্রলাপ।… এজন্য ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে বুদ্ধদেব নিরুত্তর থাকিতেন। জিজ্ঞাসুকে উপদেশ দিতেন সাধন-পথে অগ্রসর হইতে, লক্ষ্যস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে।…

সাধক জীবনে কুলদানন্দ আলোচনা করিয়াছেন অজস্র প্রশ্ন, বহু তত্ত্ব। আর গোসাঁইজী সর্বদা বলিয়াছেন: শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর—সমস্ত অবস্থা তাতেই লাভ হবে।…কী অবস্থা লাভ হইবে, নামের প্রতিপাদ্য বস্তুই বা কী—সে সম্পর্কে কোন ধারণা করিতে উপদেশ দেন নাই। শুধু বলিয়াছেন—শ্বাস-প্রশ্বাসে মনঃসংযোগ করিয়া অবিরাম চাই নাম-সাধন।…ফলে উর্বর সাধনক্ষেত্রে গুরুশক্তির বীজ অংকুরিত হইবে, ক্রমে সুশোভিত হইবে ফুলে-ফলে। নানক,

কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাধন জীবন ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন নির্বাণলাভের ইহাই একমাত্র পন্থা।...

কুলদানন্দের মনে পড়িল কিছুদিন পূর্বেও গোসাঁইজীর উপদেশঃ একমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ, সমস্ত সংশয় নষ্ট হবে। তখন বিশ্বাস আপনা হতে আসবে।

গুরুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিলেন সেই মহাবাণী। বুঝিলেন সর্ব সংস্কার ও সংশয় দূর করিতে হইবে। চাই না কোন প্রশ্ন, কোন তত্বজিজ্ঞাসা। স্থানে-অস্থানে, সম্পদে-বিপদে, ব্যসনে-বিপর্যয়ে, স্বর্গে-নরকে অহোরাত্র, অবিরাম চাই শুধু নাম, আর নাম—প্রতি পদে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—এছাড়া অন্য কোন পথ নাই ধর্মজীবনে।...

বৈশাখ ১৩০০ সাল। বস্তিতে দাদার সঙ্গে কাটিল প্রায় তিন সপ্তাহ। শরীর সুস্থ হওয়ায় অযোধ্যায় রওনা হইলেন কুলদানন্দ। প্রত্যূষে সরযূতীরে লকরমণ্ডি ঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নান-তর্পণ করিলেন। পরে 'জয় রাম, জয় রাম' বলিয়া প্রবেশ করিলেন অযোধ্যায়।

মহাতীর্থ অযোধ্যা। সুর-মুনিবন্দিত কত ঋষির নিত্যধাম। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকৃত লীলাভূমি। জনাকীর্ণ শহর নীরব, নিস্তব্ধ। পথেঘাটে, দোকানে-বাজারে ভদ্র-অভদ্র সকলের মুখে শুধু রাম নাম—'জয় সীতারাম'।...এই অপূর্ব ভাবে তিনি মুগ্ধ হইলেন। ইহলোকে, পরলোকে মহাপুরুষদের চরণোদ্দেশে জানাইলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ভক্তরাজ মহাবীরের আবাসভূমি 'হনুমান গৌড়ি'। গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন, পর্বে পর্বে সেখানে আসেন হনুমান, বিভীষণ, অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি ঋষিগণ। প্রাণের টানে সেখানে গেলেন কুলদানন্দ। ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু অবস্থায় এখানে আসিয়াছিলেন গোসাঁইজী—মহাবীরকে দর্শন করিয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। ভাবিতেই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল। মহাবীরকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেনঃ ভক্তরাজ! আশীর্বাদ করুন যেন দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবার অধিকারী হ'তে পারি।...

অযোধ্যা হইতে গেলেন ফয়জাবাদ। সাদর আলিঙ্গন দিলেন দাদার বন্ধু জালিম সিং। লক্ষণযুক্ত শালগ্রাম সংগ্রহের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। দাদার বন্ধুর লইয়া গেলেন বড় বড় মন্দির ও আশ্রমে। শত সহস্র শালগ্রাম দেখিলেন,

কিন্তু পছন্দ হইল না একটীও। ভজনানন্দী এক বৃদ্ধ মহান্ত একটী শিলাচক্র দিয়া বলিলেন: আপনি গ্রহণ করুন। এর নাম হিরণ্যগর্ভ, বহুকাল এই মন্দিরে শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে এঁর পূজা হ'য়ে আসছে। ...গুরুদেবের অভ্রান্ত বাক্য—সুন্দর শালগ্রাম নিশ্চয় জুটবে।...যতদিন না জোটে পূজা করিবার জন্য সেইটী গ্রহণ করিলেন কুলদানন্দ।

ফয়জাবাদের পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তার ঘাট। সরযূতীরে প্রস্তর নির্মিত বড় সুন্দর স্থান। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামসীতা বিগ্রহ। এখানে অবসান হয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মর্তলীলা। সর্বনিয়ন্তা হইলেও তিনি নিয়তিকে অতিক্রম করেন নাই। সংসারে আবদ্ধ হইয়া ভোগ করিলেন অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা; অবশেষে চিরতরে অদৃশ্য হইলেন এই সরযূর অতল তলে।...ভাবিয়া ক্রন্দনের আবেগে কুলদানন্দের অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল—শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। পরে জালিম সিংহের সহিত ফিরিয়া আসিলেন।

শেষরাত্রে মায়ের সম্বন্ধে একটী অশুভ স্বপ্ন দেখিলেন। ফয়জাবাদে আর এক মুহূর্তও মন টিকিল না—অস্থির প্রাণে রওনা হইলেন হরিদ্বার।

পরদিন প্রত্যুষে লাক্‌সার ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিলেন। দু-এক ষ্টেশন অগ্রসর হইলে নজরে পড়িল হরিদ্বারের পাহাড়। এই পাহাড়ে নাকি ভাব-বিহ্বল হইয়া বিচরণ করেন দেবাদিদেব মহাদেব। আর তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন পরমারাধ্যা পার্বতী। সদ্‌গুরুরূপী মহাদেবকে স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন কুলদানন্দ।

জ্বালাপুর পৌছিয়া স্পষ্ট দেখা গেল নীল পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গগুলি। উহাতে দেখিলেন অসংখ্য শ্বেত ও নীল জ্যোতির ঝিকিমিকি। অবশেষে হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। স্বচ্ছভূমি হইতে ফুটিয়া উঠিল হেমাভ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিম্ব। ভগবতীর অনুপম রূপের ছটা মনে করিয়া বারংবার প্রণাম করিলেন। প্রফুল্ল চিত্তে উপস্থিত হইলেন গঙ্গাতীরে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে। স্নানাহ্নিক অন্তে একখানি কুটীরে বসিয়া স্থিরভাবে নিমগ্ন হইলেন নামজপে।

বেলা প্রায় দুইটা। কনখলে রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমের দিকে চলিলেন। প্রখর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত ধুলাবালির উপর দিয়া নগ্নপদে চলিয়া অত্যন্ত ক্লেশবোধ করিলেন। রামপ্রকাশ মহান্তের নিকট পৌছিয়া এখানে আসিবার উদ্দেশ্য জানাইলেন তাঁহাকে। মহান্ত খুব আদর-যত্ন করিলেন।

দোতলায় উঠিবার পথে এক ঝাঁক মৌমাছি সহসা ঘিরিয়া ধরিল। মহান্ত ও তাঁহার শিষ্য কুলদানন্দকে ধাক্কা দিয়া উপরে উঠিলেন। অসংখ্য মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। নিরুপায়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া স্মরণ করিলেন গুরুদেবকে। একটু পরে উপরে উঠিয়া দেখিলেন মহান্ত ও শিষ্য মৌমাছির কামড়ে ছটফট করিতেছেন; অথচ হাতের চাপের একটি মাত্র মৌমাছি কামড়াইয়াছে তাঁহাকে। বুঝিলেন, ইহা গুরুদেবের কৃপা—মহান্ত ভাবিলেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ। মহান্তের আদর-যত্ন বৃদ্ধি পাইল।

মহান্তজীর একটী শিষ্যকে লইয়া রওনা হইলেন চণ্ডীপাহাড়। কনখল ও হরিদ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়া দেখিলেন গঙ্গার উপর একটী পুল। সরকারী ব্যবস্থায় গঙ্গাবক্ষে বসিয়াছে লৌহ কপাট। গঙ্গার বন্ধন দশা দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন, কোনদিন কিছুমাত্র যোগৈশ্চর্য লাভ করিলে সর্বপ্রথমে যেন মায়ের এই বন্ধন জ্বালা ঘুচাইতে পারেন।

দাম পার হইয়া দেখিলেন রাস্তার বামপার্শ্বে গঙ্গার উপরে সুন্দর একটী আশ্রম। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে আত্মানন্দ নামে এক সাধুর পর্ণকুটীর। এই স্থানের সৌন্দর্য অপূর্ব। আশ্রমের নীচে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত স্বচ্ছসলিলা পতিতপাবনী গঙ্গা। গঙ্গার পাড়ে মায়াপুরী হরিদ্বার, পশ্চাতে মনোরম বিল্বকেশ্বর পাহাড়। উত্তরে গঙ্গার বিস্তৃত চড়া, পরে হিমালয়ের গগনচুম্বী পর্বতমালা। পূর্বদিকে গঙ্গার নির্মল, নীল পূতধারা উপরে নীল সরস্বতীর আবির্ভাব স্থলে শোভিত নীল পর্বতের উচ্চ চূড়ারাজি; ইহার সর্বোচ্চ চূড়ায় শ্রীচণ্ডী প্রতিষ্ঠিতা। এইজন্যই ইহার নাম 'চণ্ডী পাহাড়'।

ভাগবত গ্রন্থে পাহাড়ের যে চিত্র ফুটিয়াছিল, এই স্থানের দৃশ্য অবিকল সেই প্রকার। পাহাড়ের অপরূপ শোভা দর্শনে চিত্তে প্রতিভাত হইল গুরুদেবের রূপমাধুরী। জীবন্ত শক্তিরূপে নাম চলিল আপন ছন্দে। কিছুক্ষণ যেন অভিভূত হইয়া রহিলেন কুলদানন্দ।

মহান্তের শিষ্যের সহিত যাত্রা করিলেন চণ্ডী পাহাড়। দুর্গম রাস্তার উভয় পার্শ্বে হিংস্র জন্তুসংকুল নিবিড় অরণ্য। স্থানে স্থানে গভীর ভয়ংকর গহ্বর। তবু সহজেই উঠিলেন তিনি চণ্ডীপাহাড়ে—দর্শনার্থী পরিপূর্ণ শ্রীচণ্ডী মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন মা-চণ্ডীকে।

দামপাড় আশ্রমে ফিরিয়া আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীকে হরিদ্বার আসিবার কারণ জানাইলেন। এই আশ্রমে কুটীর বাঁধিয়া থাকিতে বলিলেন আত্মানন্দ। কারণ

শাপদসংকুল চণ্ডীপাহাড়ে বাস ও ভিক্ষা করিবার বড়ই অসুবিধা। আত্মানন্দ এই ভরসা দিলেন—তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, প্রয়োজন মত ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইবেন। এখান হইতে পাহাড়ের দৃশ্যও ভাগবতের চিত্রের অনুরূপ। সুতরাং কুলদানন্দের মনে হইল, এখানে থাকিয়া সাধন-ভজন করাই গুরুদেবের অভিপ্রেত।

রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে ফিরিলে তিনিও সেই উপদেশ দিলেন। পরদিন দামপাড় আশ্রমে আসিয়া আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীর আগ্রহে তাঁহার কুটীরে আসন করিলেন কুলদানন্দ।

সেখানে কাটিল পাঁচ-ছয় দিন। কুটীর নির্মাণের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন আত্মানন্দ। কিন্তু হরিদ্বার বা কনখল হইতে কোন কুলী আসিতে চায় না। এদিকে দর্শনার্থীর ভীড়ে নিত্যকর্মের বড়ই অসুবিধা। কুলদানন্দ বুঝিলেন নিজের চেষ্টায় কিছু হইবে না। চোখের জলে স্মরণ করিলেন: গুরুদেব, ঘরের ব্যবস্থা করে দেও; নইলে আবার তোমার কাছেই ফিরে যাব।...

গুরুকৃপায় পরদিন মজুর জুটিলে কুটীর নির্মাণ আরম্ভ হইল।

আত্মানন্দের কুটীরে কাটিল এক সপ্তাহ। তাঁহার অনুরোধে এই কয়দিন ভিক্ষা বন্ধ রহিল। চার-পাঁচটী গাভী আছে আত্মানন্দের—প্রত্যহ তিনি অর্ধ সের করিয়া দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

দুই-তিন দিনে কুটীর নির্মাণ শেষ হইল। ঘরখানি বড় পছন্দ হইল কুলদানন্দের। আসনে বসিলে সম্মুখে দেখা যায় ধ্যানমৌন হিমালয়, বামে অদূরে গঙ্গা ও মায়াপুরী, দক্ষিণে নীলধারার উপর মনোরম নীলগিরি।...অপলকে চাহিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আত্মানন্দের অনুমতি লইয়া ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিলেন কুলদানন্দ। উত্তর মুখে আসন করিয়া সম্মুখে হোমকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। উৎসাহের সহিত নিয়মিত আরম্ভ করিলেন সাধন-ভজন। কুলদানন্দের সাধন জীবনে শুরু হইল স্মরণীয় নূতন অধ্যায়।

প্রত্যুষে স্নানান্তে নিজ কুটীরে আসনে বসিলেন। বেলা তিনটা পর্যন্ত নামজপে বিভোর হইয়া রহিলেন। পরে ভিক্ষার্থে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আত্মানন্দ এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী এমনি অসময়ে ভিক্ষায় যাইতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন—হরিদ্বারে বিস্তর সদাব্রত ও ধর্মশালা আছে; তবে মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইলে ডাল-রুটি পাওয়া যায়। কুলদানন্দ গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা

করিবেন বলিলে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন মায়াপুরীতে মহামায়ার বিষম খেলা।···সাধুদের পাইলে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করে মহিলারা। তাহাদের ধারণা, সিদ্ধপুরুষের ঔরসজাত পুত্র সর্ববিষয়ে গুণবান ও দীর্ঘজীবী হইবে।··· জয়পুরের মহারাজার গুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ স্বামী জানাইলেন, আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াও পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হরিদ্বারে এমনি প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহার সর্বনাশ হয়; অবশেষে গুরুকৃপায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কুলদানন্দ বুঝিলেন অভিমান বশে গুরুসঙ্গ ত্যাগ করায় বৃদ্ধের এই পরিণাম। গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে তিনি বিরত হইলেন, দুই ক্রোশ রাস্তা ঘুরিয়া একটী ধর্মশালা হইতে ডাল-আটা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন।

কিন্তু একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য প্রতিদিন দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া বিরক্তিকর। ইহাতে বহু সময়ও নষ্ট হয়। সাধুরা বলিলেন এখানে নিত্য ভিক্ষা করা অসম্ভব। অতএব স্থূলভিক্ষা করিবার জন্য গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিলেন। অনুমতিও শিগ্র পাইলেন। হৃষ্টমনে ভিক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহাতে চলিবে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ।

কয়েক দিন নিত্য ভিক্ষার ফলে বিষম জ্বরে শয্যাগত হইলেন। আত্মানন্দ বেলা ৮টায় ভিক্ষায় চলিয়া যান। সারাদিন একটু পিপাসার জল দেবারও কেহ নাই। নির্জন কুটীরে প্রবল জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। কাতর অবস্থায় স্মরণ করিলেন গুরুদেবকে। একটু পরে তন্দ্রাবস্থায় দেখিলেন—যেন গুরুদেবের নিকটে বসিয়া আছেন। পাশে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মনাক্কা দেখিয়া সেগুলি গুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। গোসাঁইজী চার-পাচটী মাত্র নিয়া অবশিষ্ট তাঁহাকে খাইতে দিলেন। যোগজীবনকে কয়েকটী দিয়া বাকি সবই মুখে দিলেন—অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায়ও মনাক্কা খাইতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ মধ্যে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইল। সত্যই আশ্চর্য গুরুকৃপা।···

ভজন-কুটীর বড় মনোমত হইয়াছে কুলদানন্দের। ঘরের জানালাগুলি বেশ বড়। আসনে বসিয়া ঝাঁপ তুলিয়া দিলে ঘরখানি ভরিয়া যায় স্বচ্ছ আলোয়। চতুর্দিকে নজরে পড়ে বিশাল পর্বতশ্রেণীর মনোরম শোভা। আবার জানালা বন্ধ করিলে ঘরখানি অন্ধকার হয়। স্থানটী বেশ উচ্চ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চোখে পড়ে। এই স্থানের প্রভাব আরো চমৎকার। আশ্রম, বৃক্ষলতা,

চতুর্দ্দিকে পর্বতশ্রেণী—সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন ধ্যানমৌন। আসনে বসিলে চিত্ত স্বতই নিমগ্ন হয় সরস ইষ্টনামে। ধ্যানযোগে ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে গুরুদেবের মধুর স্মৃতি। আহারান্তে আসনেই বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। শয়নেও আর বিশেষ আগ্রহ নাই। গুরুদেবের অসীম দয়ায় দিন কাটিয়া যায় বর্ণনাতীত আনন্দে।

বহুদিনের অভ্যাস বশে নিদ্রাভঙ্গ হয় রাত্র তিনটায়। হাতমুখ ধুইয়া আসনে বসেন—হোম করেন ধুনির প্রজ্বলিত অগ্নিতে। উষা পর্যন্ত কাটিয়া যায় নামে ও প্রাণায়ামে। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যান নীলধারার পারে সহস্র সহস্র বিল্ববৃক্ষে পরিপূর্ণ বেলবাগে। শৌচান্তে স্নান-তর্পণ করেন, পরে দুইটী বেল কুড়াইয়া লইয়া ফিরিয়া আসেন ভজন-কুটীরে। প্রভাতে আত্মানন্দ অর্ধ সের দুগ্ধ দিয়া যান। তিনি আত্মানন্দকে চা দিয়া নিজেও পরিতৃপ্তি সহকারে চা পান করেন। পরে গায়ত্রী জপ ও ন্যাস অন্তে বেলা দশটা পর্যন্ত পাঠ করেন। এগারোটায় উঠিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ ও ঘরলেপন করেন। বারোটায় স্নান ও সন্ধ্যা করিয়া শ্রীফল ভক্ষণ করেন। আসনে বসিয়া তিনটা পর্যন্ত নিমগ্ন থাকেন নামে ও ধ্যানে। ভিক্ষান্তে সন্ধ্যায় কুটীরে আসিয়া ধুনির অগ্নিতে রান্না করেন, ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পান পরম তৃপ্তিতে। নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্যন্ত আবার আসনে বসিয়া নামজপ করেন। তৎপরে নিদ্রা যান প্রায় তিন ঘণ্টা।

কুলদানন্দের মনে হইল এবার দেহ-মন অঙ্গার করিয়া সাধন-ভজন ও তপস্যা করিবেন। কিন্তু সহসা দেখা দিল এক নূতন উৎপাত। একদিন প্রত্যূষে স্নানান্তে কুটীরে আসিয়া দেখেন ঘরময় নানাজাতীয় অসংখ্য কীট। বহুবার ঝাড়, দিয়াও পোকার নিবৃত্তি হইল না। আসনে বসিয়া সারাদিন কেবল সর্বাঙ্গ হইতে পোকা বাছিয়াই সময় কাটিল। পরে দেখা দিল অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক উৎপাত। ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য মাছি আসিয়া চোখ-মুখ ও সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। তাড়াইলে তৎক্ষণাৎ আবার গায়ে আসিয়া পড়ে—মাছিগুলি এমনই ভয়ানক। বাধ্য হইয়া ধুনিতে আগুন জ্বালাইলেন, জানালা বন্ধ করিয়া ঘর অন্ধকার করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা—একটী মাছিও নড়িল না। বরং নিজেরই তখন দম বন্ধ হইবার উপক্রম।

এদিকে আসনে বসিতেই এক অজ্ঞাত শক্তিতে সারা অন্তর যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, অন্তরে জাগিয়া ওঠে মধুমাখা ইষ্টনাম। কিন্তু দুরন্ত মাছি ও

অসংখ্য কীটের দৌরাত্ম্যে দেহমন অস্থির। এ কী যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তি!...বার বার ঘর-বাহির করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তুই দিন, তুই রাত্রি এই অসহ্য উৎপাতে প্রার্থনা করিলেন চোখের জলে: ঠাকুর! দয়া করে এই যন্ত্রণা দূর কর। তোমার নামে তোমারই ধ্যানে ডুবিয়ে রাখ—নইলে এ জীবনধারণ যে আমার পক্ষে নরকভোগ মাত্র।...

শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন অসংখ্য কুৎসিত পোকা কিলবিল করিতেছে গুরুদেবের সর্বাঙ্গে,.. ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া বসিতেছে তাঁহার মুখে, চোখে।...তবু গুরুদেব স্থির, নিস্পন্দ। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, পাখা লইয়া হাওয়া করিলেও একটী মাছি বা পোকা নড়িল না। নিরুপায় দেখিয়া এক-একটী করিয়া পোকা বাছিতে লাগিলেন। এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল।

অন্তরে জাগিল দারুণ তুশ্চিন্তা। প্রত্যূষে বেলবাগে চলিয়া গেলেন। শৌচ ও স্নান অন্তে ফিরিয়া আসিলে বিস্ময় ও তুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইল। সমস্ত ঘরে একটীও পোকা বা মাছি নাই।...আঁতিপাতি খুঁজিয়া দেখিলেন, ঘরের এক কোণে মাত্র আট-দশটী কীট মৃতপ্রায়। চোখে ভাসিল স্বপ্নের বিভৎস দৃশ্য! তবে কি তাঁহাকে যন্ত্রণামুক্ত করিতে ঠাকুর নিজেই সহ্য করিতেছেন জঘন্য মাছি ও পোকার তুঃসহ দংশন?...অন্তরে জাগিল দারুণ অনুতাপ: হায়, হায়—এ কী করলাম! ঠাকুরের শ্রীচরণ একবার মাত্র পূজা করলে নিমেষে অনন্তকালের প্রারব্ধ ঘুচে যায়। তবু নিজের আরামের জন্য দয়াল ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে জঘন্য মাছি ও কুৎসিত কীটরাশি ছড়িয়ে দিলাম?...মনে পড়িল গুরুদেবের নির্দেশ: ব্রহ্মচারি, সাবধান! প্রার্থনা করলেই কিন্তু তা মঞ্জুর হবে।...তখন বোঝেন নাই প্রার্থনার জ্বালা।...এখন চোখের জলে আকুল প্রাণে বলিলেন: ঠাকুর, আমার ভোগ আমাকেই দেও।...আর আশীর্বাদ কর যেন কখনও আমার প্রাণে প্রার্থনার উদয় না হয়।...

অবিরত চোখে ভাসিতে লাগিল, ঠাকুরের অনুপম মুখমণ্ডল মক্ষিকা ও কৃমিকীটে পরিপূর্ণ।...চোখের জলে, তুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া কাটিল সারা দিন। প্রতিজ্ঞা করিলেন: জীবনে আর কখনও প্রার্থনা করব না।...

সন্ধ্যায় সহসা রূপায়িত হইল গুরুদেবের সহাস্য বদন, সস্নেহ দৃষ্টি।...এতক্ষণে যেন হাঁপ ছাড়িলেন তিনি। ঠাকুরের সেই পবিত্র, চিরসুন্দর মুখশ্রী ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া অন্তর হইতে উৎসারিত হইল: জয় গুরুদেব!...

ভগবান গোসাঁইজীর কৃপায় বাহিরের বাধাবিঘ্ন ও উপদ্রবের অবসান হইল। পরম নিশ্চিন্তে একান্তভাবে মনপ্রাণ নিবিষ্ট হইল নামসাধনে ও শ্রীগুরুর ধ্যানে। ভজনের অনুকূল স্থানেও চিত্তের পূর্ণ একাগ্রতা দেখা দেয় নাই। কিন্তু এখানে আসনে বসিলে অসাধারণ স্থান-প্রভাবে মনপ্রাণে জাগে অখণ্ড নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ। চতুর্দিকে পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা সমস্তই যেন ভগবৎভাবে নিমগ্ন। মহামায়ার অনন্ত শক্তি-প্রভাবে সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন অভিভূত। সর্বদিকেই প্রকাশিত গুরুদেবের মনোহর রূপস্মৃতি। বিহ্বল আনন্দে, অবিরল অশ্রুধারায় কাটিয়া যায় সারা দিনরাত। সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় যেন আজ অন্তর্মুখী। গুরুদেবের রূপের সঙ্গে ঝলমল করে জননী যোগমায়ার স্বর্গীয় দ্যুতি। অন্তরে কাকুতি জাগে ঃ জয় মা আনন্দময়ি! তোমার অপরিসীম দয়া আমার উপর শতধারে বর্ষিত হক।···তোমার কৃপায় গুরুদেবের মনোহর লীলা দর্শনে দিনরাত যেন মুগ্ধ হ'য়ে থাকি।···

দুনিয়ায় সুখদুঃখ, শুভাশুভ নিয়তই পরিবর্তনশীল। সুতরাং মাঝে মাঝে কুলদানন্দের মনে হইত, ঠাকুরের কৃপা অনুভূতির এমনি দুর্লভ অবস্থা অদৃষ্টে আর কতদিন আছে কে জানে! হয়ত পরম নিশ্চিন্তে সাধন-ভজন করিবার এমন অপূর্ব সুযোগ জীবনে আর নাও দেখা দিতে পারে।···ভাবিতেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন তিনি—দৃঢ় সংকল্পে সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করিয়া নিমগ্ন হইতেন সাধন-ভজনে।

কুলদানন্দের আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। তাঁহার শরীর ক্রমশ দুর্বল হইতে লাগিল। আত্মানন্দের সঙ্গে প্রথম কয়েক দিন বেশ পেট ভরিয়া আহার করিয়াছেন, দুগ্ধও দুই বেলা প্রায় অর্ধসের পান করিয়াছেন। পরে আহার কমাইতে গিয়া দেখিলেন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। আবার অন্নগ্রহণে শরীর রসস্থ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভিক্ষায় সাধারণত জোটে বুটের ছাতু, তাহা গ্রহণ করিলে চার-পাঁচ দিন উদরাময় সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রকার আহারে অভ্যস্ত হইলে নিত্য ভিক্ষা করিয়া দেহরক্ষা এস্থানে সম্ভব। আবার দেহ সুস্থ না হইলে সাধন-ভজন দূরে থাক, প্রাণরক্ষাই কঠিন। সাধন-ভজন করিবার ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু দেহের গ্লানি ও ক্লান্তি দূর হইতেছে না। যোগভূমির অসাধারণ প্রভাবে, অন্তরের ব্যাকুলতায় তপস্যার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তবু বৃদ্ধি পাইল। দৈহিক অস্বস্তি সত্ত্বেও সুরু হইল রীতিমত কঠোরতা। খোসাশুদ্ধ কড়াইয়ের ডাল অথবা বৃক্ষলতার নূতন ডগা-পাতা

নূনজলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক আটার সহিত খাইতে লাগিলেন। পরে এক ছটাকেরও কম আটার চাপাটী লবণ ও মরিচের সহিত ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন।

অত্যধিক ক্ষুধায় প্রথমে তাহাই পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শরীর অতিরিক্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। শৌচাদি ও স্নানাহ্নিক করিতে কষ্টবোধ হয়, এক মিনিট দূরের পথ গঙ্গা হইতে এক কলসী জল আনিতে হাঁপাইয়া পড়েন। আসনে অধিকক্ষণ বসিতে পারেন না—মাঝে মাঝে শুইয়া পড়েন। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়। মনে পড়ে গুরুদেবের কথা ঃ শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।···ভাবিয়াছিলেন দৈহিক বিকার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অহোরাত্র ঠাকুরের ধ্যানে মগ্ন থাকিবেন। কিন্তু অত্যধিক মনোমুখী হওয়ার ফলে নিদারুণ কঠোরতার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের কথা না বুঝিতেই এই বিপত্তি।···ফলে, ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। অন্যান্য সাধুরাও বলিলেন, ইহা আত্মহত্যার নামান্তর।

অপরাহ্নে পেট ভরিয়া ডাল-রুটী আহার করিলেন কুলদানন্দ। পরদিন মলের সহিত রক্তপাত বন্ধ হইল, হাতে-পায়ের বেদনা কমিয়া গেল। শরীর বেশ সুস্থ বোধ হওয়ায় সহজে নিত্যক্রিয়া চলিল ঠিক নিয়ম মত। সন্ধ্যায় ডাল-রুটি নিবেদন করিবার সময় গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বলিলেন ঃ ঠাকুর! আমি নিতান্ত অপাত্র, তপস্যা আমার কাজ নয়। শরীরের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কঠোরতা ত্যাগ করেছি। দয়া করে তোমার প্রসাদ দিয়ে ধন্য কর।···

কিছুক্ষণ মগ্ন রহিলেন গুরুদেবের ধ্যানে। চোখ মেলিতেই অবাক হইয়া দেখিলেন, ডাল-রুটির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকার নীলাভ গাঢ় লাল জ্যোতির ঝলকানি।·মুগ্ধ আনন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন, আর চক্ষে ভাসিতে লাগিল সেই উজ্জ্বল মনোরম জ্যোতির্বিন্দু।···সারা মনপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় কুম্ভকযোগে ধ্যান করিবার সময় ললাটে দেখা দিল উজ্জ্বল চমৎকার জ্যোতির ছটা। জ্যোতিমণ্ডলের চতুর্দিক হইতে শুভ্র-নীল অপূর্ব দ্যুতি সূর্যরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে দিগদিগন্তে, যেন পরিব্যাপ্ত সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।···ধ্যান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিলীন হইয়া গেল। এই জ্যোতি যেমন সুন্দর, তেমনই মনোহর—দর্শন মাত্র বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হয় যেন,··· দর্শনের স্পৃহাও বৃদ্ধি পায় চতুর্গুণ।···গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন ঃ

ঠাকুর! তোমার অনন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডারে তোমার চেয়েও সুন্দর যদি কিছু থাকে, তা যেন চিরকাল আমার অগোচরে থাকে—তুমি আমায় এই আশীর্বাদ কর।…

কয়েক দিন নিয়ম মত আহার করিয়া শরীর বেশ সুস্থ ও সবল বোধ হইল। নিত্যক্রিয়া, গায়ত্রীজপ, নারায়ণকে গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র প্রদান, চণ্ডী-গীতাদি পাঠ—সবই সানন্দে চলিল বিধিমত। অপরাহ্নে গিয়া বসেন আত্মানন্দের কুটীরপ্রান্তে বটবৃক্ষমূলে। চণ্ডী দর্শনার্থী বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনায় আনন্দলাভ করেন।

একদিন শৌচান্তে আসনে আসিয়া বসিলেন। ভাবিলেন সাধন-ভজনে নিবিষ্ট হইয়া দিন কাটিবে। কিন্তু ন্যাস আরম্ভ করিতেই সহসা মনে হইল প্রাণ যেন অন্তঃসারশূন্য। বহু চেষ্টাতেও ধ্যেয় বস্তুর সন্ধান মিলিল না। শালগ্রাম পূজা, গ্রন্থপাঠ—কিছুতেই মন বসিল না। সব ছাড়িয়া বসিয়া রহিলেন অসীম শূন্যতায়। অথচ অন্তরে দেখা দিল দুর্বিসহ জ্বালা, অবিরত ঘর-বাহির করিলেন নিদারুণ অস্থিরতায়। তখন বড় অভিমান হইল ঠাকুরের উপর। অকারণে কেন তিনি এই নিদারুণ শুষ্কতার জ্বালা দিতেছেন? ভাবিলেন এই জ্বালা জুড়াইতে যাহা ইচ্ছা করিবেন। অন্তরে-বাহিরে যেন একেবারে রিক্ত।… দুঃসহ যন্ত্রণায় আসনে শুইয়া পড়িলেন—দুই-তিন ঘন্টা ছটফট করিয়া কাটিল। মনে হইল ত্রিসংসারে বুঝি সবই নীরস,…একেবারে বিস্বাদ।…

অনেক জল্পনার পর মনে হইল আনন্দের মালিক তো শুধু একজন, তিনি না দিলে জীবনে কোথা হইতে আসিবে সরস আনন্দধারা?…কাজেই একান্তপ্রাণে নির্ভর করিবেন শুধু তাঁহারই উপর—ভাল-মন্দ নির্বিশেষে তিনি শুধু নিয়মিত সাধন করিয়া যাইবেন। নিত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এত জ্বালা ও শুষ্কতার মধ্য দিয়াও অনুভব করিলেন নাম ঠিকই চলিতেছে আপন গতিতে।…সত্যই আশ্চর্য!…

এখানে আসিলেন এক বৃদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—তাঁহার নাম দণ্ডীস্বামী। সন্ধ্যা ও শালগ্রাম পূজা পদ্ধতি জানিয়া লইবার জন্য গুরুদেবের নির্দেশে উপযুক্ত ব্যক্তির অপেক্ষায় ছিলেন। দণ্ডীস্বামীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে এতদিনে সেই সন্ধান মিলিল। ত্রিসন্ধ্যা ও শালগ্রাম পূজা পদ্ধতি তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইলেন। দণ্ডীস্বামী বলিলেন—নিত্য যথারীতি ত্রিসন্ধ্যাই ব্রাহ্মণ্যতেজ লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাতে সমস্ত উপাসনা-তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়।…অপরাহ্নে

পাঠ, সায়ংসন্ধ্যা ও কীর্তন অন্তে ভোগ নিবেদন করিয়া আজ বড় তৃপ্তিলাভ করিলেন কুলদানন্দ।

একদিন ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চালে এখনও খড় না বসায় ঘরের মেঝে স্রোত বহিয়া গেল। অথচ শালগ্রামের আসনের ধারে-কাছে বিন্দুমাত্রও জল পড়ে নাই। দেখিয়া মনে জাগিল বড় অভিমান। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ভগবান পূর্ণরূপে এখানে অধিষ্ঠিত। ইচ্ছা করিলে কি তিনি ঘরখানি বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না?…শালগ্রামকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন: ঠাকুর! শিগগির এই ঝড়বৃষ্টি বন্ধ কর; নইলে তোমাকেও আকাশের নীচে বৃষ্টিতে রেখে তোমার মত আমিও মজা দেখব।…

আসনে বসিয়া চিত্ত নিবিষ্ট হইল মধুর নামে। একটু পরে ঘরে জল পড়া বন্ধ হইল। মনে হইল, প্রতি অণু-পরমাণু চৈতন্যযুক্ত মহাশক্তি দ্বারাই চালিত, রক্ষিত ও বর্ধিত; তাঁহার দুঃখে সর্বশক্তিমান সেই ঠাকুর এই ব্যবস্থা করিলেন।

আর একদিন ন্যাস ও পূজা অন্তে তিনি আসনে উপবিষ্ট। কনখলের এক ধনী পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিরাট বাগিচায় শিব-মন্দিরে গিয়া থাকিবার অনুরোধ করিলেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে বাগানবাড়ী, দেবালয়, যথাসর্বস্ব দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান নিঃসন্তান পাণ্ডাজী। আহারাদি এবং সবকিছুর ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিবেন। কুলদানন্দ জানাইলেন—অভাবে পড়িয়া তিনি সাধু সাজেন নাই, এখানে থাকিয়া ভিক্ষা করিতেছেন ঠাকুরের আদেশে। কোন দেবালয়ে মহান্তগিরি করিবার বিন্দুমাত্র বাসনা নাই তাঁহার।…

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন পাণ্ডাজী। কুলদানন্দ ভাবিলেন ইহা কি মহামায়ার খেলা, না ঠাকুরের দয়া?…মনে মনে বলিলেন: গুরুদেব! তোমার হাতে গড়া জিনিষ কারো সামান্য আঙ্গুলের টিপে যেন ভেঙ্গে না যায়। সমস্ত প্রলোভন থেকে আমায় দয়া করে রক্ষা ক'রো।…

তবু মদ খাইবার জন্য একদিন ধরিয়া বসিলেন আত্মানন্দ। কুলদানন্দ তো অবাক! সহজভাবে মদের বোতল ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন: আমার তো এসব সহ্য হবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে খাও।… অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আত্মানন্দ দুখানা কচুরি খাইতে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আসনে আসিয়া তাহা সেবা করিলেন কুলদানন্দ। পাঁচ-সাত মিনিটেই শরীর অসুস্থ বোধ হইল, চিত্ত হইয়া উঠিল অত্যন্ত চঞ্চল। সন্ধ্যা করিতে হইবে ভাবিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন শালগ্রামের দিকে। দেখিলেন জ্যোতির্ময় কৃষ্ণ প্রস্তরের সর্বাঙ্গ হইতে

বিস্ফুরিত শ্বেত-নীল প্রদীপ্ত জ্যোতি।...পলকে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কচুরি খাইয়া মাথা ধরিয়াছিল, হোম করিবার পর কমিয়া গেল—দিন কাটিয়া গেল মধুর আনন্দে।

এখানে বানরের বড় উপদ্রব। প্রতিদিন বেড়ার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনিষ্ট করে। পর পর দুই দিন হোমের ঘৃত নষ্ট করিল। এক সাধুকে পাঠাইলেন কনখলে এক বর্দ্ধিষ্ণু পাণ্ডার নিকট। ফিরিয়া আসিয়া সাধু বলিলেন : আপনাকে যেতে বলেছেন। আপনি যান—আমি আশ্রমে থাকব।...বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। পাণ্ডার নিকট জানিলেন সাধুর কথা মিথ্যা। ভজন কুটীরে ফিরিয়া দেখিলেন আসন, এমনকি চতুষ্কোণ সুন্দর সিংহাসন সমেত শালগ্রাম অপহৃত !··চোখে অন্ধকার দেখিলেন কুলদানন্দ। সাধু চুরি করিয়াছে বুঝিয়াও তাঁহার উপর রাগ হইল না। ইহা নিজেরই অপরাধের দণ্ড। দণ্ডী স্বামীর নিকট হইতে পূজাবিধি জানিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু মনোমত সুলক্ষণযুক্ত সুশ্রী শালগ্রাম পাইবার আশায় এই শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। মনে হইল এই অনাদরে শালগ্রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

অন্তর শূন্য বোধ হইল, অস্থিরভাবে কাটিল সারাদিন। স্থির করিলেন যে ভাবে হউক শালগ্রাম একটী সংগ্রহ করিতেই হইবে।...পরদিন কনখলে এক সম্ভ্রান্ত পাণ্ডার নিকট উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডাজী তাঁহাকে লইয়া মন্দিরে মন্দিরে বহু শালগ্রাম দেখাইলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরদিন যাইতে বলিলেন। শালগ্রাম অভাবে রাত্রি কাটিল বড় অশান্তিতে। পরদিন নিত্যক্রিয়া অন্তে সকাল নয়টায় কনখলে গেলেন। 'লক্ষ্মী নৃসিংহ' নামে একটী জাগ্রত শালগ্রাম দিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। যতদিন পছন্দমত সুগোল সুশ্রী শালগ্রাম না মেলে, এইটী পূজা করিবার স্থির করিলেন কুলদানন্দ।

আশ্রমে আসিলেন ব্রহ্মচারী কেশবানন্দ স্বামী। গোসাঁইজীর পরিচয়ে কুলদানন্দকে সাদরে নিঃশব্দ প্রাণায়াম ও খেচরী মুদ্রা দেখাইয়া দিলেন। পরদিন তাঁহার সহিত চণ্ডীপাহাড়ে গেলেন কুলদানন্দ। বহুকষ্টে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। মন্দিরে মা-চণ্ডীকে দর্শন করিয়া মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। শুনিলেন, রণজিৎ সিংহের পিতা বা পিতামহ বহু অর্থব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্মুখে অন্নপূর্ণা মন্দির—তাহা পরিক্রমা করিয়া দর্শন ও স্পর্শ করিলেন। অবতরণ কালে একটী স্ত্রীলোকের সহিত

হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে দেখিলেন প্রায় আশী বছরের এক বৃদ্ধাকে। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—অতি সংকীর্ণ পথ হইতে একটু সরিয়া গেলেই বৃদ্ধা পতিত হইবেন কোন অতল গহ্বরে।...বৃদ্ধার জন্য ঠাকুরের দয়া ভিক্ষা করিলেন। দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার অধ্যবসায় দেখিতে লাগিলেন।

কেশবানন্দজী সদলবলে বহুদূরে নামিয়া গিয়াছেন ততক্ষণে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভয়ংকর পাহাড়ের মধ্য দিয়া তিনি একাকী চলিলেন। পথ ভুলিয়া প্রবেশ করিলেন নির্জন গভীর অরণ্যে। স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিল বন্য জন্তুর বিকট চিৎকার। নিরুপায় দেখিয়া আবার ফিরিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে চণ্ডীর যাত্রীদের পাইয়া নামিয়া আসিলেন নিরাপদে।

ব্রহ্মচারীদের উপর কেশবানন্দ স্বামীর আকর্ষণ বড় প্রবল। তাঁহার মতে এই দামপাড় আশ্রম ব্রহ্মচারীদের সাধন-ভজনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া যাবতীয় কর্তৃত্ব কুলদানন্দের উপর দিতে চাহিলেন। কুলদানন্দ আত্মানন্দের নাম করিলে সম্মত হইলেন না। কুলদানন্দের নামে একটী বৃহৎ ভাণ্ডারা দিয়া প্রচুর উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা কনখল ও হরিদ্বারের সাধুদের সেবা করিলেন। পরে শিষ্যদের রাখিয়া মীরাট রওনা হইলেন তিনি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। শরীর এখন বেশ সুস্থ। বাহিরের কোন বাধা বিপত্তি আর নাই।

মায়াপুরী হরিদ্বার মুনিঋষিদের তপস্যার পরম পবিত্র ভূমি। কুলদানন্দ ভাবিয়াছিলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এখানে সাধন-ভজন করিবেন। কিন্তু এখন মন যেন আর নিবিষ্ট হইতে চায় না। ভজনে কিসে মন বসে, আর কেন বসে না—ইহাই এক অপার রহস্য। গোসাঁইজী বলিয়াছেন—সাধক জীবনে মাঝে মাঝে দেখা দেয় অহৈতুকী শুষ্কতার জ্বালা; এই নিদারুণ জ্বালাই দগ্ধ করে বাসনা-কামনা, চিত্তের সমস্ত অভিমান।...ইতিপূর্বে এই জ্বালার হাত হইতে তিনি পরিত্রাণ পান নাই; পুনরায় সেই নিদারুণ শুষ্কতায় সারা মনপ্রাণ সর্বদা যেন বিক্ষিপ্ত। নামে আর আনন্দ নাই—আসনে বসিলে দেখা দেয় দারুণ বিরক্তি। বহুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবের পরে চৈতন্য হইলে অবসন্নভাবে উঠিয়া পড়েন। বুকে ওঠে দীর্ঘশ্বাস, মনে জাগে ব্যর্থতার গ্লানি।

অস্থিরভাবে কাটিল তিন-চা'র দিন। একদিন মনে হইল আর আসনে বসিবেন না—সন্ধ্যা ও ন্যাস কোনরকমে সারিয়া লইবেন। একটু পরে চিত্ত

স্বতই নিবিষ্ট হইল নামে ও ধ্যানে। দূরে গেল বিরক্তি ও গ্লানি—ঘুচিয়া গেল সমস্ত জ্বালা ও অস্থিরতা। সরস মধুর নামে চক্ষে বহিল আনন্দাশ্রু,...আসনে বসিয়া সারাদিন কাটিয়া গেল আচ্ছন্নের মত।...সরস হৃদয় অকস্মাৎ বিরস হইয়া পড়ে—শত চেষ্টাতেও অদম্য সেই শুষ্কতার গতি। আবার সহসা চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া ওঠে, মনেপ্রাণে বহিয়া যায় ভাবের স্পন্দন। কোন ক্ষেত্রে নিজের কিছু মাত্র কর্তৃত্ব নাই। মনের এই জোয়ার-ভাটা চলিতেছে আপন গতিতে—বাহিরের এক মহাশক্তি প্রভাবে। বার বার এই শক্তির ঘূর্ণাবর্তে নিরুপায়ে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন তিনি। সর্বশক্তিমান ঠাকুরের হস্তে তিনি কলের পুতুল মাত্র। পরম লোভের বস্তু ঠাকুর সম্মুখে ধরিতেছেন, অথচ ব্যাকুল প্রাণে হাত বাড়াইলে তখনই আবার সরাইয়া লইতেছেন। দাতা তিনি, বস্তু তাঁরই হাতে। তিনি না দিলে কোথা হইতে পাইবেন সেই পরম বস্তু?

তাঁহার উপর দিয়া চলিয়াছে ঠাকুরের এই অপূর্ব খেলা। তাঁহাকে ঠাকুর দোলাইতেছেন কান্না-হাসির বিচিত্র দোলায়। তিনি শুধু নিশ্চেষ্ট দর্শক মাত্র।...তবু তাঁহাকে খেলাইয়া, খুশিমত দোলাইয়া ঠাকুরের যে এত আনন্দ, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ। জয় গুরুদেব!

॥ উনিশ ॥

চণ্ডীপাহাড়ে আসিয়া একদিনও নিরম্বু উপবাস করিতে পারেন নাই কুলদানন্দ। এবার একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিবার সংকল্প করিলেন, কিন্তু সন্ধ্যায় ভীষণ দুর্বলতা অনুভব করিলেন। সাধন-ভজনের জন্য দৈহিক সুস্থতা প্রয়োজন। ভাবিয়া চা পান করিলেন, একটু পরে দেহ সুস্থ হইল। পরে অনুতপ্ত চিত্তে ভাবিলেন: পক্ষকালের সমস্ত পাপক্ষয় করিবার জন্য ভগবৎ বিধানে জীবের ভাগ্যে সমাগত হয় একাদশী তিথি। সেই তিথিতে নিরম্বু উপবাসে সাধিত হয় বিশেষ কল্যাণ। তাহাতে আস্থা থাকিলে অস্থায়ী আরামের জন্য কখনই তাহা ভঙ্গ করিতেন না। বুদ্ধিমান ও সুচতুর নয় বলিয়া এই সুযোগ হেলায় হারাইতেছেন।...ঠাকুরের নিকট শাস্ত্রসম্মত সুবুদ্ধি প্রার্থনা করিলেন তিনি।...

পরদিন চা ও বেলের সরবৎ পান করিলেন। সন্ধ্যার পর খুব ক্ষুধা বোধ হওয়ায় পেট ভরিয়া ডাল-ভাত আহার করিবার ইচ্ছা হইল। ধুনিতে অধিক পরিমাণে ডাল চাপাইলেন। নামাইবার সময় হঠাৎ পাত্রটী পড়িয়া ফুটন্ত ডাল আসিয়া লাগিল হাতে-পায়ে, মুখে ও বুকে। জ্বলিয়া উঠিতেই স্মরণ করিলেন গুরুদেবকে। অগ্নিদেবকে বলিলেন : ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করতেই কি এই শাসন ?···কিন্তু এক দিনের অপরাধও কি ক্ষমার যোগ্য নয় ? এখন এই জ্বালা কী করে সহ্য করব ?···

পরক্ষণে মনে হইল ঠাকুরই তো অগ্নিরূপে আহুতি গ্রহণ করেন। তেজের একমাত্র আধার তো তিনি।···ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বলিলেন : গুরুদেব ! তোমার কৃপার দানকে শাস্তি মনে কচ্ছি—আমাকে দয়া কর।···আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন এক মিনিটে সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া গিয়াছে।

কুলদানন্দ শুধু নাম সাধক নন, প্রকৃত জীবন সাধক। জীবনকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সত্য ও সুন্দরের বেদীমূলে, হৃদয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন গুরুরূপী সদাশিবের শ্রীচরণতলে।···সেই সাধনায় ইতিমধ্যেই কত উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, এই ঘটনাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।···

শুধু দেবদেবী ও শালগ্রামের মধ্য দিয়া নয়, অগ্নি ও তেজের মধ্য দিয়াও তিনি উপলব্ধি করিলেন শ্রীগুরুকে।···শ্রীভগবান সর্বত্র বিরাজিত, তাই সর্বভূতে তিনি অনুভব করেন গুরুদেবের অধিষ্ঠান।···

কুলদানন্দের মনে আবার একদিন দেখা দিল শুষ্কতা ও বিরক্তি। বহু চেষ্টাতেও নামে বা নিত্যকর্মে মনস্থির হইল না। বড় অভিমান হইল ঠাকুরের উপর। এমন সময় শালগ্রামে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, শিলার নানাস্থানে অত্যুজ্জ্বল গাঢ় নীল জ্যোতি বিচ্ছুরিত—জোনাকী পোকার মত সেগুলি বার বার জ্বলিয়া নিভিয়া যাইতেছে যেন।···কিছুক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিলেন এই অনুপম জ্যোতির খেলা। গুরুদেবের স্মৃতিতে চিত্তে জাগিল বিহ্বল আনন্দ। অন্তরে চলিল সরস ও সতেজ নামপ্রবাহ।

সারাদিন কাটিল মুগ্ধ আনন্দে। গোসাঁইজীর স্মৃতিতে চক্ষে বহিল অশ্রুধারা। স্বচ্ছ দিবালোকে রূপায়িত হইল গুরুদেবের ছায়ামূর্তি।·· ক্রমশ উহা যেন স্থূল ও খর্বাকৃতি মনে হইল, অমনি মুদিত নয়নে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন : ঠাকুর ! দয়া করে যদি দর্শন দেও, তবে এইটুকু কৃপা কর যেন তোমাতে ভক্তি,

বিশ্বাস ও ভালবাসা জন্মে।...প্রাণের ধনকে যেন প্রাণভরে ভালবাসতে পারি! নইলে কখনও দর্শন দিও না, কান্নাকাটি করলেও নয়—তোমার চরণে এই আমার প্রার্থনা।...

বিচিত্র প্রার্থনাই বটে!...পূর্বেও এমনি ছায়ামূর্তি দর্শন করিয়াছেন; অমনি চক্ষু বুজিয়াছেন, ভয় হইয়াছে পাছে গুরুদেব প্রকাশিত হন।...কারণ অন্তরে চাই সুগভীর প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস; নতুবা গুরুদেবের দর্শন যে ভোজবাজি মাত্র। সেই নিদারুণ ফাঁকি, গুরুদেবের এতটুকু অনাদর তাঁহার নিকট যে নিতান্ত অসহ্য।...যদি নিজের তরফ হইতে দেখা দের সেই অমার্জনীয় অপরাধ?...তখন যে মাথা কুটিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইবে না।... অন্তরের মণিকোঠায় যাঁহাকে নিত্য নিরত দর্শন করিতেছেন, বাহিরেও সর্বান্তঃকরণে চান তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন, সার্থক করিতে চান তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা।...তৎপূর্বে নিজে সংশয়াতীত ভাবে সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়া উঠিতে চান। তখন সারা অন্তর ভরিয়া বরণ করিবেন ধ্যানের দেবতাকে, ইহাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা,...ব্যাকুল প্রার্থনা।...

কুলদানন্দের এই গভীর ভক্তি, এই নিখাদ আন্তরিকতা হয়ত স্পন্দিত হইল অন্তর্যামী গুরুদেবের অন্তস্থলে। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইল সেই ছায়ামূর্তি।...তবু মনেপ্রাণে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন বিহ্বল আনন্দ। সমস্তটা দিন কাটিয়া গেল যেন অন্য কোন মধুময় রাজ্যে।

আষাঢ় মাস। শেষরাত্রে মুসলধারে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। সকালে বৃষ্টি থামিয়া গেল, হাসিয়া উঠিল পূর্ণ করোজ্জ্বল সিক্ত ধরণী। নীলবর্ণ পাহাড়ের বুকে দেখা দিল খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের মেলা।...চাহিলে চোখ ফিরান যায় না।

সহসা মনে হইল ঐ মেঘপুঞ্জ গুরুদেবেরই বহিরাঙ্গ। অপলকে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন তিনি। প্রফুল্ল চিত্তে জাগিল সুগভীর ভাবোচ্ছ্বাস, মধুর নাম চলিল আপন গতিতে।

আত্মানন্দ আসিয়া বলিলেন: দাদা, আজ বড় ঠাণ্ডা—চা চাই।

: তোমরা গিয়ে চা ক'রে খাও।

আত্মানন্দ দুঃখিত মনে চলিয়া গেলেন। কুলদানন্দ ভাবিলেন উৎপাতের শান্তি হইল।...একটু পরে দেখা দিল শুষ্কতা ও জ্বালা। নামে আর মন বসে না। এ কী হইল? ইহা কি আত্মানন্দকে বিমুখ করিবার প্রতিফল?...

অমনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। আত্মানন্দের কুটীরে গিয়া চমৎকার চা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বড়ই তৃপ্ত হইলেন আত্মানন্দ এবং কেশবানন্দ স্বামীর শিষ্য জ্ঞানানন্দ ও বরদানন্দ। কুটীরে ফিরিয়া নিজেও ঠাকুরকে চা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের সুখময় স্মৃতিতে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, চা সেবনের পর আবার বিভোর হইয়া পড়িলেন সুমধুর নামানন্দে।

মনে পড়িল এমনি শুষ্কতার মাঝে ঠাকুর এক কুলীর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন; এক দ্বারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দেন। অমনি তাঁহার সরস ভাব দেখা দেয়।...বুঝিলেন কাহারও প্রাণে ক্লেশ দিলে ভগবৎ উপাসনা আর হয় না, আবার লোক-সেবাতেই দেখা দেয় সাধন-স্ফূর্তি।

রীতিমত বর্ষা সুরু হইল। বিছানায়, আসনে, সর্বত্র জল পড়িতে লাগিল। কোনরকমে ধুনি জ্বালিয়া নিত্যক্রিয়া অন্তে চা পান করিলেন কুলদানন্দ।

একটী সাধু এখন গঙ্গাস্নান করিতে এমন কি গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেও নিষেধ করিয়া বলিলেন, গঙ্গা এখন রজঃস্বলা। বিশ্বাস না করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন তিনি। অমনি সর্বাঙ্গে অসম্ভব চুলকানিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। সাধুর নিকটে জানিলেন, বর্ষার প্রারম্ভে পর্বতের আবর্জনা ও নানা দূষিত পদার্থ ধুইয়া আসায় গঙ্গাজল বিষাক্ত হয়। সাধুর কথামত সর্বাঙ্গে গোবরমাটি মাখিয়া নীলধারার বদ্ধ জলে স্নান করিলেন। তবেই যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল।

পরদিন সকালে আবার নামিল ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি। সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া ও কম্বল মুড়ি দিয়া আসনে বসিলেন। উপরে আচ্ছাদন দিলেও জলপড়া বন্ধ হইল না। একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে। এই দুর্যোগে ঐ হিমালয়ের পাদদেশে বৃক্ষমূলে কত মুনিঋষি বর্ষাস্নাত হইয়াও বিভোর হইয়া আছেন ভগবৎ-ধ্যানে।...প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল তাঁহাদের জন্যে। প্রার্থনা জানাইলেন: ঠাকুর, আমি তো তোমার অনুপম দিব্যরূপ দর্শন করে ধন্য হয়েছি। যাঁরা তোমার দর্শন পাবার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেও দিনরাত ধ্যানে মগ্ন, আগে তাঁদের দয়া কর। সারা জগতে তোমার পতিতপাবন পবিত্র নাম জয়যুক্ত হ'ক।...কুলদানন্দের অনুভূতি আজ কত সূক্ষ্ম, হৃদয়বত্তা কত গভীর! সুদূর হিমালয়ে অজানা মুনিঋষিদের জন্য তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত সুনিবিড় প্রেম, চক্ষে মমতার মুক্তাবিন্দু।.. "মমাত্মা সর্বভূতাত্মা"...সর্বভূতেই আজ তাঁহার আপন সত্তার উপলব্ধি। "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ"—এই প্রণাম-মন্ত্র তাঁহার দিব্য জীবনে আজ সার্থক।...

এই অনবদ্য প্রার্থনার পর তিনি অভিষিক্ত হইলেন পবিত্র অশ্রুধারায়। মধ্যাহ্নে হোমের পর আজ্ঞাচক্রে ধ্যান রাখিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস বশে প্রকাশিত হইল অষ্টদল পদ্ম। পাপড়ির চতুর্দিকে দিব্য জোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। পদ্মের মধ্যবর্তী মণ্ডলাকার চক্রে সুনীল জ্যোতি মাঝে মাঝে শুভ্র প্রোজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করিয়া বিলীন হইতে লাগিল। সেই চক্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল, অবিরাম চলিল অখণ্ড নাম। গায়ত্রী জপের সংখ্যা পূর্ণ হইল, অমনি জ্যোতিও অন্তর্হিত হইল। নামে ও ধ্যানে সারাদিন কাটিল পরমানন্দে।···

এই সময়ে সাধন-ক্রমের অনেক উচ্চস্তরে আরোহণ করেন কুলদানন্দ। সাধারণের ইহা ধারণাতীত—ভক্ত ও সাধকের পক্ষে তাহা উপলব্ধি সাপেক্ষ।···

পরদিন আবার গায়ত্রীজপে বসিয়া চক্রে মনটীকে স্থিরভাবে নিবিষ্ট করিলেন। পূর্ব দিনের ন্যায় চক্র, পদ্ম ও জ্যোতি দর্শনের আশায় কুম্ভক করিলেন পুরাদমে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল; মনে হইল ঠাকুরের কী বিচিত্র লীলা।···

মাঝে মাঝে মণিপুর চক্রে (সহস্রারে) বসিয়া নাম করিবার নির্দেশ দিয়াছেন গোসাঁইজী। পরদিন নিত্যক্রিয়ার পর কুলদানন্দ তাহাই আরম্ভ করিলেন। এই চক্র হইতে ধ্যান প্রভাবে মধুকরী বিকশিত হইয়া পড়ে। কুম্ভক যোগে মণিপুরে বসিয়া ধ্যানযোগে অনুভব করিলেন মধুর তৃপ্তি।

ঘন বর্ষা নামিয়াছে। অবিলম্বে পুলের বাঁধ খুলিয়া দিবে। তখন আর হরিদ্বার ও কনখলে যাওয়া অসম্ভব। বর্ষাশেষে আবার পুল না পড়া পর্যন্ত এই দামপাড়ের চড়ায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহার পূর্বে অন্ততঃ তিন মাসের আহার সঞ্চয় করা প্রয়োজন; নতুবা এখানে থাকা অসম্ভব।

অপরাহ্নে সংবাদ দিলেন কেশবানন্দ স্বামীর শিষ্য বরদানন্দ। কুলদানন্দ গিয়া শুনিলেন আহারাদির জন্য কেশবানন্দ একশত টাকা পাঠাইয়াছেন। তিন মাসের জন্য প্রয়োজনীয় আটা, ঘৃত, চিনি ইত্যাদি জোগাড় হইল। কিন্তু চা প্রায় শেষ—আর তিন-চার দিন মাত্র চলিতে পারে। সহসা জালিম সিংএর পত্র আসিয়া উপস্থিত। তিনি দেখা করিতে আসিতেছেন, সঙ্গে আনিবেন এক বাক্স ভাল চা।···

নির্জন পাহাড়ে আছেন কুলদানন্দ। অথচ প্রয়োজন মত জুটিয়া যাইতেছে

সব কিছু। গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন : একটু তফাতে গিয়ে থাকলে ভগবানের কৃপা বুঝতে পারবে।...আজ স্পষ্ট বুঝিতেছেন, সব ঘটিতেছে একমাত্র তাঁহারই কৃপায়। তিনি সর্বেসর্বা, সর্বনিয়ন্তা,—আর সবই অসার।...এটুকু বুঝিলে সমস্ত অশান্তি-উদ্বেগ, আপদ-বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভবপর।

অপরাহ্নে কুলদানন্দ আসনে ধ্যানমগ্ন। সহসা কুটীরে প্রবেশ করিল কয়েকজন অতি সুন্দরী পাঞ্জাবী যুবতী। প্রণাম করিয়া তাঁহার আসনের সম্মুখে বসিল তাহারা, সিকি-দুআনি দিতে লাগিল। কুলদানন্দ বলিলেন টাকা পয়সা তিনি গ্রহণ করেন না; তবু তাহারা বিরত হইল না। তখন আত্মানন্দকে ডাকিয়া টাকা পয়সা সব দিয়া দিলেন।

একবার ভাবিলেন ধমক দিয়া তাহাদের সরাইয়া দিবেন; কিন্তু অন্তরে বাধা পাইলেন। ভাবিলেন, নিষ্ঠা রক্ষা করিতে গিয়া দম্ভের সহিত কাহারও প্রাণে কষ্ট দেওয়া অন্যায়। বরং শঙ্কায়, বিপদে শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করিয়া নাম করিতে পারিলেই যথার্থ কল্যাণ। মহিলাদের এতদিন বিষধর সর্প মনে হইয়াছে; আজ মনে হইল তাহাদের সর্বদা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা কামভাবের পরিচায়ক। স্ত্রীলোকের সঙ্গ-নিঃসঙ্গ সমজ্ঞান হইলে তবে নিরাপদ, নতুবা বাসনা-কামনার নিবৃত্তি হওয়া দুষ্কর। সাধারণ লোকে স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে অনেক সময়ে নির্বিকার থাকে; আর এতদিন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াও আজো যদি তাহাদের ভয়ে পলায়ন করিতে হয়, তবে আর ব্রত-নিষ্ঠার ফল কী? এছাড়া, নিষ্ঠা ও সংযম রক্ষা করিতে গিয়া অপরের উপর বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক।

কুলদানন্দের এই নৈতিক বিশ্লেষণ তাঁহার প্রকৃত আত্মসংযম ও উদার ভাবের স্বাক্ষর। যুবতীদের সংস্রবে আসিয়া এতদিনে সহজ ও নির্ভয় হইতে পারিয়াছেন তিনি।...ইহা তাঁহার আত্ম-বিবর্তনের সার্থক পরিচয়।...

একদিন নিত্যক্রিয়া ও চা-পান শেষ হইয়াছে। মনে হইল আসনে বসা সার হইবে। পরক্ষণে নাম করিতে বসিয়া ধ্যানযোগে নূতন অবস্থা লাভ করিলেন। বুঝিলেন নাভিচক্র হইতে নাম উঠিতেছে অতি সূক্ষ্ম স্বরে অথচ পরিষ্কার ভাবে। ইহার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন সংস্রব নাই। অনুভব করিলেন কুম্ভকের সময় নাম চলে ভিতরের বায়ুযোগে—তবু বায়ু স্থূল; আর নাম অতি সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট এবং সারবান। জলবিম্বের ন্যায় নাভিচক্র হইতে ঘূর্ণায়মান সেই নাম বায়ু সংযোগে বাহির হইয়া আসিতেছে। আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন

নাম তিনি করেন না, উহার ধ্বনি শ্রবণ করেন মাত্র; আর শ্বাসবায়ু শব্দ গ্রহণে সাহায্য করে।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট হইতে সন্ধ্যার ক্রম শিখিয়া লইয়াছিলেন। প্রত্যহ সেই ভাবে ত্রিসন্ধ্যা করায় সম্প্রতি অনুভব করিতেছেন গভীর আনন্দ। সন্ধ্যার সমস্ত বিধি-অনুষ্ঠান ও প্রণাম-মন্ত্রের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করেন শ্রীগুরুদেবকে। এমনকি পুষ্পচন্দনে, আচমনের জলে, বিভিন্ন চক্রে অনুভূত হয় ঠাকুরের অধিষ্ঠান। স্তবপাঠ কালে প্রণতি জানান শ্রীগুরুর উদ্দেশে। পাপরূপী পুরুষ জলে মিশিয়া গেলে তাহাকে বধ করা বিধেয়; কিন্তু তাঁহার প্রাণে মমতা জাগে। পাপরূপী পুরুষ যদি কেহ থাকেন, তিনিও ভগবানের সৃষ্টি, তাঁহারই লীলা সহচর।...তাই ভগবানের অত্যাচারী পুত্রকে ভগবানের কোলেই সমর্পন করেন তিনি। ত্রিসন্ধ্যা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নয়নমনে ভাসমান থাকে ঠাকুরের অনুপম রূপজ্যোতি। কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: "চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণ আমার ঠাকুরেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা মনে করি। শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে, মন্ত্রের আবৃত্তিতে ইষ্টমূর্তিই বিকাশ পায় দেখিতেছি। ধন্য গুরুদেব! কোথা হইতে আমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিলে।"

কথাটী খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি ছিলেন নিরাকার পরব্রহ্মে বিশ্বাসী, মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। অথচ তিনিই আজ শালগ্রামে, জলে-স্থলে সবত্র দর্শন করিতেছেন শ্রীগুরুর অপরূপ রূপলহরী। মন্ত্রে, কুম্ভকে, ইষ্টনাম স্মরণে, প্রতি নিঃশ্বাসে অনুভব করিতেছেন শ্রীগুরুদেবকে।...সারা দেহমন-প্রাণ, তাঁহার সমস্ত সত্তাই এখন শুধু গুরুময়।...

কয়েক দিন পরে রাত্রি বারোটায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। তন্দ্রায় জাগরণে নাম চলিল সমভাবে। প্রভাত হইলে নিত্যক্রিয়া অন্তে আজ আবার নূতন অবস্থা অনুভব করিলেন। নামজপের সঙ্গে বাহিরের সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হইল। মনে হইল শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন বিরক্তিকর। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভক চলিল স্বাভাবিক গতিতে। মহাপুরুষদের মুখে শুনিয়াছেন নাম ও নামী এক; আজ তাহা উপলব্ধি করিলেন।...

একদিন গঙ্গাতীরে জলের উপর দেখিলেন একটী সুন্দর কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড। এটীও তো চক্রধারী স্বাভাবিক শিলা—ভাবিয়া সানন্দে প্রস্তরটী কুটীরে আনিয়া রাখিয়া দিলেন শালগ্রামের পাশে। একটী ব্রাহ্মণ জালিম সিং প্রেরিত এক

বাক্স চা ও শালগ্রাম-চক্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। যে শালগ্রাম আছেন, তাহা অপেক্ষা এটী সুশ্রী; এইটী পূজা করিবার ইচ্ছা হইল। স্থির করিলেন পরদিন হইতে এটী পূজা করিবেন, আর পূর্বেরটী পবিত্র গঙ্গাজলে বিসর্জন দিবেন। সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের শিলাটীকে বলিলেন: অনেক দিন তোমাতে ঠাকুরের পূজা করেছি। ঠাকুর দয়া করে তোমার মধ্য দিয়ে তাঁর বিস্তর বিভূতিও দেখিয়েছেন। কিন্তু জালিম সিং-এর শালগ্রামটী আরো সুশ্রী; তাই কাল থেকে তাতেই ঠাকুরের পূজা করব।

পাষাণের বুকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন কুলদানন্দ। শালগ্রাম যে জাগ্রত, সে প্রমাণও মিলিল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে শিলাচক্রের দিকে চাহিয়া দেখেন অবাক কাণ্ড!…শালগ্রামের সর্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু,…যেন পদ্মপত্রে শিশির কণা। শিলাটী স্বহস্তে লইয়া পরীক্ষা করিলেন।…তুলসীপত্র শুকাইয়া গিয়াছে, অথচ বাহিরের এই খরতাপে জলবিন্দু আসিল কোথা হইতে?…এটীকে বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন, তাহাতেই কি এই মর্মদাহ?…

সযত্নে শীতল জলে ধুইয়া মুছিয়া সিংহাসনের উপর রাখিলেন শালগ্রামটী। বলিলেন: তোমার আশ্রয় ত্যাগ করব না; পূজা আমি তোমাকেই করব। জালিম সিং-এর শালগ্রাম যেমন আছেন, তেমনি থাকবেন।…

আসন হইতে উঠিলেন বেলা এগারটায়। গৃহকর্ম এবং স্নানাহ্নিক অন্তে আসনে বসিলেন বেলা বারোটায়। শালগ্রামের দিকে চাহিয়া অবাক হইলেন আরো বেশী। দেখিলেন, এবার জালিম সিং-এর শিলাটী ঘর্মাক্ত - সর্বাঙ্গে অসংখ্য স্বেদবিন্দু।…শালগ্রামটীকে গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন এবং সচন্দন তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিয়া রাখিয়া দিলেন। সমস্ত দিনে কোন শালগ্রাম আর ঘামিল না। অবিরত ভাবিয়াও পর্যায়ক্রমে দুইটী শালগ্রামে স্বেদবিন্দু নির্গত হওয়ার কোন হেতু বুঝিয়া পাইলেন না।…বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি আজ স্তব্ধ—সবকিছুই রহস্যময়।…

আশ্রমে আসিলেন আর একজন পরম সুন্দর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—নাম শিবানন্দ। আলাপে জানিলেন তাঁহার একটী সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম আছে, তিনি নিত্য উহা পূজা করেন। গণ্ডকী নদীর তীরে আট ক্রোশ স্থান ঘুরিয়া উহা সংগ্রহ করেন। শালগ্রামটী দেখিতে চাহিলে শিবানন্দ সাগ্রহে দেখাইলেন। দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন কুলদানন্দ। এমন সুন্দর, সুঠাম, সৌষ্টবপূর্ণ শালগ্রাম কীভাবে নির্মিত হইল?…ইহতো অতি সুনিপুণ শিল্পীরও সাধ্যাতীত।…

নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, স্থগোল শালগ্রামটী আপন দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, আশ্চর্য মসৃণ তাহার কলেবর। বহুদিন হইতে এমনি একটা সর্বাঙ্গসুন্দর, অতি সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম পাইবার আশায় আছেন তিনি। কাশীতে, অযোধ্যায়, হরিদ্বারে, কনখলে কত মন্দিরে মন্দিরে সন্ধান করিয়াছেন এমনি মনোমত শালগ্রাম। গোসাঁইজীও বলিয়াছেন সে আশা পূর্ণ হইবে। তবে কি এতদিনে সেই সুদিন উপস্থিত?

শালগ্রামটী পাইবার জন্য প্রকাশ করিলেন ব্যাকুল আগ্রহ। শিবানন্দও খুশী হইয়া জানাইলেন, এক সপ্তাহ মধ্যেই গণ্ডকী নদী হইতে অবিকল এইরূপ একটী আনিবেন, অভাবে তাঁহার নিজেরটী দিবেন।···বলিলেন: গুণী দাদা, জেনে রাখ শালগ্রাম তুমি পেয়েছ।···

বড় আনন্দ কুলদানন্দের। নিশ্চিন্ত হইলেন এতদিনে। এবার তাঁহার মনোসাধ ষোলআনা পূর্ণ করিবেন শ্রীগুরুদেব।

কুলদানন্দ দেখিলেন একটী চমৎকার স্বপ্ন: যেন গেণ্ডারিয়ায় গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কাছে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। গোসাঁইজী তাঁহার মাথাটী পায়ের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন: আঙুল চুষে চরণামৃত পান কর।···আঙুল চুষিতেই মুখ ভরিয়া গেল দুগ্ধের মত সুস্বাদু রসে। কিছুক্ষণ পান করিয়া বিস্মিতভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন পান করলে? চরণামৃত যে অমৃত, তাতে সন্দেহ আছে? তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, এখনও আছে।···ঠাকুর মাথাটী আবার পায়ের উপর চাপিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া চুষিতে বলিলেন; আর সাধ মিটাইয়া তিনিও আবার চুষিতে লাগিলেন। সুগন্ধ, সুস্বাদু চরণামৃত সাগ্রহে পান করিতে করিতে স্বপ্নভঙ্গ হইল।

চরণামৃতের গুণ তাঁহার নিকট অজ্ঞাত, তাহা গ্রহণ করিবার কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু স্বপ্নে এই চরণামৃত পানে লাভ করিলেন অপূর্ব আনন্দ। সারাদিন ঠাকুরের স্মৃতিতে চিত্ত ভরপুর রহিল। ভাবিলেন: আহা! কবে এমন সৌভাগ্য হবে যে ঠাকুরের চরণামৃত পান করে ধন্য হব?···

শিবানন্দের শালগ্রাম দর্শনের পর হইতে মন অহরহ সেইদিকে নিবিষ্ট। দয়াল ঠাকুর যেন ঐ শালগ্রামের মধ্যে অধিষ্ঠিত। শালগ্রামটী পাইবার জন্য মনে জাগে অবিরত দারুণ উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা

জানান, শিবানন্দের সুমতি যেন বজায় থাকে। খেলার পুতুল পাইবার জন্য অবোধ শিশুর সাগ্রহ প্রতীক্ষা যেন।...

এমন সময় উপস্থিত হইলেন শিবানন্দ। বলিলেন : গুণী দাদা, কাল তুমি যেমন একটা চিহ্ন নেবে, আমিও তেমন একটা নিশানী আদায় করব।

: কী আদায় করবে ?

: তোমার রুদ্রাক্ষ ছড়াটী চাই।...

কুলদানন্দের মাথা গরম হইয়া উঠিল। বলিলেন : সহস্র শালগ্রাম দিলেও রুদ্রাক্ষের একটা দানাও দিতে পারব না। এই মালা গুরুদেবের দেওয়া ; অন্য যা হয় তোমাকে দেব।

শিবানন্দ চলিয়া গেলেন। কুলদানন্দের মনে হইল সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম পাওয়া দুরূহ সমস্যা, দুর্লভও বটে ; কিন্তু রুদ্রাক্ষের মালা কাশী হইতে কিনিয়া ঠাকুরের স্পর্শ করাইয়া লইলেও তো হয়।...তাহা করাই তো শ্রেয়।...

ভাবিতে ভাবিতে আসন হইতে উঠিলেন। মালাগুলি খুলিবার সময় হাতে লাগিয়া অকস্মাৎ রুদ্রাক্ষের মালাছড়া ছিঁড়িয়া গেল—ছড়াইয়া পড়িল আসনের উপর। অমনি কুড়াইতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন। একি ! প্রত্যেকটা রুদ্রাক্ষই যে শিবানন্দের এক-একটি শালগ্রাম !!...

স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। সারাদিন ইহার স্মৃতি তাঁহার অন্তর মথিত করিতে লাগিল। এই মালা ও উপবীত চিরকাল ধারণ করিতে বলিয়াছেন গোসাঁইজী।...শালগ্রাম পাইবার অত্যধিক আগ্রহে সেই গুরুদত্ত বস্তু অন্যকে দিবার কথা ভাবিতেই এইভাবে চৈতন্য হইল। ভাবিলেন : আর আমি শালগ্রাম চাইব না। ঠাকুর, তুমি তো আমার কোন কিছুর অভাব রাখনি। জয় গুরুদেব ! তোমার এসব খেলা যেন মনে থাকে।...

আশ্রমে একত্র হইয়াছেন পাঁচ-ছয়জন সমবয়স্ক ব্রহ্মচারী। সকলেই ধর্মপিপাসু কঠোর সাধক। জ্ঞানানন্দ ও বরদানন্দ পূর্ব হইতেই ছিলেন ; সম্প্রতি আসিয়াছেন শিবানন্দ, ঈশ্বরানন্দ ও ফণিদাদা ব্রহ্মচারী। ইঁহাদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনায় দিন কাটে কুলদানন্দের।

দ্বাদশী তিথিতে শালগ্রাম দিতে সম্মত হইলেন শিবানন্দ। আত্মানন্দ সেকথা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'—এই ঋষিবাক্যের দোহাই দিয়া শিবানন্দের অনুপস্থিতিতে শালগ্রামটী সরাইয়া

রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন: শালগ্রাম চতুর্ভুজ হ'য়ে স্বর্গে গেছে; তুমিও কিছুকাল আমাদের সঙ্গ কর, তোমাকেও চতুর্ভুজ করে স্বর্গে পাঠাব।...বেশী গোলমাল করিলে অর্ধচন্দ্র দিয়া তাড়াইয়া দিবেন শিবানন্দকে।

শালগ্রামের জন্য এমনি হীন উপায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করিলেন কুলদানন্দ। জানিতেন ঠাকুরের কৃপায় সময়মত শালগ্রাম ঠিকই জুটিবে।...

দ্বাদশীতে শুভক্ষণ দেখিয়া শিবানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। খুব আদর করিয়া বসাইলেন শিবানন্দ। বলিলেন: শালগ্রাম নিয়ে যাও।

: শুধু শালগ্রাম নয়, তোমার আশীর্বাদও চাই। আশীর্বাদ কর যেন শালগ্রাম আর ফিরিয়ে দিতে না হয়। আমার কয়েকটী শালগ্রাম আছে, তুমি একটী নেও। তোমার শালগ্রাম-পূজায় বাধা দিতে চাইনে।

সন্তুষ্ট মনে সম্মত হইলেন শিবানন্দ। একখানা শুদ্ধ বস্ত্র দিতে চাওয়ায় আরো খুশী হইলেন। শিবানন্দকে নিজের শালগ্রামটী দিয়া তাঁহারটী সসম্ভ্রমে লইয়া আসিলেন কুলদানন্দ। মনোমত সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম পাইবার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল এতদিনে।...

কেশবানন্দ স্বামী আশ্রমে আসিলেন। শিঘ্রই গঙ্গার পুল খুলিলে ব্রহ্মচারীদের থাকিবার ও সাধন-ভজনের অসুবিধা না হয় ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। ফণিদাদার সহিত হরিদ্বারে গিয়া থাকিবেন ভাবিয়াছিলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন, ঠাকুরের সে ইচ্ছা নয়।

ব্রহ্মচারীদের নিকট কুলদানন্দের খুব প্রশংসা করিলেন কেশবানন্দ। সেসব কানে আসিলে একটু গর্ববোধ হইল কুলদানন্দের। ভাবিলেন দোষ সংশোধন যাহাতে হয় স্বামিজীকে তাহা বলিবেন। স্বামিজী ডাকিয়া পাঠাইলেন; কুলদানন্দ উপস্থিত হইলে খুব উৎসাহ দিয়া এখানে থাকিতে বলিলেন। পরে ব্রহ্মচারীদের ভজন-নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন: এখানে যে কয়জন আছেন তাঁদের মধ্যে ফণিভূষণ ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ।...ওঁর আর তুলনা নেই।...

কথাটী কুলদানন্দের অভিমানে আঘাত দিল, বিরক্তি জাগিল স্বামিজীর উপর। স্বামিজী তো কাহারও সঙ্গ করেন নাই, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কী করিয়া বুঝিবেন?...নিশ্চয়ই তাঁহার কোন দোষের কথা কেহ স্বামিজীকে বলিয়াছে।...

ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া আসিলেন কুলদানন্দ। আসনে বসিয়াও মনের বিরক্তি ঘুচিতে চায় না। সহসা গুরুদেবের স্মৃতিতে মোহ ঘুচিল, অভিমান আজো দূর

হয় নাই জানিয়া মনে জাগিল অনুতাপ। বুঝিলেন অপরের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু সুখ সমৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ করা বড় কঠিন।...

শিবানন্দের নিকট হইতে মনোমত শালগ্রাম পাইয়া মন বেশ প্রফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু পূজা করিবার ব্যাকুল আগ্রহ সত্ত্বেও শাস্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থা আজও অজ্ঞাত। নিজের মনোমত নাম জপ করিয়া এতকাল শালগ্রামকে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়াছেন। আশ্রমের সকলকে শাস্ত্রবিধি জিজ্ঞাসা করিলে ফণি ব্রহ্মচারী অতি জীর্ণ একখানি কাগজ আনিয়া দিলেন। একজন নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহুকাল পূর্বে পূজাপদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন; খুশী মনে তাহা লইয়া কণ্ঠস্থ করিলেন কুলদানন্দ। আগামী দ্বাদশীতে ঠাকুরকে শালগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিলেন।

বেলা নয়টায় আসনে তিনি নিঃশব্দ প্রাণায়াম ও নামে নিমগ্ন। সহসা পশ্চাতে বেড়ার বাহিরে ঠিক যেন কাঁধের উপর ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বাহিরে গিয়া দেখিলেন একটী বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প বেড়া ফাঁক করিয়া ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। বরদানন্দ প্রভৃতিকে ডাকাডাকি করিতেই শব্দ শুনিয়া সাপটী অদৃশ্য হইল। বরদানন্দ ও আত্মানন্দ আসিয়া বলিলেন: একটী ভয়ঙ্কর জাতসাপ শিশুগাছের তলায় গর্ত করিয়া আছেন। বাহির হইতে গর্তটী ঠিক আসনের নীচে গিয়াছে; সুতরাং আসনের স্থান পরিবর্তন করা দরকার। এটী বহু পুরাতন বাস্তু সাপ—বাস্তুসাপের দর্শনলাভ দুর্লভ। সৌভাগ্যবশে তিনি এই দেবাংশী সর্পের দর্শন পাইলেন।...

মধ্যাহ্নে আহ্নিক ও হোম অন্তে খুব সরুনালে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিতে লাগিলেন। সর্পটীকে মনে পড়ায় প্রার্থনা করিলেন: সর্পরাজ দয়া করে ক্ষমা কর—না বুঝে তাড়িয়ে দিয়ে অপমান করেছি। দূরে থেকে একবার দর্শন দেও, তোমাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হই।...

নামে নিবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জানালার বাহিরে শোনা গেল সর সর্ শব্দ। চোখ মেলিয়া দেখিলেন, বেড়ার ফাঁক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই বিরাট কৃষ্ণসর্পটী। এক লাফে আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভক্তি ভুলিয়া দারুণ ভয়ে ডাকিতে লাগিলেন ব্রহ্মচারীদের। সর্পটী ততক্ষণে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু সকলে আসিয়া পড়িলে অদৃশ্য হইল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিলেন না কুলদানন্দ। সর্পটীর ঘরে প্রবেশের চেষ্টা কেন? নিঃশব্দ প্রাণায়ামের শব্দে আকৃষ্ট হইয়াই কি?...

আশ্রমে আসিলেন এক পর্যটক সন্ন্যাসী। তাঁহার সহজ সাহচর্যে সকলে আনন্দ লাভ করিলেন। সন্ন্যাসী খুব খুশী হইলেন কুলদানন্দের উপর। তাঁহাকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন—তাঁহার দেহ সাধন-ভজনের বড় অনুকূল; কাজেই এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যাহাতে অনায়াসে ঊর্ধরেতা হওয়া যায়। করজোড়ে নমস্কার করিয়া কুলদানন্দ বলিলেন—গুরুদেব যাহা দেন নাই এমন কোন কিছু তিনি কামনা করেন না; গুরুতে নিষ্ঠা জন্মে এবং ব্যভিচারে প্রবৃত্তি না হয় এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। আনন্দিত হইয়া অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিলেন সন্ন্যাসী।

শালগ্রাম আসিবার পর হইতে প্রত্যহ সন্তোষজনক কিছু না কিছু জুটিয়া যাইতেছে। ভাবিলেন আজ ঠাকুর কী আনেন দেখা যাক। পূজার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় ছোট দাদা প্রেরিত একখানা তসরের ধুতি আসিয়া হাজির। বড় আনন্দিত হইলেন কুলদানন্দ। শিবানন্দকে সানন্দে উহা দান করিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

চণ্ডীপাঠ কালে মনে হইল: চণ্ডী কে? ঠাকুরের কোন্ অঙ্গে চণ্ডীর অবস্থান?···গোসাঁইজীর সম্মুখস্থ জটার কথা মনে পড়িল। একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—সম্মুখের বড় জটাটী ছিঁড়িয়া তাঁহার হস্তে দিলেন গোসাঁইজী। স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন: এই জটা শক্তি। এই জটায় আছেন মায়-কালী, ভগবতী যোগমায়া। গুরুদেবের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিন এই জটার ধ্যানও চলিয়াছে। আজ মনে হইল, তাই বুঝি মা-ভগবতী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আনিয়াছেন আপন স্থান এই চণ্ডীপাহাড়ে। মা-চণ্ডীকে গুরুদেবের জটায় ভাবিয়া স্তবপাঠের সময় উদ্বেল হইয়া উঠিল সারা অন্তর। তাঁহার মনে হইল: গুরুদেব স্বয়ং ভগবান, তাঁহার প্রতি অঙ্গে এক-এক দেবতার অধিষ্ঠান। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও সেই দেবদেহে সংঘটিত।···মা-চণ্ডী আদ্যাশক্তি—সবার উপরে তিনি। তাই ঠাকুর তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন মস্তকে।···জয় মা-কালী! জয় মা-ভগবতী!!

দেবদেবীর প্রতি পূর্বে একটা অশ্রদ্ধা ছিল কুলদানন্দের। আজ মনে হইল: শুধু দেবতা কেন—মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট-পতংগ সমস্তই গুরুদেবের অঙ্গীভূত; সব কিছু লইয়াই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পূর্ণতা।···'সর্ব্বদেবময়ো গুরু' তাহা এতদিন না বুঝিয়া মহা অপরাধ করিয়াছেন।···জয় গুরুদেব—তুমিই সব!···

৮ই শ্রাবণ, ১৩০০। চতুর্থ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য ব্রতের শুভারম্ভ। আজ শালগ্রামের অভিষেক। শালগ্রামে ইষ্টপূজা হয়ত এই বৎসরের প্রধান অনুষ্ঠান।

অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলেন কুলদানন্দ। স্নান, তর্পণ ও ন্যাস অন্তে প্রাণায়াম ও কুম্ভক দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিলেন। পঞ্চগব্য দ্বারা শোধিত করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলেন শালগ্রামকে; গন্ধবারি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সিংহাসনে তুলসীপত্রের উপর স্থাপন করিলেন। অতঃপর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া সকাতরে বলিলেন: ঠাকুর, আজ পর্যন্ত কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখনি; আশাতীত কৃপা লাভ করেছি। শালগ্রাম পূজার প্রবল ইচ্ছা তুমিই প্রাণে দিয়েছ। যেমন বলেছিলে, তোমার কৃপায় শালগ্রামও জুটেছে ঠিক তেমনি। এখন দয়া করে এই শিলার অনু-পরমাণুতে তুমি অবস্থান কর। দেবদেবী বুঝি না, ভগবানকেও জানি না—আমার সুখ-শান্তি, আরাম-আনন্দের তুমিই একমাত্র আধার।··· ক্ষুদ্র আমি—তোমার হাতের এক গণ্ডূষ জলেই আমার তৃপ্তি। তোমার নদী-নালা, সমুদ্রে আমার কী প্রয়োজন? ঠাকুর, যতকাল শালগ্রামে তোমার পূজা করব তাতে যেন তোমার আনন্দ হয়।

আকুল প্রার্থনার পর শালগ্রামটী মস্তকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর বক্ষে ধারণ করিয়া কাতর প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন প্রাণের ঠাকুরকে।···বুক ভাসিয়া গেল আনন্দাশ্রু জলে। পরিস্কার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর সানন্দে শালগ্রামে প্রবেশ করিলেন। মার্বেল পরিমান শালগ্রামটী সহসা খুব ভারী বোধ হওয়ায় সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এই রহস্য, অনুভব করিলেন ঠাকুরের অনন্ত কৃপা। অতঃপর নারায়ণ-পূজা আরম্ভ করিলেন। ১০৮ বার ইষ্টমন্ত্র সহযোগে গায়ত্রী জপ করিলেন। এক একটী সচন্দন তুলসী অর্পণ করিলেন ঠাকুরের প্রতি অঙ্গে।

এই ভাবে তুলসীপত্র দিতে বেলা বাজিল প্রায় তিনটা। তখনও ঝরিতে লাগিল অবিরাম অশ্রুধারা। পূজা অন্তে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী বিস্তর লুচি তরকারি, মোহনভোগ, পায়স আনিয়া উপস্থিত করিলেন বরদানন্দ। সব কিছু ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন পরমানন্দে। পরে সকলে খুব পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন করিলেন। একজন সৎ ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা সিধা প্রস্তুত করিয়া দান করিলেন। সকলে প্রসন্ন হইয়া জানাইলেন আন্তরিক আশীর্বাদ। পূজার পরে কণ্ঠ-শালগ্রাম কৌটায় করিয়া কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিলেন। বুকের ধনকে পরম যত্নে বুকে রাখিয়াছেন ভাবিয়া সারাদিন কাটিয়া গেল গভীর আনন্দে।···

মনোমত শিলার এই অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা, শালগ্রামে গুরুদেবের বোধন ও পূজা, সেই অমূল্য রত্ন বক্ষে ধারণ—সব কিছুই কুলদানন্দের পরাভক্তির অপূর্ব নিদর্শন। গঙ্গাজলের সহিত আজ দেখা দিল অশ্রুজলের সার্থক সমন্বয়—শাস্ত্রীয় পূজার সহিত মানস পূজার জয়জয়কার।·· কুলদানন্দের গুরুনিষ্ঠা ও ঠাকুরপূজা সত্যই আজ বর্ণনাতীত সার্থকতায় ভরপুর, স্বর্গীয় অমৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত।···

সহসা গেণ্ডারিয়া হইতে দুইখানা পত্র আসিল। জনৈক গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন: গোসাঁই বলিলেন যতক্ষণ আনন্দ ও স্ফূর্তি, ততক্ষণ থাকিবে। যখনই থাকিতে ইচ্ছা হইবে না, চলিয়া আসিবে।···যোগজীবন লিখিয়াছেন—বাবা বলিলেন ব্রহ্মচারীকে হরিদ্বার হইতে আসিতে বল। তাঁরই কথামত লিখিলাম।···

পত্র পড়িয়া কুলদানন্দের মনে হইল: ঠাকুরের সঙ্গলাভের অযোগ্য আমি, তবু ঠাকুর আবার ডেকেছেন?··ভাবিতেই চোখে জল আসিল, প্রাণ নাচিয়া উঠিল। অচিরে গেণ্ডারিয়া রওনা হইবার সংকল্প করিলেন।

আসনে বসিয়া নামে নিবিষ্ট হইতেই সে সংকল্প আর রহিল না। গুরুদেবের আকাশব্যাপী ছায়ারূপ ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। কুলদানন্দ প্রার্থনা করিলেন: ঠাকুর, দয়া করে দর্শন দিও না। আদরের বস্তু যতদিন আদর করতে না পারি, ততদিন দর্শন চাই না।···তোমার কৃপায় যদি ভক্তি-বিশ্বাস লাভ হয়, তোমার যাতে যথার্থ তৃপ্তি ও আনন্দ তাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিও; তবেই তোমার ঐ ভুবন-ভুলান মোহন রূপ যেন দর্শন করি।···নতুবা আশীর্বাদ কর, তোমার স্মৃতি নিয়েই যেন এ জীবন শেষ হয়।

তাঁহার মনে হইল: সত্যই তো, প্রকৃত অনুরাগ ভিন্ন গুরুদেবের দর্শনলাভ নিরর্থক। কী লাভ তাঁর নিকট গিয়ে? এই অবস্থায় ঠাকুরের ত্রিসীমায়ও যাব না।···ভাবিয়া সারাদিন ঠাকুরের নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন। দেহমন আবিষ্ট হইয়া রহিল এক অব্যক্ত তৃপ্তি ও আনন্দে।···

বস্তুত, প্রাণের ঠাকুর একান্ত অনুগত ভক্তকে অবিরত শুধু কাছেই টানেন না, নিজেকে আড়াল করিয়াও রাখেন। এই লীলার মধ্য দিয়া তিনি ভক্তের প্রাণে জ্বালিয়া দেন বিরহের আগুন—তাহাকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া প্রাণে সঞ্চারিত করেন মিলনের মহানন্দ।···

কণ্ঠ-শালগ্রামের বহু আকাঙ্ক্ষিত অভিষেক ও পূজা সমাপ্ত হইল। কুলদানন্দের অন্তর আজ যেমন সরস, তেমনই প্রফুল্ল। সন্ধ্যার পর হোমাগ্নিতে ডালরুটি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া লাভ করিলেন নূতন তৃপ্তি, নির্মল আনন্দ।

মনেপ্রাণে অহোরাত্র লাগিয়া থাকে সেই তৃপ্তির আবেশ, সেই আনন্দের স্পন্দন। সর্বদা মনে হয়—ঠাকুর ঠিক মনোমত শালগ্রাম জুটাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার কৃপা সত্যই অনন্ত। নিত্যক্রিয়াগুলি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে। প্রতি অনুষ্ঠানে গুরুদেব এখন একমাত্র লক্ষ্য,··প্রতি কার্যই তাঁহার নিবিড় সম্বন্ধে অমৃতময়।···প্রতিদিন ঠাকুরের নামও এক, ধ্যানও এক—তবু তাহা হইতে প্রাণে জাগে নূতন ভাবোচ্ছ্বাস ও আনন্দধারা।···শুধু জাগরণে নয়, স্বপ্নযোগেও চলিয়াছে তুলসী আর গঙ্গাজলে ঠাকুরের পূজা ও নিত্যক্রিয়া। গুরুদেবের বিচিত্র কৃপা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ের পরিসীমা নাই কুলদানন্দের। মনে হয় গেণ্ডারিয়া যাইবার আর কী প্রয়োজন? যে কয়দিন ঠাকুর এমনি আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখেন, এখানেই থাকিবেন। সাধন-ভজনের প্রতিকূল অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ করিবার উপায় আছে এখানেই। কাজেই ঠাকুরের নিত্য সঙ্গ, মহামায়ার এই নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবেন কোথায়?···

কণ্ঠে শালগ্রাম ধারণ করা অবধি নিত্য পর্যাপ্ত সুখাদ্য আসিতেছে। এই ধন সঙ্গে থাকিলে নাকি দেখা দেয় বিপুল ঐশ্বর্য। সে যে এক দুশ্চিন্তা, আর এক বিষম বিপদ।···

তাহার উপর সুরু হইল মহামায়ার নূতন খেলা। বিষম ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন, মাঝে মাঝে নিজেকেও যেন হারাইয়া ফেলিতেছেন। আর দিব্য পুলকভরে রঙ্গে মাতিলেন মহামায়া। অসামান্যা রূপসী এক তরুণী যুবতীকে লইয়া সুরু হইল এই রসরঙ্গ। সাধু হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন তরুণীটীর স্বামী—আর, তাহাকে প্রেমের নিগড়ে বন্দী করিতে পতিবিরহিণী আসিয়াছে এই আশ্রমে। তাহার কান্নাকাটিতে আত্মানন্দ ও বরদানন্দ তাহাকে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় দিলেন। তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন কুলদানন্দ। শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া তাঁহারা বলিলেন : দাদা! আত্মদানেও বিপন্নকে আশ্রয় দিতে হয়, রক্ষা করতে হয়।···তরুণীকে তাঁহারা ভরসা দিলেন তাহার স্বামীকে যমালয় হইতেও টানিয়া আনিবেন। আর গুণীদাদা কুলদানন্দ একটা

গুণতুক করিলে তো কথাই নাই। তবে গুনীদাদা বড় ক্রোধী ; তরুণী যেন তাঁহাকে খুশী রাখিবার চেষ্টা করে।...

তরুণীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল কুলদানন্দের ভজন কুটীরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে একটী শূন্য ঘরে। আত্মানন্দদের ভরসায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে তরুণীও নিপুণ কৌশলজাল বিস্তারে উদ্যোগী।...তাহাকে সরাইবার জন্য ব্রহ্মচারীদের বার বার বলিলেন কুলদানন্দ, কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হইল। কয়েক দিন পরে তাহার পাঞ্জাবী স্বামীও উপস্থিত হইল। তবুও এখান হইতে যাইতে চায় না তাহারা। একদিন কুলদানন্দ খুব জেদ করিলে পরিষ্কার জানাইয়া দিল—তাহারা আশ্রম ছাড়িয়া যাইবে না, যতকাল ইচ্ছা থাকিবে।...

দূরদেশে নিরাপদ আশ্রমে এ কী নূতন আপদ ?.. বাধ্য হইয়া ক্যানেলের ম্যানেজারের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ম্যানেজার দুইজন চাপরাশি সহ আশ্রমে আসিয়া পাঞ্জাবী দম্পতিকে জোর করিয়া সরাইয়া দিলেন। তখন আশ্রমের বাহিরে একটী বৃক্ষমূলে তাহারা আশ্রয় লইল। সন্ধ্যার পর প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বড় কষ্ট হইতে লাগিল কুলদানন্দের। তাহাদের আশ্রমে আনিয়া রাখিবার জন্য রাত্রে দুইবার খোঁজ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও আর সন্ধান মিলিল না।

পরদিন নিত্যক্রিয়া অন্তে বেলা এগারটায় কুটীরের বাহিরে আসিলেন। বরদানন্দ একখানা কার্ড আনিয়া বলিলেন : ভাই ব্রহ্মচারী, এ স্থান মহামায়ার। এখানে তিনিই সকলকে শাসন করেন, অন্য কারো শাসন তিনি সহ্য করতে পারেন না। দেখ, কাল তুমি একজনকে তাড়িয়েছ—আর আজই তোমার নামে এই সমন।...

কার্ডখানায় কোন গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন : ঠাকুর বলিলেন ব্রহ্মচারী ঢাকা চলিয়া আসুক। তুমি পত্রপাঠ ঢাকা রওনা হইবে। আর যাহা জানিতে চাহিয়াছ, ঢাকায় আসিলে জানিতে পারিবে। পুঃ—আসিতে বিলম্ব করিও না।

পত্র পড়িয়া কুলদানন্দ অবাক। আবার হঠাৎ এই পত্র কেন ? বুঝিলেন : ইতিপূর্বে চিঠি পাইয়াও দুমনা হইয়াছিলেন, গুরুদেবের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাহার মনোভাব বুঝিয়া আবার এই নির্দেশ দিয়াছেন গুরুদেব।.. গেণ্ডারিয়া যাইবার কথা মনে হইতেই তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার সময় গোসাঁইজী অন্যান্য শিষ্যদের বলিয়াছিলেনঃ হরিদ্বারে গিয়ে ঠিকমত চলতে পারলে ব্রহ্মচারী এবার সন্ন্যাসী হবেন, নইলে গৃহস্থালী করতে হবে।···গেণ্ডারিয়ায় ফিরিয়া গেলে ঠাকুর এবার কোন্ পথে চলিতে বলিবেন কে জানে!···

এদিকে হরিদ্বার ছাড়িয়া যাইতে মন একেবারেই চায় না। দিন দিন শরীর সুস্থ হইতেছে, সাধন-ভজনেও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রমে আর কোন উৎপাত নাই। ঠাকুরের নামে ও ধ্যানে দিন কাটিতেছে গভীর আনন্দে। তবু আবার ঠাকুরের এই নির্দেশ কেন?···

কারণ যাহাই হউক, এখানে থাকিতে যতই আগ্রহ জাগুক, ঠাকুরের আদেশ অমোঘ। তাই এই স্থানের উপর বিরক্তি জন্মাইবার জন্য আসনটী তুলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন, আসন তুলিলে সাধুরা সেস্থানে আর টিকিতে পারেন না, অন্যত্র গিয়া আসন না করা পর্যন্ত স্থির হইতেও পারেন না।····বিষম উদ্বেগে কুলদানন্দেরও সাধন-ভজন ছুটিয়া গেল। অবিলম্বে তিনি ঢাকা রওনা হইবার সংকল্প করিলেন।

গেণ্ডারিয়ায় শ্রীগুরুদেবের নিকট যাইবার জন্য ভিক্ষা করিয়া জুটিল সাড়ে ছয়টী টাকা। রওনা হইবার পূর্বে নিকটবর্তী তীর্থগুলি দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। প্রত্যুষে নিত্যক্রিয়া ও চা-পান অন্তে বরদানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া এক্কা গাড়ীতে রওনা হইলেন হৃষীকেশ। পথে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলেন।

পরে উপস্থিত হইলেন ভীমগড়ে। এখানে নাকি ভীমসেন ভাগীরথীর প্রবাহ রোধ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের শান্ত, প্রফুল্ল মূর্তি দর্শন করিয়া পৌছিলেন সপ্তস্রোতে। ভগীরথের অনুসরণ কালে গঙ্গা এইস্থানে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণের আশ্রম পরিক্রমা করেন; পরে আবার মিলিত হইয়া প্রবাহিতা হন একই ধারায়। সপ্তস্রোতের সংযোগস্থলে স্নান ও তর্পণ করিলেন কুলদানন্দ। এখানে দর্শন করিলেন এক মৌনী ব্রহ্মচারী, আর গঙ্গামধ্যে প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান জটাজুটধারী ঊর্ধবাহু এক সন্ন্যাসী। তাঁহাদের ভজন নিষ্ঠা ও কঠোর তপস্যা প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মাভিমান দূর হইল। সপ্তস্রোতের পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র।···তাঁহার সহিত অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর। সপ্তস্রোতের সাধু, সন্ন্যাসী, যাত্রী, পর্বত বৃক্ষলতা সকলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দিবা অবসানে পৌছিলেন হৃষীকেশ।

পরদিন দর্শন করিলেন হৃষীকেশের নানা স্থান, লছমন ঝোলায় লছমনজী ও সতীর তপোবন, কনখলে দক্ষযজ্ঞ স্থান এবং বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। পরিখাবেষ্টিত বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বিল্বকেশ্বর পাহাড়ের দৃশ্য অতীব মনোরম—সাধু সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। তাঁহাদের তপস্যার তেজ কুলদানন্দের অন্তর স্পর্শ করিল।

কুটিরে ফিরিবার পর ব্রহ্মচারী ভ্রাতাদের সহিত একসঙ্গে আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। আসন তুলিয়া লওয়ায় ঘরে, বেলতলায়, গঙ্গাতীরে বসিয়া নাম ও গায়ত্রী জপ করিলেন।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩০০ সাল। আজ ছাড়িয়া যাইবেন এত সাধের, এত সাধনার মধুর হরিদ্বার।

ঘর-বাহির করিয়া কাটিল সারাদিন। মা-গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন: দয়াময়ি, আশীর্বাদ কর যেন আমার ঠাকুরের শ্রীচরণ সকল তীর্থের সার ও মূলাধার জেনে মনে প্রাণে ভক্তি করতে পারি। সুখশান্তি, যা কিছু আরাম ঐ চরণতলে যেন লাভ করি—আর কিছুতেই যেন আকৃষ্ট না হই।...

গঙ্গাস্নান ও আহারান্তে অপরাহ্নে ঝোলাঝুলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলেন। ঘর-বাহির, জিনিষপত্র, বৃক্ষলতা বিদায়লগ্নে যেন বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান।... সবাই যেন জীবন্ত,...পরম আপনার।...ধুনচিতে ধূপধুনা চন্দনাদি জ্বালাইয়া ঘরে বাহিরে সমস্ত বস্তু ও বৃক্ষলতার অভিনব আরতি করিলেন—সকলকে প্রণাম জানাইয়া চাহিলেন আশীর্বাদ।...অতঃপর ব্রহ্মচারী ভ্রাতাদের বিদায় আলিঙ্গন দিয়া রওনা হইলেন ষ্টেশনে। পশ্চাতে রহিল দামপাড় আশ্রম, দীর্ঘ বৃক্ষরাজি, চণ্ডীপাহাড়, দূরে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী। পিছন ফিরিয়া সাশ্রুনয়নে বার বার চাহিতে লাগিলেন—আর শতধারে বর্ষিত হইতে লাগিল মা-চণ্ডীর অক্ষয় আশীর্বাদ, মুক বিশ্বপ্রকৃতির বিগলিত অশ্রুধারা।...

॥ বিশ ॥

জ্বালাপুর। ষ্টেশন মাষ্টারের অনুরোধে প্রথমে গেলেন সেখানে। ধর্ম আলোচনায় সময় কাটিল। পরে জালিম সিংহের বিশেষ অনুরোধে গেলেন সাহারাণপুর। খুব আদর যত্ন করিলেন জালিম সিং। কিন্তু এখানে নামে মন বসিল না, বরং দেখা দিল ভীষণ জ্বালা।···

অতঃপর রওনা হইলেন ফয়জাবাদ। ট্রেণে এক বৈষ্ণব নিষেধ সত্ত্বেও হাওয়া করিলেন সারারাত্রি। অপরিচিত সাধুর কী অযাচিত দয়া! কুলদানন্দের মনে হইল ইহা ঠাকুরের কৃপা, তাঁহারই খেলা।···হয়ত, সেবার এমন সর্বোৎকৃষ্ট আধার সাধুর জীবনেও এই প্রথম।···

সবকিছুর মধ্য দিয়া কুলদানন্দের মন ছুটিয়া চলিয়াছে গুরুদেবের কাছে। ট্রেণের গতি আজ কেন এত মন্থর? জোরে, আরো জোরে কেন উড়িয়া চলে না? ··কেন গিয়া লুটাইয়া পড়ে না ঠাকুরের শ্রীচরণতলে?···

সেই মনোভাব সত্য হইয়া উঠিল মধুর স্বপ্নে।···শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন: পশ্চিমে নানাস্থানে ঘুরিয়া দিনের শেষে উপস্থিত হইলেন ঠাকুরের কাছে। যোগজীবন প্রসাদ আনিয়া দিলেন। কিন্তু ঠাকুর না বলিলে লইবেন কেন? ভাবিয়া বসিয়া রহিলেন, ঠাকুর বলিলে তবে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন প্রসাদের কোন স্বাদ নাই, কিন্তু গন্ধ বাহির হইল – ঠিক যেন ঠাকুরের দেহগন্ধের ন্যায় পদ্মগন্ধ।···সেই মধুর গন্ধে চিত্ত হইল নন্দিত, অবসন্ন। সাগ্রহে প্রসাদ পাইবার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল।···

তবু রহিয়া গেল স্বপ্নের মধুর আবেশ, সচেতন মনে অবচেতন মনের অবদান। সারা অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বার বার মনে পড়িতে লাগিল শুধু গুরুদেবের কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন: যথার্থ প্রসাদ পেলে কোন স্বাদই পাবে না, একপ্রকার সুগন্ধ মাত্র পাবে। ·এতদিনে স্বপ্নযোগে লাভ করিলেন সেই পরম প্রসাদ।···

ফয়জাবাদে পৌছিলে ষ্টেশন মাষ্টার সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাইলেন। পরদিন অযোধ্যা-ঘাটে স্নান ও তর্পণ করিয়া বস্তি পৌছিলেন। সুযোগ পাইয়া একাওয়ালা জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করিল। কণ্ঠ-শালগ্রাম কণ্ঠেই ছিলেন; অন্যান্য

জিনিষপত্র দাদা কিনিয়া দিলেন। তাঁহার স্নেহ-মমতায় কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিল।

কলিকাতায় গুরুভ্রাতা অভয়বাবুর বাসায় পৌছিলেন। শুনিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ক্যানসার রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোসাঁইজীরও গলায় ক্ষত দেখা দেওয়ায় শিষ্যেরা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হন। পথে ষ্টীমারের মধ্যে স্বর্গীয় ডাক্তার তুর্গাচরণ গোসাঁইজীকে বলিয়া দেন—ইহা সাধারণ অসুখ, ক্ষতস্থানে কালোকচুর রস লাগাইলে সারিয়া যাইবে। তাহাই করিয়া গোসাঁইজী সুস্থ আছেন।...

কুলদানন্দের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। অভয়বাবুর সহিত রওনা হইলেন সুকীয়া ষ্ট্রীটে রাখাল বাবুর বাসায়। পৌছিয়া শুনিলেন গুরুদেব দোতলায় আছেন, আহারান্তে ৪টা পর্যন্ত হলঘরের একাংশে পর্দা খাটাইয়া আসনে একাকী বসিয়া থাকেন। বাহিরের সিড়ি দিয়া কম্পিদপদে তিনি উঠিলেন গাড়ী বারাণ্ডায়। সেখান হইতেই মিলিল গুরুদেবের বহুইপ্সিত দর্শন। বহুদিন পরে নয়ন ভরিয়া সুধাপান করিলেন, চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর শান্ত সমাহিত সৌম্য মূর্তি। আকাশে ঘন মেঘের মেলায় সুরু হইল গুরু গুরু গর্জন, আর তাঁহার বুকে জাগিল তুরু তুরু পুলক স্পন্দন। পরক্ষণে লুটাইয়া পড়িলেন সেই গাড়ী বারাণ্ডায়—সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন: ঠাকুর! দয়া করে পাহাড় থেকে যেমন টেনে আনলে, তোমাতে ভক্তি-বিশ্বাস দিয়ে বাকি দিনগুলি তোমারই সঙ্গে রাখ—এই আমার একমাত্র কামনা।...

এই সময় মগ্নাবস্থায় ছিলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দের প্রার্থনায় অস্ফুটে সায় দিয়া মাথা তুলিয়া বসিলেন। চোখ চাহিতেই মুখে ফুটিল স্নেহপূর্ণ অমিয় হাসি। ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন: হরিদ্বার থেকে কবে এসেছ? এখন কোথা থেকে এলে? খাওয়া হয়েছে?...

সাগ্রহে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিলেন গোসাঁইজী। কিন্তু তিনি তো সর্বজ্ঞ, তবু শুধু শেষ প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়িলেন কুলদানন্দ। তখনই যোগজীবনকে ডাকিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: কিছু খাবার এনে দে।

গুরুদেবের আদেশে দিনে আহার, বিশেষত মিষ্টি দ্রব্য গ্রহণ নিষেধ। তবু তাঁহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন গোসাঁইজী—সন্দেশ, রসোগোল্লা প্রভৃতি স্বহস্তে দিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন।

আনন্দের সীমা রহিল না কুলদানন্দের। কিন্তু মনে পড়িল হরিদ্বার রওনা

হইবার পূর্বে ঠাকুরের নির্দেশ। এখন শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া সন্ন্যাস পথে চালাইবেন, অথবা গৃহস্থালী করিতে বলিবেন, ঠাকুরই জানেন। এ সম্পর্কে ঠাকুরের আদেশ জানিবার জন্য মনে ছিল দারুণ উদ্বেগ, এখন তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি আনিয়াছেন চরম শূন্যতা, অথবা পরম পূর্ণতা—তাহাই সবার আগে ঠাকুরের কাছে জানিতে চান। ঠাকুরের সেই নির্দেশের উপর নির্ভর করিবে তাঁহার ভাবী জীবন—ভাগ্যে জুটিবে প্রায়শ্চিত্ত, অথবা সার্থক পুরস্কার।...

এমন সময় গোসাঁইজী খাতায় লিখিয়া কুলদানন্দের হাতে দিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পাহাড়ে পাঠান হয়েছিল তা সফল হয়েছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে অথবা যেখানে ইচ্ছা থাকতে পার। আজই তুমি এখানে আসন আনতে পার।...

গুরুদেবের অসীম দয়ায় কুলদানন্দের চোখে ফুটিল আনন্দাশ্রু। আজীবন যে সংসারের প্রতি তাঁহার এত বিরাগ, পাছে স্বীয় কর্মদোষে সেখানে ঢুকিতে হয়, ইহাই ছিল তাহার প্রধান দুশ্চিন্তা। এতদিনে তিনি সারা জীবনের মত নিশ্চিন্ত হইলেন। গুরুদেবের কাছে তাঁহারই কৃপায় উত্তীর্ণ হইলেন কঠোর পরীক্ষায়; লাভ করিলেন পরম শান্তি, গুরুদেবের অক্ষয় আশীর্বাদ।...

গোসাঁইজী শালগ্রাম দেখিতে চাহিলে উহা কণ্ঠ হইতে খুলিয়া দেখাইলেন। সেইদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: চক্রটী খুব ভাল।

শালগ্রামটী কুলদানন্দের মনোমত হইয়াছিল। এখন গুরুদেবের কথায় অধিকতর আনন্দলাভ করিলেন।

আজই এখানে আসিবার ইচ্ছা গুরুদেবকে জানাইলেন। অভয় বাবুর সহিত ফিরিয়া গিয়া কোনরকমে ভাতে-সিদ্ধ ভাত রান্না করিলেন এবং ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে ঝোলাঝুলি লইয়া উপস্থিত হইলেন সুকীয়া ষ্ট্রীটে। হলঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোসাঁইজী আসন করিয়াছেন। কুলদানন্দ গাড়ী বারাণ্ডায় পৌছিলে বহু ভীড়ের মধ্য দিয়াও তাঁহাকে ডাকিলেন গোসাঁইজী। নিজ আসনের তিন-চার হাত দূরে উত্তর মুখে আসন পাতিতে বলিলেন। কুলদানন্দ সানন্দে আসন পাতিলে গোসাঁইজী ইঙ্গিতে জানাইলেন: দিনরাত তুমি এখানেই থেকো।...গুরুদেবের অসীম দয়ায় কৃতার্থবোধ করিলেন। আসনে স্থিরভাবে বসিয়া গুরুদেবের সান্নিধ্যে নামের মধ্য দিয়া মগ্ন হইলেন তাঁহারই ধ্যানে।...

সন্ধ্যার সময়ে সংকীর্তনের আনন্দে সকলে মাতিয়া উঠিলেন। নির্বাত প্রদীপ শিখার মত গোসাঁইজী তবু একইভাবে সমাধিস্থ। কীর্তনান্তে গোসাঁইজী হরিলুটের বাতাসা ছড়াইয়া দিলেন। অনেক দিন পরে কীর্তনে যোগদান করিয়া এবং গুরুদেবের হস্তে হরিলুটের প্রসাদ পাইয়া খুব তৃপ্তিলাভ করিলেন কুলদানন্দ।

রাত্রি কাটিল সুখ-নিদ্রায়। শেষরাত্র হইতে নিত্যক্রিয়া চলিল নিয়মিত ভাবে। বেলা নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত শালগ্রামকে গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র প্রদান করিলেন। গুরুদেবের নিকট বসিয়া শালগ্রামে গুরুপূজা করিলেন—লাভ করিলেন বিপুল প্রেরণা, বিমল আনন্দ।

জল-কল, পায়খানার অসুবিধায় শৌচ ও রান্না সারিলেন অভয় বাবুর বাড়ীতে। কিন্তু কলিকাতায় ভিক্ষা করার বড় অসুবিধা। অপরিচিত স্থলে কপালে জোটে নিন্দা ও অবজ্ঞা; পরিচিত স্থলে মনে জাগে লজ্জা, সংকোচ ও অভিমান। এই অসুবিধা মনে মনে গুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে গোসাঁইজী একখানা কাগজে লিখিয়া যোগজীবনকে দিলেন। যোগজীবন পড়িয়া শুনাইলেন: ব্রহ্মচারী যতদিন কলিকাতায় থাকবেন অন্যত্র ভিক্ষা করবার দরকার নেই। এখানে থেকে প্রয়োজন মত জিনিষপত্র নিয়ে পাক করে খাবেন। এখানকার সমস্তই ভিক্ষান্ন। ইচ্ছা হলে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করতে পারেন।···এবারও বুঝিলেন কুলদানন্দ তাঁহার উপর ঠাকুরের অনন্ত কৃপা।

কয়েক দিন অভয় বাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিয়াছেন। মেয়েরা সযত্নে সব গোছাইয়া দেওয়ায় রান্নাও করিয়াছেন। অনেক গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে গুরুদেবের অনেক লীলা, কথাবার্তা ও কার্যকলাপ শুনিলেন। হরিদ্বারে থাকায় এসব কিছুই এতদিন জানিতে পারেন নাই। গত চৈত্রমাসে গুরুদেবের জননী স্বর্ণময়ী দেবীর দেহত্যাগ এবং যোগজীবনের দ্বারা শ্রাদ্ধশান্তি ও পিণ্ডদানের কথাও শুনিলেন। গুরুদেবের লীলাপ্রসঙ্গ শুনিয়া খুব আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করিলেন।

জন্মাষ্টমীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সমাধিস্থানে মহা সমারোহে সুরু হইল কীর্তন মহোৎসব। গোসাঁইজী সশিষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া এই মহোৎসবে যোগদান করিলেন; কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছা নয় বুঝিয়া কুলদানন্দের সেখানে যাওয়া হইল না। বেলা তিনটা পর্যন্ত শালগ্রামকে তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া তিনি নিয়ম মত পূজা করিলেন।

পরে গেলেন অভয় বাবুর বাসায়। অভয় বাবুর ভাগিনেয়ী বালিকা সত্যদাসীর কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। গোসাঁইজীর আশ্রিতা এই বালিকা তিন-চার ঘন্টা সমাধিস্থ হইয়া থাকেন, অক্ষর-জ্ঞান না থাকিলেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় স্তবস্তুতি পাঠ করেন। সাধনের সময় গুরুশক্তি প্রভাবে সত্যদাসী আসন হইতে উত্থিত হইয়া কিছুক্ষণ শূন্যে অবস্থান করেন। ধন্য গুরুকৃপা!··· আজীবন কুলদানন্দ বুঝিয়াছেন এই কৃপাই একমাত্র ভরসা।···ব্রাহ্মভাবাপন্ন মোহিনী বাবু ও জ্ঞানবাবুর দীক্ষাগ্রহণ কালীন গুরুদেবের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। গুরুভ্রাতারা গোসাঁইজীকে লইয়া মহোৎসব হইতে ফিরিয়া আসিলে পরমহংস দেবের নানা মহিমার কথা শুনিলেন।

একাদশীর দিনে নাম করিয়া সারাদিন কাটাইবার সংকল্প করিলেন। বেলা তিনটায় তাঁহার শালগ্রাম পূজা শেষ হইল।

অকস্মাৎ গোসাঁইজী আসন হইতে উঠিয়া কুলদানন্দের নিকট শালগ্রামটী চাহিলেন। শালগ্রাম লইয়া বারাণ্ডায় গেলেন—হাতের তালুতে উহা রাখিয়া হরিনামের সহিত নৃত্য করিলেন। পরে শালগ্রামটী কুলদানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া একখানি কাগজে লিখিলেন : ব্রহ্মচারীর শালগ্রামে সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী মহাবিষ্ণু, চারিদিকে ক্ষীরোদ সমুদ্র, গলে বনমালা, কর্ণে কুণ্ডল।··· পরে অস্ফুটে বলিলেন : ভারতে এইরূপ শালগ্রাম আর দুটী আছেন। ইনি ক্ষীরোদার্ণবশায়ী অষ্টভূজ মহাবিষ্ণু।···

একথা শুনিয়া অবাক হইলেন কুলদানন্দ। শালগ্রামে তিনি একমাত্র গুরুদেবের পূজা করেন। তবে গোসাঁইজী কি মহাবিষ্ণু? কিন্তু মহাবিষ্ণু তো অনন্তদেব—সেই অনন্তদেব তো স্বয়ং ভগবান নন।···ভাবিয়া অন্তরে উদ্বেগ বোধ করিলেন। এমন সময় গুরুদেবের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন তাঁহার রূপ খুব সুন্দর ও গৌরবর্ণ।···মনে হইয়াছিল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান।···শালগ্রামে তো গৌরাঙ্গ নাই—গুরুদেব বুঝি নিত্যানন্দ প্রভু।···এখন মনে হইল তাঁহার সন্দেহ দূর করিতেই গুরুদেব গৌর হইলেন। ভাবিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে পুলক-শিহরণ বহিয়া গেল। গুরুদেবের এমন সুন্দর গৌরবর্ণ মূর্তি আর কখনও দেখেন নাই। আজ নিঃসংশয়ে বুঝিলেন শ্রীঅদ্বৈত অভিশাপে তাঁহার দশম পুরুষে অবতীর্ণ গোস্বামী প্রভুই স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু!···

গুরুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : গুরুর চক্ষুতে বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রেখো।···অন্যদিন গোসাঁইজী একপাশ হইয়া বসেন, তাই সকালে ঠাকুরকে

মুখোমুখি দেখিবার জন্য মনে মনে প্রার্থনা করেন কুলদানন্দ। ঠাকুর বুঝি সেই আশা পূর্ণ করিলেন। তিনি আজ সোজা তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছেন, আর সময় সময় চক্ষে ফুটিতেছে সরল সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি।

কুলদানন্দ ভাবিলেনঃ বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু বোঝেন না—শালগ্রামে তিনি গুরুদেবেরই পূজা করেন। গুরুদেব সেই পূজা গ্রহণ করেন কিনা স্পষ্ট বুঝিতে চান।···ফুল-তুলসী গুরুদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে শালগ্রামে অর্পণ করিতে করিতে প্রার্থনা করিলেনঃ ঠাকুর, বাস্তবিক যদি তুমি এর ভিতর থেকে আমার পূজা গ্রহণ কর, তবে আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করলে তা আমাকে জানাও।···

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে পদাঙ্গুষ্ঠে তুলসী দিয়া গুরুদেবের দিকে চাহিলেন। মধুর ভাবাবেশে তাঁহার চক্ষুদুটী অশ্রুভারে টলমল করিয়া উঠিল। হতবাক হইয়া দেখিলেন—চঞ্চল দৃষ্টিতে গোসাঁইজী শালগ্রামের দিকে চাহিয়া নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ করে ধরিলেন, বাম করে করঙ্গ হইতে জল লইলেন, পরে শালগ্রামের দিকে তেমনি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দুই-তিন বার ধুইয়া ফেলিলেন। আবার চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।···

কুলদানন্দের অশ্রুবিন্দু বিগলিত ধারায় ঝরিয়া পড়িল। মনে হইল, গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।···

সন্ধ্যার পূর্বে কুলদানন্দের সহিত ইঙ্গিতে আলাপ আরম্ভ করিলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দ নিরম্বু একাদশী করায় খুব সন্তুষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

হরিদ্বারে নিরম্বু একাদশী করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও পারেন নাই কুলদানন্দ। এখানে তাহা করিয়া এবং গুরুদেবের মধুর উৎসাহ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। গুরুদেবের নিকট জানিলেন প্রকৃতরূপে একাদশী করিতে পারিলে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ ফললাভ করা যায়।

ভোর চারিটায় উঠিলেন কুলদানন্দ, হাতমুখ ধুইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিনের মত দশ মিনিট বিশ্রাম অন্তে গোসাঁইজীও সাড়ে চারিটায় আসনে উঠিয়া বসিলেন। আলমারি খুলিয়া কুলদানন্দের হাতে দিলেন একটা পাথরের বাটী। কতকগুলি রসগোল্লা দেখাইয়া বলিলেনঃ এসব নিয়ে তোমার শালগ্রামকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাও।···

যেন ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্য স্নেহময়ী জননীর অসীম মমতা। আলমারিতে রসগোল্লা ছিল না, তাঁহার শয়নের পর আনাইয়া রাখিয়াছেন গুরুদেব।

এখন সন্তানকে খাওয়াইবার জন্য অস্থির হইয়া বার বার বলিতেছেন ঃ শালগ্রামকে নিবেদন করে প্রসাদ পাও না।...

সত্যই কী আশ্চর্য লক্ষ্য গুরুদেবের! কিন্তু তিনি পড়িলেন উভয় সঙ্কটে। নিরম্বু একাদশী করিয়া আছেন, অথচ এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। শৌচ, স্নান, শালগ্রাম পূজা সবই এখনও বাকি। তবু এখনই রসগোল্লা খাওয়াইতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন গুরুদেব। গভীর মমতাবশে শাস্ত্রীয় প্রথা কি ভুলিয়া গেলেন ?...অথচ তাঁহার আদেশ অমান্য করাও যে একেবারে অসম্ভব।...

দুইকূল বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া বলিলেন ঃ এখনও যে পায়খানা, স্নান কিছুই হয়নি। ব্যস্তভাবে বলিলেন গোসাঁইজী ঃ যাও, যাও—পায়খানায় যাও।

উপবাসী সন্তানকে খাওয়াইতে পারিলেই তবে তাঁহার স্বস্তি। তখনই নীচে গেলেন কুলদানন্দ। শৌচ ও স্নানান্তে আসনে আসিয়া শালগ্রামকে তুলসী প্রদান করিলেন। পরে রসগোল্লা নিবেদন করিয়া তন্ময়ভাবে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের আনীত, স্বহস্তে দেওয়া পরমামৃত।... অধিকন্তু, এক একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন গোসাঁইজী। সে দৃষ্টি স্বস্তি ও তৃপ্তিতে কমনীয়, নিবিড় স্নেহে ও অসীম দরদে পরিপূর্ণ।...পরমানন্দে রসগোল্লা খাইতে লাগিলেন কুলদানন্দ। মনে হইল ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া তাঁহারই কৃপারস-সুধা জীবনে এভাবে আর কখনও সম্ভোগ করেন নাই।...

গোসাঁইজীর চা আসিল। কুলদানন্দের চা খাওয়ার অভ্যাস বহুদিনের, কিন্তু এখানে তাহা খাওয়ার উপায় নাই। তবু আজ তাঁহার চা খাওয়ার বড় ইচ্ছা হওয়ায় মনে মনে বলিলেন ঃ ঠাকুর, এখানে চা খাওয়ার যখন অসুবিধা, আমার চা খাওয়ার স্পৃহা দূর করে দেও।...একান্ত অনুগত শিষ্যের বাসনা আজ পূর্ণ করিলেন গোসাঁইজী, কিন্তু স্পৃহা দূর করিয়া নয়—বরং গভীর মমতায় তাহার তৃপ্তিসাধন করিলেন। দরদভরা দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন কুলদানন্দের দিকে—পাত্র হইতে বাটীতে চা তুলিয়া দিয়া তাহা লইবার জন্য বার বার ইঙ্গিত করিলেন। আশাতীত আনন্দে চাটুকু লইয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন কুলদানন্দ। আজ তাঁহার পরম সৌভাগ্যের দিন।...অতি সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়াও উপলব্ধি করিলেন গুরুদেবের কৃপা কত অসাধারণ।...গভীর আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার চোখে ফুটিল অশ্রুবিন্দু। মনে হইল দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণতলে লুটাইয়া কাঁদিলেই তবে মনের আবেগ মিটিবে।...

এতকাল কুলদানন্দ ধ্যান করিয়া আসিয়াছেন নাভিমূলে। এখন সময়ে সময়ে হৃদয়ে ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয়। একদিন শালগ্রাম পূজার সময় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ধ্যানটী কোথায় রাখব ?

গোসাঁইজী বলিলেন : শালগ্রামে।

সেইভাবে চেষ্টা চলিল ; কিন্তু মন যেন কিছুতেই নিবিষ্ট হইতে চায় না। বার বার অজ্ঞাতসারে ধ্যান আসিতে লাগিল নাভিচক্রে। পুনঃপুনঃ চেষ্টায় শুধু ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে পারিলেন না কিছুতেই। ব্যর্থ মনে হইল সমস্ত ধ্যান ধারণা। একবার মনে হইল ভিতরের একটা নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল যেন। অসহ্য জ্বালা ও বিরক্তিতে কান্না আসিয়া পড়িল।

তখন ধ্যান ছাড়িয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। বড় অভিমান হইল ঠাকুরের উপর। ঠাকুর যখন অন্তরের বস্তু কাড়িয়া লইয়াছেন, তখন তাঁহাকেই স্থানচ্যুত করিয়া সেখানে বসাইবেন অন্য মূর্তি! শিলাচক্র হইতে ঠাকুরকে সরাইতে হইবে—এক আঘাতেই চুরমার করিয়া দিবেন ঐ শিলাচক্র।…দুঃসহ যন্ত্রণায় দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল—ক্ষিপ্ত হইয়া সত্যই বড় সাধের শালগ্রামকে চরম আঘাত হানিতে উদ্যত হইলেন !…

সহসা বাধা পাইলেন নিজের মনে। পলকে সম্বিৎ ফিরিল—মনে হইল : শালগ্রামে ধ্যান করা যায় কিনা ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করাই যাক না।

কুলদানন্দের দিকে চাহিলেন গোসাঁইজী। তাঁহার চোখে মুখে তেমনি ভুবনভুলানো সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি।… কুলদানন্দের চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তকে ও সর্বাঙ্গে দুঃসহ দহন জ্বালা।…গুরুদেব চাহিতেই রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে তিনি জানাইলেন নিজের ব্যর্থতার জ্বালা। বলিলেন : নাভিচক্রে ধ্যান ছেড়ে শালগ্রামে ধ্যানের চেষ্টায় অসহ্য কষ্ট ভোগ কচ্ছি। জীবনে এমন কষ্ট আর কখনও পাইনি।…মনে হ'চ্ছে প্রাণের একটা বস্তু আপনি যেন ছিঁড়ে নিয়েছেন।

শান্তভাবে সান্ত্বনার সুরে বলিলেন গোসাঁইজী : প্রথম প্রথম শালগ্রামে ধ্যান করতে পারবে কেন ? তুমি ভিতরেই ধ্যান করো, ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে করতে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে।….একটু পরে আবার বলিলেন : শালগ্রাম পূজা বড়ই কঠিন। মূলাধার প্রভৃতির কেবল একচক্রে সহজে মনস্থির করা যায় ; কিন্তু শালগ্রাম চক্রে মনস্থির করা সহজ নয়। দৃষ্টিসাধন ও যোগভ্যাসের পর শালগ্রাম-চক্র ভেদ করতে পারলে এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত

হয়। তখন প্রতি পরমাণুতে বিষ্ণুদর্শন করা যায়। এজন্যে প্রাচীনকাল থেকে ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম-চক্র পূজা ও ধ্যান করে আসছেন।

যেন মন্ত্রগুণে এতক্ষণে সুস্থ হইলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন হৃদয়ে বা দেহস্থ অন্য কোন চক্রে ধ্যান করা অপেক্ষা শালগ্রামে ধ্যান করা যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনই দুরূহ। কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছা, আপ্রাণ চেষ্টা সবই যে বৃথা। তখন গুরু-নির্দেশ পালন করিতে গুরুদেবের নিকটেই শক্তি প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে শালগ্রাম পূজায় বসিলেন। ভাবিলেন নাভিচক্রে ধ্যান করিলেও মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য শালগ্রামে দৃষ্টি রাখিবেন ; পরে সময় মত সবই করাইয়া লইবেন গুরুদেব। এই নির্ভরতা লইয়া শালগ্রামকে প্রণাম করিলেন—উহাতে ধ্যান রাখিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন গুরুদেবের শ্রীচরণে। পরক্ষণে শালগ্রামে দৃষ্টিপাত করিতেই সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন গুরুদেবের আশ্চর্য কৃপা। কাল যাহা দুঃসাধ্য ছিল আজ তাহাই হইল সহজসাধ্য। শালগ্রামের ভিতর গুরুদেবের অনন্ত রূপে মনপ্রাণ আকৃষ্ট হইল—চিত্ত হইল নিবিষ্ট, অটল !···তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল একই ভাবে। নিজের অবস্থায় নিজেই বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। ইচ্ছা করিলেও নাভি বা হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে আর ভাল লাগে না—শালগ্রামেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। ঠাকুরের পাশে বসিয়া শালগ্রামে ঠাকুরের পূজা—গুরুকৃপায় ইহা সত্যই এক আশ্চর্য অনুভূতি।··· কোন জ্বালা, কোন অস্বস্তি আর নাই—দেহে মনে আছে শুধু অব্যক্ত শান্তি,··· সুধাস্রোতে নিমজ্জিত হইবার অপার্থিব আনন্দ।··

গোসাঁইজী এই সময়ে বার বার অপাঙ্গে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখেমুখে কী অপরূপ শোভা, নয়নে সে কী স্বর্গীয় দ্যুতি !···তাঁহার চোখে চোখ পড়িতেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন কুলদানন্দ, গভীর ভাবোচ্ছ্বাসে গণ্ডদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।···

শালগ্রাম পূজা অন্তে ভাগবত পাঠে উদ্যোগী হইলেন। গোসাঁইজী বলিলেন : শালগ্রাম পূজা করে উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করো—আর নমস্কার-মন্ত্র পড়ে শালগ্রামকে নমস্কার করো। এতে সঙ্কোচ করো না।

শালগ্রাম পূজার পর মনে মনে 'নমস্তে সতে···' ইত্যাদি স্তব প্রতিদিন পাঠ করেন কুলদানন্দ। কিন্তু নমস্কার-মন্ত্রটী পাঠ করিতে অনেক সময় খেয়াল থাকে না। হরিদ্বার যাওয়ার পূর্বে গেণ্ডারিয়ায় গোসাঁইজী স্বহস্তে একটী নমস্কার-মন্ত্র লিখিয়া দেন। তিনি বলেন : রাত্রে শয়নকালে এবং ঘুম থেকে

ওঠবার সময়, সাধন করতে বসে এবং সাধনের পর এই মন্ত্র পড়ে নমস্কার করো। ভগবৎ বুদ্ধিতে যখন যেখানে নমস্কার করবে মন্ত্রটী পড়ে করো। ভগবানের অন্তর্ধান কালে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঋষি-মুনি, দেব-দেবী, যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করেছিলেন। মন্ত্রটী পড়ে নমস্কার করলে তা ভগবানের চরণে পৌছাবে এরূপ বর আছে।...

এই বলিয়া স্বহস্তলিখিত নমস্কার-মন্ত্রটী গোসাঁইজী কুলদানন্দের হাতে দেন এবং সকলকে জানাইতে বলেন। মন্ত্রটী এই :

" ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ "

আজ সেই মন্ত্রপাঠ করিয়া শালগ্রামের উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম করিলেন কুলদানন্দ।

॥ একুশ ॥

গোসাঁইজীর প্রভাবে ও সঙ্গলাভে সর্বকার্যে কুলদানন্দ এখন বেশ নিয়মানুবর্তী। ভোর চা'রটায় দশ-মিনিট বিশ্রাম করিয়া করতাল বাজাইয়া উষাকীর্তন সুরু করেন গোসাঁইজী। অমনি কুলদানন্দ নীচে নামিয়া যান, শৌচান্তে গঙ্গাস্নান ও তর্পণ করিয়া পূজার জন্য ফুল-তুলসী সংগ্রহ করেন। হোম ও প্রাণায়াম অন্তে সাতটায় ঠাকুরের সহিত চা সেবা করেন। প্রথমে কুলদানন্দের জন্য চা বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু গোসাঁইজী দুই-তিন দিন নিজের চা হইতে প্রায় অর্ধেক ঢালিয়া দেন ; ফলে তাঁহারও জন্য চা আসিতে থাকে। আবার, তাঁহার জন্য চা আসিতে একটু দেরী হইলে অমনি গোসাঁইজী তাঁহাকে চা দিয়া ফেলেন। কুলদানন্দ বোঝেন তাঁহার জন্য চা'এর ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে গুরুদেবের এই মধুর কৌশল। চা পান অন্তে ন্যাস, শালগ্রাম পূজা, গুরুদেবের নিকট গ্রন্থপাঠ, নামসাধন সবই চলে নিয়ম মত। অপরাহ্নে ঘড়ি দেখিয়া রান্না করিতে বলেন গোসাঁইজী। অমনি ভিতরে যান কুলদানন্দ, উনুন ধরাইয়া ভাতে-সিদ্ধ ভাত রান্না করিতে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া যায়। ডাল বা তরকারী রান্না করিতে বলিয়া কুতুবুড়ী জিদ প্রকাশ করেন। সময় হইয়া ওঠে না বলিয়া চা'রটায় উনান ধরান, রান্নার জিনিষপত্রও গোছাইয়া দেন।

কুতুর মমতা ও সহানুভূতি সত্যই গভীর। তাঁহার প্রতি কুলদানন্দের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় যেন।...

হোমের পর রান্না, আহার, বাসন মাজা প্রভৃতি করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। গুরুদেবের আদেশে তখন সুরু করেন শালগ্রামের আরতি। সন্ধ্যা কীর্তন সুরু হইলে বারাণ্ডায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টায় সংকীর্তন শেষ হয়; তখন নিজ আসনে আসিয়া বসেন। রাত্রি নয়টা হইলে গোসাঁইজীর ইঙ্গিতে শয়ন করেন এবং গুরুদেবের আহারের পূর্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ঘুম ভাঙ্গে রাত বারোটায়। হাতমুখ ধুইয়া আসনে বসেন এবং একখানা বড় পাখা হাতে গুরুদেবকে হাওয়া করিতে থাকেন। এই সময়ে গুরুদেবের সঙ্গে গল্প, আলাপ ও নানা প্রশ্নের মীমাংসা চলে। পরে সমাধিস্থ অবস্থায় গোসাঁইজী নিজ হইতে যাহা বলেন মনোযোগ দিয়া তাহা শ্রবণ করেন। রাত্রি চারটায় গুরুদেব উষাকীর্তন আরম্ভ করিলে তিনি শৌচে চলিয়া যান। নিত্যক্রিয়া এইভাবে চলে ঠিক সময় মত।

কিন্তু সুকীয়া ষ্ট্রীটের এই বাসায় আসিয়া বিস্তারিত ডায়েরী লেখা তাঁহার পক্ষে বড় দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। উদয়াস্তের মধ্যে পনের মিনিটের জন্যও অবসর নাই। বিকালে ও রাত্রে ঠাকুরের যে অমূল্য উপদেশ শুনিয়া থাকেন, পেনসিল দিয়া আলগা কাগজে তাহা লিখিয়া রাখেন। কিন্তু দিন-তারিখ অনেক সময় ঠিকমত তুলিয়া নেওয়া হইয়া ওঠে না। মধ্যাহ্নে শৌচ, স্নান ও আহারের জন্য গোসাঁইজী বাড়ীর ভিতর যান; তখন সেই নির্জন অবসরে আলগা কাগজে নিজের লেখার ও গুরুদেবের লিখিত খাতার যথাসাধ্য নকল করেন। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের কিছু উলটপালট হইলেও এইভাবে লিখিয়া চলিলেন তাঁহার অমূল্য দিনলিপি। নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যা-পূজা, সাধন-ভজন প্রতি মুহূর্তে সবকিছুর মধ্যদিয়াও এই অত্যাবশ্যক কার্যটী চলিল সমান গতিতে।

একদিন উনুন ধরাইয়া রান্না করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। নির্ধারিত সময়ে গুরুদেবের নিকট যাওয়া হইবে না ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন কুলদানন্দ। উত্তপ্ত খিচুড়ি নিবেদন করিয়া শালগ্রাম তখনই কৌটায় বন্ধ করিলেন। প্রত্যহ ভোগ নিবেদনের পর শালগ্রামের সম্মুখে ধূপধূনা জ্বালাইয়া একটু সময় বসিয়া থাকেন। আজ আর সে অবসর মিলিল না; তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া উপস্থিত হইলেন গোসাঁইজীর নিকট।

সহসা খুব ব্যস্ততা দেখাইয়া বলিলেন গোসাঁইজী: শিগগির শালগ্রাম বের কর—ভোগ দিয়েই কৌটায় বন্ধ করে রেখেছ? গরমে ঠাকুর যে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছেন, হাত গুটিয়ে বসে কষ্ট প্রকাশ কচ্ছেন! বের করে শিগগির বাতাস কর—এই পাখা নেও।...

তৎক্ষণাৎ কৌটা খুলিয়া দেখেন শালগ্রামের সর্বাঙ্গে ফুটিয়াছে স্বেদবিন্দু।... দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন কুলদানন্দ, চক্ষুদুটীও অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ভাবিলেন—হায় ঠাকুরকে এত কষ্ট দিলাম!... চোখের জলে শালগ্রামকে হাওয়া করিতে লাগিলেন। সাতটা পর্যন্ত হাওয়া করার পর তবে ঘর্ম শুকাইয়া গেল।

গোসাঁইজী বলিলেন: এখন শালগ্রাম কৌটায় রাখ—ভোগ দিয়ে আরতি করো। একখানা চামর আনিয়ে নেও, চামরের হাওয়া বড় ঠাণ্ডা। তাই দিয়ে শালগ্রামকে হাওয়া করতে হয়।...

দুদিনের মধ্যে চামর আসিল। গোসাঁইজী কাঁসরের কথা বলায় অভয়বাবু আনিয়া দিলেন ছোট একখানি কাঁসর। আরতির সময় গোসাঁইজী স্বয়ং উহা বাজাইতে সুরু করিলেন।

শালগ্রামের আরতির সময় সুরু হইল বড়ই ধুমধাম। তালে তালে খোল করতাল বাজে, আর পরমানন্দে কুলদানন্দ শালগ্রামে করেন গুরুদেবের আরতি। অনেকের মধ্যেই জাগিল প্রচুর উৎসাহ ও আনন্দ। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মভাবাপন্ন, শালগ্রামের আরতিতে তাঁহাদের অন্তরে উঠিল ক্ষোভ ও বিস্ময়ের ঢেউ। বিশেষত গোসাঁইজীকে কাঁসর বাজাইতে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন: একি! গোসাঁই কেন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন?...আবার গোঁড়া হিন্দু গুরুভ্রাতারা বলিলেন: গুরুদেবের নিকটে শালগ্রামের আরতি! এ আবার কেমন পূজা?...ব্রাহ্ম এবং হিন্দু সকলেই বিরোধী ও অসন্তুষ্ট। এই দোটানায় পড়িয়া কুলদানন্দ ভাবিলেন গুরুদেবই একমাত্র ভরসা।...

একদিন সকালে জননীকে দেখিবার জন্য বড় অস্থির হইয়া উঠিলেন। ফয়জাবাদ হইতে চণ্ডীপাহাড় যাইবার দিনে একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নে মায়ের উপর করিয়াছিলেন নিষ্ঠুর ব্যবহার। ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে গোসাঁইজী আসনে বসিলে নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করিলেন। সবই যেন জানেন এইভাবে ঈষৎ হাস্যমুখে গোসাঁইজী বলিলেন: হ্যাঁ হ্যাঁ—স্বপ্নটী বল না শুনি।

কুলদানন্দ বলিলেন : স্বপ্ন দেখলাম—কুতু, মা-ঠাকরুণ ও যোগজীবনের সঙ্গে আপনার কাছে বসে আছি। সহসা আমার মা এসে একটু দূরে আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলেন। আপনি একখানা খাঁড়া দিয়ে মাকে বধ করতে বললেন—অমনি আমি খাঁড়া নিয়ে ছুটলাম। ভাবলাম আপনার আদেশ মত মাকে বধ করি, পরে আপনার পায়ে পড়ে কেঁদে মাকে আবার বাঁচাবো। মা'র কাছে গিয়ে এক আঘাতে তাঁকে দুভাগ করে ফেললাম। পরক্ষণে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম—খাঁড়া হাতে নাচতে লাগলাম। আপনি ছুটে গিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমি স্থির হলাম। আপনি বললেন—এর চিহ্নও রাখতে নেই, মাটিতে পুতে ফেল।···আমিও একটা গর্ত করে মাকে পুতে ফেললাম। তখন আপনি আমাকে হাতে ধরে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গেলেন। অমনি আমি জেগে পড়লাম।

খুশীভাবে বলিলেন গোসাঁইজী : সুন্দর স্বপ্ন দেখেছ—ওকথা ভেবে উদ্বেগ কেন ? ঐ মা তোমার গর্ভধারিণী নন, মায়া-পিশাচী মাতৃরূপে আড়াল থেকে তোমাকে উঁকি মেরে দেখছিল—তাকেই বধ করেছ।···

স্বপ্নটীর কথা ভাবিয়া অনেক দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করিয়াছেন কুলদানন্দ। আজ এতদিনে তাঁহার প্রাণ শান্ত হইল। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন : স্বপ্নে কি জীবনের যথার্থ উন্নতি হতে পারে ?···

: খুব পারে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন দুই-পাঁচ মিনিটের স্বপ্নে কেটে যায়। সব স্বপ্নই অলীক নয়।···

কুলদানন্দের মনে পড়িল গুরুভ্রাতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার কথা। তিনি বলিয়াছিলেন—প্রথম রাত্রে জন্ম হইতে বাল্যকাল, দ্বিতীয় রাত্রে যৌবন এবং তৃতীয় রাত্রে বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু, এইভাবে পর পর তিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এক জন্মের ভোগ শেষ হইল তিন রাত্রির স্বপ্নে।···

কুলদানন্দের অন্তরে আবার দেখা দিল দারুণ উদ্বেগ। মনে হইতে লাগিল: গুরুদেবের স্নেহযত্ন ও ভালবাসার অন্ত নেই, শ্রীঅঙ্গের সুশীতল স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে হিংসার জ্বালা তিনি জুড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের জন্যে আমি কী কচ্ছি ?···তাঁর অবিরাম কৃপাবর্ষণ এখনও যে অনুভূতির বাইরে! তবু তাঁরই কৃপায় অসাধারণ অবস্থা লাভ করে যদি তা সম্ভোগ করতে না পারি, তবে গুরুদেবের এই কৃপাবর্ষণের কী প্রয়োজন ?···

কিছুদিন হইতে দুইটী অবস্থা লাভের জন্য অন্তরে সর্বদা প্রার্থনা জাগিতেছে। আজ মনে মনে তাহা নিবেদন করিলেন শ্রীগুরুচরণে: ঠাকুর, যদি সত্যিই আমাকে সুখী ও কৃতার্থ দেখতে চাও, তবে তোমাতে স্বাভাবিক স্থির বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তি-ভালবাসা দেও। আমাকে চিরদিনের মত আপনার করে নেও! নতুবা অন্তর থেকে তোমার স্মৃতি ও সংস্রবের চিহ্ন নিঃশেষে মুছে দেও। এই শুষ্কতা ও অবিশ্বাসের জ্বালায় জীবন যে আজ সত্যই একটা বিড়ম্বনা।···সারা দিন নামের সঙ্গে অবিরাম চলিল এই প্রার্থনা। রাত্রে শয়ন করিলেও হুল ফুটাইতে থাকে এই ব্যর্থতা ও অক্ষমতার জ্বালা। ছটফট করিয়া কাটিল বহুক্ষণ—গভীর রাত্রে তিনি নিদ্রামগ্ন হইলেন।

অন্যান্য দিনের মত আজ আর ঠিক সময় মত ঘুম ভাঙ্গিল না। গোসাঁইজী বার বার হাতে তালি দিয়া জাগাইয়া তুলিলেন। ঘুমের ঘোরে তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কী স্বপ্ন দেখলে?

কুলদানন্দ বলিলেন: দেখলাম—একটা আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিফল হ'লাম। একান্ত নিরাশ ও অবসন্ন ভাবে 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলে কাঁদতে লাগলে আপনার সমাধি ভেঙ্গে গেল। আমাকে কাছে দেখে নমস্কার করলেন, আর পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ালেন। মনে হল গুরুকে পাদস্পর্শ করতে দেওয়া তো মহাপাপ! পরক্ষণে মনে হল—আমি তো দিতে চাইনে, তিনিই নিতে চান; তাঁর যাতে তৃপ্তি তাতে বাধা দেব কেন? তাঁর দ্বারা কোন অনিষ্ট বা অকল্যাণ হবে না। আর গুরু কোন্ কাজে কীভাবে কল্যাণ করেন কে জানে।···ভেবে আমি আর আপত্তি করলাম না। আপনি পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমাকে কোলে নিতে হাত বাড়ালেন, অমনি আমি শিশুর মত আপনার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।···আমার সর্বাঙ্গে আপনি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম—আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।···এমন সময় আপনার হাত তালিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

স্বপ্নের কথা শুনিয়া খুশীভাবে মাথা নাড়িলেন গোসাঁইজী। হাত-মুখ ধুইয়া কুলদানন্দ গুরুদেবকে হাওয়া করিতে লাগিলেন। একটু পরে অবাক হইয়া দেখিলেন গুরুদেব ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন, আর তাঁহার দিকে এক একবার চাহিতেছেন।···নীরবে ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবদ্ধ হইল মুগ্ধ, ভক্তিনত দৃষ্টি,···উদ্বেল হৃদয়ে নাম চলিল অভিভূতভাবে।

এই অপূর্ব স্বপ্নের তাৎপর্য কী তাহা ব্যক্ত করেন নাই গোসাঁইজী। কুলদানন্দও তাঁহার দিনলিপিতে এ সম্পর্কে একেবারেই নীরব। অথচ গভীর-ভাবে অনুধাবন করিলে বোঝা যায় স্বপ্নটী সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব ও তত্ত্ব নিঃসংশয়ে সাধারণের ধারণাতীত। তবু মনে হয় বাস্তবে যাহা অপ্রাকৃত, স্বপ্নযোগে প্রকাশিত হইল সেই অনন্ত চিরমধুর লীলারহস্য।... অপরিসীম স্নেহ ও ভক্তির বেদীমূলে লোকচক্ষুর অগোচরে অভিনীত হইল এই স্বর্গীয় দৃশ্য।...

কিছুকাল হইতে গ্রন্থপাঠের সময় কুলদানন্দের মনে হইয়াছে প্রতি শাস্ত্রগ্রন্থ গুরুদেবের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রে তাঁহার অন্তরে চলিয়াছে গুরুদেবেরই মানসপূজা। শিলাচক্রেও চলে গুরুদেবের ধ্যান ও ধারণা, পূজা ও আরতি। স্নান-তর্পণ, হোম-ন্যাস, সাধনভজন, পাঠ ও প্রার্থনা, প্রতিপদে প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার সম্মুখে অধিষ্ঠিত ধ্যানের দেবতা, প্রাণপ্রিয় গুরুদেব।...আসন-বসন, পুষ্প-বৃক্ষলতা, আকাশ-বাতাস, সারা ত্রিভুবন তাঁহার চক্ষে শুধু গুরুময়!...

এইরূপে শ্রীগুরুর সঙ্গসুধা অহোরাত্র সম্ভোগ করায় কুলদানন্দ সদাই উদ্‌ভ্রান্ত। গুরুদেবের শ্রীচরণে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করিয়াও তাঁহার আজো তৃপ্তি নাই। ভক্তিসিন্ধুর বিপুল প্লাবনে তাইতো তিনি চান আত্মবিসর্জন।... অন্তর্যামী গোস্বামী প্রভুও কিছুদিন পূর্বে ইহার সূচনা দেখিয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন আত্মহারা শিষ্যের পুষ্পাঞ্জলি। আজো তিনি স্বপ্নযোগে সাগ্রহে হয়ত গ্রহণ করিলেন শ্রেষ্ঠ ভক্তের পদধূলি।...এইভাবে প্রকাশ করিলেন নিজের অপার স্বর্গীয় মহিমা,...আর স্নেহাভিষিক্ত মানস পুত্রের পুণ্যগাঁথা।...

স্বপ্নের বিবরণে দেখিতে পাই পরক্ষণেই গোসাঁইজী দিলেন ব্যাকুল আলিঙ্গন, আর কুলদানন্দও অশ্রুগঙ্গায় ধৌত করিলেন তাঁহার যুগল চরণ।... স্নেহ-ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গুরু ও শিষ্য আজ যেন অভেদ,...ভক্ত ও ভগবান সত্যই যেন একাকার!...তাই কি স্বপ্নকথা বলিবার পর অপার্থিব আনন্দে ধ্যানমগ্ন গোসাঁইজীর এই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন?...

রাত্রি তিনটা। একমনে গুরুদেবকে হাওয়া করিতেছেন কুলদানন্দ। সহসা দেখিলেন গুরুদেব চরণ দুখানি প্রসারিত করিয়া নিজেই টিপিতেছেন। তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের পদসেবা সুরু করিলেন।

ক্ষণকাল পরে গোসাঁইজী বলিলেন: একি! তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নারায়ণটীও যে আছেন!…আহা – কেমন সুন্দর সূর্যমণ্ডল, তার মধ্যে নারায়ণ।… এমন উৎকৃষ্ট চক্র বড় দেখা যায় না।…

অনেকক্ষণ ধরিয়া এই শালগ্রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন গোসাঁইজী। পরে ভাবাবেশে অধীর হইয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন।…বহু ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করিলেন।…

বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিলেন কুলদানন্দ। অনেক কিছু শুনিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেবতাদের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়া গুরুদেবের চরণ ছাড়িয়া দিলেন; ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিজ আসনে গিয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।…

একটু পরে গোসাঁইজী তাঁহার দিকে চাহিয়া শিশুর মত আবদারের ছলে বার বার খাবার চাহিতে লাগিলেন। গুরুদেবের হাতে একটু মিষ্টি ও কমণ্ডলুর জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: এবার কি আমার শ্রদ্ধাভক্তি লাভ হবে? বিশ্বাস জন্মাবে?….

: হ্যাঁ—তা নিশ্চয়ই।

: একটীবার এক মুহূর্তের জন্যও যেন ভক্তি-বিশ্বাস ও ভালবাসার চোখে আপনাকে দেখে আমার মৃত্যু হয়!…তাহলে জীবন আমার সার্থক মনে করব।

: যেরূপ ধ্যান-পূজা করছ, তাই কর। তাতেই ক্রমে ভক্তি-বিশ্বাস সব হবে।…অনেকে বলে অলৌকিক কিছু দেখলে বিশ্বাস আসবে; কিন্তু তা ভুল। ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ হয়। তুমি কি অলৌকিক কিছু দেখতে চাও?

: না—অদ্ভূত কিছু দেখে যদি তা আপনার চেয়ে ভাল লাগে তাহলেই তো সর্বনাশ! সুন্দর কিছু দেখবার ইচ্ছা আমার যেন না হয়।

: যেমন কচ্ছ করে যাও—ওতেই সব হবে।…

গোসাঁইজী চোখ বুজিলে নিশ্চিন্তে বাতাস করিতে লাগিলেন কুলদানন্দ।

শালগ্রামে নিষ্ঠা দূর করিবার জন্য গুরুভ্রাতারা অনেকে প্রতিদিন নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কুলদানন্দ দেখিলেন গুরুদেবের দয়া ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহাকে শান্ত রাখিতে গোসাঁই সর্বদা উন্মুখ। শালগ্রাম পূজায় উৎসাহ দিবার জন্য স্বহস্তে ভোগ প্রস্তুত করিয়া দেন। কখনও ডাব বা সরবৎ আনাইয়া রাখিয়া দেন শালগ্রামের জন্য। প্রায় তিনটায় শালগ্রাম পূজা শেষ

হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ করেন কুলদানন্দ। বোধ হয় সেইজন্য ঐসময়ে কিছু খাবার শালগ্রামকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে বলেন গোসাঁইজী। কোন দিন আবার মিষ্টি খাবার আলমারি হইতে বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলেন: খেয়ে নেও। শালগ্রামের প্রসাদ হয়েছে—খেয়ে ফেলো।…শালগ্রামকে নিবেদন করিতে সময় লাগে দু-পাঁচ মিনিট। ততটুকু দেরীও যেন সহ্য হয় না গোসাঁইজীর।…নিজেই শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া খাইতে দেন।

অতি সামান্য বিষয়েও গুরুদেবের কত লক্ষ্য, কত অসীম দয়া। ভাবিয়া উৎসাহে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন কুলদানন্দ। কিন্তু গুরুভ্রাতাদের ক্ষোভ ও বিরক্তি তত বৃদ্ধি পায় যেন।…

শালগ্রাম পূজার সময়েও মাঝে মাঝে তাঁহার দিকে নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে চাহিতে থাকেন গোসাঁইজী। সম্মুখের জটা মুখের উপর ধরিয়া উহার ভিতর দিয়া দুষ্ট বালকের মত তাকাইতে থাকেন; কুলদানন্দের দৃষ্টি পড়িবা মাত্র আবার মুখ ঢাকিয়া ফেলেন। স্নেহপ্রতিম শিষ্যের সহিত এইভাবে চলে তাঁহার অপূর্ব লুকোচুরি খেলা।…ঠাকুরের চোখে চোখ পড়িলে আত্মহারা হইয়া পড়েন কুলদানন্দ। সারাদিন মনশ্চক্ষে ঝলমল করে গুরুদেবের সেই মধুর বিচিত্র চাহনি। মনে হয় ঠাকুর যেন তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন অনুপম সুধার স্রোতে।…

নামজপ করার সঙ্গে সঙ্গে কুলদানন্দের অন্তরে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে মনোহর ইষ্টমূর্তি। নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হেতু তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বাসনা জাগে। ইষ্টদেবে সর্বোত্তম ভাব আরোপ করিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয়। ইষ্টদেবের স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার মধ্য দিয়া গড়িয়া ওঠে একটা স্থায়ী সম্পর্ক। কিন্তু কুলদানন্দ অনুভব করেন গুরুদেবের উপর তাঁহার কোন একটা ভাব স্থায়ী হয় নাই আজো। শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব আছে কিনা কে জানে।…

তিনি জিজ্ঞাসা করেন: যখন যে-ভাব ভাল লাগে, তখন সে-ভাব নিয়ে সাধন করব—না, একটা নির্দিষ্ট ভাব অন্তরে রেখে ধ্যান করব?

: যা সবচেয়ে ভাল লাগে, সর্বদা তাই অন্তরে রেখে সাধন করবে।

অনেক দিন হইতে হাবভাবে, আকার-ইঙ্গিতে অন্তরে একটা ভাব ফুটাইয়া তোলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দ বুঝিতে পারেন, সেই ভালবাসার ভাব লইয়াই গুরুদেবের সহিত তাঁহার মধুর সম্বন্ধ। নিশ্চিন্তে মনে মনে বলিলেন:

দয়াল ঠাকুর—দয়া করে বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা দেও। দূর থেকে তোমাকে চাইনে, মনেপ্রাণে এক হয়ে ভালবাসতে পারি যেন।…তিনি বোঝেন লজ্জা-ভয়, সংকোচ থাকিলে ভালবাসায় গভীরতা জন্মে না; সেই সব দূর হইলে তবে দেখা দিবে প্রকৃত প্রেম।

কুলদানন্দ ভাবিতে থাকেন: যাঁকে ভালবাসি তাঁকেই নিয়ে মাথামাথি করব—কখনও তাঁকে কোলে বসাব, কখনও তাঁর কোলে বসব।…কখনও তাঁর পায়ে লুটাব, তাঁকে মাথায় রাখব—আবার কখনও তাঁর কাঁধে উঠব।… সে অবস্থা না হলে কিসের ভালবাসা?…তিনি প্রার্থনা করেন: ঠাকুর, কবে আমাকে দয়া করে সেই অবস্থা দেবেন?…

প্রাণযমুনায় এতদিনে উজান বহিয়া চলিয়াছে যেন। কদমতলায় কৃষ্ণ বাজান বাঁশি,…আর তাহারই প্রাণবন্ত সুরে শ্রীরাধার আননে ফোটে অমিয় হাসি। পলকে প্রেমময়ী ভুলিয়া যান লাজ, মান, ভয়; …জল আনিবার ছলে কম্পিত ত্রস্তপদে ছুটিয়া যান প্রাণবল্লভের পাশে। গাগরি ফেলিয়া গভীর আবেগে লুটাইয়া পড়েন গোলকপতির সুশীতল বক্ষে।…সেই বাঁশির সুরে কুলদানন্দও আজ যেন দিশেহারা! শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি ভাবের মধ্যে 'মধুর' ভাব সর্বোৎকৃষ্ট; সেই সুমধুর ভাবের প্রস্রবণ বহিয়া যায় তাঁহার গোপন অন্তরে।…

চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিবার প্রণালী ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার অবসর মেলে নাই এতদিন। শ্রীমদ্‌ভাগবত দেখিয়া নিজের বুদ্ধিমত করিয়া যাইতেছেন। ঠিকমত হইতেছে কিনা নির্জনে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কীভাবে তিনি ন্যাস করেন গোসাঁই জানিতে চাহিলে সবই জানাইলেন। গোসাঁইজী বলিলেন ঠিক হইতেছে। পঞ্চ তন্মাত্রের ন্যাস এবং রূপের ধ্যান সম্বন্ধে সব বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন: এসব খুব গোপনে করতে হয়—কোথাও প্রকাশ কর না।

মনে মনে বলিলেন কুলদানন্দ: জয় দয়াল ঠাকুর! এসব সাধন আমাকে কেন দিয়েছ জানি না। তোমার রূপ ধ্যান করতে করতে কবে আমি 'তুমি' হব?…

এই ঐকান্তিক প্রার্থনা কুলদানন্দের মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ।…গভীর ভক্তি ও মধুর প্রেমের অমৃত সিঞ্চনে তিনি আজ আত্মহারা।…এইভাবে তিনি এক হইয়া মিশিয়া যাইতে চান গুরুদেবের অনন্ত আনন্দ-সত্তায়।…তাই কলনাদী মহানদীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছেন কত না ছন্দে, কত না ভঙ্গিমায়।

সর্বস্ব ভুলিয়া নিজেকে বিলাইয়া চলিয়াছেন প্রতি মুহূর্তে। অতলান্তে অকূল পাথারে সঞ্চারিত কী অপার রহস্য!···তাহারই দুর্বার আকর্ষণে হৃদয়-তটিনী তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া চলিয়াছে মহাসিন্ধুর নিঃসীম বুকে। সেই অনন্তে বিলীন হইতে পারিলেই আপন পৃথক সত্তার পরিসমাপ্তি, মহানন্দে সাগরসঙ্গমে জীবন-নদীর সার্থক পরিণতি!···

গভীর রাত্রি। কুলদানন্দ আসনে নামে নিমগ্ন। নাম চলিয়াছে অবিরাম।

শেষরাত্রে আরতির সময় গোসাঁইজী কাঁসর বাজাইলেন। পরে শালগ্রামকে ভোগ দিবার জন্য দিলেন দুটী রসগোল্লা। যথারীতি ভোগ দিয়া মিষ্টি দুটী রাখিয়া দিলেন কুলদানন্দ।

ভোরে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণাদি সারিয়া পূজার ফুল তুলিলেন অনেকগুলি। পরে চন্দন ঘসিতে বসিয়া মনে পড়িল গুরুদেবের কথা: দশ মাসের গর্ভবতীর মত ধীরে ধীরে চন্দন ঘসতে হয়, তাতে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়।··· ভাবিতে ভাবিতে চন্দন ঘসিবার সময় চমৎকার ভাবের উদয় হইল। মনে হইল—ধন্য এই চন্দন, ইহা লাগিয়া থাকিবে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে।···এই চন্দন ঘসাই তো সার্থক পূজা-অর্চনা,···চন্দনের সঙ্গে মিশিয়া ঠাকুরের চরণ-সেবার অধিকার পাইলেই সফল হইবে তাঁহার আবাল্য জীবনের স্বপ্ন।···

ঘর্ষণে চন্দনের উৎপত্তি, ভক্ত ও দেবতার শ্রীঅঙ্গে তাহার বিলুপ্তি। তবু রহিয়া যায় মধুর গন্ধ, পবিত্র সুগন্ধ ও আনন্দ দানে তাহার সার্থক পরিণতি।··· কুলদানন্দের মনে হয়—দুঃখের স্পর্শে, কঠোর সাধনার ঘর্ষণে তাঁহারও অন্তর হইতে উৎসারিত হউক অমনি পবিত্রমধুর সুগন্ধ, ··ভুবনের হাটে হাটে সকলকেই বিমল আনন্দ দিয়া ঐ চন্দনের মতই তিনি যেন মিশিয়া যাইতে পারেন গুরুদেবের শ্রীচরণে।···

কুলদানন্দের অন্তরে আজ বাজিয়াছে বিসর্জনের বাদ্য।···প্রতি কার্যে শ্রীগুরুচরণে আত্মবিসর্জন তাঁহার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। গুরুময় অন্তর্লোকে বিচ্ছুরিত গুরুকৃপার ভাস্বর দ্যুতি;···তাই মনের আনাচে কানাচে যেখানে যতটুকু অভিমান জমিয়া আছে, তাহাকে নিঃশেষ করিবার জন্যই অহোরাত্র এই প্রস্তুতি। তবেই পূর্ণ হইবে তাঁহার আত্মদান, ধন্য হইবে তাঁহার সাধনা।···

চন্দন-ঘসা শেষ হইলে তাহা ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন। আঙ্গুলে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন গোসাঁইজী—অবশিষ্ট শালগ্রাম পূজার জন্য রাখিয়া দিলেন।···

শালগ্রামে বিষ্ণুচক্রে বিরাজিত স্বয়ং গুরুদেব,...তাইতো পূজা-অর্চনার পূর্বে চন্দন ঘসিয়া কুলদানন্দ সর্বান্তঃকরণে তাহা নিবেদন করিলেন গুরুদেবকে।...আর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন ভগবান গোস্বামী প্রভু।...

গোপালভট্ট গোস্বামী যে চক্র পূজা করিতেন, তাহা হইতে ধ্যান প্রভাবে প্রকাশ করেন রাধারমণ বিগ্রহ। কুলদানন্দ গোসাঁইজীর নিকট শুনিয়াছেন তাঁহার এই চক্রও সেইরূপ। সেই অবধি তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্প জাগিয়াছে, এই শালগ্রাম চক্রে ঠাকুরের পূজা ও ধ্যান করিয়া ইহাতেই প্রকট করিবেন গুরুদেবের শ্রীরূপ। প্রয়াস নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য—তবু আকাঙ্ক্ষা যেমন অসীম, সংকল্পও তেমনি অটুট। সেই ভাবে একান্তমনে শালগ্রামে গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র অর্পণ করেন তিনি। গোসাঁইজী একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার সেবাপূজা দেখিতে থাকেন। কুলদানন্দের মনে হয়ঃ গুরুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, সর্বশক্তিমান স্বয়ং পরমেশ্বর; সম্মুখে থেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার পূজা হৃষ্টমনে ঠাকুর গ্রহণ কচ্ছেন।..ভাবিয়া ভাবাবেশে বিভোর হইয়া পড়েন।

কিন্তু নিজের বিশ্বাস-ভক্তির শিথিলতা লক্ষ্য করিয়া অন্তরে জাগে দুঃসহ যাতনা। গুরুচরণে প্রার্থনা করেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা। অবশেষে গুরুদেবের উপর জাগে নিদারুণ অভিমান। প্রকৃত বিশ্বাস লইয়া এক মিনিট বাঁচিলেও জীবন ধন্য। কিন্তু এমনি অবিশ্বাস-বিষে অহরহ জর্জরিত হইয়া লক্ষ বছর বাঁচিলেই বা কী লাভ?...ইহার চাইতে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়! ব্যাকুল প্রাণে তিনি প্রার্থনা জানানঃ ঠাকুর, আমাকে এক মিনিটের জন্য বিশ্বাস দেও; প্রকৃত ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার শ্রীরূপ দর্শন করে তবে দেহপাত হক। পরে সহস্র বছরের জন্যও নরকে যেতে রাজী আছি।...

চোখের জলে এমনি প্রার্থনা করার পর দেহমনে দেখা দিল দারুণ ক্লান্তি। গুরুদেবের শ্রীরূপ মণিপুরে ধ্যান করিতে করিতে ঐস্থানে দেখা দিল ভীষণ উত্তাপ ও জ্বালা। অথচ সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়াও অনুভব করিলেন কেমন একটা আরাম। সহস্রারে ধ্যানকালে দর্শন করিতে লাগিলেন জ্যোতির্ময় শ্বেত বৈদ্যুতিক চক্র।...

গোসাঁইজী রাখালবাবুকে ঘৃতমিশ্রিত গরম দুধ আনিতে বলিলেন। গুরুদেবের নির্দেশে উহা পান করিয়া একটু সুস্থবোধ করিলেন কুলদানন্দ। আর গোসাঁইজী ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন সস্নেহ দৃষ্টিতে। গুরুদেবের অসমী

দয়ার কথা ভাবিয়া আবার প্রার্থনা জানাইলেন : ঠাকুর, তোমার স্নেহ-মমতা ধারণ করবার যোগ্য আমি নই। তোমাতে যথার্থ বিশ্বাস ও একান্ত ভক্তি দেও ; নতুবা এ জীবনে আমার দিকে আর তাকিও না, আমিও যেন অন্ধ হয়ে যাই !...

হরিদ্বারে দুর্লভ শিলাচক্র লাভের পর কুলদানন্দের সাধন-জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূত্রপাত। সর্বক্ষণ তাঁহার উপর গোসাঁইজীর সস্নেহ দৃষ্টি, সদাজাগ্রত প্রহরা। গুরুদেবের সদয় ব্যবহারে ও অপ্রাকৃত করুণাধারায় তাঁহার মনপ্রাণ অভিসিঞ্চিত। প্রদীপ্ত উৎসাহে, শ্রীগুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাধন-পথে সুরু তাঁহার এই অগ্রগতি। কিন্তু সাধন জীবনে এই ক্রম-বিবর্তনের পথে আবার দেখা দিল অগ্নিপরীক্ষা।...

। বাইশ ।

আশ্বিন মাস। কুলদানন্দ শালগ্রাম পূজায় নিমগ্ন। তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন গোসাঁইজী। হাত-মুখ নাড়িয়া অস্ফুটে কত কথা বলিতেছেন যেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন কুলদানন্দ। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। চোখে বহিল অবিরল অশ্রুধারা। স্বেদ, কম্প, অশ্রুপুলকাদি ভাবে শরীর একেবারে অবসন্ন। গুরুদেবের অনুপম রূপের ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। ঠাকুরের স্মৃতিপূত নিস্তরঙ্গ অন্তরে নিবিষ্ট চিত্তে চলিল মধুর নাম-প্রবাহ।

ভজনানন্দ সম্ভোগে আবার সুরু হইল অভিমানের বিষম আক্রমণ। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভাব বহুভাগ্যে ভক্তের অন্তরে সঞ্চারিত হয় একমাত্র ভগবানের অনন্ত কৃপায়। আজ তাঁহারও এই সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া নিশ্চয় খুব খুশী হইয়াছেন গুরুদেব। ভাবিয়া এই ভাব আরো বৃদ্ধির জন্য চলিল আপন প্রচেষ্টা। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সরস ভাব তখন আর রহিল না, পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইল অসহ্য শুষ্কতা। আবার মনে জাগিল সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তাহারই লেলিহান শিখায় মনেপ্রাণে দেখা দিল দুর্বিসহ যন্ত্রণা। ক্ষিপ্ত হইয়া শরীরের নানাস্থানে আঘাত করিতে লাগিলেন। নিকটেই যে গুরুদেব বসিয়া আছেন তাহাও ভুল হইয়া গেল। ভীষণ ক্রোধ জন্মিল শালগ্রামের উপর—ফুল-তুলসী, পূজার উপকরণ লইয়া শালগ্রামের উপর ছুড়িয়া মারিতে লাগিলেন !

ভীষণ উত্তেজনায় অবশেষে ক্রোধ জন্মিল ধীর-স্থির গুরুদেবের উপর। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা গুরুদেবকে টলাইবার চেষ্টা করিলেন। ব্যর্থতার জ্বালায় বর্ধিত হইল আসুরিক তেজ। সারা অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল—চক্ষেও সুরু হইল নিদারুণ যন্ত্রণা। নিরুপায়ে স্মরণ করিলেন গুরুদেবের অভয় চরণ।···

এতক্ষণে 'হরিবোল-হরিবোল' বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন গোসাঁইজী। পরম স্নেহভরে চাহিয়া বলিলেন: কী ব্রহ্মচারি, ক্ষুধা পেয়েছে?···এই নেও—এই সন্দেশ শালগ্রামকে নিবেদন করে প্রসাদ পাও। পরে রান্না করতে যাও।···

গোসাঁইজীর কৃপায় এতক্ষণে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বোধ করিলেন কুলদানন্দ। প্রসাদ পাইয়া রান্না করিতে গেলেন। রান্না, হোম ও আহার কোনরকমে শেষ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন গুরুদেবের নিকট।

পরীক্ষা তখন সবে সুরু। তাই আবার দেখা দিল নূতন এক উৎপাত। সম্মুখে পরম আনন্দময় গুরুদেব—তাঁহার পূজা-অর্চনায়, অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভে দিনরাত কাটিয়াছে মুগ্ধ আনন্দে। কিন্তু হৃদয় আজ যেন শ্মশান,····অহর্নিশি চিতানলে দগ্ধ হইয়া সময় কাটিতেছে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। তারপর একদিন রান্না করিবার সময় তরুণী কুতুর দিকে নিবদ্ধ হইল চঞ্চল দৃষ্টি। চিতানলে পড়িল ঘৃতাহুতি—অধীর উত্তেজনায় অস্থিপঞ্জর চূর্ণপ্রায়।·· নিজের চরম বিপদ ও দুরবস্থা বুঝিয়া উচ্চশিরে দাঁড়াইলেন সব্যসাচীর মত। নাম চলিল দ্রুতবেগে, খুব তেজের সহিত চলিল প্রাণায়াম ও কুম্ভক। কিন্তু কুতুর কুসুম-কোমল, লাবণ্যময় দেহবল্লরী ঘিরিয়া ক্রমশ দুর্বার হইয়া উঠিল প্রবল উত্তেজনা। আর তাহারই উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া গেল নাম-ধ্যান, সাধন-ভজন।

অবশেষে অস্থিরভাবে গুরুদেবকে বলিয়া বসিলেন: কুতুর উপর আমার ভয়ানক আকর্ষণ দেখা দিয়েছে—বহু চেষ্টাতেও আর স্থির হতে পাচ্ছিনে। কখন কী করে ফেলি বলতে পারিনে! আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।···

তেমনি পরম স্নেহভরে চাহিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: যে বয়েস, তাতে এ রকম হতেই পারে। এ তো কিছু অস্বাভাবিক নয়।···একটু দূরে দূরে থাকতে পার না?

কিছুমাত্র লজ্জিত বা দমিত হইলেন না কুলদানন্দ। তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিলেন: না—এখন আর পারি নে। আমার চেষ্টা নিয়ত তার কাছে কাছে

যাবার, দূরে থাকব কী করে?···আমি সব সময় সুযোগ খুঁজছি। সামলাতে না পারলে সজন-নির্জনতার কোন পরোয়া করব না—পরে যা হয় হবে!···

তবু শান্ত, নির্বিকার কণ্ঠে বলিলেন গোসাঁইজী: কর্তা ভগবান। তাঁরই ইচ্ছায় সব! দেখ কী হয়।···

বলিয়া চক্ষু বুজিলেন গোসাঁইজী। আর অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন কুলদানন্দ। নিদারুণ লজ্জায় ও অনুতাপে চোখের জলে নিজের পাপ-বাসনা নিবেদন করিতে পারিতেন গুরুদেবের শ্রীচরণে। এই সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য জানাইতে পারিতেন সকাতর প্রার্থনা। কিন্তু অধীর উত্তেজনায় বরং যেন ধমকাইলেন ধ্যানের দেবতা গুরুদেবকে—তিনি আবার কুতুরই পিতা।···গোসাঁইজী তবুও স্থির বিশ্বাসে অচঞ্চল,···অসীম স্নেহ ও ক্ষমায় অপরূপ।···সেই ধৈর্য ও বিশ্বাস কুলদানন্দের সাধন জীবনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত সঞ্চারিত হইল।

বস্তুতঃ, গুরুদেবকে স্বয়ং অন্তর্যামী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন কুলদানন্দ। তাই নিজের মনোভাব কিছুমাত্র গোপন করিবার কোন অপচেষ্টা দেখা দেয় নাই তাঁহার অন্তরে। গুরুদেবের উপর ছিল তাঁহার অনন্ত দাবী, অখণ্ড অধিকার। নিজে সংগ্রাম করিয়াও যখন বিপর্যস্ত, তখন সেই জোরেই একান্ত অকপটে উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন তাঁহার মনের সমস্ত দুয়ারগুলি! কামের বিষম উত্তেজনায় পাছে কোন অঘটন ঘটিয়া বসে, পণ্ড হয় তাঁহার আজন্ম সাধন, ইহাই ছিল তাঁহার সমস্ত উদ্বেগ ও অস্থিরতার কারণ। সুতরাং মনের বিন্দুমাত্র পাপ বাসনাকেও হেলা বা গোপন করা দূরে থাক, গুরুদেবের নিকট প্রকাশ করিলেন সুপ্ত উত্তেজনার সবটুকু বীভৎসতা।···

বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও শোচনীয় দুর্বিনীত ভাবের পরিচয়। কিন্তু তাঁহার অন্তরে ছিল গুরুদেবের উপর একান্ত নির্ভরতা। ফলে অন্তর্যামী গোস্বামী প্রভু অবিচল স্থৈর্যে প্রসারিত করিলেন অভয় হস্ত। একটু পরে তিনি আবার বলিলেন: কামের উৎপাতে তোমার চেয়েও আমি বেশী ভুগেছি।···

অনুগত শিষ্যের উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য স্বীয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিলেন গোসাঁইজী। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কালে পাঞ্জাবে বক্তৃতা সভায় এক বালিকার সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হন। তীব্র অনুতাপে পরে আত্মহত্যা করিতে যান রাভী নদীতীরে, এক মুসলমান ফকির তাঁহাকে রক্ষা করেন। শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন কামরিপুর ভীষণ

উত্তেজনা হইতে শিষ্যদের রক্ষা করিবার জন্য গুরুদেব এইভাবে নামিয়াছিলেন কামনার পল্বল পঙ্কে। আজ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই গুরুদেব দ্বিধাহীন চিত্তে উল্লেখ করিলেন সেই কলঙ্কের দৃষ্টান্ত।...

কুলদানন্দ শান্ত হইলেন। কিন্তু নিজের দুর্বলতায় হতাশ ভাবে বলিলেন : আমার যে রকম ভিতরের দুরবস্থা, তাতে এ জীবনে যে কিছু হবে এমন আশা করতে পারিনে। এতদিন সাধন ভজন করে কিছু যে আমার হয়েছে, তাও মনে হয় না।...

গোসাঁইজী বহুবার বলিয়াছেন সাধকের মনোভাব হইবে 'তৃণাদপি সুনীচেন'। কুলদানন্দের অন্তর হইতে সেই ভাবই প্রকাশ পাইল এতদিনে। তবু তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য শাসনের স্বরে বলিলেন গোসাঁইজী : কী বললে—কিছু হয়নি ?...যে দুর্লভ বস্তু পেয়েছ. তা যখন প্রত্যক্ষ করবে তখনই বুঝবে কী হয়েছ।...একেবারে নির্ভয় হয়েছ ! যাঁরা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই নির্ভয় হয়েছেন।...এটী নিশ্চয় জেন—নরকেও যদি যাও, সেখানেও বুকে করে রাখবার একজন আছেন ! ..

সাময়িক শুষ্কতা বা উত্তেজনা সাধন জীবনের একটা দিক মাত্র। কিন্তু অন্যদিকে গোসাঁইজীর এই বাণী হইতে বোঝা যায় সত্যই কুলদানন্দ ইতিমধ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কতখানি নির্ভয় হইয়াছিলেন।...

এই আশাতীত আশ্বাস-বাণীতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গুরুদেবের অসাধারণ সহানুভূতির কথা ভাবিয়া রাত্রে আর নিদ্রা আসিল না। যুবতী কন্যার প্রতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন নিজের জঘন্য আসক্তি। অনায়াসে তাঁহাকে সরাইয়া দিতে পারিতেন গোসাঁইজী। অন্তত তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য দিদিমাকেও বলিতে পারিতেন। কিন্তু কোন কিছুই করা দূরে থাক, কাহাকেও বিন্দুবিসর্গ জানিতে দিলেন না ; বরং নিজ জীবনের ঘটনা বলিয়া শান্ত করিলেন।...সারারাত্রি মুগ্ধ বিস্ময়ে অসীম শ্রদ্ধায় এ বিষয় চিন্তা করিলেন। মনে হইল কোন মুনি-ঋষি বা দেবদবীর এত কৃপা ও মহত্বের কথা আজো শোনেন নাই।...বস্তুত, এমনি অমৃত-স্পর্শেই কুলদানন্দের সমস্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রশমিত করিলেন গোস্বামী প্রভু। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর অন্তরে মহত্বের আলো জ্বালাইয়া সুগম করিয়া দিলেন তাঁহার সাধনার অগ্রগতি ;...

তবে কুলদানন্দের উৎপাত তখনও দূর হয় নাই।

শালগ্রাম পূজা করিয়া এতদিন বেশ আনন্দে ছিলেন। কিন্তু বহু লোকের

বিষদৃষ্টিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আর কাছে আসেন না ; তাঁহাকে শুনাইয়া তাঁহার কুসংস্কারের জন্য আক্ষেপ করেন। দীক্ষিত গোঁড়া হিন্দুরা আরো ভয়ানক—গুরুদেবের সমক্ষেই শালগ্রাম পূজা ও আরতি করায় তীব্র সমালোচনা করেন তাঁহারা। এসব দেখিয়া শুনিয়া দুই-তিন দিন বলিলেন গোসাঁইজী : ব্রহ্মচারি, তুমি গয়া-কাশী বা অযোধ্যায় গিয়ে নির্জ্জনে সাধন কর। তাহলে ঠিকমত কাজ হবে, খুব উপকারও পাবে। এসব জায়গায় হট্টগোলের মধ্যে লোকের চোখের উপর সাধনে তোমার তেমন সুবিধা হবে না।

কুলদানন্দের সাধনের অবস্থা তখন খুব সুন্দর। গুরুদেবের দয়ায়, প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভে অন্তর সর্বদাই সরস। তিনি বলিলেন : যতদিন আপনার কাছে থেকে সাধন-ভজন ঠিকমত করতে পারি ততদিন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। তেমন বাধা ঘটলে অন্য কোন দিকে চলে যাব।

গোসাঁইজী তখন বার বার সাবধান করিয়া দিলেন : যেভাবে পূজা করো, কারো কাছে প্রকাশ করো না। ভজনের বিষয় গোপন রাখতে হয়, প্রকাশ করলে ক্ষতি হয়। 'আপন ভজন কথা না কহিও যথা তথা'।...

শালগ্রামে কুলদানন্দ পূজা করেন ইষ্টমূর্তি গুরুদেবের—তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে ইহাই গোসাঁইজীর ইচ্ছা।

কিন্তু কুলদানন্দ শালগ্রামের আরতি করিবার সময় স্বহস্তে কাঁসর বাজান গোসাঁইজী। ইহাতে তিনি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন ভাবিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদের মধ্যে সুরু হইল আন্দোলন। দিনে দিনে ব্রাহ্ম গুরুভ্রাতারা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন কুলদানন্দের উপর। কুলদানন্দ তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন এক কথায়। বলিলেন : আমি শালগ্রাম পূজা কচ্ছি নিজের খুশিমত নয়, তোমাদের গুরুজীর হুকুম মতই।...শুনিয়া তাঁহারা মর্মান্তিক যন্ত্রণাভোগ করিলেন, অথচ কুলদানন্দকে আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্ম ও গোঁড়া হিন্দু সকলেরই তীব্র দৃষ্টি পড়িল কুলদানন্দের উপর। আর নিষ্ঠার সহিত শালগ্রাম পূজায় ততই উৎসাহ দিতে লাগিলেন গোসাঁইজী। নির্জ্জনে বলিলেন : কারো কথায় জবাব না দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে শালগ্রাম পূজা করে যাও।...সাধারণের বিষদৃষ্টির মাঝে কুলদানন্দ এইভাবে লাভ করিলেন গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টি—বিরক্তি দূরে গিয়া মনেপ্রাণে দেখা দিল অধিকতর আনন্দ ও উৎসাহ।...

এই সময়ে কুলদানন্দের সাধন-জীবনে শুরু হইল যোগসঙ্কট। নাম করিতে করিতে নাভিস্থলে ও ক্রমশ মেরুদণ্ডে দেখা দিল উত্তাপ ও জ্বালা। দ্রুত নাম চলিবার সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধদেশ হইতে চক্ষু পর্যন্ত দুই পাশের শিরায় টান ধরিত; সেই টানে নাকটী ধরিয়া যাইত। চক্ষু বেদনা হইত, মাথাও অত্যন্ত গরম হইয়া পড়িত। শেষে মনে দেখা দিত দারুণ চাঞ্চল্য, তখন দেহমনের জ্বালায় হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করিত। আজ্ঞাচক্রে ধ্যান রাখিয়া গায়ত্রী জপের সময়ে সেখানেও প্রথমে সুড়সুড়ির পর দেখা দিত দারুণ জ্বালা।

গোসাঁইজী বলিলেন: দেহমনের এই জ্বালা সাধনেরই একটা অবস্থা। এই সময় হাত-পা, নাড়ীভুড়ি থেকে নাক-মুখ, চোখ-কান পর্যন্ত টানতে থাকে। একে বলে যোগসঙ্কট; অনেকে এই যন্ত্রণায় সাধন-ভজন ছেড়ে দেয়। খুব সাবধান হয়ে এই সময়টা ভাল মত কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়।

এই জ্বালার সময় গরম ঘৃত ও সরবৎ খাইতে বলিতেন গোসাঁইজী। কখনও বা নাম ছাড়িয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য করিতেন। অমনি সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইত।

কিন্তু যাহা প্রকৃত ক্ষতিকর সেই অভিমান দেখা দিল কুলদানন্দের অন্তরে। যোগ আরম্ভের পর সাধকের দেহমনে দেখা দেয় যোগসঙ্কট। কাজেই তিনি বুঝি যোগী হইলেন এই অভিমান জাগিল তাঁহার মনে। শালগ্রাম পূজায় অশ্রুপাত ও ভাবাবেশে সেই অভিমান বৃদ্ধি পাইল। পূজা-বিদ্বেষীরা আসিলে সেই ভাব ও অশ্রুপাত দেখাইতে চেষ্টা করিতেন। ফল হইত বিপরীত—ভাব একেবারে শুকাইয়া যাইত, মুখমণ্ডলে থাকিত বাহ্যিক গদ-গদ ভাব।

গোসাঁইজী একদিন সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন: প্রশংসার ভাবে তোমার ভিতরের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। সাবধান থেকো।...এছাড়া, শালগ্রামে গুরুপূজার তত্ত্ব ও রহস্যও তিনি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু নানা মর্মান্তিক সমালোচনায় বাধ্য হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন কুলদানন্দ।

একজন গুরুভ্রাতা গুরুদেবের সম্মুখেই পাথরের নুড়ি পূজা করিবার তীব্র নিন্দা করিলেন। কুলদানন্দ বলিলেন: পাথরটীকে আমিও পাথর ছাড়া আর কিছু মনে করিনে; কিন্তু শিলার অণু-পরমাণুতে ওতোপ্রতভাবে যে চৈতন্য-শক্তি পূর্ণ অবয়বে রয়েছেন, যাঁকে তুমি পূজা কর—আমিও তাঁরই পূজা করি।...

কোন কোন গুরুভাই উত্তেজিত ভাবে একই আপত্তি তুলিয়া বলিলেন: শেষরাত্রে ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দে গোসাঁইয়ের উদ্বেগ সৃষ্টি করেন এ আমরা

সহ্য করতে পারব না। আপনি সাবধান হবেন -আমরা গুরু ছাড়া অন্য কিছু জানি না।...

কুলদানন্দ : কাঁসর-ঘণ্টা ইচ্ছা ক'রে নাড়িনে—ঠাকুরের আদেশে শালগ্রামে গুরুদেবেরই পূজা ও আরতি করি। আপনারা বিরক্ত হ'লেও ঠাকুরের আদেশ তো লঙ্ঘন করতে পারিনে।...

গুরুভ্রাতারা সকলেই লজ্জিতভাবে নির্বাক হইলেন। কিন্তু গোসাঁইজীর আদেশের বিরুদ্ধে পূজার ভাব ও রহস্য প্রকাশ করিয়া মহা অপরাধ করিলেন কুলদানন্দ। তখন তাহা না বুঝিলেও অচিরে দেখা দিল সেই অপরাধের প্রতিক্রিয়া, ভিতরে যেন জ্বলিয়া উঠিল প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা।...গুরুভ্রাতাদের প্রায় সকলের তীব্র বিষদৃষ্টিতে জ্বালা-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইল চতুর্গুণ। ভিতরে উঠিল দারুণ হাহাকার—অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।..

একদিন রাত তিনটায় গুরুদেবকে বলিলেন : ভিতরের যন্ত্রণা আর যে সহ্য করতে পারিনে! নাম-ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্ত আমার ছুটে গিয়েছে ; দিন রাত জ্বলে পুড়ে মচ্ছি। এবার বোধ হয় নাস্তিক হলাম! এখন কী করব ?

: নাস্তিক হবে না। তবে এ সময়ে অন্য কোথাও যাওয়া ভাল। এখানে লোকের দৃষ্টি তোমাকে শুষ্ক করে দিচ্ছে। এখানে থাকলে এ জ্বালা বেড়ে যাবে। লোকের দৃষ্টি বড় বিষম!...জীয়ন্ত গাছ লোকের দৃষ্টিতে শুকিয়ে যায় দেখনি ?

: হাজার লোকেও রুক্ষ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে শুষ্ক করবে কী করে? আমি যে আপনার স্নেহদৃষ্টিতে সর্বদা রয়েছি। আর, শালগ্রামে ইষ্টদেবের পূজা করি শুনে তারা এখন চুপচাপ আছে। কিন্তু পূজায় আমার আগের মত ভক্তি শ্রদ্ধা তো আসছে না।...

: শালগ্রামে ধ্যান শাস্ত্রে যেমন আছে তুমি তেমন কর না ?

: না, আমি তো ইষ্টদেবের ধ্যান করি। অন্য কিছুতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

: তবে তুমি শালগ্রামে মানুষের পূজা কর! সে যে অপরাধ - শাস্ত্রমতে শালগ্রামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান করতে হয়। তোমাকে অন্য কোথাও যেতে বলেছিলাম ; সে-কথা গ্রাহ্য করলে না। কাল থেকে শাস্ত্রমতে শালগ্রামের পূজা ও ধ্যান ক'রো।

: কিন্তু ঠাকুর, আমি তো শালগ্রামে মানুষের পূজা করিনে। 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু'...এতো শিববাক্য। কাজেই শালগ্রামে গুরুপূজায়-বিষ্ণু বাদ গেলেন কী করে? সে পূজা আশাস্ত্রীয় হলই বা কিসে?...

মনের উদ্বেগে কুলদানন্দের তখন খেয়াল নাই যে, শালগ্রামে গুরুপূজা করিতে প্রথমে সম্মতি দেন গুরুদেবই। কিন্তু তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে সেই গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করাতেই এই আপত্তি! তিনি শাসনের সুরে বলিলেন: শালগ্রামে চতুর্ভূজ বিষ্ণুর ধ্যান ও পূজা করো—নইলে শালগ্রাম পূজা ছেড়ে দেও।

সহসা বজ্রপাত হইল যেন! কুলদানন্দ ভাবিলেন: এ কী হ'ল! ঠাকুর এ কী কঠোর শাস্তি দিলেন!...

পরে বুঝিলেন পূজার রহস্য ভেদ করিয়া ভবিষ্যতে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিলেন। তাই সহজে চারিদিক রক্ষা করিবার জন্য এইভাবে গুরুতর শাসন করিলেন গুরুদেব, এত দৃঢ়তার সহিত অন্যত্র যাইতে বলিলেন। ফলে তাঁহার মনপ্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তবু বাধ্য হইয়া পরদিন এ স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। মনে হইল: হায়, যদি গুরুদেবের আদেশ মত আগেই এখান থেকে চলে যেতাম!

পরদিন প্রাতঃকালে সংক্ষেপে নিত্যকর্ম সারিয়া প্রস্তুত হইলেন কুলদানন্দ। রাখালবাবু তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া গোসাঁইজীকে বলিলেন: যদি বলেন ওঁকে আমি তেতালায় নির্জনে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

গোসাঁইজী: ওর নির্জনে থাকাই ভাল। দৃষ্টিতে ছেলেটীকে এমন শুষ্ক করে দিয়েছে যে, এই অবস্থা কিছুদিন থাকলে অনায়াসে আত্মহত্যা করে ফেলবে।...তেতালায় ওর ইচ্ছা হলে থাকতে পারে, আমার আপত্তি নেই।

বারান্দায় থাকিয়া সবই শুনিলেন কুলদানন্দ। কিন্তু শালগ্রাম পূজা করিতে হইলে যে গুরুদেবের আদেশে চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি ধ্যান করিতে হইবে! অবশ্য মনুষ্য-পশু, স্থাবর-জঙ্গম, দ্বিভূজ-চতুর্ভূজ সবই একমাত্র ভগবান শ্রীগুরু-দেবের চৈতন্যময় শক্তির বিভিন্ন বিকাশ; তবু গুরুদেবের অপরূপ রূপের সহিত তাঁহার চিত্তের শান্তি ও আনন্দের যে বিশেষ সম্বন্ধ। তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে দারুণ ক্লেশদায়ক।... বিষ্ণুমূর্তি ধ্যান করিতে বলিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে গুরুদেব নিষেধ করেন নাই বটে; ইহা তাঁহার পক্ষে শাস্তিও নয়। তবু শালগ্রামে বিষ্ণুপূজা করা তাঁহার সাধ্যাতীত।...

বাধ্য হইয়া আসন তুলিলেন কুলদানন্দ। রাখালবাবু তাঁহাকে তেতালায় রাখিতে খুব চেষ্টা ও যত্ন করিলেন ; কিন্তু তাঁহার মনে হইল বাড়ীটা যেন অগ্নিকুণ্ড। গুরুদেবের উপরেও জাগিল গুরু অভিমান। গোসাঁইজী স্নানে যাওয়ার পর সেই অবসরে জিনিষপত্র লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন ঝামাপুকুরে ভাগিনেয়দের বাসায়। কিছুক্ষণ পরে গেলেন মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায়। গোসাঁইকে ছাড়িয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন মহেন্দ্রবাবু। সুযোগ পাইয়া সবই বলিলেন কুলদানন্দ। জানাইলেন : শালগ্রাম তিনি রাখিতে পারিতেছেন না, ছাড়িতেও পারিতেছেন না—এ এক বিষম সমস্যা।··· সমস্ত কথা গোসাঁইজীকে জানাইবার জন্য মহেন্দ্রবাবু গেলেন রাখালবাবুর বাসায়।

পরদিন সকালে কোনরকমে নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন কুলদানন্দ। নিদারুণ অভিমান ভরে ভাবিয়াছিলেন গুরুদেবের কাছে আর যাইবেন না। কিন্তু একদিনে ভাসিয়া গেল সে অভিমান—বেলা নয়টা না হইতেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ঠাকুরের জন্য। পরক্ষণে সুকীয়া ষ্ট্রীটে রওনা হইয়া গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন সকলেই তাঁহার জন্য খুব আক্ষেপ করিতেছেন, গুরুদেবও আন্তরিক দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কুলদানন্দ পৌঁছান মাত্রই গোসাঁইজীর মুখে ফুটিল প্রসন্ন হাসি। পরম স্নেহে একগাল হাসিয়া বলিলেন : আসন কোথায় নিয়েছ ?···

অতি সংক্ষেপে কুলদানন্দ বলিলেন : ঝামাপুকুরে।

গোসাঁইজী আরও যেন কী বলিতে গেলেন। কিন্তু শিশু সন্তানের মত দুরন্ত অভিমানে মুখ ফিরাইয়া লইলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী শৌচে গেলে গুরুভ্রাতারা সকলেই দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। শালগ্রামটীর চূড়ান্ত ব্যবস্থা তিনি করিবেন শুনিয়া কেহ কেহ সাগ্রহে চক্রটী চাহিলেন। অথচ তাঁহারাই ছিলেন শালগ্রামের প্রধান বিরোধী। ভাবিয়া অবাক হইলেন কুলদানন্দ।

গোসাঁইজীর সেবা অন্তে আহার করিতে গেলেন সকলে। কুলদানন্দের অভিমান এতক্ষণে প্রশমিত হইয়াছিল অনেকখানি। গুরুদেবকে এবার নির্জনে পাইয়া তিনি বলিলেন : কয়েকটী কথা বলতে চাই।

: হ্যাঁ, খুব বল।

: দেবদেবী আমি বুঝিনে। এতদিন যেভাবে শালগ্রাম পূজা করে এসেছি

তা যদি নিষেধ করেন, তবে আমি আর পূজা করতে চাইনে। শালগ্রামটীকে যা করতে বলেন তাই করব।

ঃ তবে তুমি শালগ্রাম পূজা ছেড়ে দেও, আগে যা করতে তাই কর। যাকে দিলে শালগ্রামের সেবাপূজা হবে তাকে দিয়ে দেও। শালগ্রাম পূজা যে জন্যে দরকার তা তোমার হয়েছে। এখন আর পূজা না করলে কোন ক্ষতি নেই।

ঃ তাহলে সবাইকে যেমন রেখেছেন, আমাকেও সেইভাবে রাখুন। দশজনের মত নাম করব, আর আপনার কাছে পড়ে থাকব।

ঃ ভাল দশজনের মতই চল। তবে গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যাটী ছেড়ো না। তাতে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।

ঃ বেশ, তাই করব। কিন্তু হোম না করে পারি কিনা?

ঃ হোমটীও করো—ওটী তোমার দরকার।

ঃ কিন্তু ভিক্ষা করতে সময় বড় নষ্ট হয়, খাওয়ার নিয়মও ঠিক থাকে না।

ঃ ভিক্ষায় আর দরকার কী? তবে আহার স্বপাকেই করো।

ঃ শালগ্রাম পূজা যখন করব না, তখন আপনার সঙ্গে থাকতে পারব তো?

ঃ তা পারবে না কেন? শালগ্রাম পূজা নিয়ে সঙ্গে থাকা অসম্ভব। গেণ্ডারিয়া হ'লে পারতে।

অতঃপর গোসাঁইজী পুনরায় কুলদানন্দকে আসন আনিতে বলিলেন। তাঁহার সস্নেহ আহ্বানে গলিয়া জল হইয়া গেল কুলদানন্দের পুঞ্জীভূত অভিমান। তৎক্ষণাৎ তিনি ঝামাপুকুরে গেলেন। শালগ্রাম পূজার বাধার কথা সবই বলিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সজনীকান্তকে; তিনি সাগ্রহে শিলাচক্রটী গ্রহণ করিলেন। নিশ্চিন্তে কুলদানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। গুরুদেবের নির্দেশে আসন করিলেন তাঁহারই কাছে।

আবার সুরু হইল শ্রীগুরুর পূজা ও ধ্যান—অভাব শুধু শালগ্রামের। ইহারই জন্য ছিল কত আগ্রহ,...তীর্থে তীর্থে চলিয়াছে কত না সন্ধান!... চণ্ডীপাহাড়ে অভাবনীয়ভাবে মিলিল সেই শালগ্রাম—বিধিমত প্রতিষ্ঠার পর চলিল গুরুদেবের পূজা ও ধ্যান। গাঢ় কৃষ্ণ অবয়বে দেখা দিল কত অপরূপ জ্যোতির্বিকাশ।...এখানে ফিরিয়াও সেই শালগ্রামে গুরুদেবের সমক্ষেই শ্রীগুরুর পূজা ও আরতির কত ধূমধাম!...অবশেষে গোপাল ভট্টের মত শিলাচক্রে ফুটাইতে চাহিলেন শ্রীগুরুর রূপ ও বিভূতি। নিকষ কালো কলেবরে বিকশিত

হইল ঠাকুরের তাম্রবর্ণ আভা।···ক্রমে উহা নিশ্চয়ই গুরু-রূপে পরিণতি লাভ করিত—কিন্তু সেই স্বপ্ন ও সাধনা আজ ব্যর্থ নিরাশায় পরিণত।··ভাবিয়া বড় দুঃখবোধ করিলেন কুলদানন্দ।

পরে বুঝিলেন ঐ শালগ্রামকে উপলক্ষ্য করিয়া দেখা দিয়াছে অনেক বিপত্তি। একমাত্র তিনিই লাভ করেন শালগ্রামে গুরুপূজা করিবার অধিকার। ফলে, তিনি যে গুরুদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র, মনে জাগিল এই অভিমান। সেইসঙ্গে পড়িল সকলের বিষদৃষ্টি— গুরুনির্দেশের বিরুদ্ধেই পূজার রহস্য ব্যক্ত করায় দেখা দিল আত্মপ্রচার।···গুরুভ্রাতাদের মুখ বন্ধ হইলেও ঈর্ষানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। একদিকে প্রতিষ্ঠার অভিমান, অন্যদিকে বিদ্বেষ-বহ্নির প্রতিক্রিয়া—এই উভয় সংকটে পড়িয়া মর্মান্তিক অন্তর্দাহে তিনি বিপর্যস্ত হইলেন।···

শালগ্রাম পূজার জন্য দেখা দেয় আর এক কুঅভ্যাস। ঠাকুরকে দুই-তিনবার ভোগ দিয়া প্রসাদ পাওয়ায় আহার হইত অপরিমিত। প্রসাদ জ্ঞানে অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্যও পান ও ভোজন করিতে হইত। তাহাতে দেহ অসুস্থ হইত, মন হইত বিক্ষিপ্ত। এছাড়া কাঁসর, ঘন্টা, চামরাদি দ্বারা খুব ধূমধাম করিয়া পূজা ও আরতি করায় মন বদ্ধ হইতেছিল বাহ্য আড়ম্বরে, রাজসিক ভাবে।···

এইসব কারণে বড় সাধের শালগ্রাম আজ আর নাই। নাই বা রহিল কোন স্থূল প্রতীক—তবু মন্ত্রপাঠ ও ঠাকুরপূজা মনে মনে ঠিকই চলিয়াছে। বরং আজ তিনি সব বাধা, সমস্ত বিষদৃষ্টির বহু ঊর্ধ্বে। সকলের মধ্যে থাকিয়াও পরম নিশ্চিন্ত, ঐকান্তিক ধ্যান ও ধারণায় আত্মসমাহিত। শালগ্রাম থাকাকালে এতদিন অধিকাংশ সময়ে নিজেরও দৃষ্টি থাকিত সেইদিকে। কিন্তু মুগ্ধ দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ সুহাস, নয়নানন্দ ঠাকুরের দিকেই। সম্মুখে সর্বদা পূর্ণ অবয়বে বিরাজিত প্রাণপ্রিয়তম, সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং গুরুদেব।···কী প্রয়োজন সেখানে স্থূল প্রতীক চিহ্নের ?···যেখানে শতধারে বর্ষিত পূর্ণচন্দ্রের স্বচ্ছ সুবিমল জ্যোৎস্নার হাসি, সেখানে ক্ষুদ্র খদ্যোতের প্রবেশাধিকার কোথায় ?···

এইজন্য গুরুদেব বলিয়াছেন শালগ্রাম পূজার প্রয়োজন আর নাই। তাঁহার আদেশে, তাঁহারই কৃপায় তিনি লাভ করিয়াছিলেন মনোমত শিলাচক্র ; কিন্তু গুরুদেব পরম দয়াল, পরম কল্যাণময়—তাই আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সেই শালগ্রাম আজ অপসারিত।···সমস্ত বাধা, আশংকা ও অভিমান হইতে তিনি আজ মুক্ত, নিঃসংশয়।

গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় কুলদানন্দের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। গুরুদেবের ইচ্ছা উপলব্ধি করিয়া এবং সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়া আজ তিনি উত্তীর্ণ হইলেন অগ্নিপরীক্ষায়।...

রাত্রি তিনটা। অকস্মাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কুলদানন্দ। স্বপ্নদোষ হওয়ায় একটু পরে জাগিয়া উঠিলেন। অন্তরে জাগিল দারুণ বিরক্তি। বীর্যধারণের জন্য এতকাল চলিয়াছে কত প্রচেষ্টা। সাধন-ভজন, ব্রহ্মচর্য ব্রত সবই পালন করিতেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। তবু আজো মনের বিকার, দেহের অপবিত্রতা কিছুই ঘুচিল না!...নিজের চেষ্টা না হয় পণ্ডশ্রম, কিন্তু গুরুদেবও উদাসীন! ইচ্ছা করিলেই কি এই আপদ ও গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে পারেন না তিনি?...

ভাবিয়া বড় অভিমান হইল গুরুদেবের উপর। এমন সময় জল খাইবার জন্য দুইখণ্ড মিশ্রী চাহিলেন গোসাঁইজী। বীতশ্রদ্ধ মনে অপবিত্র হাতে মিশ্রী দিবার জন্য আলমারির নিকটে গেলেন কুলদানন্দ। হাত ধুইবার কথা বলিয়া কমণ্ডলুর জল দিতে গেলেন গোসাঁইজী। হাতে অল্প একটু জল লইয়া কুলদানন্দ ফেলিয়া দিলেন। আবার গোসাঁইজী বলিলেন: হাত একটু ভাল করে ধুয়ে নিলে হয় না? এবার লজ্জিত হইয়া বাহিরে গেলেন কুলদানন্দ। ভাল করিয়া হাত ধুইয়া গুরুদেবকে মিশ্রী দিলেন। মিশ্রী মুখে দিয়া জল পান করিলেন গোসাঁইজী।

পরে দেখা দিল অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন। তিন-চার দিন পরে মহেন্দ্রবাবু, মোহিনীবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের নিকট এ বিষয় প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন তাঁহারা। গোসাঁইজীকে বলিলেন: ব্রহ্মচারীর দোষেই আপনার যত রোগ। সে যখন এত নোংরা, তার হাতে আর কোন সেবা নেওয়া ঠিক নয়—তাকে আপনার কাছে থাকতে দেওয়াও উচিত নয়।...

বারান্দায় দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন কুলদানন্দ। তিনি ভিতরে আসিলে গোসাঁইজী বলিলেন: ব্রহ্মচারি, মহেন্দ্রবাবু যা বললেন তা কি ঠিক?...

লজ্জায় ও অনুতাপে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন কুলদানন্দ। কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন: ঠিক—সত্যি আমি নোংরা হাতে মিশ্রী দিতে গিয়েছিলাম।...

অকপট সত্যকথায় গোসাঁইজীর চক্ষুদুটী ছলছল করিয়া উঠিল। স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন: এখন থেকে তোমার ঐ হাতে যা দেবে, পরম পবিত্র

মনে করে আমি তা গ্রহণ করব! তবে যা নিজে খেতে পার না, তা আমাকে দিও না।...

একসঙ্গে যেন শত বীণা ঝংকার দিয়া উঠিল।...কুলদানন্দের মনে হইল এত অদ্ভুত অথচ এমন মধুর কথা যেন সারা জীবনে শোনেন নাই। সীমাহীন দুঃখে ও আনন্দে গুরুদেবের চরণে মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হইল! যতই অন্যায় ও দুর্ব্যবহার করুন না কেন, গুরুদেবের স্নেহমমতার অন্ত নাই।.. ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন: ঠাকুর! এই ঘৃনিত পাষণ্ডকেও তুমি এমনি করেই এতখানি আপনার করে নিয়েছ।...তোমার এ দয়া আমার যে অসহ্য! বহু জন্মের সাধন ভজন ও কঠোর তপস্যাতেও যা দুঃসাধ্য, তা অনায়াসে তোমার কাছে পেয়েছি,.. আমার জঘন্য কার্যের বিনিময়েও তুমি তাই আমাকে দিয়েছ। পাপীর প্রতি তোমার এ কী মধুর শাস্তি! এ কী মহত্তম প্রতিশোধ!!...

সেইদিন হইতে কুলদানন্দের মনে হইল, তিনি যেন গুরুদেবের শ্রীচরণে সত্যই আত্মবিক্রিত।...

মধ্যাহ্নে আহারান্তে গোসাঁইজী আসনে উপবিষ্ট। কুলদানন্দের বাঁধান খাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন: ওখানা কী গ্রন্থ?

: আমার ডায়েরী।

: কই দেখি—

গুরুদেব হাত বাড়াইলে ডায়েরীখানা দিলেন কুলদানন্দ। কয়েক পাতা উল্টাইয়া গোসাঁইজী বলিলেন: বেশ—রেখে দাও।

কুলদানন্দের মনে হইল গুরুদেবের অযাচিত স্পর্শে ডায়েরীখানা পরম পবিত্র হইয়া গেল। কিন্তু কিছু না পড়িয়া শুধু পাতা উল্টাইলেন কেন? হয়ত তাঁহাকে উৎসাহ দিতেই এরূপ করিলেন গুরুদেব।

পূর্বে তিনি একবার বলিয়াছিলেন: ব্রহ্মচারী যা লিখছেন, একশত বছর পরে তা দেশের শাস্ত্র হবে।...

কুলদানন্দের মনে হইয়াছিল হয়ত বারদীর ব্রহ্মচারী কোন গ্রন্থ লিখিতেছেন। আজো তাঁহার কোন গ্রন্থ প্রকাশের তো সম্ভাবনা নাই। তবু ডায়েরীর পাতায় পাতায় ঠাকুর আজ বুলাইয়া দিলেন অমৃতস্পর্শ। সুতরাং তাঁহারই আশীর্বাদে নিশ্চয় একদিন জনসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হইবে ঠাকুরের অপূর্ব কথামৃত।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ নামে ডায়েরীগুলি সত্যই আজ সর্বসাধারণের নিকট অমূল্য সম্পদ. সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের অপরিহার্য সাধন সহায়। অনাগত ভবিষ্যতেও এই অপূর্ব গ্রন্থাবলী নিঃসংশয়ে লাভ করিবে সমধিক মর্যাদা ও সমাদর।···

মাঘ মাসে পুণ্যতীর্থ প্রয়াগধামে এবার পূর্ণ কুম্ভমেলা। কুলদানন্দ শুনিলেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ গিরিপ্রদেশ হইতে আসিবেন অতি প্রাচীন তিন-চার জন মহাপুরুষ ; তাঁহাদের দর্শন করিতেই কুম্ভমেলায় যাইবেন গুরুদেব।

কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন কুলদানন্দ : মহাপুরুষেরা কি কুম্ভে স্নান করতে আসবেন ?

: না—তাঁদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। দেশে সর্বত্র ধর্মের অবস্থা বড় ম্লান হয়ে পড়েছে। এক একটী মহাত্মার উপর এক এক দেশের ভার অর্পণ করে তাঁরা চলে যাবেন। চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার দেবেন এবার কাঠিয়া বাবার উপর।

: আর বাঙলা দেশের ভার ?··

ঈষৎ হাস্যমুখে কুলদানন্দের দিকে একটু চাহিয়া বলিলেন গোসাঁইজী : তা কি এখন বলা যায় ?···

কুলদানন্দের মনে হইল সে ভার পড়িবে এবার স্বয়ং গুরুদেবের উপর।··· প্রয়াগে বাড়ী ভাড়া করিবার চেষ্টা সুরু হইল।

কুলদানন্দের মনে পড়িল, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য বাড়ীতে জননী বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। জননীর পদধূলি ও আশীর্বাদ লইয়া না আসিলে তিনি স্থির হইতে পারিবেন না। ভাবিয়া জননীকে দর্শন করিয়া আসিবার অনুমতি চাহিলেন গুরুদেবের নিকট। অনুমতি পাইয়া কার্তিকের শেষ সপ্তাহে ঢাকা রওনা হইলেন। শালগ্রামটী বাড়ীতে মায়ের গোপালের সহিত রাখিলে নিত্য সেবা-পূজার ব্যবস্থা হইবে। তাই শালগ্রামটী সজনীকান্তের নিকট হইতে তিনি লইয়া চলিলেন।

॥ তেইশ ॥

অপরাহ্ন। অনেক দিন পরে গেণ্ডারিয়া পৌছিলেন কুলদানন্দ। জনমানব-শূন্য গেণ্ডারিয়া আশ্রম। গোসাঁই-হারা আশ্রমের আজ যেন অকাল বৈধব্য! কয়েক মাস পূর্বেও ভজনানন্দী ভক্তদের সংকীর্তনে, শাস্ত্রপাঠে সদালোচনায় সর্বদা গম গম করিত এই আশ্রম। আজ তাহা নির্জন, নিস্তব্ধ—গোসাঁইজীর বিরহে সারা আশ্রমটী যেন হতশ্রী, বিষাদমলিন।...

কত স্বপ্ন, কত সাধনার পীঠস্থান এই গেণ্ডারিয়া। ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন কুলদানন্দ। ধীরে ধীরে ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। দক্ষিণ দিকে ঘরের বারান্দায় গালে হাত দিয়া একাকী নীরবে বসিয়া আছেন কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী। তাঁহার কথামত পূবের ঘরে গুরুদেবের আসনের স্থান বাদ দিয়া নিজের আসন করিলেন কুলদানন্দ। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন পাড়ার মহিলারা। কাহারও চোখে শোকাশ্রু, কেহ বা গভীর বিষাদে ক্রন্দন-শক্তি রহিত।

তাঁহাদের মুখে ফুটিল নানা প্রশ্ন: গোসাঁই কই?.. গোসাঁই সুস্থ আছেন তো?...গোসাঁই আমাদের কি মনে করেন?.. গোসাঁই কি আর গেণ্ডারিয়া আসবেন না?...

তাঁহাদের মুখে শুধু গোসাঁই আর গোসাঁই!.. কৃষ্ণবিরহিনী ব্রজবালারা যেন।...সবই আছে তাহাদের · নেই শুধু গোসাঁই। ফলে যথাসর্বস্ব ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে যেন! তাই বুঝি আজ তাঁহাদের এমনি মলিন বেশ, নিস্তেজ ভাব, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা! · গোসাঁই-হারা হইয়া এই কয়মাসেই তাঁহাদের কী শোচনীয় অবস্থা!...বিস্ময়ে, গভীর সমবেদনায় কুলদানন্দের চক্ষে ফুটিল অশ্রুবিন্দু।

আশ্রমে তিন-চার দিন কাটাইলেন কোনরকমে। নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন আজ শুধু অন্ধকার নয়, সত্যই যেন শ্মশান! কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় সকালে একবার গোসাঁইয়ের ভজন কুটীরে ধূপধুনা দেন; পরে এক অধ্যায় চৈতন্য-চরিতামৃত ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া চলিয়া যান। ভক্ত ফণিভূষণ সকালে জননী যোগমায়ার পূজা ও সন্ধ্যায় তাঁহার আরতি করেন। মন্দির প্রাঙ্গন

তখনও তেমনই নির্জন। গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আসিয়া আমতলায় বা পুকুরপাড়ে একটু বসিয়া থাকেন আনমনে। মহিলারা আসিয়া আমগাছের দিকে চাহিয়া থাকেন উদাস দৃষ্টিতে। তাঁহাদের ক্ষীণ সকরুণ ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হয় কুলদানন্দের অন্তরে। উদয়াস্ত আমগাছে শোনা যাইত কত মধুর কলগান, আজ আর একটী পক্ষীও নাই।…বৃক্ষলতার কাছে গিয়া গোসাঁইজী মৃদুহাস্যে কত আদর করিতেন তাহাদের। আজ সমস্ত বৃক্ষই পত্রহীন, শুষ্কপ্রায়। নরনারী, পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা—সকলের বুকেই আজ যেন শ্মশান-চিতার মর্ম্মদাহ। চারিদিকে কেমন একটা জমাট, থমথমে নীরবতা। সর্বত্রই গুমরিয়া ওঠে নিরুদ্ধ বুকফাটা আর্তনাদ, শুষ্ক পত্রমর্মরে জাগে বিষাদঘন মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস!…

গোসাঁইজী গেণ্ডারিয়া-বাসীর প্রাণ—আর কুলদানন্দের মনপ্রাণ, সমস্ত অস্তিত্বের মর্মকেন্দ্র।…গোসাঁই-শূন্য গেণ্ডারিয়ায় তাই আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। শূন্য উদাস প্রাণে অবিলম্বে বাড়ী রওনা হইলেন।

অপরাহ্নে বাড়ী পৌছিয়া সানন্দে প্রণত হইলেন পরম স্নেহময়ী জননীর চরণতলে। মায়ের স্নিগ্ধ হাসিতে, সস্নেহ করস্পর্শে দেহমন শীতল হইল—অন্তরে বহিল পরিমল আনন্দধারা।

আহারান্তে জননীর নিকট পর্বত-বাসের গল্প বলিয়া কাটিয়া গেল অনেক রাত্রি। শুনিয়া জননীর আনন্দের অন্ত নাই, সীমা নাই স্নেহ-মমতার।… বাড়ীতে দিন কাটিতে লাগিল বড় আনন্দে। সন্ধ্যা, হোম, ন্যাস, গীতা ও চণ্ডী পাঠ, অবিরাম নাম—সবই চলিল নিয়ম মত।

নিজের গর্ব, অভিমান সবই আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। কিন্তু গুরুদেবের গর্বে আজ তিনি অধিকতর উচ্ছ্বসিত। কথায় কথায় বলেন 'আমার গোসাঁই'!… জননীকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন: মা, তুমি যে এত ঠাকুর দেবতা, গাজী-পীরদের নমস্কার কর—আমার গোসাঁইকে একবার মনে কর না?…

স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বলেন হরসুন্দরী: করি বৈকি রে—সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই সকলের আগে যে তোর গোসাঁইকে নমস্কার করি।

আশাতীত আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলেন কুলদানন্দ: কেন কর মা?

: গোসাঁইকে যে তোরা ভগবান বলিস।…

সহসা সারা অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠে—কুলদানন্দ লুটাইয়া পড়েন জননীর চরণতলে। প্রাণ ভরিয়া গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দেন পরম স্নেহময়ী, শতধারে ঝরিয়া পড়ে অক্ষয় আশিস্ ধারা।

আহারের সময় যাহা ভাল লাগে সন্তানের হাতে পরম আদরে তুলিয়া দেন হরসুন্দরী। সানন্দে চার-পাঁচ গ্রাস মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন কুলদানন্দ। তিনটার সময়ে মহাভারত পাঠ করেন—হরসুন্দরী পাড়া-পড়শীদের লইয়া গভীর শ্রদ্ধায় তাহা শ্রবণ করেন। অপরাহ্নে জননী সমস্ত গোছাইয়া দিলে রান্না করেন।

তাঁহার আসিবার পর হইতে প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ীতে আরম্ভ হয় মহোৎসব। পাড়ার বাউল, বৈষ্ণব, নমশূদ্রেরা খোল-করতাল আনিয়া সুরু করে নাম-সংকীর্তন। সকলের সঙ্গে নামানন্দে বড়ই আনন্দলাভ করেন কুলদানন্দ।

উদয়াস্ত প্রখর রৌদ্রতাপে সূর্যমুখী হইয়া সূর্যপূজা করেন হরসুন্দরী। দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় কুলদানন্দ অভিভূত হইয়া যান। রাত্রি দশটায় মায়ের শয়নঘরের বারান্দায় শুইয়া পড়েন। তাঁহাকে কচি ছেলের মত কোলে করিয়া বসেন জননী নিদ্রা না আসা পর্যন্ত গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটে মন্ত্র পড়িয়া পেটে আঙ্গুলের টোকা দেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন কুলদানন্দ ঃ মা, ও কী কর ?

ঃ রক্ষা বেঁধে দি।

ঃ কেন, ওতে কী হয় ?

ঃ জানিস নে ? এতে ঘুমের সময় কোন আপদ-বিপদ ঘটে না, ভূত-প্রেত অপদেবতায় কোন ক্ষতি করতে পারে না। ডেয়ে-পিঁপড়া, ইঁদুর-বিড়ালেও কামড়ায় না। এখন আর কথা বলিস নে – চোখ বুজে ঘুমো।···

আশ্চর্য! ঘুমের ঘোরেও যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে, তাহার জন্যও মায়ের কত চিন্তা,···কত না চেষ্টা! জননীর অপরিসীম স্নেহে কুলদানন্দের চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়। মনে হয়—আহা! এমন মায়ের কোলে জন্মেছি বলেই তো ঠাকুর আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর দেবদুর্লভ শ্রীচরণে।···

গুরুভ্রাতা কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতার বাড়ী বরিশালে বানরিপাড়ায়। সেখানে যাইবার জন্য বার বার চিঠি লিখিতেছেন কুঞ্জ বাবু।

এমন সময় একটী স্বপ্ন দেখিলেন কুলদানন্দ ঃ ঠাকুরের কৃপায় কুঞ্জবাবুর স্ত্রী কুসুম কুমারীর অলৌকিক অবস্থা—তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার হস্তে অন্নগ্রহণের জন্য যেন সেখানে গিয়াছেন তিনি। কুসুম ভিক্ষা হস্তে দ্বারে উপস্থিত। শুভ্র-উজ্জ্বল মূর্তি এক মহাপুরুষ সহসা প্রকাশিত হইয়া কুসুমের দেহে

বিলীন হইয়া গেলেন। কুসুমের স্কন্ধদেশে দেখা গেল মহাপুরুষের হাত দুখানি—কুসুম চতুর্ভুজা হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষান্ন প্রদান করিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।…ইহার পর বানরিপাড়া যাইবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল।

জননীর স্নেহক্রোড়ে পরমানন্দে কাটিল প্রায় এক মাস। ইহার পর বানরিপাড়া রওনা হইলেন কুলদানন্দ।

বরিশাল পৌছাইলে গুরুভ্রাতা অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রণীত 'ভক্তি যোগ' পুস্তক উপহার দিলেন। পুস্তকখানা খুলিবা মাত্রই কুলদানন্দের চোখে পড়িল: 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—ভোগের দ্বারা কামের উপশম হয় না।…কুলদানন্দ বলিলেন: দাদা! বৈধ ভোগে কামের নিবৃত্তি হয়—এটা শাস্ত্রবাক্য।

অশ্বিনীবাবু: ঐ শ্লোকও তো শাস্ত্রেরই। ভোগের নিবৃত্তি হ'লে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ভূয়া এবাভিবর্দ্ধতে' এ কথার তাৎপর্য থাকে না।

: ঐ শ্লোকে 'ভোগের' কথা নেই—'উপভোগের' কথা আছে। স্বেচ্ছাচারে ভোগই উপভোগ, তাতে শাম্য হয় না; কিন্তু বিধিসম্মত ভোগে শাম্য হয়।…

ক্ষণকাল নীরব রহিলেন অশ্বিনীবাবু। বলিলেন: ভুলই হয়েছে—আগামী সংস্করণে সংশোধন করে দেব।

ক্ষণকাল পরে অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন: আচ্ছা ভাই, আত্মার উন্নতি হচ্ছে কিসে বুঝব?

: আপনি কী বুঝেছেন বলুন।

: সত্য, দয়া, বিনয়, সরলতা, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখা গেলে আত্মার উন্নতি হচ্ছে মনে হয়।

: কিন্তু ভয়ে বা প্রশংসার লোভে অনেকে ঐসব সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে পারে। আমার মনে হয়, যাঁর চিত্ত গুরুতে আকৃষ্ট তাঁরই আত্মা উন্নত।

: কোন্ যুক্তিতে?

: গুরু সর্বগুণাধার—গুরুতে আকর্ষণ হলে চিত্ত সদগুণে আকৃষ্ট হয়। তখন অন্তর হয় সৎমুখী, আর তাহলেই আত্মা হবে উন্নত।

: বাঃ—বেশ বলেছ ভাই, বেশ বলেছ।

বস্তুতঃ, কুলদানন্দের অন্তর সর্বদাই গুরুমুখী—মূল তত্ত্বসন্ধানে নিরত। ফলে, অন্য সমস্ত তত্ত্বই তাঁহার নিকট পরিস্ফুট।

বরিশালে পাঁচ-ছয় দিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আনন্দে কাটিল। কুলদানন্দ রওনা হইলেন বানরিপাড়া। ষ্টীমার ঘাটে গুরুভ্রাতারা সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া লইয়া গেলেন কুঞ্জ বাবুর বাড়ী। দোতালায় নির্জন ঘরে আসন পাতিয়া দিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে কুসুম কুমারী আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার সহিত কুলদানন্দের এই প্রথম সাক্ষাৎ। সরলতা মাখা পবিত্র মূর্তি দর্শনে বড়ই আনন্দলাভ করিয়া বলিলেন: কুসুম! আজ তোমার হাতে আমার ভিক্ষা। এখন চা নিয়ে এস।

: ঠাকুরের আদেশে আপনার জন্য ভিক্ষান্ন রেখেছি, চা'ও তৈরি করেছি।

চা আনিয়া দিলেন কুসুম কুমারী। শুষ্ক অন্নপ্রসাদ হাতে-দিয়া বলিলেন: এই নিন ভিক্ষা—ঠাকুর আপনার জন্য রাখতে বলেছিলেন।

চা-পান করিতে করিতে কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন: কুসুম! অন্নপ্রসাদ কোথায় পেলে? ঠাকুরই বা এই প্রসাদ আমায় দিতে বলেছেন কেন?

কুসুম সবিনয়ে জবাব দিলেন: একদিন ভাতের হাড়ি উনুনে চাপিয়ে আগুন ধরাতে বসলাম। ভিজে কাঠ উনুনে দেওয়ায় আগুন নিভে যেতে লাগল। বার বার ফুঁ দিতে দিতে চোখ জ্বালা করতে লাগল, মাথাও ধরল। বড় কষ্ট দেখে ভগবতী অন্নপূর্ণা প্রকাশিত হ'লেন—তাঁর আদেশে আমি স'রে বসলাম। কতক্ষণ পরে দেখি উনুনে আগুন নেই, অথচ ভাত ফুটছে।... আমি ফেন ঝরিয়ে অন্ন ঠাকুরকে নিবেদন করলাম। ঠাকুর প্রকাশিত হয়ে বললেন—ব্রহ্মচারী আসছেন, এক গ্রাস তাঁর জন্য রেখে দেও।...তাই অন্নপূর্ণার রান্না অন্নই একগ্রাস শুকিয়ে আপনার জন্য রেখে দিয়েছি।...

কুঞ্জবাবুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন কুলদানন্দ। কুঞ্জবাবু বলিলেন: সেদিনের কথা জীবনে ভুলব না। অগ্নিশূন্য রান্না—সত্যি অদ্ভূত ব্যাপার! আমার সাক্ষাতেই এই ঘটনা ঘটে।...

প্রসাদ পাইবার জন্য স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন কুলদানন্দ। এত বড় অলৌকিক ব্যাপারেও আজ আর বিস্মিত হইলেন না। ইতিমধ্যে তিনি নিজেও প্রবেশ করিয়াছেন অপার রহস্যের গোলোক ধাঁধায়। তাই বিস্ময়ের ঘোর তাঁহার কাটিয়া গিয়াছিল। শুধু একটা অনির্বচনীয় ভাবস্রোত প্রবাহিত হইল তাঁহার অন্তরে। কুসুমের নিকট হইতে অন্নপূর্ণার রান্না কিছু অন্ন চাহিয়া লইয়া তিনি ঝোলায় রাখিয়া দিলেন।...

বানরিপাড়া আসিয়া নিয়মিত চলিয়াছে নিত্যকর্ম। সাধন-ভজন, পাঠ ইত্যাদিতে কাটিতে লাগিল বেলা দুইটা পর্যন্ত। তিনটা হইতে গুরুভ্রাতারা আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন—সময় কাটিতে লাগিল বড় আনন্দে।

অপরাহ্নে গুরুভ্রাতারা একদিন সাগ্রহে বলিলেন: ভাই, আজ তুমি রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দেও—আমরা প্রসাদ পাব।…তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিলেন সাত সের চা'ল, পাঁচ সের ডাল ও প্রচুর তরিতরকারী। ঠাকুরের নামে রান্না চাপাইলেন কুলদানন্দ। চা'ল-ডাল সিদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু হাঁড়ির উপরে জল রহিল তিন-চার ইঞ্চি। গুরুভ্রাতারা বলিলেন: আজ সরবৎ খাওয়া যাবে।·· কুলদানন্দ হাঁড়ি নামাইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। ভোগ লাগাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিয়া দেখিলেন খিচুড়িতে এক ফোটাও জল নাই।…সকলে প্রসাদ পাইয়া লাভ করিলেন পরম তৃপ্তি।

কুলদানন্দের মনে পড়িল ঠাকুরের কথা: ব্রহ্মচারীর মত সুস্বাদু অন্ন কেউ খায় না।…আজ প্রত্যক্ষ করিলেন ঠাকুরের অপার কৃপার কণা।·· সেই কৃপাতেই খিচুড়ি আজ এত সুস্বাদু, সকলের এত তৃপ্তিকর।…

গুরুভ্রাতাদের অনুরোধে এক-একজনের বাড়ীতে ভিক্ষা চলিয়াছে প্রতিদিন। এই ভিক্ষা যেন এক মহোৎসব। প্রতিদিন খিচুড়ি প্রসাদ পাইতে তাঁহাদের কত না আনন্দ।

একদিন কুসুম আসিয়া বলিলেন: আপনি তো বেশ! একদিনও আমার কাছে ভিক্ষা কচ্ছেন না? আমার কষ্ট হয় না?

: বেশ, আজ তোমার হাতেই আমার ভিক্ষা। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট জিনিষ দেবে যা কখনও খাই নি।

: আচ্ছা—তাই হবে।

বেলা দুইটা পর্যন্ত চলিল নিত্যকর্ম। তারপর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সানন্দে চলিল সদালাপ। অপরাহ্নে কুসুম আসিয়া ডাকিলেন। কুঞ্জ ও কুসুমের সঙ্গে নীচে গেলেন কুলদানন্দ। দেখিলেন ভোগরান্নার সমুদয় উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত। সন্ধ্যায় খিচুড়ি চাপাইলেন। কুঞ্জ ও কুসুম সানন্দে বলিতে লাগিলেন গুরুদেবের অসামান্য কৃপার কথা। কুলদানন্দেরও মন সরস হইয়া উঠিল। ভাবিলেন: আহা! কবে কুঞ্জ-কুসুমের মত ঠাকুরের অনুগত হব?…

কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন : কুসুম! আহার ত্যাগ তোমার কী করে হ'ল? মুনিঋষিরা আহার ত্যাগ করে সমাধিতে থাকতেন। কিন্তু এ যুগে আহারত্যাগী কেউ আছেন এমন তো শুনি নি। তাছাড়া, সমস্ত দিন তোমার বিশ্রাম নেই—তবু আহার ত্যাগে কী করে সিদ্ধিলাভ করলে?...

কুসুম : একদিন রান্না করে সকলকে খাওয়াবার পর অনেক বেলায় বাসন নিয়ে ঘাটে গেলাম। দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে ফেলে ঠাকুরকে স্মরণ করতে লাগলাম। দয়াল ঠাকুর অমনি দেখা দিলেন। আমি কেঁদে বললাম—বাবা, বড় অসহ্য ক্ষুধা। ফুল-তুলসী আমার কিছু নেই, আজ এই ক্ষুধাকেই পদ্ম মনে করে তোমার শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলাম। আমাকে আশীর্বাদ কর।...ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে চেয়ে থেকে ঠাকুর অন্তর্ধান হ'লেন। সেই থেকে আর আমার ক্ষুধা-পিপাসা নেই। এ শুধু ঠাকুরের কৃপা।...

আনমনে অমৃতকথা শুনিতে থাকেন কুলদানন্দ। খিচুড়ি রান্না হইয়া গেলে ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। সকলেই দয়াল ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন একান্ত মনে। কুলদানন্দ কুসুমকে বলিলেন : এবার আমরা আনন্দ করে প্রসাদ পাই—আর তুমি বসে দেখ।

করযোড়ে সাশ্রুনয়নে বলিলেন কুসুম কুমারী : দাদা! দয়া করে আজ আমার একটা বাসনা পূর্ণ করুন।—

: আচ্ছা বল—ক্ষমতা থাকলে নিশ্চয় করব।

: আপনি যখন বাড়ী ছিলেন, তখন একদিন দেখলাম আমার কাছে এসে আপনি বললেন—'আমার ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খাবার দেও।' আমার কাছে ঠাকুরের প্রসাদ ছিল। আমি তাই এনে আপনার মুখে দিতে লাগলাম—আর খুব আনন্দের সঙ্গে আপনি খেতে লাগলেন।

কুলদানন্দের মনে পড়িল নিজের স্বপ্নের কথা। বলিলেন : আমাকে তো আর কখনও দেখনি। ভিক্ষার সময় আমার কি ঠিক এই রূপই দেখেছিলে?

: ঠিক এই রূপ। তবে কপালে বিভূতির ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ছিল না—ছিল সিঁদূরের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র।

অপূর্ব যোগাযোগ।...বাড়ীতে থাকিবার সময় সত্যই তিনি গুরুদেবের চরণ-রুলি দ্বারা লাল ঊর্ধ্বপুণ্ড্র করিয়াছিলেন। যারপরনাই বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন ঠাকুরের ইচ্ছাতেই কুসুমের এই অপূর্ব অনুরোধ!... হৃদয়ে-হৃদয়ে বহিয়া গেল আনন্দের প্রস্রবন। সাগ্রহে বলিলেন : আমাকে

তুমি নিঃসংকোচে হাতে ধরে খাইয়ে দেও—আমিও খুব আনন্দ পাব।··· তোমার হাতে ঠাকুরের প্রসাদ বহুভাগ্যে লাভ হয়।···

শ্রীগুরুকে প্রণাম জানাইয়া স্বামীর সম্মতি গ্রহণ করিলেন কুসুম কুমারী। নিমেষে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে পা-দুখানি ছড়াইয়া বসিলেন কুলদানন্দের পাশে। দুই হস্তে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া কোলে বসাইলেন—তাঁহার মস্তক বাম বাহুর উপরে রাখিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন।···নিঃসংকোচে বার বার যথেচ্ছ আদর করিতে লাগিলেন।···ভাবাবেশে এক একবার ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন কুলদানন্দের উপর।···কুঞ্জবিহারী তখন অভিভূতভাবে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিলেন সুমধুর ইষ্টনাম। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কুলদানন্দের মুখে প্রসাদ দিতে লাগিলেন আত্মহারা কুসুম কুমারী।

কুলদানন্দও তখন মন্ত্রমুগ্ধ।···বাস্তবে রহিয়াও তিনি যেন কোন্ দিব্যলোকে আনন্দ-সাগরে ভাসমান। কুসুম কোলে টানিয়া লইতেই মনে হইল যেন ঠাকুরের কোলে বসিয়াছেন।···ঠাকুরের দেহের পদ্মগন্ধে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। অনুভব করিলেন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের অনুপম স্পর্শ।··· অভিভূত আনন্দে মনে হইল ঠাকুরের কোলে শয়ন করিয়া তাঁহারই শ্রীহস্তে তিনি গ্রহণ করিতেছেন মহাপ্রসাদ।···এই ধ্যানযোগে পরমানন্দে বিলুপ্ত হইল তাঁহার সমস্ত বাহ্যস্মৃতি।···শুধু রহিল একমাত্র স্পর্শানুভূতি, আর অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ!···

পরক্ষণে কুলদানন্দ দেখিলেন শ্রীগুরু কুসুমের ক্রোড়ে অর্ধশায়িত। কুসুম তাঁহার মুখে খিচুড়ি তুলিয়া দিতেছেন, আর ঠাকুর আনন্দে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখের সে কী অপরূপ শোভা,···কী অপূর্ব দ্যুতি!··· অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে কুলদানন্দের বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইল।

প্রায় এক ঘন্টা সকলে নিমজ্জিত রহিলেন এই অপার অলৌকিক আনন্দ সাগরে। পরে ভাবাবেশে কুঞ্জবিহারী 'জয়গুরু, জয়গুরু' বলিয়া উঠিলে সংজ্ঞালাভ করিলেন কুলদানন্দ। কুসুমও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার সমাধিস্থ হইলেন। কুলদানন্দ ঘরের মেঝেতে কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন: এ কী হ'ল!···এ কী দেখলাম!··· জয় দয়াল গুরুদেব! এই অপূর্ব অনুভূতির কথা যেন কখনও ভুলে না যাই— তোমার এই অনন্ত কৃপার কথা যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকে।···

॥ চব্বিশ ॥

কুঞ্জ-কুসুমের সঙ্গলাভে দুই সপ্তাহ কাটিল মধুর আনন্দে। কুঞ্জবাবুর নিকট শুনিলেন, বহু গুরুভ্রাতা-ভগ্নীদের লইয়া গুরুদেব প্রয়াগ চলিয়া গিয়াছেন। অমনি গুরুদেবের নিকট যাইবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কুসুম কুমারীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কুঞ্জবাবুর সাথে রওনা হইলেন। কলিকাতা পৌছিলে ছোটদাদা সারদাকান্ত কুম্ভমেলায় যাইতে চাহিলেন। কয়েকটী টাকা ভিক্ষা করিয়া রওনা হইলেন পুণ্যধাম প্রয়াগ।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌছিলেন রাত্র নয়টায়। এতক্ষণে খেয়াল হইল কেহই গোসাঁইজীর ঠিকানা জানেন না। ইহা লইয়া কুঞ্জ ও অশ্বিনী বৈরাগীর মধ্যে চলিল বাকৃবিতণ্ডা। অবশেষে শীতের রাত্রে ঝোলাঝুলি লইয়া কুলদানন্দের সঙ্গে চলিলেন সকলে। কুলদানন্দের ধারণা—বেশী খুঁজিতে হইবে না, ঠাকুরই তাঁহাদের খুজিতেছেন। কিছুদূর যাইবার পর সত্যই পাশের বাড়ী হইতে কানে আসিল : ব্রহ্মচারি, আমি এখানে—এস।···গোসাঁইজীর সন্ধান পাইয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। গুরুদেবকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন কুলদানন্দ।

পরদিন অপরাহ্নে তিনি গোসাঁইজী ও গুরুভ্রাতাদের সহিত বাসা হইতে বাহির হইলেন। অনেক দূর হাটিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন গঙ্গাতীরে। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম। শুভ্রবর্ণা গঙ্গা ও নীল যমুনার মিলন স্থান পরিষ্কার রেখার মত, আর সরস্বতী অন্তঃসলিলা। দুই স্রোতস্বতীর মাঝে এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ দুর্গ, ভিতরে হিন্দুধর্মের অক্ষয়কীর্তি 'অক্ষয় বট'। পুরাকালে এখানে ছিল ভরদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রম। বনগমন কালে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ কিছু সময় অবস্থান করেন এই আশ্রমে। অসাধারণ স্থান মাহাত্ম্যে প্রয়াগধাম ঋষিদের কাছে তীর্থরাজ। প্রতি বৎসর সমস্ত মুনিঋষি প্রয়াগ আশ্রমে সমবেত হইয়া কল্পবাস ও ত্রিবেণীতে স্নান করিতেন। সেই মহাসম্মিলন হইতেই কুম্ভমেলার উৎপত্তি। তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বারে, প্রয়াগে নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে ইহার অধিবেশন হয়। আধ্যাত্মিক ভারতের সার্থক পরিচয় মেলে এই ঐতিহাসিক মেলায়। অনুভব করা যায়, ভারতীয় ধর্ম ও

আধ্যাত্মিকতা কত প্রাণবন্ত। গোসাঁইজী কুলদানন্দকে বলিয়াছিলেন কুম্ভমেলা সাধুদের কংগ্রেস।...

কুম্ভমেলায় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের থাকিবার জন্য অনেকগুলি স্থান লইয়াছেন সর্বপ্রধান বৈষ্ণব নেতা। গোসাঁইগণের জন্যও এক বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে। স্থানটী দেখিয়া লইয়া সকলে বাসায় ফিরিলেন।

পরদিন ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া বেণীমাধব দর্শন করিলেন। এই স্থানে মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে দশদিন শিক্ষা দিয়াছিলেন। অপরাহ্নে সকলে নানা দেবালয় দর্শন করিলেন। গোসাঁইজীর নির্দেশে কুলদানন্দ কমণ্ডলু হস্তে সর্বদা থাকিতেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। প্রত্যহ গঙ্গাতীরে বা মেলাস্থানে যাইয়া সাধুদের দর্শন করিয়া আসিতেন। একদিন দর্শন মিলিল সাধু ন্যাঙাবাবার। নব্বই বৎসরের এই উলঙ্গ সাধু গোসাঁইজীকে সাদরে বসাইয়া স্তবস্তুতি করিলেন। বাসায় ফিরিয়া ন্যাঙাবাবার ভাবভক্তির প্রশংসা করিলেন গোসাঁইজী।

ঠাকুরের সঙ্গে নিজ পরিবার, আর এতগুলি গুরুভ্রাতা। প্রত্যহ বিরাট খরচ—অথচ ঠাকুরের আকাশ বৃত্তি। অবস্থাপন্ন গুরুভ্রাতাদের এবং স্থানীয় এক মাড়োয়ারীর দানে সবই চলিয়া যাইতেছে। কুলদানন্দ বুঝিলেন সত্যই ঠাকুরের বিচিত্র মহিমা।

মাঘ মাস আগতপ্রায়। লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী চড়ায় আসিয়া ছাউনি ফেলিয়াছেন, অনাবৃত স্থানেও আসন করিয়াছেন। একদিন অপরাহ্নে শিষ্য-পরিবৃত গোসাঁইজীও চড়ায় চলিলেন। পথে মাধোদাস বাবাজীর আশ্রমে মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রণত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন সকলে।

গোসাঁইজীর দিকেই ছায়াসঙ্গী কুলদানন্দের সদাসতর্ক দৃষ্টি। পুল ও চড়ার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন গুরুদেব। সতৃষ্ণনয়নে চড়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার আদেশে বাজিয়া উঠিল খোল-করতাল। কুলদানন্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন স্ফীত ও রক্তাভ হইল গুরুদেবের মুখমণ্ডল, ঘন ঘন কম্পিত হইল লম্বিত জটাভার।...সহসা ছুটিয়া আসিলেন দীর্ঘাকৃতি, মুণ্ডিত-মস্তক এক মহাপুরুষ।.. 'আও মেরা প্রাণ, আও মেরা প্রাণ'—বলিতে বলিতে গুরুদেবকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন। কুলদানন্দের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মহাপুরুষ গুরুভ্রাতাদের মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিলেন। উচ্চ সংকীর্তনে মহাভাবের তুফান বহিয়া গেল। অনেকে মহাপুরুষের চরণস্পর্শ করিলেন। কিন্তু কুলদানন্দের এক হস্তে গুরুদেবের দণ্ড, অপর হস্তে কমণ্ডলু—তাই ইচ্ছা

সত্ত্বেও তিনি চরণস্পর্শ করিবার সুযোগ পাইলেন না। তবুও মহাপুরুষ তাঁহার মস্তকে অভয় হস্ত বুলাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন পরক্ষণে। সংকীর্তনের মহাভাবে সেদিন অভিভূত হইলেন সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী। ছাউনিতে প্রবেশ করিয়াও সংকীর্তন চলিল কিছুক্ষণ। কুলদানন্দের অন্তরে থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল একটী প্রশ্ন : কে ঐ দিব্যকান্তি মহাপুরুষ ?... পরে গুরুদেবের নিকট জানিলেন, আজ আসিয়া আদর ও আশীর্বাদ করিয়া গেলেন পরমগুরু পরমহংসজী !...

সুরধুনী গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রয়াগধাম। পূর্বপারে সাধুদের ভজনস্থান ঝুঁসি। মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে দ্বীপের ন্যায় প্রকাণ্ড একটী চড়া। এই চড়াই কুম্ভমেলার স্থান। জমাট বালি-মাটীর এই চড়াটী প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দীর্ঘ। ঝুঁসিতে, প্রয়াগ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। দূর হইতে মনে হয় জনাকীর্ণ সুদীর্ঘ বন্দর। উভয় পার্শ্বে চারিদিকে অপূর্ব শোভা দর্শন করিলেন কুলদানন্দ।

সকলকে লইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী পরিক্রমায় বাহির হইলেন গোসাঁইজী। রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রতি নমস্কার করিয়া শশব্যস্তে আসন দিলেন বাবাজী। তাঁহারা যতক্ষণ বাবাজীর নিকট রহিলেন, কুলদানন্দের অন্তরে স্বতঃই 'নারদ নারদ' ধ্বনি উঠিতে লাগিল।...অন্যান্য চত্তরে ঘুরিয়া সকলে তাঁবুতে পৌছিলেন। রামযাদব বাগচি মহাশয় পূর্বেই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আজ মুর্তিদ্বয় বেদীতে স্থাপন করায় গোসাঁইজী সানন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাঁহার নির্দেশে উপবীত গ্রন্থি দিলেন কুলদানন্দ—গায়ত্রী জপ করিতে করিতে পরাইয়া দিলেন মহাপ্রভুর গলে। ফুলতুলসী ও সুন্দর মালা দ্বারা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে সাজাইয়া দেওয়ায় শোভা হইল চমৎকার। দরজার উপরে সুন্দর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইল :

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। ত্রিবেণী সঙ্গমে আজ মকর-স্নান। চড়াবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের অফুরন্ত আনন্দ। সকলেরই অঙ্গে বেশভূষা ও মালাতিলক।

বেলা দশটায় শিঙা ও বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সাধুদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ইষ্টদেবের জয়গান। বাহির হইল অপূর্ব স্নানযাত্রা—পুরোভাগে সুসজ্জিত

অশ্বারোহণে অগ্রণী মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি; পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, নাগা উদাসী, নানকপন্থী এবং সহস্র সহস্র বৈষ্ণবমণ্ডলী। ভক্ত-হৃদয়ে সর্বত্রই আজ মহাভাবের বিপুল বন্যা। ভাবনদীর সেই প্রচণ্ড প্লাবনে বুঝি অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান।...

লক্ষ লক্ষ ভক্তের সহিত গুরুদেব ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া পরমানন্দে পুণ্যতীর্থে পুণ্যস্নান করিলেন কুলদানন্দ। পাণ্ডাজী সংকল্প-মন্ত্র পড়াইতে জিদ করিলে বলিলেন গোসাঁইজী: আমাদের সংকল্প বিকল্প নাই—ভগবৎ-প্রীতিই আমাদের স্নানের উদ্দেশ্য।...সানন্দে কুলদানন্দের মনে হইল সত্যই কী মধুর সংকল্প গুরুদেবের।...

প্রয়াগ ধামে কুম্ভমেলায় সশিষ্য গোস্বামী প্রভু মাসাধিক কাল চড়ায় বাস করেন। তাঁহার নিত্য সাহচর্যে কুলদানন্দ সাধু-সন্ন্যাসীদের কত অপূর্ব কীর্তি দেখিলেন—শুনিলেন কত বিস্ময়কর কাহিনী। আধুনিক সভ্যজগতে একবার মাত্র চিকাগো সহরে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রতি তিন বৎসর অন্তর ভারতের এই ধর্ম সম্মিলন আপন বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে মহিমোজ্জ্বল।...কুম্ভমেলা ধর্মবিষয়ের নিছক আলোচনা সভা নয়; স্নান-তর্পণ, সাধন-ভজন, সাধুদর্শন, ধর্মোপদেশ গ্রহণ ধর্মের সর্ববিধ পবিত্র অনুষ্ঠানই এই মহামেলার প্রধান লক্ষ্য। কত জ্ঞানী-গুণী, কর্মী-ত্যাগী, কত ভক্ত-সাধক, মহাপুরুষ পূত চরণপাতে ধন্য করেন এই ধর্মমেলা। যে কোন অনুষ্ঠানে কয়েক সহস্র জন-সমাগমেই দেখা দেয় কত বাদ-বিসম্বাদ, অশান্তি-উদ্বেগ। কিন্তু আশ্চর্য যে, এই মহামেলায় মাসাধিক কাল ধরিয়া প্রায় দশ লক্ষ নরনারীর বিরাট সমাবেশেও নাই কোন বিতর্ক বা কোলাহল। অহোরাত্র সকলেই পরমানন্দে নিবিষ্ট ভগবৎ ধ্যানে, সাধন-ভজনে, শাস্ত্র ও সদালাপে। বিপুল জন-সমাগমে, আপন বৈশিষ্ট্যে ও মহিমায় ভারতের এই ঐতিহাসিক কুম্ভমেলা জগতের মধ্যে নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়।...কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, গোলক, বৃন্দাবন কী জানি না। পৃথিবীতে এমন আনন্দের স্থান কল্পনা করা মনুষ্যজীবনে অসাধ্য।...

প্রায় প্রতিদিন গুরুদেবের সহিত সাধুমণ্ডলী পরিক্রমা করেন কুলদানন্দ। তাঁহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে অধ্যাত্ম ভারতের এই বিরাট সমাবেশ। প্রথমে প্রবেশ করেন বৈষ্ণব ছাউনিতে। শ্রেণীবদ্ধ সহস্র সহস্র সাধুদের

সকলেই পূজা-পাঠ, জপতপে নিমগ্ন। দেখিয়া বড় ভাল লাগে কুলদানন্দের।

এক সাধুর দেহে জটা-মালা কিছুই নাই, পরিধানে মাত্র কাঠের কৌপীন। দেহ বলিষ্ঠ, কিন্তু সুকুমার মুখশ্রী, চাহনি স্নিগ্ধ ও সরল। স্বল্পভাষী, শিশুর মত আধ আধ কথা। গোসাঁইজীকে দেখিয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। গুরুদেবের নিকট কুলদানন্দ জানিলেন, পাঁচ শত বৎসর পূর্বে দেহকল্প করায় সাধুর যৌবন আজো অটুট। এই সিদ্ধ মহাত্মা ভরতের ভাবে রাম-উপাসক। প্রত্যহ গোসাঁইজীর নিকট বসিয়া করযোড়ে তাকাইয়া থাকিতেন—বলিতেন : হামারা সাক্ষাৎ রামজী।...সকলে সাধুকে বলিতেন 'ছোট কাঠিয়া বাবা'।

একদিন উপস্থিত ছিলেন এক বালক সন্ন্যাসী। আর একজন সন্ন্যাসী আসিলেন, গোসাঁইজীর সমাধি শ্রেষ্ঠ নয় বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। অমনি ধমক দিলেন তেজস্বী, গৌরবর্ণ বালক সন্ন্যাসী—শাস্ত্রপাঠে ভুল ধরিয়া পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিলেন। সমাধির নানা অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন : গোসাঁইজী যে অবস্থায় আছেন, মনুষ্যদেহে এর চেয়ে উন্নত অবস্থা লাভ হয় না।...মুহূর্তের জন্যও যে সমাধি লাভ হ'লে দেহ ছুটে যায়, সেই সমাধিও এঁর আয়ত্ব—দেহ থাকবে না বলে ইচ্ছা করেই সে অবস্থায় থাকেন না।... শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত।...কুলদানন্দের প্রশ্নে গোসাঁইজী বলিলেন : ইনি কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী। এক মৃত ব্রাহ্মণ বালকের দেহে প্রবেশ করে বাকি কর্মটুকু শেষ করে নিচ্ছেন।...

পরে সুরু হইল নানকসাহী সাধু দর্শন। ইঁহারা যেমন বীর, তেমনই ভজননিষ্ঠ। ভজন প্রভাবে সিংহতুল্য সাধুরা মেষের মত। মহান্তরা সাজসজ্জায় মহারাজা, আবার সর্বকার্যে অভ্যস্ত। তাঁহাদের সদাব্রত সহস্র সহস্র সাধুর জন্য উন্মুক্ত। পাঁচ-সাত দিন অসংখ্য সাধুদর্শনের পর কুলদানন্দের মনে হইল, নানকসাহীদের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের ভক্তি-বৈরাগ্যও অপূর্ব। গোসাঁইজী বলেন : এই সম্প্রদায়ে ধর্ম সর্বাপেক্ষা জীবন্ত। বিষয়গন্ধ থাকতে যথার্থ ধর্মলাভ হয় না। ভগবান যাকে দয়া করেন, যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের কাঙাল করেন।...

অতঃপর দর্শন করেন বিরাট সন্ন্যাসী-মণ্ডলী। ইঁহারা সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত, সুশ্রী ও সুবেশ। অস্ত্রধারী নাগাদের প্রহরায় আছেন বহু সন্ন্যাসিনী। এক তাঁবুতে রাজা ও সাহেবদের জন্য বহুমূল্য আসবাবপত্র, আর এক তাঁবুতে বাইনাচের আসর।...এত ঐশ্বর্য ও নৃত্যের আয়োজন ভাল লাগে না

কুলদানন্দের। গোসাঁইজী বুঝাইয়া বলেন: ভগবানের দরবারেও বাইনাচ হয়—নৃত্য একটী উৎকৃষ্ট ভজন। এখন আর সে সব নাই।

সাধুদের সদাব্রতে বিস্ময়কর শৃঙ্খলা। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ সাধুর উৎকৃষ্ট আহার চলিতেছে আশ্চর্যভাবে। কুলদানন্দ জানিলেন ধনকুবের ব্যক্তিরা নিত্য সরবরাহ করেন যাবতীয় বস্তু, আর শত শত সাধু নীরবে সর্বকার্যে নিযুক্ত।

গোসাঁইজীরও আকাশ বৃত্তি। তবু সদাব্রত প্রত্যহ আসিতেছে।

সহসা সদাব্রত বন্ধ হইল। কুলদানন্দ শুনিলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে সুরু হইয়াছে প্রবল আন্দোলন। গোসাঁইজীর প্রভাবে ঈর্ষান্বিত তাঁহার এক ব্রাহ্ম-বন্ধু ইহার পুরোধা। গোসাঁইজীকে সরাইবার জন্য দয়ালদাস স্বামীর খ্যাতনামা বাঙালী শিষ্যকে লইয়া সমস্ত সাধুমণ্ডলীতে তিনি সুরু করেন অপপ্রচার। প্রধান সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদের সভা বসিল। দয়ালদাস স্বামীর শিষ্য অভিযোগ করিলেন: (১) গোসাঁইয়ের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, সাধন-ভজন বৈষ্ণবধর্ম বিরোধী; (২) তাঁর গৌর-নিতাই বিগ্রহের পূজা অশাস্ত্রীয়; আর, (৩) স্ত্রীলোক, পুত্রকন্যা ও গৃহস্থ বাবুদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত থাকায় বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে তাঁর অবস্থান ঘোর আপত্তিকর।...

কিন্তু মহাশাস্ত্রজ্ঞ পরমানন্দ স্বামী প্রমাণ করিলেন: গোসাঁইজীর বেশভূষা, আচার-ব্যবহার ও সাধনভজন যথার্থই বৈষ্ণবশাস্ত্র-সম্মত।...প্রধান সন্ন্যাসী অমরেশ্বরানন্দ বলিলেন: গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পূজা শাস্ত্রসম্মত, কৃষ্ণ-বলরাম অবতার রূপে তাঁহাদের পূজা বাঙলা ও শ্রীবৃন্দাবনে সুপ্রচলিত।... সন্ন্যাসী-শিরোমণি ভোলাগিরি মহারাজ বলেন: পুত্রকন্যা ও স্ত্রীলোকের সংস্রব বর্জন সন্ন্যাসীর বিধি বটে; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিধি-নিষেধের বাইরে। গোসাঁইজীর সঙ্গ করে আমি জানি উনি সাক্ষাৎ সদাশিব আশুতোষ।...বৈষ্ণব চূড়ামণি কাঠিয়া বাবা বলেন: গোসাঁইজী তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায়—প্রেমকা অবতার! উন্‌কো ললাটমে হামেসা আগ্‌ ধক্‌ধক্‌ জ্বলতা হ্যায়। য্যায়সা প্রেমিক, ত্যায়সা হি সামর্থী! বৈষ্ণব লোকন্‌কা বিচমে ছাউনি কি হ্যায়, ইসমে তো বৈষ্ণব লোকন্‌কা মান বঢ়্‌ গিয়া হ্যায়—বৈষ্ণব লোকন্‌কা বহুৎ ভাগ্‌ হ্যায়।...

সত্যই অদ্ভুত ভগবানের লীলা!...ব্রাহ্ম-বন্ধুর ষড়যন্ত্রের ফলে দেখা দিল কল্পনাতীত প্রতিক্রিয়া। লক্ষ লক্ষ সাধুর মধ্যে সকলেই নিজ সম্প্রদায়ের

মহাত্মাদের লইয়া ব্যস্ত। গোসাঁইজী শতসহস্র সাধুদের দর্শন দিলেও জ্বলন্ত হুতাশন এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত ছিলেন যেন! সেজন্য বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেন কুলদানন্দ। কিন্তু সর্ব সম্প্রদায়ের নেতা ও মহান্তদের বিরাট সভায় ঘোষিত হইল প্রধান মহাত্মাদের অভাবনীয় সিদ্ধান্ত—তড়িৎ প্রবাহে তাহা প্রচারিত হইল লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর ভিতর।·· ফলে, নিত্য অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড় লাগিয়া গেল—আর গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব। এইভাবে দিকে দিকে প্রচারিত হইল সদ্‌গুরুর অপার মহিমা। কুলদানন্দ লিখিলেন: জয় ভগবান! জয় ঠাকুর! আশীর্বাদ করি চিরকাল তুমি সুখে থাক, জয়যুক্ত হও!···আনন্দবানে আত্মহারা চিরঅনুগত ভক্ত বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করিলেন প্রাণের দেবতাকে।···তাই শ্রীগুরুর উদ্দেশে স্নেহপ্রতিম শিষ্যের আজ এই অনুপম আশীর্বাদ।···

কুলদানন্দের নীলকণ্ঠ বেশ দেখিয়াও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন সাধু সন্ন্যাসীরা। তিনি কী বলিবেন জিজ্ঞাসা করিলে গোসাঁইজী বলিলেন: নামের সঙ্গে 'আনন্দ' যোগ করে বলো আর গুরুর নাম বলো অচ্যুতানন্দ।

এই প্রথম জানিলেন গুরুদেবের সন্ন্যাসের নাম অচ্যুতানন্দ। আজ হইতে তাঁহারও নাম হইল 'কুলদানন্দ'।···

পরদিন সর্বপ্রথম নিমন্ত্রণ হইল দয়ালদাস স্বামীর তাঁবুতে। তাঁহার বাঙালী শিষ্যটী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় গোসাঁইজীকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যই লজ্জিত স্বামিজীর এই আয়োজন।

বেলা এগারটায় গোসাঁইজী সশিষ্যে উপস্থিত হইলে করযোড়ে প্রণাম করিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন স্বামিজী। সকলের পরিচর্যায় নিযুক্ত করিলেন বাঙালী শিষ্যটীকেই। গোসাঁইজী গীতার ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলে উহা কণ্ঠস্থ থাকায় সোৎসাহে পাঠ করিলেন কুলদানন্দ। সংকীর্তনে ভাবাবেশে নৃত্য করিলেন গোসাঁইজী ও শিষ্যবৃন্দ। দর্শনার্থী বহু সাধু তাঁবু ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। অপরাহ্নে উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা ভোজন করাইলেন দয়ালদাস স্বামী। কাঙাল-দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া। একদিন রামদলের ভয়ে কাঙালীরা অর্ধভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যাওয়ায় স্বামিজী ত্যাগ করেন প্রধান শিষ্যকে। গুরুর আদেশে শিষ্য গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দেহ বিসর্জন করিতে গেলে তাঁহাকে বুকে টানিয়া স্বামিজী বলেন: ব্যাস—পুরা প্রায়শ্চিত্ত হোগিয়া, বাচ্চা।

শুনিয়া কুলদানন্দ লেখেন : গুরুদেব ! কবে আমাকে তোমার এরূপ অনুগত করিয়া লইবে ? কবে তোমাকে আমি যথার্থ আমার বলিয়া বুঝিতে পারিব ?...

একদিন গুরুদেবের সহিত সন্ন্যাসী দর্শনে রওনা হইলেন। মণ্ডলীর কিছু দূরে খড়ের গাদায় বসিয়াছিলেন এক পরমহংস। তাঁহাকে নমস্কার করিলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দ চিনিলেন, চড়ায় আসিবার দিন গুরুদেব পরিক্রমা করেন ইঁহাকেই। মহাত্মার নিকট তাঁহারা অর্ধঘন্টা বসিলেন। ভাবাবেশে মৌনী মহাত্মার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সজোরে নাম চলিল কুলদানন্দের প্রফুল্ল অন্তরে। মনে হইল, পরব্রহ্মে বিলীন হওয়ায় মহাত্মা এমনি শান্ত-সমাহিত। ইনি মৌনী বাবা নামে খ্যাত।

সন্ন্যাসী মণ্ডলীতে প্রধান তাঁবুর দ্বারে গিয়া স্তম্ভিত হইলেন কুলদানন্দ। স্বর্ণখচিত. মখমলের গদিতে এক স্বামিজী রাজবেশে সমাসীন। পাশেই জীর্ণ কম্বলে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। ধনীদের উপদেশ দিতে দিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন স্বামিজী। রাজসিক আড়ম্বরে তাঁহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ভাবের ভাণ মনে হয় কুলদানন্দের।...সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—দুই দিন চলিল অবিরাম বর্ষণ। তৃতীয় দিনে বৃষ্টির মধ্যেই আসিলেন এক কৌপীনধারী, গোসাঁইজীর নিকট করযোড়ে বসিয়া কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই মণ চাউল. ডাল, আটা, ঘৃত সবই আনিয়া দিতে বলিলেন দুইজন সহচরকে—পরক্ষণে ছুটিলেন অন্য তাঁবুতে। অপরাহ্ন হইতে সারারাত্রি শীত-বৃষ্টির মধ্যে নগ্নদেহে অবিরাম এই ছুটাছুটি—সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত, ক্ষতবিক্ষত !...কুলদানন্দ সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোসাঁইজী বলিলেন : ইনিই তোমার সেই বিলাসী সাধু—নাম সঙ্করারণ্য। পাশে ছিলেন এঁর গুরু—শিষ্যকে রাজবেশে সাজিয়ে আনন্দ কচ্ছিলেন। আর গুরুকৃপার কথা ভেবে শিষ্য অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছিলেন !...কুলদানন্দের চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল। ভোগ ও ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সেবার কী অপূর্ব নিদর্শন !

রাত্রি এগারোটা। এক সাহেব আসিতেই গোসাঁইজী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ আসনে বসাইলেন। বিস্মিত হইলেন কুলদানন্দ। সাধুদের যথেষ্ট মর্যাদা দিলেও গুরুদেব কাহাকেও নিজ আসনে বসিতে দেন না। কিছুক্ষণ মৃদু আলাপের পর সাহেব চলিয়া গেলেন। কুলদানন্দের প্রশ্নে গোসাঁইজী বলিলেন : ইনি সা সাহেব—আমার গুরুভ্রাতা। এখন জাতিবুদ্ধি নেই, পরমহংস অবস্থা। এঁর শক্তি অসাধারণ, এই ঝড়বাদলে এক ফোটা জল

গায়ে পড়েনি। আমাদের খবর নিতে এসেছিলেন। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন।...কুলদানন্দ বুঝিলেন গুরুভ্রাতা বলিয়াই ঠাকুরের এত সমাদর।...

হাসিয়া উঠিল শান্ত ধরণী। প্রতি চত্বরে সঞ্চারিত হইল নবজীবন।

তাঁবুতে আসিলেন মহাত্মা ভিখনদাস বাবাজী, গোসাঁইজী সাদরে পাশে বসাইলেন। প্রত্যহ পাঁচ-সাত শত লোকের সেবা হয় বাবাজীর আশ্রমে—অথচ তাঁহার আকাশবৃত্তি। গোসাঁইজীর প্রশংসায় বাবাজী বলিলেন: মা-গঙ্গার ন্যায় দান-স্রোতও ভগবৎ ইচ্ছায় চলেছে—আমি সেই গঙ্গায় হাত ডুবিয়ে পবিত্র হচ্ছি মাত্র।...বাবাজীর প্রেমপূর্ণ মূর্তি দর্শনে ধন্য হইলেন কুলদানন্দ।

অতঃপর ঠাকুরের সহিত গেলেন মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর দর্শনে। দর্শন মাত্রেই ভিতরে সতেজে নাম চলিল ফোয়ারার মত। তাঁহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে সাগ্রহে বসিতে দিলেন বাবাজী। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ, তপদীপ্ত—প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষুদুটী অশ্রুসিক্ত। তাঁহার আদেশে উপাদেয় কাবুলি মেওয়া দ্বারা তৈয়ারি চা আসিলে সহস্তে চা দিলেন বাবাজী। গোসাঁইজী বলিলেন এমন উৎকৃষ্ট চা তিনি কখনও পান করেন নাই। গুরুদেবের নিকট কুলদানন্দ জানিলেন: ইনি নাথ যোগিদের মহান্ত—অতি কঠোর সাধন বলে মহাসিদ্ধি লাভ করেন। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নেই।

এবার অবধুত মণ্ডলীতে গিয়া দেখিলেন এক তেজস্বিনী ভৈরবী। গোসাঁইজীকে 'আও বাবা গণেশ' বলিয়া তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। গোসাঁইজী বসিলে ভাবাবেশে মুগ্ধ হইলেন ভৈরবী, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করায় গণ্ডস্থল অশ্রুসিক্ত হইল। ভস্ম মাখা অঙ্গে উলঙ্গিনী যোগাসনে সমাসীন। দৃষ্টি বড়ই স্নিগ্ধ ও সুন্দর, শ্যামাঙ্গী হইলেও অপূর্ব সুশ্রী—যেন দেবী ভগবতী আবির্ভূতা! দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন কুলদানন্দ।

একদিন গঙ্গাতীরে এক মহাপুরুষের সন্ধান পাইয়া তাঁবুতে লইয়া আসিলেন। মহাত্মার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়িল তাঁহার উপর। সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া ঊর্ধরেতা হইবার জন্য একটি কবচ দিতে চাহিলেন। কুলদানন্দের মনে হইল: তাই তো একমাত্র কাম্য। কিন্তু ঠাকুর ছাড়া আর কেউ কি তা দিতে পারে? যদি দয়া ক'রে দেন তো ভাল।...মহাত্মা মন্ত্রঃপূত কবচ দিয়া ধারণ করিতে বলিলেন। কুলদানন্দ শুনিলেন: মহাত্মার বয়স তিন শত বৎসরের অধিক। দেবমুহূর্তে তিনি স্নান করেন মানস সরোবরে, বদ্রিনারায়ণ দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গল আরতি করেন, দ্বারকাতে

শ্রীশ্রীদ্বারকানাথজীর দর্শনান্তে হোম করেন ; অতঃপর প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানান্তে ফিরিয়া যান নিজ আসনে। ইহাই তাঁহার নিত্যকর্ম।…

মহাত্মা চলিয়া গেলে ঠাকুরকে নির্জ্জনে সমস্ত কথা বলিলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বলিলেন : তোমার খুব সৌভাগ্য! উনি বাকসিদ্ধ—যেমন বলেছেন ধারণ করলে সেই অবস্থা লাভ হবে। ইচ্ছে হ'লে আজই ধারণ করতে পার।

তবু ধারণ করিতে আগ্রহ হইল না, উহা ঝোলায় রাখিলেন কুলদানন্দ।

একজন পাঞ্জাবী আসিলে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন গোসাঁইজী। ভদ্র-লোকের পরিধানে সাদা বস্ত্র ও জামা, মস্তকে সাদা পাগড়ী। গৌর বর্ণ, সুদীর্ঘ দেহ—খুব তেজস্বী। নীরবে অর্ধঘণ্টা গোসাঁইজীর নিকট বসিয়া প্রণামান্তে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বড় ভাল লাগিল কুলদানন্দের। গুরুদেবের নিকট জানিলেন : ইনি কর্ণেল অল্‌কটের গুরু কৌথুম ঋষি।

অহোরাত্র গোসাঁই-সঙ্গে আছেন একটী সাধু। গোসাঁইজী বলেন ইনি অসাধারণ মহাপুরুষ, কিন্তু সাধুর কোন লক্ষণ বা ক্রিয়া ইঁহার নাই। কদাকার অঙ্গে ছিন্ন কৌপীন—পিশাচবৎ হইলেও ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ, প্রেমভক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ। শেষরাত্রে তিনি স্নান করেন সপ্ততীর্থে। তাঁহার নাম অর্জ্জুন দাস, গোসাঁইজী বলেন ক্ষ্যাপাচাঁদ। রাত্রে গুরুদেবের সম্মুখে তাঁহার স্তুতি ও মর্মভেদী ক্রন্দনে অধীর হইতেন কুলদানন্দ। ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সদ্‌গুরুর কৃপালাভের জন্যই সাধুর কত ব্যাকুলতা!…

পরে দর্শনলাভ করেন কালীকম্বলী বাবার। বয়স বারো শত বৎসরের অধিক, দেখিতে যুবকের মত। হিমালয় হইতে আসিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামী পান ; তাহা দ্বারা পর্বতে রাস্তা নির্মাণ, ধর্মশালা স্থাপন প্রভৃতি কার্য করেন। নিজের সম্বল একখানি কম্বল। প্রায়ই তিনি মৌনী থাকেন।

প্রধান সাধুদের ফটো লইতে আসেন একদল আমেরিকাবাসী। তাঁহারা আসিতেছেন শুনিয়া গোসাঁইজী বলেন : এখানে সাধুর ফটো নিতে চাইলে ব্রহ্মচারীকে দাঁড় করিয়ে দিও।…শুনিয়া বড় লজ্জিত হন কুলদানন্দ। কিন্তু প্রিয়তম সন্তানকে বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরাই গোসাঁইজীর উদ্দেশ্য। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, নীলকণ্ঠ কুলদানন্দ এখন প্রধান সাধুশ্রেণীভুক্ত।…

বহু ভৈরব-ভৈরবীর দর্শন মিলিল। গোসাঁইজী বলিলেন : রাত্রি একটা হ'তে চা'রটা পর্যন্ত সাধনের শ্রেষ্ঠ সময়—এই সময়ে নাম করলে সাধনের মর্ম উপলব্ধি করা যায়।…পরে তান্ত্রিকদের উলঙ্গ যুবতী-পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করেন।

কুলদানন্দের মনে পড়ে বাড়ীতে নিজের এইরূপ পূজার কথা। জিজ্ঞাসা করেন : আমাদের সাধনে কি স্ত্রীলোক নিয়ে পূজা আছে ?

: খুব আছে—সাধন করে যাও, সব জানতে পারবে।···নামযোগে এক একটি চক্র ভেদ হ'লে পদ্ম প্রকাশিত হয়—তার ভিতর এক-একটী কুটির দ্বারে রূপসী দেবীরা থাকেন। তাঁদের ছলা-কলায় না ভুলে মাতৃজ্ঞানে পূজা করলে চক্রভেদ করা যায়। ক্রমে পরমা সুন্দরী দেবীরা এসে কঠোর পরীক্ষা করেন। তখন একমাত্র গুরুকৃপায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এইরূপ বাহাত্তর হাজার চক্রের মধ্যে প্রধান দশটী ভেদ করতে পারলে জীবন সার্থক !···

মৌনী বাবা ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ চাহিলে গোসাঁইজী জানান : সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা না হলে ব্রহ্মদর্শন হয় না। ধ্রুব, ঈশা, শ্রীচৈতন্য সকলেই দীক্ষিত। দীক্ষা অন্তে সমস্ত বাসনা দূর হ'লেই ব্রহ্মদর্শন হয়। ভগবানের সমস্ত কার্য নিয়মাধীন—ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অবার্থ নিয়ম !···

কুলদানন্দ বুঝিলেন এই অমূল্য উপদেশ ভক্ত মাত্রেরই প্রধান পাথেয়। কীর্তনের সময় গুরুদেবের সর্বাঙ্গে প্রত্যক্ষ করিলেন সাত্ত্বিকভাবের নানা খেলা। এক সন্ন্যাসী প্রকাশিত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন গুরুদেবকে—পরে নিত্যানন্দ বিগ্রহের গলার মালা ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন। ঠাকুরের নিকট জানিলেন, স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।···

২৪শে মাঘ। কুম্ভস্নানের শেষ দিন। লক্ষ লক্ষ সাধুর নানা বাদ্য ও জয়ধ্বনিতে মুখরিত দিগদিগন্ত। পরমানন্দে স্নান করিলেন সকলেই—একমাত্র ব্যতিক্রম সশিষ্যে গোসাঁইজী। মাঘ মাসে চড়া ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ ছিল পরমহংসজীর।

মাঘী সংক্রান্তিতে সাধুদের স্নানকার্য সমাপ্ত হইল। আসন্ন বিদায়ক্ষণে সকলের মুখশ্রী বিষাদমলিন। ১লা ফাল্গুন ছাউনি গুটাইবার ধূম পড়িল। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ বিসর্জন দিয়া সকলের সহিত চড়া ছাড়িয়া চলিলেন কুলদানন্দ।

পুলের নিকট আসিয়া ফিরিয়া চাহিলেন চড়ার দিকে। লক্ষ লক্ষ সাধুর ব্যাকুল আরাধনার পুণ্যধামে পড়িয়া রহিবে শূন্যভূমি। তবু থাকিয়া যাইবে লক্ষ সন্ন্যাসীর চরণস্পর্শ। অশ্রুসজল চক্ষে কুলদানন্দ গুরুদেবের সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ দিয়া লুটাইতে থাকেন চড়ার ধূলায়।···

সেই পুণ্যভূমি পশ্চাতে রাখিয়া ফিরিয়া চলিলেন সকলে। চড়াবাসের প্রথম হইতে প্রতিটী দিনের স্মৃতি মনে পড়ে কুলদানন্দের। লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলায়, মহাপুরুষদের বিস্ময়কর পরিচয়ে উন্মোচিত অধ্যাত্ম ভারতের বিরাট রহস্য। বাহ্যিক দৈন্য বা চাকচিক্যে সে পরিচয় মেলে না—বীর্যবত্তা ও বৈরাগ্যের মহিমায় তাঁহারা মহীয়ান। সর্বোপরি, গুরুদেবের মধ্যে উপলব্ধি করেন অনন্ত মাধুর্য ও ভাববৈচিত্র্যের অপূর্ব সমাবেশ। কুম্ভমেলায় আসিয়াই তিনি আবিষ্কার করেন: পরম দয়াল শ্রীগুরু সর্বপ্রধান মহাত্মাদেরও মাথার মণি,…সহস্র সহস্র সাধুদেরও পরিত্রাতা।…এমনকি পরমহংসজী ও নিত্যানন্দ প্রভুও আবির্ভূত হইয়া শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেন গোসাঁইজীকে। তিনি সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্বলন্ত প্রতীক, নব্য ভারতের উজ্জ্বলতর আদর্শ।…এই উপলব্ধির প্রেরণায় কুলদানন্দের সাধন জীবনে সূচিত হইল নূতন অধ্যায়। এখানেই গোসাঁইজী তাঁহাকে মনোনীত করেন প্রধান সাধুরূপে, ভূষিত করেন চিরমধুর 'কুলদানন্দ' নামে। সর্বদিক দিয়াই তাঁহার অন্তর্লোকে কুম্ভমেলার প্রভাব সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে দিব্য মহিমায়।…

দারাগঞ্জের বাসা। পরদিন চা-সেবার পর নির্জনে গোসাঁইজী বলিলেন: ব্রহ্মচারি, মহাপুরুষের দেওয়া কবচটি ধারণ করলে না, ফেলে রাখলে?

আরো একদিন এই প্রশ্ন করেন গোসাঁইজী। আজ নিজের ভুল বুঝিয়া কুলদানন্দ কবচটি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন: আপনি দয়া করে আমাকে গ্রহণ করেছেন। তবু এ দুর্মতি কেন হ'ল? অন্যের দেওয়া বস্তু নিয়ে গুরুতর অপরাধ করেছি। এখন আমি কী করব?

গোসাঁইজী ছল-ছল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন: অন্য কারো দিকে তাকাতে হবে না—যা কিছু দরকার সব এখান থেকেই পাবে।…

নিশ্চিন্ত ভরসায় প্রাণ জুড়াইয়া গেল কুলদানন্দের।

গুরুভ্রাতারা আসিলে কুম্ভমেলার সাধুদের প্রশংসা করিলেন গোসাঁইজী। তখন অনেকেই নিজেদের শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ করিলেন। একজন বলিলেন: সাধন তো কিছুই হ'ল না—আমাদের কী গতি হবে?

গোসাঁইজী: তোমাদের গতি যদি তোমরাই করবে, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টা এভাবে আমি বসে আছি কেন? তোমরা তো রাজপুত্র—পেট ভরে খাবে, মন ভরে হাগবে। তোমাদের আর চিন্তা কী?…

শ্রীগুরুর মধুর অভয়বাণী।...অকূলে কূল পাইলেন সকলে। আর, ঠাকুরের অসীম স্নেহে অশ্রুসিক্ত হইলেন কুলদানন্দ।

১৫ই ফাল্গুন প্রেমসখির বিবাহ। গোসাঁইজীর আদেশে পূর্বেই বস্তিতে চলিলেন কুলদানন্দ। দাদার নিকট রহিলেন দশদিন। পরে গেলেন ভাগলপুরে, কয়েক দিন কাটিল বহুস্মৃতি বিজড়িত পুলিনপুরীতে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩০০। মহাপ্রভুর আবির্ভাব লগ্ন। চারিশত বৎসর পরে অবিকল সেই পুণ্যলগ্নে সারা নবদ্বীপে সুরু হইল সংকীর্তন মহোৎসব।

গঙ্গাতীরে আজ মহাভাবের বন্যা। সশিষ্যে নৃত্যোন্মত্ত গোসাঁইজীর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল : জয় শচীনন্দন!...অমনি চতুর্দিকে উঠিল লক্ষকণ্ঠের প্রতিধ্বনি : জয় মহাপ্রভু।...সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যে ভাবাবিষ্ট হইলেন কুলদানন্দ।

চন্দ্রগ্রহণ কালে সমাধিস্থ গুরুদেবের সহিত নিবিষ্ট রহিলেন সরস নামজপে। মুক্তিস্নান অন্তে সংকীর্তন করিতে করিতে সকলে গেলেন টোলবাড়ীতে।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে নব গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে সশিষ্যে নিমন্ত্রিত হইলেন গোসাঁইজী। বালক গৌরাঙ্গ প্রকাশিত হইয়া সোনার নূপুর ও বালার বায়না ধরিলে তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন গোসাঁইজী।...বিগ্রহের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া আত্মহারা হইলেন কুলদানন্দ—প্রত্যক্ষ করিলেন মৃন্ময় মূর্তিতে চিন্ময়ের অপূর্ব লীলা।...কীর্তনের সময় শ্রীগুরুর ভাগবতী তনুতেও দর্শন করিলেন নানা প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ।

নবদ্বীপ হইতে গুরুদেব ও গুরুভ্রাতাদের সহিত শান্তিপুর গমন করেন কুলদানন্দ।

এই সময়ে তিনি উপনীত হইলেন সংগ্রাম ও শান্তি, সাধনা ও সিদ্ধির পরম সন্ধিক্ষণে। নিত্য ক্রিয়াশীল ও সমস্যাসঙ্কুল সাধন-জীবন হইতে ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন শান্ত-সংযত অন্তর্লোকের প্রবেশদ্বারে।.. পশ্চাতে রহিল কঠোর সংগ্রামের কত তিক্ত অভিজ্ঞতা, অপ্রাকৃত সাধনার শ্রদ্ধামণ্ডিত কত মধুর স্মৃতি;...আর সম্মুখে পূর্ণতা লাভের সংহত আকাঙ্ক্ষা, মহাসিদ্ধির পথে অগ্রগতির দিব্য প্রেরণা।...তীব্র হলাহল পান করিয়া উত্তরকালে অমৃত পরিবেশনের মাধ্যমেই নীলকণ্ঠের দিব্য জীবনে দেখা দিবে সার্থক পরিণতি!...

নীলকণ্ঠ

যোগিরাজ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

নীলকণ্ঠ

যোগিরাজ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ